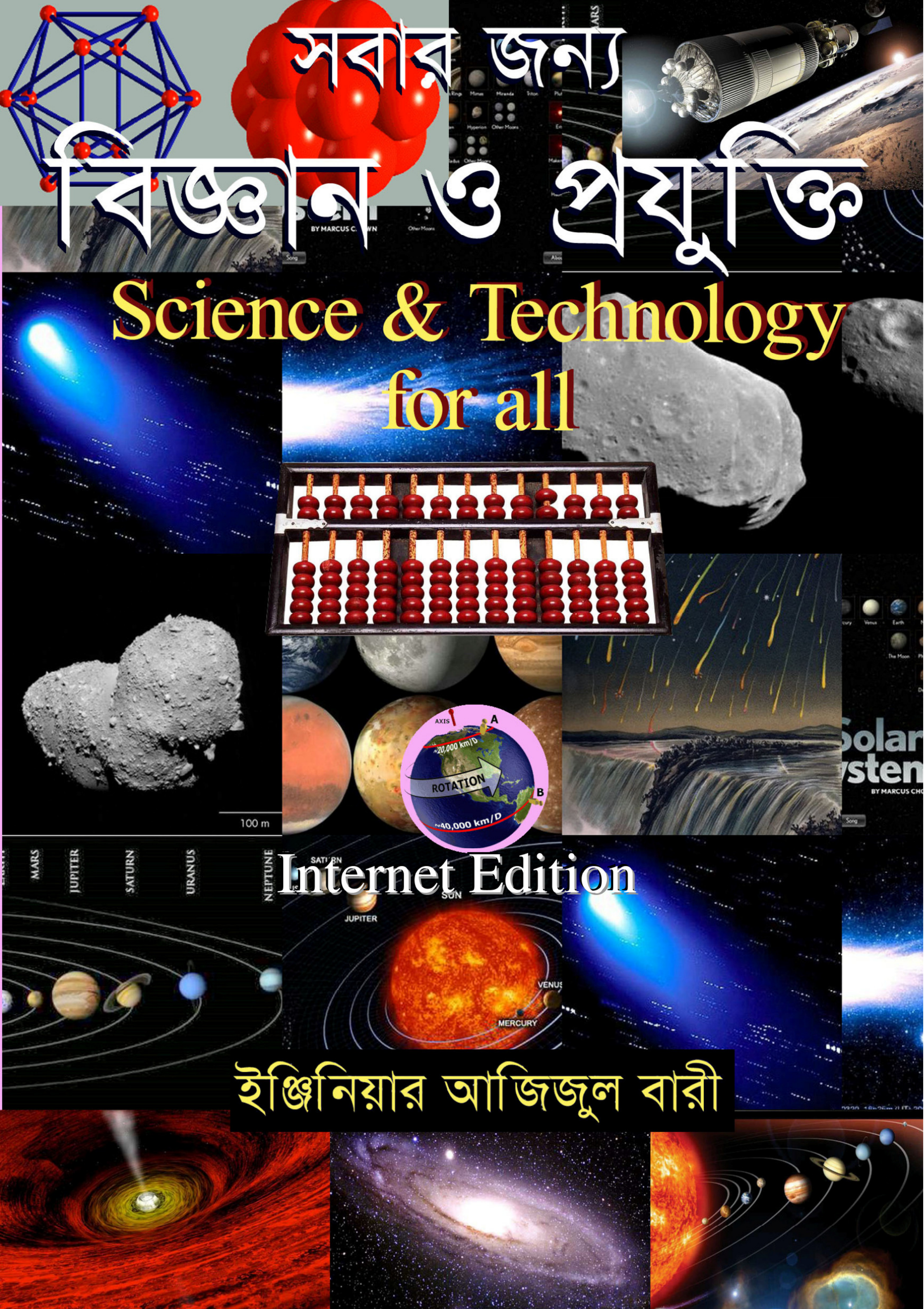
সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

Science & Technology for all

Internet Edition

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ইন্টারনেট সংস্করণ

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

Khanqa-E-Aminia-Asgaria
Sylhet, Bngladesh

সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

Science and Technology for all
(Internet Edition)

প্রকাশক: গ্রন্থকার

প্রথম প্রকাশ (প্রিন্ট সংস্করণ): ফেব্রুয়ারী ২০০৯।

প্রচ্ছদ: গ্রন্থকার

বর্ণবিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা: গ্রন্থকার

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

ভূমিকা

পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে প্রত্যেক মু'মিন নর ও নারীর জন্য জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে মূলত ধর্মজ্ঞান। অর্থাৎ ঈমান ও দ্বীন পালনে ন্যূনতম কিছু জ্ঞান ছাড়া কেউ সঠিকভাবে তার জিন্দেগী ইসলামের উপর পালন করতে সক্ষম হবে না- তাই, তাকে অবশ্যই এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জ্ঞান ছাড়াও আরো কিছু বিষয় আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যাকে আমরা জাগতিক জীবনচলার সঠিক জ্ঞান বলতে পারি। বিভিন্ন পেশার জন্যও উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দরকার। ব্যাংকে চাকুরী করতে যেয়ে অবশ্যই ফিনেন্স বা অর্থকড়ি কিভাবে জমা করা হবে এবং তার সঠিক ব্যবহার বা ইউটিলাইজের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে। তবে ব্যাংকিং সেক্টরে কর্মরত সবাইকে কিন্তু এ শিল্পের উপর সবকিছু জানা যেমন সম্ভব নয় তেমনি দরকারীও নয়। একইভাবে একজন ডাক্তারকে মানবদেহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও রোগ-ব্যাধি ও এর চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর পারদর্শী হতে হবে। তবে গাড়ির **ইঞ্জিন** কিভাবে চলে তা তার জানার দরকার নেই। সেটার জন্য গাড়ি **মেকানিক্স** পারদর্শী হবেন। এভাবে প্রত্যেক পেশার জন্য আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা আছে। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, সকল পেশার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাব্যবস্থা সেই পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সীমাবদ্ধ থাকলেও সবাইকেই কিছু মৌলিক বিষয়ের উপর জ্ঞানার্জন করতেই হয়। যেমন অক্ষরজ্ঞান। ভাষার ব্যবহারের মাধ্যমেই আমরা যারতার পছন্দসই পেশার উপর শিক্ষা করতে সক্ষম হবো। সুতরাং ভাষাজ্ঞান ছাড়া কিছুই অর্জন সম্ভব নয়। তবে আজকের বিশ্বে জীবনচলার পথে শুধুমাত্র ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য তা কিন্তু মোটেই সঠিক নয়। বাস্তবে আজকের বিশ্বের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর ন্যূনতম কিছু ধারণা না থাকলে অপরের সাহায্য ব্যতীত বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলাফেরাই মুশকিল হবে। কোনো দূরবর্তী স্থানে গমন করতে যেয়ে যেভাবে রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে জানা থাকা অপরিহার্য ঠিক সেরূপ আজকাল বিজ্ঞানের উপর কিছু জ্ঞান ছাড়া জীবনচলার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বৈকি।

বিজ্ঞানের উপর জ্ঞানার্জনের চেষ্টা যে কোন বয়সের লোক করতে পারেন। আর এতে প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও বেশ মজার ব্যাপারও আছে। কারণ, বিজ্ঞান আসলে মানুষের মনে সদা-সর্বদা জাগ্রত অনেক প্রশ্নের জবাব বের করে থাকে। রহস্যের দ্বারোন্মোচনের মাধ্যমে আমরা মনের ক্ষুধা মেটাই। আমাদের চারদিকে দৃশ্যমান এক বিরাট জগত বিদ্যমান। এখানে অগণিত ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে। এসব ঘটনার সঠিক কারণ আমাদের অনেকেরই জানা নেই। নিশ্চয় এমন লোক কম পাওয়া

যাবে, যে এসব স্বভাবসৃষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে জানতে অনিচ্ছুক। মানুষ তো সে নিজেই এক বিরাট রহস্যের মধ্যে নিমজ্জিত। তার দেহটাই তো রহস্যের সর্বাপেক্ষা জটিল এক বৃহৎ জগৎ। সে কি জানতে চাইবে না, তার হৃদপিণ্ডটি কিভাবে কাজ করে? মস্তিষ্ক, ফুসফুস, লিভার, কিডনি ইত্যাদি দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদি সম্পর্কে সে কি জানতে ইচ্ছুক নয়? অবশ্যই। এছাড়া আকাশ-পৃথিবীতে দৃশ্যমান অসংখ্য ঘটনাবলী যা তার চোখের সামনে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করছে। এসব বিষয় কি সে লক্ষ্য করে না? এগুলো কেন কিভাবে ঘটে এবং ঘটার পেছনে কোন্ কোন্ কারণ নিহিত তা কি সে জানতে চায় না? অবশ্যই। সুতরাং জাগতিক জীবনচলার পথে জানার জন্য অপরিহার্য জ্ঞানের পরও, আরও অনেক বিষয় আছে যা আমাদের জানতে ইচ্ছে হয়। আর সঠিক যে পদ্ধতির মাধ্যমে তা জানা সম্ভব তা হলো বিজ্ঞান। আজকের বিশ্বে বিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার উপর বেসিক কিছু জ্ঞান থাকা সবার জন্য অপরিহার্য।

সর্বসাধারণ্যের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের উপর লেখালেখি অবিশ্বাস্যভাবে অল্প বললে অত্যুক্তি হবে না। অথচ পৃথিবীর একটি সুপরিচিত এবং উন্নত ভাষা হলো বাংলা। এ ভাষায় বৃহৎ এক জনগোষ্ঠি কথা বলে এবং লিখে। আজকের বিশ্বে পৃথিবীর এমন কোন মেজর ভাষা নেই যার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চা হচ্ছে না। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শুধু বিজ্ঞান কেন- যে কোন আধুনিক বিষয়ে শিক্ষার্জনে আমাদেরকে ইংরেজী ভাষা শিখে নিতে হয়। এটা চয়েজ নয়- প্রয়োজনের তাগিদেই অর্জন করতে হয়। অবশ্য যে কোন বিদেশী ভাষা আর বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষাতে কোন দোষ তো নেই-ই, বরং তা একান্ত যুগোপযোগী। কিন্তু তাই বলে নিজের ভাষায় আধুনিক বিষয়গুলোর উপর লেখালেখি ও গবেষণা করা থেকে বিরত থাকার মধ্যে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বরং এই চর্চা দ্বারা যেমনি সমাজের উপকার সাধিত হবে তেমনি স্বয়ং বাংলা ভাষারও উত্তরোত্তর উন্নয়ন সম্ভব হবে। এছাড়া দেশের সিংহভাগ শিক্ষিতরাও ইংরেজী ভাষায় তেমন পারদর্শী নন যে, তারা ইংরেজীতে রচিত সব বিষয় পাঠ-অধ্যয়ন করে সবকিছু বুঝতে সক্ষম হবেন।

যা হোক, বাংলার উপর অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সবার জন্য আমি এই পুস্তকটি রচনা করেছি। বিজ্ঞানকে সমাজের সর্বত্র জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে এই বইটি যদি ন্যূনতম অবদান রাখতে সক্ষম হয় তাহলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। ভাষার কাঠিন্যতা বর্জন করে অল্প কথা ও অনেক চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপন করেছি। গণিত একটি সুকঠিন বিষয়। এটা পাঠে আমরা কেউ তেমন আনন্দবোধ করি না। তবে ব্যাপার হচ্ছে, গণিত বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বলা হয় 'গণিত সকল বিজ্ঞানের মা'। সুতরাং একে এড়িয়ে বিজ্ঞানকে বুঝানো সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। এরপরও আমি গণিতের ব্যবহার থেকে যেটুকু সম্ভব বিরত থেকেছি। মনে রাখতে হবে, এই পুস্তক দ্বারা পাঠককে বিজ্ঞানের জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান দ্বারা আমরা মানবদেহ, বাইর জগৎ, পৃথিবী, আবহাওয়া, পদার্থ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আরোও বেশি জ্ঞানবান হতে ইচ্ছুক। সুতরাং বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও এ থেকে যেসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তা-ই আমাদের বিষয়বস্তু। বিষয়ের গভীরে যেয়ে গাণিতিক গবেষণা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য মোটেই নয়।

এই রচনায় সাইন্স এন্ড টেকনোলজির উপর লেখাপড়া করে যা জানতে পেরেছি তা-ই আমি সবার জন্য অনুধাবনযোগ্য সরল ভাষায় পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোয় বর্ণনা করেছি। তবে বিজ্ঞান একটি **ডাইনামিক** বিষয়- অর্থাৎ এই জ্ঞান চিরপরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের অনেক বিষয় আছে যা আমার কলেজ-জীবনে আত্মপ্রকাশই করে নি। অনেক যন্ত্রপাতি ও নতুন তথ্যাদি ইতোমধ্যে তৈরী ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এগুলো সম্পর্কেও আমাদেরকে জানতে-বুঝতে হবে। বইটি প্রকাশের সময় পর্যন্ত আবিস্কৃত বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর ব্যাখ্যা-বিশে-ষণ জরুরী- বিধায়, আমি প্রয়োজনের তাগিদেই এসব বিষয়ের উপর সঠিক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে বিভিন্ন বই-পুস্তক, **ইনসাইক্লোপিডিয়া**, **ইন্টারনেট** ইত্যাদি মিডিয়ার সাহায্য নিয়েছি। তবে প্রমাণস্বরূপ কোন বিশেষ সূত্রের উল্লেখ করি নি। তার প্রয়োজনও নেই।

আমি আশা করবো এই বই দ্বারা পাঠকরা উপকৃত হবেন। তবে আমার সকল লেখালেখিই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায়- তাই প্রভুর দরবারেও আবদার করছি, এ লেখা থেকে যেনো সবাই উপকৃত হন। ভুল-ত্রুটি হওয়াটা স্বাভাবিক। কারো চোখে বিশেষ কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাঁর সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত করুন। আ-মিন।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
সিলেট, ২৮/০২/০৮ ঈ।
engineerazizulbari@gmail.com

বিষয়সূচি

প্রথম অধ্যায়

মৌলিক বিজ্ঞান

পরিচ্ছেদ ১

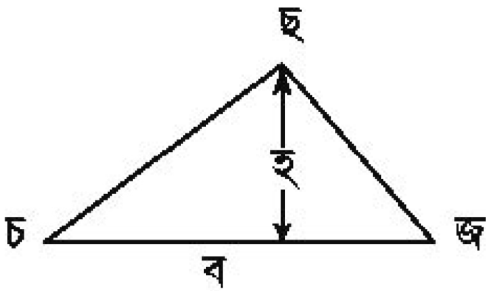
পাটিগণিত

সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে দু'টি শাখায় বিভক্ত করা যায়। এর একটি হলো মৌলিক বিজ্ঞান যাকে আমরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানও বলতে পারি। অপরটি হলো ব্যবহারিক বিজ্ঞান যার আরেক নাম প্রযুক্তি।

মৌলিক বিজ্ঞান হলো আমাদের মনে জাগ্রত প্রশ্নাবলীর অনুসন্ধান যা একজন বিজ্ঞানী তার গবেষণাগারে করে থাকেন। এই মনের স্পৃহা বা পিপাসা নিবৃত্তি হেতু যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানচেতা মানুষ একনিষ্ঠভাবে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। তারাই রেখে গেছেন আমাদের মনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট ভাণ্ডার। তবে মৌলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে ব্যবধান নির্ণয় সহজ নয়। বাস্তবে একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পৃক্ত। দেখা গেছে অনেক মৌলিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই প্রযৌক্তিক উপায়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ঘটেছে। এরপরও আমরা এই বইয়ের প্রাথমিক অংশে শুধুমাত্র বেসিক বৈজ্ঞানিক থিওরীবলীর উপরই আলোচনা করবো যদিও এসব থিওরীর সঙ্গে হয়তো অনেক প্রযৌক্তিক উন্নয়ন সরাসরি জড়িত থাকতে পারে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। মৌলিক বিজ্ঞানের উপর ধারণা না থাকলে প্রযুক্তি বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন আদৌ সম্ভব নয়। তাহলে আসুন, আমরা মৌলিক বিজ্ঞানের উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাই। পাঠকদেরকে আগেই বলে রাখি, এই পুস্তকে বর্ণিত কোন বিষয়েই আপনাদের পূর্ব ধারণা আছে

ভূমিকায় বলেছি, বিজ্ঞানের মা হচ্ছে গণিত বা অঙ্ক শাস্ত্র। সুতরাং প্রথমেই এই শাস্ত্র কি, কেন এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে। অঙ্কের ভাষা হলো নাম্বার, যোগ, বিয়োগ, ভাগ, পূরণ, সংকেত, **লজিক, ইক্যুয়েশন** বা সমীকরণ,

প্রমাণ ইত্যাদি। পাঠকরা এগুলো শোনে হয়তো কিছুটা শঙ্কিত হয়ে থাকবেন। না, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা বড় বড় জটিল-কঠিন অঙ্ক কষতে যাচ্ছি না। সংকেত দ্বারা সমীকরণ সৃষ্টির মাধ্যমে এক বা একাধিক বিষয়ের যোগসূত্র দেখানো যায়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে যে কোন সমীকরণ থেকে যা বেরিয়ে আসে তাহলো কিছু নাম্বার। এই নাম্বার হলো অঙ্কের ফলাফল। মনে করুন একটি বস্তু যদি কিছু নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে মাটির দিকে পড়তে থাকে তাহলে গাণিতিকভাবে এটি ভূপাতিত হওয়ার একটি সমীকরণ তৈরী করা যায় যা থেকে বস্তুর উপর আবর্তিত বিভিন্ন গতির মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিফহাল হতে পারি। এ থেকে হয়তো জানতে পারবো একটি বিশেষ উচ্চতা থেকে ভূপাতিত হতে ঠিক কতটুকু সময় অতিবাহিত হবে কিংবা চলন্তাবস্থায় বস্তুটির উপর গতি কি হবে। গণিতের মাধ্যমে বস্তুতে সৃষ্ট শক্তিগুলোকে আমরা এই সমীকরণ দ্বারা উপস্থাপন করতে পারি: **ক = ৯.৮১ মিটার / স**^{২}। এখানে **ক** অর্থ মহাকর্ষের মাধ্যমে সৃষ্ট ত্বরণ, **স** হলো সেকেন্ড। লক্ষ করুন, এই ত্বরণ সৃষ্টিতে বস্তুর ওজন প্রযোজ্য নয়। অন্য আরেকটি সমীকরণ হলো, **খ = ১/২ * হ * ব**। এখানে **খ** হলো কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, **হ** হলো ত্রিভুজের উচ্চতা এবং **ব** হলো এর বেইজের মাপ।



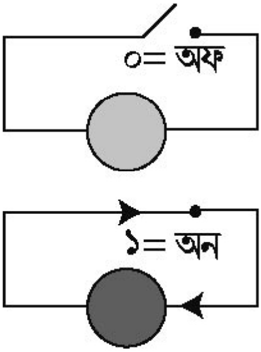
গণিতের কয়েকটি প্রধান শাখা আছে। এগুলো হলো পাটিগণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত ও **কালক্যুলাস**। এছাড়া আধুনিক যুগে সেট **থিওরী** ও স্টেটিসটিক্সকেও গণিতের শাখা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আমরা এবার গণিতের এসব মৌলিক শাখার উপর আরও বিস্তারিত আলোচনা করবো।

পাটিগণিত (ইংরেজীতে যাকে বলে **এ্যারিথমেটিক**) গণিতের মৌলিক শাখাগুলোর অন্যতম একটি। এ শাখা মূলত নাম্বার নিয়ে অঙ্ক কষাকে বুঝায়। গণনা করার সঙ্গে জড়িত থাকে কিছু পাটিগণিতের **অপারেশন** যা মূলতঃ চারটি: যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও পূরণ। অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত নাম্বারও আবার বিভিন্ন হতে পারে যেমনঃ **পজিটিভ** (+ চিহ্নযুক্ত) ও **নেগিটিভ** (- চিহ্নযুক্ত) **ইন্টেজার** (পূর্ণ নাম্বার), **ফ্রেকশন** (ভগ্নাংশ)

এবং **ডেসিমেল**। দৃষ্টান্ত হলো: **১. +৭৮৬ (পজিটিভ ইন্টেজার)**; ২. - ৯০ (**নেগিটিভ ইন্টেজার**); ৩. ৯/৮ (**ফ্রেকশন**); ৪. ৩৪.০৯ (**ডেসিমেল**)। সকল নাম্বারকে একটি নাম্বার লাইনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় যেমন: **..... .... - ১০ -৯ -৮ -৭ -৬ -৫ -৪ -৩ -২ -১ ০ +১ +২ +৩ +৪ +৫ +৬ +৭ +৮ +৯ +১০ ... ...**

লক্ষ করুন এই নাম্বার লাইনে শূন্য (০) ঠিক মধ্যখানে আছে। শূন্যের বায়ের সব নাম্বার **নেগিটিভ** ও ডানের সবগুলো **পজিটিভ**। এছাড়া **ফ্রেকশন** ও **ডেসিমেল** নাম্বার যেহেতু আস্ত নাম্বারের অংশ তাই এগুলোও এই নাম্বার লাইনে বিদ্যমান। সাধারণত **পজিটিভ** নাম্বার লিখতে প্লাস (+) চিহ্ন লেখা হয় না।

সচরাচর আমরা যে নাম্বার **সিস্টেম** ব্যবহার করি তা **বেইজ** ১০ এর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ১০টি ভিন্ন সংকেত দ্বারা আমরা সকল নাম্বারকে বুঝি। এগুলো হচ্ছে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯। নাম্বার ৯ লেখার পরই আমরা একই সংকেত আবার শুরু করি যেমন, ১০, ১১, ১২ .... ১৯। এই **সিস্টেম** আরম্ভ হয়েছে আদি যুগে। হয়তো আমাদের হাতে মোট ১০টি অঙ্গুলি থাকা এর মূল কারণ হতে পারে। তবে নাম্বার **সিস্টেম** শুধু এটাই নয়। আরো আছে। বাস্তবে একের অধিক যে কোন নাম্বারকে **বেইজ** হিসেবে ধরে নেওয়া সম্ভব। আদি যুগে মানুষ বিভিন্ন **বেইজ** ব্যবহার করেছে। ব্যবিলনের মানুষ **সেক্সাগেসিমেল** (**বেইজ** ৬০), রোমানরা **ডুওডেসিমেল** (**বেইজ** ১২) এবং উত্তর আমেরিকার মায়া সভ্যতা **ভিজেসিমেল** (**বেইজ** ২০) নাম্বার **সিস্টেম** ব্যবহার করতো। বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ **বেইজ** হলো ২ যাকে বলে **বাইনারি** সিস্টেম। শুধুমাত্র দু'টি সংকেত দ্বারা **বাইনারি** সিস্টেমে নাম্বারকে উপস্থাপন করা হয়। এগুলো হলো ১ এবং ০। **কম্পিউটার** সাইন্সে এই সিস্টেমই চালু আছে।



কম্পিউটারের চীপ বা **প্রসেসর ইলেকট্রিক** সিগনালের মাধ্যমে কাজ করে। দু'টি অবস্থা দ্বারা সত্য কিংবা মিথ্যাকে বুঝানো যায়। **ইলেকট্রিক** উপায়ে আমরা একটি সুইচকে হয় অন (সত্য) কিংবা অফ (মিথ্যা) অবস্থায় রেখে দিয়ে উভয় অবস্থা বুঝাতে পারি। তাই ১-কে যদি আমরা সুইচের **অন** অবস্থা ও ০-কে **অফ** অবস্থা ধরে নিই তাহলে কম্পিউটারে নাম্বার ঢুকানো ও **প্রসেস** করা সহজ হয়ে ওঠে। **বাইনারি সিস্টেম** সম্পর্কে আমরা একটু পরই আলোচনায় যাচ্ছি।

১০ বেইজের সকল নাম্বার কিন্তু মূলতঃ দশের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং নাম্বার ৩,০৯৮,৩২৩ -কে আমরা এভাবে লিখতে পারবো: (৩ × ১০^{৬}) + (০ ×১০^{৫}) + (৯ ×১০^{৪}) + (৮ ×১০^{৩}) + (৩ ×১০^{২}) + (২ ×১০^{১}) + (৩ ×১০^{০}, বা ৩ ×১). উক্ত সংখ্যায় মোট ৭টি **ডিজিট** আছে। এ কারণে আমরা ৬ থেকে ০ পর্যন্ত নাম্বারগুলোকে ১০ এর **পাওয়ার** নিয়ে প্রতিটি ডিজিটের সঙ্গে পূরণ করেছি। এই সিস্টেমে ০-এর একাধিক ডিউটি আছে। সে নাম্বার শূন্যকে বুঝায় আবার **বেইজ** দশের গুণফল অর্থাৎ ১০, ২০, ১০০০, ২৯০০০ ইত্যাদিকেও বুঝায়। এছাড়া ০ দ্বারা একের ছোট নাম্বারকেও বুঝানো হয় এভাবে ০.০৯ কিংবা ০.৫ ইত্যাদি।

আগেই বলেছি **বাইনারি** সিস্টেমে ০ ও ১ এই দু'টি মাত্র নাম্বারের প্রয়োজন হয়। তেমনি **সেক্সাগেসিমেলে** ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই ৬টি, **ডুওডেসিমেল** সিস্টেমে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, t (দশ), e (এগারো) এই ১২টি নাম্বারের প্রয়োজন। সুতরাং আমরা ৬ বেইজে লিখিত নাম্বার ৩০১৫৫-কে **ডেসিমেল** সিস্টেমে পরিবর্তন করতে পারি এভাবে: (৩ × ৬^{৪}) + (০ × ৬^{৩}) + (১ × ৬^{২}) + (৫ × ৬^{১}) + (৫ × ৬^{০}) = ৩৯৫৯। লক্ষণীয় যে এখানে ৪ থেকে ০ পর্যন্ত ৬ এর **পাওয়ার** ব্যবহৃত হয়েছে। বলতে পারেন এর কারণ কি? প্রতিটি ব্র্যাকেটে বায়ের নাম্বারটি হলো উক্ত ৩০১৫৫-এর একেকটি নাম্বার। ৬ হলো **বেইজ** এবং যেহেতু মোট **ডিজিট** (একেকটি সংকেত হলো একেকটি ডিজিট) ৫টি তাই আমরা ৪, ৩, ২, ১ ও ০ এই মোট ৫টি সংখ্যাকে ৬ এর **পাওয়ার** হিসাবে নিয়েছি। কয়েকবার অন্যান্য নাম্বার দ্বারা একটু প্রাকটিস করে নিলেই বিষয়টি পুরোপুরিভাবে অনুধাবন হবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে **ডুওডেসিমেল** সিস্টেমে (**বেইজ** ১২-তে) লিখিত নাম্বার ২et-কে আমরা **ডেসিমেল** সিস্টেমে রূপান্তর করতে পারবো এভাবে: (২ × ১২^{২}) + (১১ × ১২^{১}) + (১০ × ১২^{০}) = ৪৩০। এখানে লক্ষ করুন, মোট **ডিজিট** আছে তিনটি তাই আমরা ১২ এর **পাওয়ার** নিয়েছি ২, ১ ও ০-এই মোট তিনটি। আর ইংরেজী অক্ষর e = ১১ ও t = ১২ তাই গুণসংখ্যা তিনটি হয়েছে যথাক্রমে ২, ১১ ও ১২। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, **বেইজ ১০ (ডেসিমেল) সিস্টেম** ছাড়া অন্য কোন সিস্টেমে লিখিত যে কোন নাম্বারকে আমরা অতি সহজেই **ডেসিমেল** সিস্টেমে (অর্থাৎ সচরাচর ব্যবহৃত

বেইজ ১০-এ) রূপান্তর করতে পারি। তবে **বেইজ ১০** থেকে অন্য সিস্টেমে রূপান্তরের ক্ষেত্রে একই কথা সত্য নয়।

মনে করুন **বেইজ ১০**-এ লিখিত যে কোন নাম্বারকে আমরা **ক** দ্বারা এবং যে **বেইজ** সিস্টেমে রূপান্তর করবো তাকে **ব** দ্বারা সম্বোধন করলাম। প্রথমে আমাদেরকে **ক**-কে **ব** দ্বারা ভাগ করতে হবে **(ক/ব)**। ভাগফলকে আবার **ব** দ্বারা ভাগ করতে হবে। এরপর আবার, আবার ... অবশেষে শূন্যে পৌঁছুবো। প্রতিবার ভাগ করার পর যে নাম্বার অবশিষ্ট থাকবে তা আমরা ডানে লিখে রাখবো। এই অবশিষ্ট নাম্বারগুলোই শেষ পর্যন্ত আমাদের ফলাফল হবে। সুতরাং **ডেসিমেল** নাম্বার ৩৯৫৯ (**বেইজ ১০**)-কে আমরা **বেইজ** ৬-এ নিম্নোক্ত উপায়ে পরিবর্তন করতে পারি:

৬) ৩৯৫৯

) ৬৫৯ ৫

) ১০৯ ৫

) ১৮ ১

) ৩ ০

) ০ ৩

সুতরাং $৩৯৫৯_{১০} = ৩০১৫৫_{৬}$। নাম্বারের ডানে নীচে (**সাবস্ক্রিপ্ট**) দেখানো পদ্ধতিতে এর **বেইজ** নাম্বার লিখা হয়ে থাকে। এবার নিজে অন্য কোন নাম্বারকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে রূপান্তর করুন। এতে পদ্ধতিটি জানা হয়ে যাবে।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত বাইনারি সিস্টেম

আগেই বলেছি কম্পিউটারে **বাইনারি (বেইজ ২) সিস্টেম** ব্যবহৃত হয়। ০ কিংবা **১** দ্বারা সকল নাম্বার লিখা যেতে পারে। প্রথম বিশটি **বাইনারি** নাম্বার হলো: **১, ১০, ১১, ১০০, ১০১, ১১০, ১১১, ১০০০, ১০০১, ১০১০, ১০১১, ১১০০, ১১০১, ১১১০, ১১১১, ১০০০০, ১০০০১, ১০০১০, ১০০১১, ১০১০০**। পাঠকরা এসব নাম্বার পড়ার সময় এভাবে বলবেন: এক-শূন্য (১০), এক-শূন্য-এক-এক (১০১১), এক-শূন্য-শূন্য-এক-শূন্য (১০০১০) ইত্যাদি। অর্থাৎ, সংখ্যাগুলোকে সচরাচর পদ্ধতিতে পাঠ করলে সমস্যা হবে, যেমন: দশ, এক হাজার এগারো, দশ হাজার দশ ইত্যাদি- কিন্তু

বাইনারি সংখ্যাগুলো তো আর এসব **বেইজ ১০** এর মতো সংখ্যা নয়। যা হোক, যে কোন **বাইনারি** নাম্বারকে আমরা আগের মতো **ডেসিমেল** সিস্টেমে রূপান্তর অতি সহজেই করতে পারি। যেমন **বাইনারি** নাম্বার $১০১০১১০১_{২} = (১ \times ২^{০}) + (০ \times ২^{১}) + (১ \times ২^{২}) + (১ \times ২^{৩}) + (০ \times ২^{৪}) + (১ \times ২^{৫}) + (০ \times ২^{৬}) + (১ \times ২^{৭}) = ১৭৩_{১০}$। লক্ষ করুন, সকল বায়ের নাম্বার যথাক্রমে **বাইনারি** ডিজিটসমূহ (১ এবং ০; **বাইনারি** সংখ্যার ডান থেকে বায়ের দিকের সকল নাম্বার)। ডানের গুণক নাম্বারগুলো সবই ২ (**বাইনারি** বেইজ) এবং **পাওয়ার** ০ থেকে ৭ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে এ কারণে যে, **বাইনারি** নাম্বারটিতে মোট **ডিজিট** সংখ্যা ৮টি। অপর একটি **বাইনারি** যেমন $১০০১০_{২}= (০ \times ২^{০}) + (১ \times ২^{১}) + (০ \times ২^{২}) + (০ \times ২^{৩}) + (১ \times ২^{৪}) = ১৮_{১০}$ (**বেইজ ১০ ডেসিমেল**)। এখন আমরা কিভাবে কোনো **ডেসিমেল** নাম্বারকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে পারি? আসলে খুব বেশি কঠিন নয়!

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো কথায় বুঝানোর চেয়ে উত্তম। মনে করুন আমরা $৫১৯_{১০}$ -কে বাইনারিতে রূপান্তর করবো। আমাদেরকে **বাইনারি** থেকে ডেসিমেলে রূপান্তর পদ্ধতির ঠিক উল্টোটা করতে হবে। প্রথমে আমরা ২ (**বাইনারি** বেইজ) এর সর্বোচ্চ **পাওয়ার** ৫১৯-এ কি হয় তা দেখে নিই। ৫১৯ এর সর্বোচ্চ ২এর **পাওয়ার** হলো $২^{৯} = ৫১২$। সুতরাং আমরা ধরে নেবো বাইনারিতে মোট **ডিজিট** হবে ১০টি (৯+১)। অর্থাৎ ০০০০০০০০০০। এখন দশম নাম্বার **ডিজিট** (ডান থেকে গণনা করে) ১ বসানো হবে = ১০০০০০০০০০। তবে অবশিষ্ট রয়েছে, তাহলো ৫১৯ - ৫১২= ৭। এবার এটারও সর্বোচ্চ ২ এর **পাওয়ার** বের করতে হবে। এখানে রেজাল্ট হলো $২^{২} = ৪$ (বাকী ৩)। এখন আমরা উক্ত বাইনারির (২+১) তৃতীয় ০-কে বদলে সেখানে ১ বসাবো। ১০০০০০০১০০। এবার ৩ এর মধ্যে ২ এর সর্বোচ্চ **পাওয়ার** নির্ণয় করতে হবে। তাহলো $২^{১} = ২$ (বাকী ১)। এবার আমরা (১+১) দ্বিতীয় স্থানে ১ বসাবো, সুতরাং এ পর্যন্ত নাম্বার হবে ১০০০০০০১১০। $১ = ২^{০}$ (বাকী নেই)। এখন আরেকটি ১ (০+১) বা প্রথম স্থানে বসাবো। এবার নাম্বার দাঁড়াবে: ১০০০০০০১১১। সুতরাং $৫১৯_{১০} = ১০০০০০০১১১_{২}$। এবার যা করেছি তা একবারে লিখে নিই: $২^{৯}$ (৫১২ বাকী ৭), $২^{২}$ (৪ বাকী ৩), $২^{১}$ (২ বাকী ১), $২^{০}$ (১ বাকী ০)। লক্ষ করুন কিভাবে আমরা মোট **ডিজিট** ও এতে কোথায় ১ বসবে তা নির্ণয় করেছি। মোট **ডিজিট** হবে ২এর সর্বোচ্চ **পাওয়ার** +১ (উপরে এটা হলো ৯+১ = ১০)। প্রথম ১ বসবে **পাওয়ার** মুতাবিক সংখ্যা + ১-এর স্থানে ডান থেকে (উপরে

৯+১ = ১০ম স্থানে)। অবশিষ্ট থাকলে তার ২ এর পাওয়ায় নির্ণয় করে **পাওয়ার +১-**এর স্থানে ডান থেকে গুণে **১** বসবে (উপরে ২+১=৩য় স্থানে)। একই ভাবে আরো অবশিষ্ট থাকলে তাই বসবে (উপরে ১+১=২য় স্থানে) এবং সবশেষে শেষ অবশিষ্ট সংখ্যা **১** থাকলে যেহেতু তাও ২ এর $২^{০}$ তাই একটি **১** বসবে ডান থেকে ০+**১** অর্থাৎ প্রথম স্থানে। আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে! হয়েছে তো? আরেকবার সহজ করে লিখে দিচ্ছি।

$৫১৯_{১০} = (১ \times ২^{৯}) + (০ \times ২^{৮}) + (০ \times ২^{৭}) + (০ \times ২^{৬}) + (০ \times ২^{৫}) + (০ \times ২^{৪}) + (০ \times ২^{৩}) + (১ \times ২^{২}) + (১ \times ২^{১}) + (১ \times ২^{০}) = ১০০০০০০১১১_{২}$। এবার ভালো করে অনুধাবন করুন। সকল নাম্বার যা ২ এর পাওয়ারের সাথে **১** দ্বারা পূরণ করেছি তা-ই বাইনারির **১** সংকেতসমূহ হয়েছে। বাকীগুলো ০। এবার দেখুন অপর দু'টি নাম্বার কিরূপ সহজে বাইনারিতে পরিবর্তন করা যায়: $১২০_{১০} = (১ \times ২^{৬})$ [$২^{৬}$ = ৬৪ অবশিষ্ট ১২০-৬৪ = ৫৬] + (১×২^{৫}) [$২^{৫}$ = ৩২ অবশিষ্ট ৫৬-৩২ = ২৪] + (১×২^{৪}) [$২^{৪}$ = ১৬ অবশিষ্ট = ২৪-১৬ = ৮] + (১×২^{৩}) [$২^{৩}$ = ৮ অবশিষ্ট = ৮-৮ = ০] + $(০ \times ২^{২}) + (০ \times ২^{১}) + (০ \times ২^{০}) = ১১১১০০০_{২}$। দ্বিতীয়টি: $১৯_{১০} = (১ \times ২^{৪})$ [$২^{৪}$ = ১৬ অবশিষ্ট ১৯-১৬ = ৩] + $(০ \times ২^{৩}) + (০ \times ২^{২}) + (১ \times ২^{১})$ [$২^{১}$ = ২ অবশিষ্ট = ৩-২ = ১] + (১×২^{০}) [$২^{০}$ = ১ অবশিষ্ট = ১-১ = ০] = $১০০১১_{২}$। এখন আপনি নিশ্চয়ই **ডেসিমেল** থেকে **বাইনারি** ও **বাইনারি** থেকে ডেসিমেলে পরিবর্তন পদ্ধতি শিখে ফেলেছেন।

বাস্তবে কয়েকবার বিভিন্ন নাম্বার দ্বারা প্রাকটিস করে নিলে বিষয়টি রপ্ত হয়ে যাবে- বিশ্বাস করুন হবে! একটু ধৈর্যের প্রয়োজন- এই যা। সুবিধের জন্য নিচের টেবিলে বিভিন্ন সিস্টেমে কিভাবে নাম্বার লিখা হয় তার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

বিভিন্ন বেইজের নাম্বার সিস্টেম

বাইনারি (বেইজ ২)	**অকটেল (বেইজ ৮)**	**ডেসিমেল (বেইজ ১০)**	**হেক্সাডেসিমেল (বেইজ ১৬)**
0	0	0	0
1	1	1	1
10	2	2	2
11	3	3	3

100	4	4	4
101	5	5	5
110	6	6	6
111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	A
1011	13	11	B
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F
10000	20	16	10
11111111	377	255	FF
11111010001	3721	2001	7D1

একটি কম্পিউটারে আমরা সাধারণ **ডেসিমেল** নাম্বারই **ইনপুট** বা প্রবেশ করি। কম্পিউটারই একে প্রথমে বাইনারিতে রূপান্তর করে এরপর অপারেশনের মাধ্যমে ফলাফল বের করে তা আবার ডেসিমেলে রূপান্তর করে দেয়- যা আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাই। আমরা যখন **কম্পিউটার** প্রযুক্তির উপর আলোচনা করবো তখন আবারো এই বাইনারির উপর বিস্তারিত বলবো। উপরের টেবিলে বর্ণিত চারটি নাম্বার **সিস্টেম** বর্তমানে ব্যবহৃত হয়- তবে এর মধ্যে **ডেসিমেল** ও কম্পিউটারে **বাইনারি সিস্টেম** সম্পর্কে জানা থাকাই আমাদের জন্য আপাতত যথেষ্ট। তবে এ প্রসঙ্গের ইতি টানার পূর্বে **বাইনারি** নাম্বার দ্বারা যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ কিভাবে করা হয় তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করছি। মৌলিক এই চারটি অপারেশন আসলে অত্যন্ত সহজ- বেসিক ক’টি আইন জানা থাকাই যথেষ্ট। এগুলো হলো: **১ + ১ = ১০; ১ × ১ = ১; ১ + ০ = ১** এবং **১ × ০ = ০**। যোগ, বিয়োগ ও পূরণ **ডেসিমেল** সিস্টেমে এগুলো কষার সমান। যথা:

$১১০০_২$ ($১৪_{১০}$)

$+\ \underline{১১০১}_{২}\ (১৫_{১০})$

$=১১০০১_{২}\ (২৯_{১০})$

$১১১১_{২}\ (১৫_{১০})$

$-\ \underline{১০১০}_{২}\ (১০_{১০})$

$=\ ০১০১_{২}$

$=১০১_{২}\ (৫_{১০})$

$১০_{২}\ (২_{১০})$

$\times\ \underline{১১}_{২}\ (৩_{১০})$

১০

$\underline{১০}$

$=\ ১১০_{২}\ (৬_{১০})$

পাটিগণিত সম্পর্কে বাকী যা জানার প্রয়োজন তাহলো বিভিন্ন অপারেশন। **পজিটিভ** ও **নেগিটিভ ইন্টেজার** বা পুরো নাম্বার, **ফ্রেকশন** বা ভগ্নাংশ এবং **ডেসিমেল** নাম্বার দ্বারা **এ্যারিথমেটিক অপারেশন** কিভাবে করতে হয় একুটু জানাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আজকের **ইলেকট্রনিক কালক্যুলেটর** ও কম্পিউটারের যুগে অবশ্য কেউ খাতা-কলমে হিসাব-নিকাশ করেন না; আর মানসাঙ্ক বা মেন্টাল এ্যারিথমেটিকের যুগ তো ইতোমধ্যে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে! যা হোক, এটা সন্দেহাতীত যে, সকলেই এসব বেসিক অঙ্ক সম্পর্কে অবগত আছেন। এরপরও সম্পূর্ণতা রক্ষার্থে মৌলিক রুলগুলো এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

পজিটিভ ও নেগিটিভ নাম্বার নিয়ে অঙ্ক

যে কোন দু'টি **পজিটিভ** নাম্বারের যোগফল শুধুমাত্র গণনা করে বের করা যায় ঃ ৫টি আপেল ও ৬টি আপেল এক পাশাপাশি রেখে গুণে নিলে রেজাল্ট হবে **১১**টি আপেল। তবে অঙ্কে ৫+৬ = ১১ অনেকটা সহজ। এছাড়া যতোটি ইচ্ছে আপেল এনে এক জায়গায় রেখে গুণা যাবে। যেমন ১টি, ২টি, ২৩টি ও আরো ৫টি আপেল এক

জায়গায় রেখে গুণে নিলে তা হবে ৩১টি। আর অঙ্কে তা হবে; ১ + ২+ ২৩ + ৫ = ৩১।

নেগিটিভ (নাম্বারের পূর্বে - (বিয়োগ) চিহ্নযুক্ত) সংখ্যা ও **পজিটিভ** সংখ্যা থাকলে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। কারণ রুল হলো + ও + = + (উভয় নাম্বারকে যোগ করাই যথেষ্ট); আর - ও - = - (বিয়োগ চিহ্ন) (উভয় বা ততোধিক সকল **নেগিটিভ** সংখ্যাকে যোগ করে নাম্বার লিখার পূর্বে - (বিয়োগ) চিহ্ন লিখে দিতে হবে।) আবার - ও + = **নেগিটিভ** কিংবা **পজিটিভ** এই উভয়টির যে কোন একটি হতে পারে, যা নির্ভর করবে কোন্ নাম্বারটি বড়ো তার উপর। - (বিয়োগ) চিহ্নযুক্ত **নেগিটিভ** নাম্বার বড় হলে ছোট নাম্বারটি বিয়োগ হবে কিন্তু লিখতে হবে **নেগিটিভ** নাম্বার হিসাবে। পূরণ ও ভাগের ক্ষেত্রে কিছু আইন মেনে নিতে হবে যখন নাম্বার **নেগিটিভ** থাকবে। এসব রুল হলোঃ + * + = +; - * - = +; + * - = - ।; +/+ = +; -/+ = - ; - / - = +। কথায় এসব বলে আর লাভ নেই। আসুন দেখে নিই।

যোগ ও বিয়োগ :

১২+৯ = ২১ ; ১২- ৯ = ৩;

- ১২ + ৯ = - ৩; - ১২ - ৯ = - ২১;

-১৮ + ৪ - ৪ + ৮ = +৪+৮ - ১৮ - ৪ = ১২ - ২২ = - ১০।

পূরণ ও ভাগ :

৫ * ৮ = ৪০;

- ৬ * - ৯ = + ৫৪;

৭ * - ৪ = - ২৮;

৪০/৫ = ৮;

- ৮০/১০ = - ৮;

- ৯ / - ৩ = + ৩।

ডেসিমেল নাম্বার যেমন : ১০.৯ ও ২.০৮ ইত্যাদি দ্বারা যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ উপরোক্তভাবেই হবে।

যথা : ১০.৪ - ২৩.৯ = - ১৩.৫;

৮.৫ + ৬.৯ = ১৫.৪;

- ১২.০১ - ২৩.০০৬ = - ৩৫.০১৬;

৩৪.৯ * ৮ = ২৭৯.২;
-৭৮.৯ / - ৫০.২ = +১.৫৭১৭১৩১৪৭৪১০৩৬
৪৫.৫ / - ৫ = - ৯.১ ইত্যাদি।

এখন বাকী রইলো **ফ্রেকশন** বা ভগ্নাংশ। **সাইন** বা চিহ্ন ও অপারেশনের আইন-কানুন একই। কিন্তু কিছু রুল-কানুন মেনে নিলে সহজেই অঙ্ক কষা যায়। আসুন, এক-দু'টো কষে দেখে নিই।

১/৯ + ৫ / ১৫ = ১/৯ + ১/৩ (কেটে-কুটে ছোট করা: উপরের ও নীচের নাম্বারকে একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে ভাগফল বসানো) = (১*(৯/৯)+১*(৯/৩))/৯ = (১+৩)/৯ = ৪/৯। কথায় বুঝানোর চেষ্টা : উভয় ভগ্নাংশের নীচের নাম্বার (যাকে ডিভাইজার বলে) ৯ (লয়েস্ট বা নিম্নতম কমন ডিনোমিটের) এর মধ্যে বিভাজ্য অর্থাৎ ৯/৯ = ১ এবং ৯/৩ = ৩। এখন নীচের সংখ্যাটি আমরা ঐ কমন ডিনোমিনেটর ৯-কেই রেখেছি কিন্তু উপরে আমরা প্রথম সংখ্যার নীচের নামার দ্বারা ৯-কে ভাগ করে ১ ফলাফল পেয়ে এটি দ্বারা আবার উপরের নাম্বার (এ ক্ষেত্রে) ১ এর সঙ্গে পূরণ করেছি। এতে আমরা (৯/৯) * ১ = ১ পেলাম। এরপর যোগ চিহ্ন বসিয়ে একইভাবে যে ফলাফল পেলাম তাহলো (৯/৩) * ১ = ৩। এবার উপরের নাম্বার দুটোর যোগফল দাঁড়ালো ১ + ৩ = ৪ আর যেহেতু নীচের নাম্বার ৯-ই আছে তাই আমাদের ভগ্নাংশের যোগফল হলো ৪/৯। একইভাবে সকল ভগ্নাংশ দ্বারা অঙ্ক কষা যায়। তবে **কমন ডিনোমিনেটর** যদি সঠিক না থাকে তাহলে বড় সংখ্যাটির গুণ করে করে ন্যূনতম যে সংখ্যাটি সবক'টি নীচের নাম্বারের সঙ্গে বিভাজ্য হবে তা-ই ধরে নিতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দেখলে কথাটি পরিষ্কার হবে।

১/২ + ৯/৩ - ৮/৫ এই অঙ্কের মধ্যে ৫ হলো নীচের বড় নাম্বার। কিন্তু এটা একমাত্র নিজে ছাড়া ২ কিংবা ৩ দ্বারা বিভাজ্য নয়। সুতরাং প্রথমে একে দ্বিগুণ করে ১০ নিলেও দেখা যায় এটি নিজ ও ২ দ্বারা বিভাজ্য হলেও ৩ দ্বারা নয়। এবার তিনগুণ নিলেও দেখা যাবে এটি ২ দ্বারা বিভাজ্য নয়। চারগুণ করলেও তা হয় না কারণ ২০ সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য নয়। পাঁচগুণ দ্বারাও কাজ হবে না- কারণ ২৫ সংখ্যা ৩ ও ২ দ্বারা বিভাজ্য নয়। ছয়গুণ করলে সংখ্যাটি হবে ৩০। হ্যাঁ, এবার এই সংখ্যাটি ২, ৩

ও ৫ দ্বারা বিভাজ্য। এটাই হলো আমাদের **লয়েস্ট কমন ডিনোমিনেটর**। এখন আমরা অঙ্কটি কষতে যেয়ে যা লিখবো তা নিম্নরূপ:

$$১/২ + ৭/৩ - ৮/৫ = \frac{১*(৩০/২) + ৭*(৩০/৩) - ৮*(৩০/৫)}{৩০} = \frac{১৫ + ৭০ - ৪৮}{৩০}$$

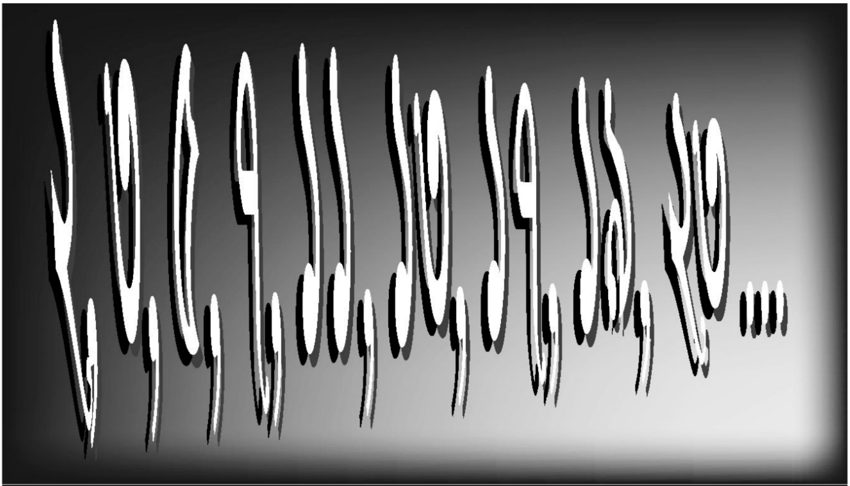
= ৩৭/৩০

অঙ্কশাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা পাটিগণিতের উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রায় শেষ। অবশ্য পাটিগণিতের আরো এক দু'টো ব্যাপার আছে যা এ প্রসঙ্গে শুধু বলে রাখা ভালো। এগুলো হলো **পার্সেন্ট** বা শতাংশ (একশ ভাগের নির্দিষ্ট অংশ), **প্রাইম** বা অবিভাজ্য সংখ্যা (যেমন ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি), **স্কোয়ার** ($২^{২}$, $৭^{২}$ ইত্যাদি) ও **স্কোয়ার রুট্স** (এসকিউআর ৫, ৮ ইত্যাদি) এবং **কিউব** ($২^{৩}$, $৭^{৩}$ ইত্যাদি) ও **কিউব রুট্স** (কিউআর ৮, ১৫ ইত্যাদি) এবং **পাওয়ার** ($৭^{৯}$, ৮^{4})। আমরা এবার এগুলো দিয়ে অঙ্ক কষার কিছু আইন-কানুন দেখে নিই।

কোন সংখ্যার **পার্সেন্ট** বের করা: ৩৪৫৬ এর ৩২% = ৩৪৫৬ * ৩২/১০০ = ১১০৫.৯২।
শতকরা বাড়তি বা কমতির হিসাব : ৪৫০ বেড়ে ৫৩০ হলো। কতো **পার্সেন্ট** বাড়লো? উঃ ((৫৩০ - ৪৫০) / ৪৫০) * ১০০ = ১৭.৭৮% (৮০ বেড়েছে যা মূল ৪৫০ এর ১৭.৭৮ পার্সেন্ট); ৭৬০ কমে ৪৯০ এ নেমেছে। কত **পার্সেন্ট** কমলো? উঃ ((৭৬০ - ৪৯০) / ৭৬০) * ১০০ = ৩৫.৩% (২৭০ কমেছে যা মূল ৭৬০ এর ৩৫.৩%)।

সংখ্যা আইন : ১ এর বেশী যে কোন ইন্টেজার (আস্ত নাম্বার) হলো এক বা একাধিক অবিভাজ্য (প্রাইম) সংখ্যার গুণফল। দৃষ্টান্ত: ৩০ = ২ * ৩ * ৫, এবং ২৮ = ২ * ২ * ৭ (বা $২^{২}$ * ৭)। এখানে ২, ৩, ৫ ও ৭ হলো অবিভাজ্য সংখ্যা।

পাওয়ার আইনসমূহ : **১. পূরণ আইন,** $ক^{প} * ক^{ট} = ক^{(প+ট)}$, দৃষ্টান্ত: $৭^{৫} * ৭^{৪} = ৭^{(৫+৪)} = ৭^{৯}$ (৭*৭*৭*৭*৭ = ১৬৮০৭, ৭*৭*৭*৭ = ২৪০১, ১৬৮০৭ * ২৪০১ = ৪০৩৫৩৬০৭ = $৭^{৯}$); **২. ভাগ আইন,** $ক^{প} / ক^{ট} = ক^{(প-ট)}$, দৃষ্টান্ত: $১২^{৪} / ১২^{২} = ১২^{(৪-২)} = ১২^{২}$ (১২*১২*১২*১২ = ২০৭৩৬, ১২*১২ = ১৪৪, ২০৭৩৬



অবিভাজ্য সংখ্যা সিরিজ- এই সিরিজেরও শেষ নেই।

/ ১৪৪ = ১৪৪ = $১২^{২}$); ৩. **পাওয়ার আইন,** $(ক^{প})^{ট} = ক^{(প*ট)}$, দৃষ্টান্ত: $(৯^{৪})^{৩} = ৯^{১২}$ ($৯^{৪}$ = ৬৫৬১, $৬৫৬১^{৩}$ = ২৮২৪২৯৫৩৬৪৮১ = $৯^{১২}$)।

রুট্‌সকে আমরা এভাবেও লিখতে পারি: $১৬^{১/২}$ (১৬ এর **স্কোয়ার রুট** বা এসকিউআর ১৬); $১২৫^{১/৩}$ (১২৫ এর **কিউব রুট** কিউবরুট ১২৫); $১২৯৬^{১/৪}$ (১২৯৬ এর **চতুর্থ রুট** বা চতুর্থরুট ১২৯৬)। এভাবে লেখার পর আমরা এগুলো দিয়ে উপরোক্ত **পাওয়ার** আইনসমূহ ব্যবহার করে অঙ্ক কষতে পারি। যেমন: আইন ১ এর ব্যবহার, $১৬^{১/২} * ১৬^{১/৪} = ১৬^{(১/২+১/৪)} = ১৬^{৩/৪}$ ($১৬^{১/২}$ = ৪, $১৬^{১/৪}$ = ২; ৪*২ = ৮ এবং $১৬^{৩/৪}$ = (আইন ৩ দ্বারা) $(১৬^{১/৪})^{৩}$ = ৮ (কারণ ২-কে চারবার পূরণ করলে ১৬ হয় এবং ২-কে তিনবার গুণ করলে রেজাল্ট দাঁড়ায় ৮)। অন্যান্য আইনও এভাবে ব্যবহার করা যায়।

আপনি জানেন কি: কম্পিউটার বিজ্ঞানে **সফট্‌ওয়ার** তৈরীতে **'আলগোরিথম'** নামক একটি গাণিতিক গবেষণা করা হয়। এই শব্দের অর্থ হলো, বড় কোন বিশেষ ফলাফল বের করতে যেয়ে ছোট ছোট **ইউনিট** করে গবেষণা চালিয়ে মূল লক্ষ্যে পৌঁছা। আর আসল কথা হলো **'আলগোরিথম'** শব্দটি এসেছে অষ্টম/নবম শতকের প্রখ্যাত মুসলিম গাণিতিক **মূসা আল-খোয়ারিজমি** (৭৮০-৮৫০ খৃঃ) থেকে। **'আল-খোয়ারিজমি'** নামের বিকৃত রূপই হলো **'আলগোরিথম'**।

পরিচ্ছেদ ২

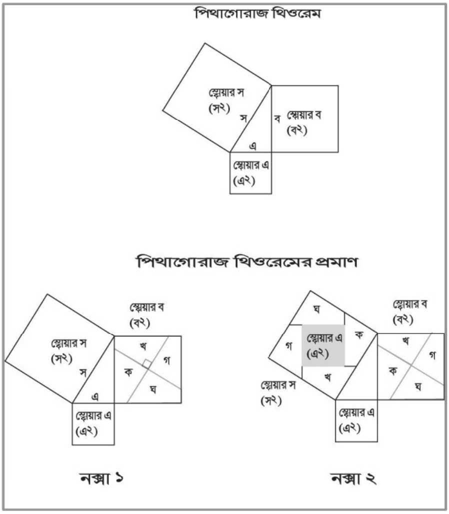
বীজগণিত

আরবী শব্দ আল-জাবুর থেকে ইংরেজী শব্দ Algebra এর উৎপত্তি। এক বা এর অধিক অজানা সংখ্যাকে অক্ষরের মাধ্যমে আমরা উপস্থাপন করে নিতে পারি। এরপর এই অক্ষরগুলো গণিতের বিভিন্ন অপারেশনের চিহ্ন দ্বারা উপস্থাপন করে সাধারণ সমীকরণ গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমনঃ $\mathbf{x + y = z}$ এখানে আমরা বলছি একটি অজানা সংখ্যা $\mathbf{x}$ এর সঙ্গে আরেকটি অজানা সংখ্যা $\mathbf{y}$ যোগ করলে ফল দাঁড়াবে সংখ্যা $\mathbf{z}$-এ। এখন মনে করুন, আমরা জানি প্রথম সংখ্যাটি 4 (x) এবং দ্বিতীয়টি 9 (y), তাহলে z-এর মান হবে $z = 4 + 9 = 13$। এছাড়া যদি z ও x-এর মান জানা থাকে তাহলে আমরা সহজেই y-এর মান বের করতে পারি। যেমনঃ $4 + y = 13$, এই সমীকরণে একটি মাত্র সংখ্যা অজানা। সুতরাং যেহেতু দু'টি সংখ্যার যোগফল ১৩ তাই যোগফল থেকে জানা সংখ্যাটি বাদ দিলেই অজানা সংখ্যাটি নির্ণিত হবে। তবে সমীকরণকে আমরা একটু পাল্টে লিখলে সহজ হয়। যেমনঃ $y = 13 - 4$, এখানে লক্ষণীয় যে সমীকরণের একপাশ থেকে অপরপাশে যে সংখ্যাটি আমরা নিয়ে গেছি তার **সাইন** বা সংকেত বদলে গেছে। এখানে আমরা বীজগণিতের একটি আইন ব্যবহার করেছি তাহলোঃ **সমীকরণের সমান চিহ্নের (=) একদিক থেকে অপরদিকে কোন সংখ্যা বা অক্ষর যদি নেওয়া হয় তাহলে তার সাইন বদলে যাবে (+ (প্লাস) থাকলে - (মাইনাস) হবে আর - (মাইনাস) থাকলে + (প্লাস) হবে)**।

বীজগণিতের সকল সমীকরণের ব্যাপারে এই মৌলিক আইনটি প্রযোজ্য, সুতরাং একে শিখে নেওয়া জরুরী। বীজগণিতের সমীকরণে শুধু যোগ-বিয়োগের সীমাবদ্ধতা নয়। পূরণ, ভাগ, ভগ্নাংশ, **রুট্‌স** ইত্যাদি **এ্যারিথমেটিক অপারেটরস্‌**ও এতে ব্যবহার করা যায়।

আদি যুগের একটি প্রখ্যাত সমীরকণ হলোঃ $a^2 + b^2 = c^2$। এই সমীকরণকে **পিথাগোরাজ থিওরেম** বলে। এটা দ্বারা একটি **'রাইট-আংগুল্‌ড ট্রায়াঙ্গুল'** [সমকোণে ত্রিভূজ] এর তিনপ্রান্তের মান নির্ণিত হয়। এখানে a^2 (a*a) ও b^2 (b*b) হলো ৯০

ডিগ্রির অপরদিকের সাইড c (যাকে **হাইপোথিনিউজ** বলে) ছাড়া বাকী দু'টি সাইডের মাপ (নক্সাটি দেখুন)। এখন, যদি a এবং b এর মান আমাদের জনা থাকে তাহলে সমীকরণকে একটু পাল্টে নিয়ে আমরা অপর সাইড তথা c এর মান নির্ণয় করে নিতে সক্ষম হবো। যেমন: $3^2 + 4^2 = c^2$। $SQR(3^2 + 4^2) = c = SQR(25) = 5$। লক্ষ করুন, আমরা ২৫ এর **স্কোয়ার** রুট নিয়ে ৫ বের করেছি। নীচের নক্সাটি দেখুন।

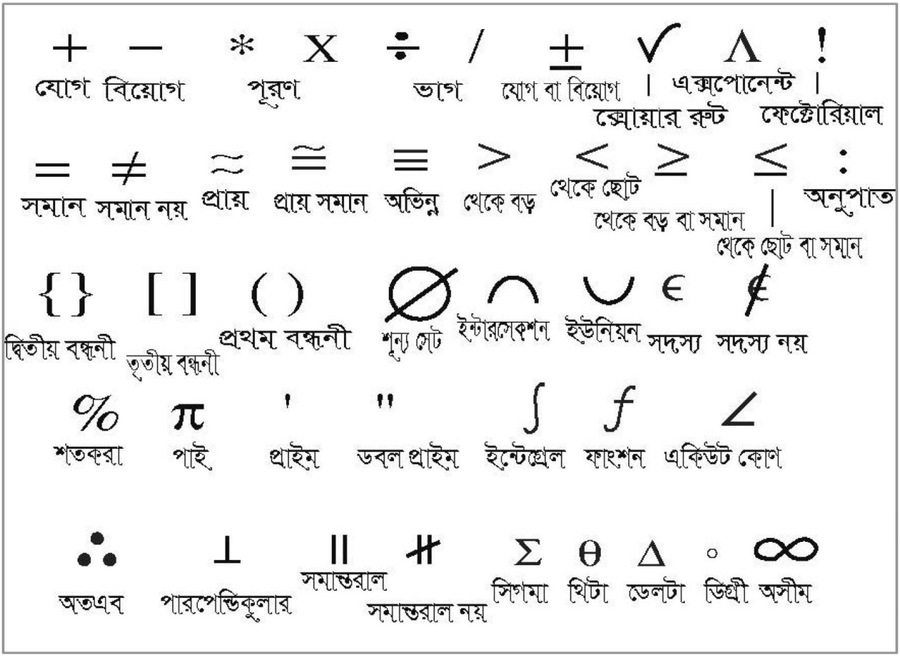


এই **থিওরেম** বলে: **যে কোন সমকোণে ত্রিভুজের দুই সাইড (তথা বেইজ স্কোয়ার এ ও অপোজিট স্কোয়ার ব) এর স্কোয়ারের যোগফল অপর সাইড (তথা হাইপোথিনিউজ স্কোয়ার স) এর স্কোয়ারের সমান**। অঙ্কে বলা যায়:- স^২ = ব^২ + এ^২ আমরা এ ফরমুলা দ্বারা এ ধরনের ত্রিভুজের বিভিন্ন প্রান্তের পরিমাণ হিসাব করতে পারি। যেমন:- যদি এ=৩ ও ব=৪ হয় তাহলে, স = ৩২ + ৪২ = ২৫ = ৫

পিথাগোরাজ থিওরেমের প্রমাণ এভাবে করা যায়: আমরা প্রথমে স্কোয়ার **ব**-কে চারটি ভাগে ভাগ করেছি। স্কোয়ারটির সেন্টার পয়েন্টের উপর দিয়ে অঙ্কন করেছি একটি লাইন যা ত্রিভুজের **হাইপোথিনিউজ স** এর সঙ্গে প্যারালাল। এরপর এই সেন্টার পয়েন্টের উপর অঙ্কিত লাইনের সঙ্গে **পারপেন্ডিকুলার** (৯০ ডিগ্রীতে) করে আরো একটি লাইন এঁকেছি। এখন স্কোয়ারটি **ক, খ, গ ও ঘ** এই চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে (নক্সা ১)। এবার **স্কোয়ার** এ-কে **স্কোয়ার** স এর ঠিক মধ্যখানে বসিয়েছি। দেখুন কিভাবে লাইন টেনে বাকী অংশটুকুকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে (নক্সা ২)। **স্কোয়ার** ব-এর চারটি অংশ **স্কোয়ার** স-এ ফিট হয়ে বসে গেছে। এতে প্রমাণ হলো, **স্কোয়ার** এ ও **স্কোয়ার** ব এর যোগফল হচ্ছে **স্কোয়ার** স।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে অজানা সংখ্যা নির্ণয়সহ অক্ষর দ্বারা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন **ফিজিক্যাল সিস্টেমের** উপর আমরা বীজগণিতের সীমকরণ গড়ে তুলতে পারি। এভাবে সমীকরণ গড়ে তোলার মাধ্যমে পুরো বিজ্ঞানজগতে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শতশত প্রতিপাদ্য, **থিওরী** ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত গণিতশাস্ত্র।

বীজগণিতের সমীকরণে সাধারণ পাটিগণিতের মৌলিক চারটি সংকেত (+, - / *) ছাড়াও আরো অনেক সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নের নক্সায় এদের কিছু তুলে ধরা হলো।



প্রতিটি সংকেত সম্পর্কে পূর্ণ ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ

যোগচিহ্ন (+, **এডিশন**) দুই বা ততোধিক সংখ্যা যোগ করার সংকেত, দৃষ্টান্ত : ক + খ = গ।

বিয়োগচিহ্ন (− , **সাবট্রাকশন**) দুটি সংখ্যার একটা থেকে অপরটি বিয়োগ করার সংকেত, দৃষ্টান্ত : ক − খ = গ।

পূরণচিহ্ন (*, x, **মাল্টিপ্লিকেশন**) দুই বা ততোধিক সংখ্যা গুণ করার সংকেত, দৃষ্টান্ত : ক * খ * গ = ট।

ভাগচিহ্ন (/, ⁚ ÷, **ডিভিশন**) একটি সংখ্যাকে অপরটি দ্বারা ভাগ করার সংকেত, দৃষ্টান্ত : ক/খ = চ।

যোগ বা বিয়োগচিহ্ন (±, **প্লাস** অর **মাইনাস**), কোন বিশেষ সংখ্যার **নেগিটিভ** ও **পজিটিভ** মান, দৃষ্টান্ত : ক = ± ৫০।

গুণক সংখ্যা (^ **এক্সপোনেন্ট**), এটার পরবর্তী সংখ্যা বায়ের নাম্বারটি কতোবার নিজে নিজেই গুণ করা হবে তা বুঝায়, দৃষ্টান্ত : ৬ ^ ৩ = ৬*৬*৬ = ২১৬। অবশ্য ডানের নাম্বারটি **পাওয়ার** হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন: ৬^{৩} (সিক্স কিউব) = ৬*৬*৬ = ২১৬।

ফেক্টোরিয়াল (!), যে কোন সংখ্যার পরে এটা থাকলে ঐ সংখ্যাটিকে ক্রমোবনিতর দিকে একে একে ১ পর্যন্ত লিখে একত্রে সবগুলোর গুণফল বুঝায়। যেমন: ৪! = ৪*৩*২*১ = ২৪।

সমানচিহ্ন (=, **ইক্যুয়াল**), এই চিহ্নের বাম ও ডানের মান সমান বুঝায়, দৃষ্টান্ত : ট + ৭ = ঢ - ৯।

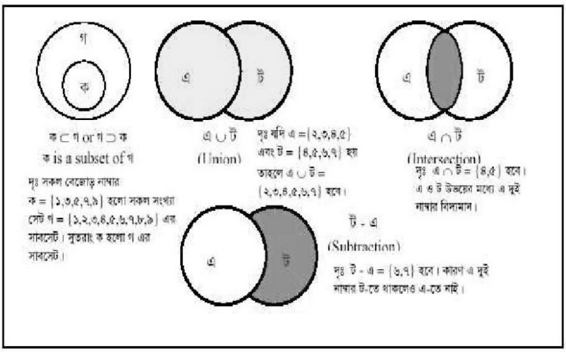
সমান নয় (≠, **নট ইক্যুয়াল**), এই চিহ্নের ডান ও বামের মোট মানে পার্থক্য বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত : ৪-৩ ≠ ৫-২।

প্রায় সমান (≈, **এপ্রোক্সিমেটলি ইক্যুয়াল**), এটা দ্বারা তার বায়ের মান ডানের মানের প্রায় সমান বুঝায়, যেমন : ২.০০০৩ ≈ ২।

জমজচিহ্ন (≡, **আইডেন্টিক্যাল**), এই চিহ্ন দ্বারা এর দু'দিকের ক্যুয়ান্টিটি সমপর্যায়ের বা একই ধরনের বুঝায়। যেমন, একটি স্কুলের সকল ছেলেদের সংখ্যা যদি ক দ্বারা সম্বোধন করা হয় তাহলে এই স্কুলের সকল ছাত্র খ যাদের কেউ মেয়ে নয় তা হবে: ক ≡ খ।

হতে বড় (>, **গ্রেটার দেন**), হতে ছোট (<, লেস দেন), হতে বড় বা সমান (>=, **গ্রেটার দেন অর ইক্যুয়াল টু**) এবং হতে ছোট বা সমান (<=, **লেস দেন ওর ইক্যুয়াল টু**) যথাক্রমে বায়ের সংখ্যার মান ডানেরটির তুলনায় বড়, বায়ের সংখ্যার মান ডানেরটির তুলনায় ছোট, বায়ের সংখ্যার মান ডানেরটির তুলনায় বড় বা সমান এবং বায়ের সংখ্যার মান ডানেরটির তুলনায় ছোট বা সমান বুঝায়। দৃষ্টান্ত : ৪>৩,

৭৮<৯০, ব >= ক (অর্থাৎ ব ক এর বড় কিংবা সমান হতে পারে- ছোট হবে না) এবং ক <= ফ (ক এর মান ফ থেকে ছোট কিংবা সমান হতে পারে, বড় হবে না)।
রেচিও (:), এটা দ্বারা দু'টি সংখ্যার সাংখ্যক যোগসূত্র নির্ণয় বুঝায়, মনে করুন শফিক ৩টি পুস্তক পাঠ করে যে সময়ে, হাসি পাঠ করে দু'টি। সুতরাং শফিক ও হাসির বই পাঠের **রেটিও** হলো ৩:২ (তিন থেকে দুই)।
প্রথম বন্ধনী (( ), **প্যারেনথিসেস**), দ্বিতীয় বন্ধনী ({ }, **কারলি ব্রাকেট্স**) ও তৃতীয় বন্ধনী ([ ] , **ব্রাকেট্স**) কোন সমীকরণে হিসাব করার অগ্রাধিকার নির্ণয় করে, দৃষ্টান্ত : {১ + [(৬*৭)-(৪+৬)+৫} = ৩৮। এখানে প্রথমে প্রথম বন্ধনীর হিসাব (৬*৭) এরপর ফলাফল থেকে বিয়োগ করা হয়েছে অপর প্রথম বন্ধনীর মান (৪+৬)। এরপর প্রথম ফলাফল থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করে ফলাফলের সঙ্গে ১ ও ৫ যোগ করা হয়েছে। এখন দেখুন এই অঙ্কটি আবার বন্ধনীসমূহ ছাড়া লিখলে কি হয়: ১ + ৬ * ৭ - ৪ + ৬ +৫; এই অঙ্কের মান কিভাবে নির্ণিত হবে? এখানে ১+৬ হতে পারে বা ৭ - ৪ হতে পারে- যা আমরা আদৌ চাই নি। বন্ধনীর মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার ও এর মান নির্ভুল হলো।
শূন্য সেট (∅, **এম্পটি সেট**), আধুনিক গণিতে ব্যবহৃত এই চিহ্ন দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, একটি গ্রুপের মধ্যে কোন সদস্য নেই। দৃষ্টান্ত : মনে করুন, গ্রামের প্রাইমারীতে ক নামক এক গ্রুপ ছাত্র আছে যাদের সবাই ৫ম শ্রেণীতে ৮০ মার্কস্ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পড়াশোনা করে। কিন্তু সেই প্রাইমারীতে যদি পঞ্চম শ্রেণীতে আশি মার্কপ্রাপ্ত কেউ না থাকে তাহলে সেট থিওরীতে আমরা বলতে পারি ক = ∅।
আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রের অন্যান্য সেট থিওরীর চিহ্নসমূহ হলো **ইন্টারসেকশন, ইউনিয়ন, মেম্বার অব** এবং **নট এ মেম্বার অব**। এগুলোর ব্যাখ্যার জন্য নিম্নের নক্সাটি দেখুন।



শতকরা হার চিহ্ন (%, **পার্সেন্ট**), এই চিহ্নযুক্ত সংখ্যা দ্বারা শতকরা মান নির্ণিত হয়। যেমন: ২০০ এর ২৫% = ৫০।
পাইচিহ্ন (μ), এটা একটি গাণিতিক অপরিবর্তনীয় সংখ্যা (**কন্সটেন্ট**)। এটার মান হলো, ৩.১৪১৫৯২৬৫ .. ..। μএর **ডেসিমেল পয়েন্ট** পরে অসংখ্য **ডিজিট** আছে। গাণিতিক অনেক ক্ষেত্রে μ ব্যবহৃত হয়, দৃষ্টান্ত : একটি বৃত্তের পরিধি-রেখা (**সারকামফেরেন্স**) হলো, 2*μ*R- এখানে R হচ্ছে বৃত্তের রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ।

পূর্ণরাশিক চিহ্ন (∫, **ইন্টেগ্রেল**) ও **ফাংশন** চিহ্ন (f), উচ্চগণিত বা **কালক্যুলাসে** এ দু'টি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। প্রথমটির ডানের **ফাংশন ইন্টেগ্রেটেড** হবে বলে নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টি দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক বুঝায়। যেমন: $S = f(x)dx$ ।

থিটা (θ) ও **ডিগ্রী** (°), এগুলো সাধারণত ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি দ্বারা ত্রিভূজের কোণ্ বুঝায়, আর দ্বিতীয়টি কোণের মাফ কিংবা তাপমাত্রার মান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত : **Sin θ = O/H,**; একটি সমকোণবিশিষ্ট ত্রিভূজের একটি কোণ হলো ৯০°; পানির স্ফুটনাঙ্ক বা যে তাপমাত্রায় পানি ফুটে তা হলো ১০০° **সেন্টিগ্রেড**।
অসীম রাশিচিহ্ন (∞, **ইনফিনিটি**), এটা দ্বারা কোন **ক্যুয়ান্টিটির** অসীমত্ব বুঝায়- অর্থাৎ এটি কল্পনা ও গণনার সীমাবদ্ধতার বাইরে।

আপনি জানেন কি: 'মবিয়াস স্ট্রিপ' নামক একটি দুই বিস্তৃতিসম্পন্ন **সারফেস** আছে যার মধ্যে একটি মাত্র বহির্ভাগ বিদ্যমান! নীচের ছবিতে লক্ষ্য করুন, বলটি যদি ঘুরে আসে তাহলে উভয় বিস্তৃতিতে ভ্রমণ করলেও সে সর্বদাই একই সাইডের উপর বহাল থাকে। এই অদ্ভুত সারফেসের আবিষ্কারক ছিলে জার্মান গাণিতিক **অগাস্ট ফারদিনেন্ড মবিয়াস**। ছবির নির্দেশমতো আপনিও একটি **মবিয়াস স্ট্রিপ** তৈরী করতে পারেন।

পরিচ্ছেদ ৩

জ্যামিতি

স্থানের উপর গবেষণা হচ্ছে গণিত শাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা যাকে জ্যামিতি বলা হয়। তবে জ্যামিতির নিজস্ব কয়েকটি শাখা আছে। এর মধ্যে সমতল (**প্লেইন**) জ্যামিতি, ত্রিমাত্রিক (**সলিড**) জ্যামিতি, **অ্যানালিটিক জিওমেট্রি**, গোলকাকার (**স্ফেরিক্যাল**) জ্যামিতি ও দৈশিক (**টপোলজি**) জ্যামিতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। আমরা এ ক'টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা একটু পরে একে একে উল্লেখ করবো। প্রথমে জ্যামিতির উপর কিছু বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি।

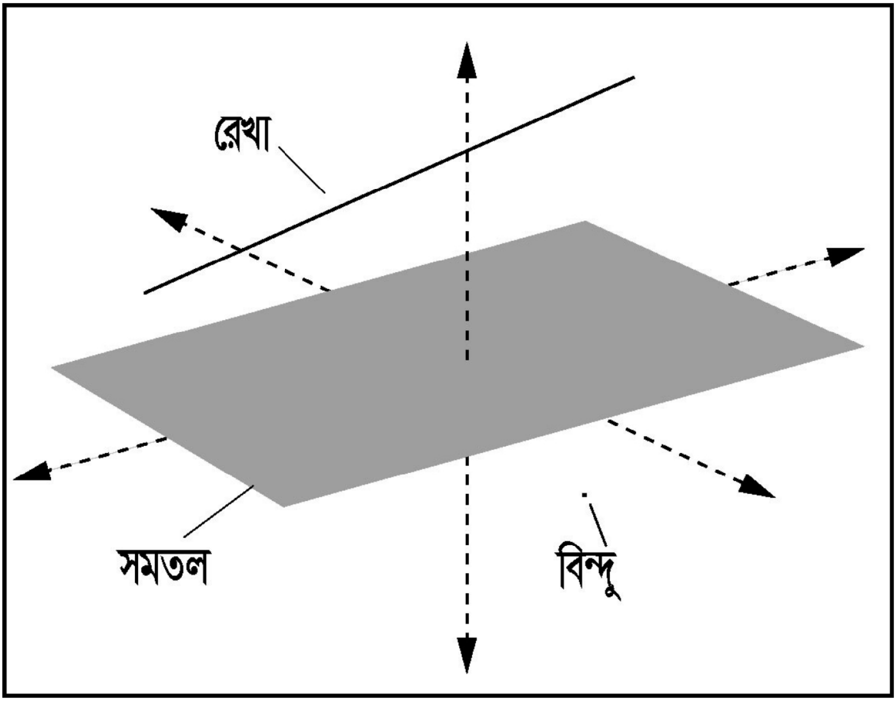
নিয়ম-পদ্ধতি

গণিত বা বিজ্ঞানের যে কোন ব্যাপারে গবেষণায় কিছু মৌলিকত্বের অনুসরণ অপরিহার্য। একে বিজ্ঞানের ভাষায় '**মেথোডলোজি**' [নিয়ম-পদ্ধতি] বলে। জ্যামিতির **মেথোডলোজি** হলো, সাধারণ ধারণাভিত্তিক বিল্ডিং ব্লক যা যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। এসব বিল্ডিং ব্লকের মূলে আছে সংজ্ঞাহীন ও সংজ্ঞাযুক্ত শর্তাবলী এবং অনেক **পসটুলেট** (যুক্তিসম্মত গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত)। এসব একত্রে এনে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা গণিতজ্ঞ যে ফলাফল উপস্থাপন করেন তাকে বলে উপপাদ্য বা **থিওরেম**। জ্যামিতির নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে এই গ্রন্থের স্কোপ যেটুকু সে অনুপাতে আমরা নিম্নোক্ত ক'টির উপর মাত্র আলোচনা করবো।

১. সংজ্ঞাহীন শর্তাবলী

সংজ্ঞাহীন জ্যামিতিক শর্তাবলী মূলত আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আমরা এগুলো এমনিতেই মেনে নিই। যেমন স্থানের উপর অঙ্কিত সরল রেখা, সমতল ফিগার কিংবা বিস্তৃতিহীন **পয়েন্ট** [দেখুন নীচের নক্সাটি]। আমরা অনেক বস্তু দেখতে পাই যেগুলোর কোন এক অংশ পয়েন্টের মতোই লাগে- যেমন একটি বাক্সের কোণ, পেন্সিল বা কলমের মাথা কিংবা একটি আলপিনের শানিত প্রান্তের শেষাংশ ইত্যাদি। একইভাবে লাইন বলতে আমরা একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে বিস্তৃত এক-বিস্ড়ৃতিসম্পন্ন রেখাকে বুঝি। এছাড়া ইংরেজী শব্দ **'Plane'** অর্থ কোন বস্তুর উপরিভাগের সমতল সারফেসকে বুঝায়। তবে আমরা ধারণা করি এটির বিস্তৃতি দু'টি ও তা চতুর্দিকে অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। অনুরূপ একটি রেখাও সমতল

প্লেইনের মতো একদিক থেকে অপরদিক অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব ব্যাপার কোন গাণিতিক প্রমাণ ছাড়াই আমরা গ্রহণ করে নিই- এজন্য এগুলো হলো **আনডিফাইন্ড টার্মস্** বা সংজ্ঞাহীন শর্তাবলী। জ্যামিতির ক্ষেত্রে এসব শর্তাবলী ও এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্বন্ধ বিনাবাক্যে মেনে নিতে হবে- অন্যথায় অনেক মৌলিক আইন-কানুনও কার্যকরী হবে না। সম্বন্ধের একটি দৃষ্টান্ত হলো, "**একটি পয়েন্ট যা একটি রেখার উপর আছে।**"



২. সংজ্ঞাযুক্ত শর্তাবলী

সংজ্ঞাহীন ছাড়াও সংজ্ঞাযুক্ত কিছু শর্তাবলী আছে যেগুলো পরিষ্কারভাবে গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপপাদ্য। উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাহীন শর্ত **পয়েন্ট** দিয়েই আমরা সংজ্ঞাযুক্ত অপর কোন উপপাদ্য সংজ্ঞায়িত করতে পারি। যেমন, **নন-কলিনিয়ার পয়েন্ট;** এতে বলা হয়েছে, "**ঐসব পয়েন্ট যেগুলো একই রেখার উপর নয়।**" অপর একটি দৃষ্টান্ত : "**একটি রেখার অংশে দু'টি পয়েন্ট উভয় প্রান্তে আছে এবং এর উপর**

আরোও বহু পয়েন্ট থাকতে পারে।” আরোও একটি ব্যাপার হলো : “**একটি রেখা হলো এক প্রান্তের একটি পয়েন্ট ও অপরদিকে তা অনন্ত পর্যন্ত লম্বা।**” এসব সংজ্ঞা আমরা সংজ্ঞাহীন **পয়েন্ট, লাইন ও প্লেইন** ইত্যাদি থেকে গড়ে তুলেছি। অন্য আরো কিছু বস্তুর সংজ্ঞা আমরা একইভাবে উপস্থাপন করতে পারি। যেমন, একটি কোণকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে বলতে পারি, “**দু'টি রেখার অংশ বা রে এর শেষপ্রান্ত যা একটি পয়েন্টে গিয়ে মিশেছে।**” একইভাবে ত্রিভূজ মানে হচ্ছে, “**তিনটি নন-কলিনিয়ার পয়েন্ট যেগুলো একে অন্যের সঙ্গে রেখা অংশ দ্বারা মিলিত হয়েছে।**” সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে জ্যামিতির যে কোন ফিগারকে আমরা এভাবে মৌলিক কিছু সংজ্ঞাহীন শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। নীচের চিত্রটি স্ট্যাডি করলে বিষয়টি ধরা পড়বে- আশারাখি।

৩. পসটুলেট বা যুক্তির মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত

পসটুলেট বলতে সংজ্ঞাহীন কিছু গাণিতিক ব্যাপারকে বুঝায় যেগুলোর সত্যতার উপর কেউ প্রশ্ন করে না। সবাই এসব ব্যাপার মেনে নেয়। অথচ এগুলোর গাণিতিক কোন প্রমাণ নাই বরং তা যুক্তির মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত সত্য। একটি দৃষ্টান্ত হলো, “**শুধুমাত্র একটি লাইন দু'টি বিশেষ পয়েন্টের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে।**” আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন **পসটুলেট** ও তার সঙ্গে উপরে বর্ণিত সংজ্ঞাহীন শর্তাবলী যেমন রেখা, সমতল ও **পয়েন্ট** ইত্যাদি মিলিয়ে যে জ্যামিতিক আইন-কানুন গড়ে উঠে তা থেকে যেসব রেজাল্ট আসবে তা-ও বিশ্বাস করা হয় যে, তা আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে। এক কথায়, আমরা এরূপ কোন গাণিতিক ফলাফলকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে মেনে নিতে পারি। কিন্তু যেহেতু মূলে কিছু সংজ্ঞাহীন শর্তাবলী সম্পৃক্ত আছে তাই সর্বক্ষেত্রে এসব ফলাফল সঠিক কিংবা আসল সত্যের কাছাকাছি হলেও সম্পূর্ণ নির্ভুল না-ও হতে পারে। অথচ এই পসটুলেটের উপর ভিত্তি করেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়। এখানেই বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

৪. থিওরেম বা উপপাদ্য

পসটুলেট বা যুক্তির মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত শর্তাবলী থেকে গাণিতিক প্রমাণ সাপেক্ষে যৌক্তিক উপায়ে উপপাদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রমাণ বা প্রুফ তৈরীর প্রতিটি পদে অবশ্যই প্রমাণ করে যেতে হবে যে এটা **পসটুলেট** বা অপর কোন প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত **থিওরেম** দ্বারা সমর্থনযোগ্য। একটি দৃষ্টান্ত হলো **প্যারালাল লাইনস্** (সমান্তরাল রেখা)। আমরা জ্যামিতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, **"দু'টি রেখা যখন একে অন্যের মধ্যে সমান্তরাল হয় তখন তা সর্বদাই একে অন্য থেকে সমপরিমাণ দূরত্বে থাকবে।"**

উপরে বর্ণিত জ্যামিতির মৌলিক কিছু বিষয়বস্তু আমরা প্রয়োজনের খাতিরেই তুলে ধরেছি। পাঠকরা এ থেকে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, গণিতের এই শাখাটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ডেভোলাপ হয়েছে। এখন আমরা সচরাচর ব্যবহৃত **ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির** উপর বিস্তারিত কিছু আলোচনা করবো।

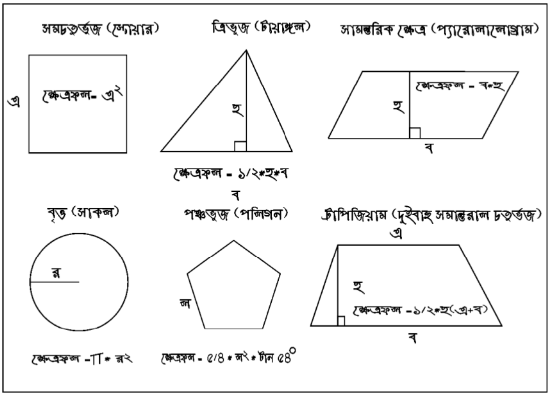
ইউক্লিডের পসটুলেটসমূহ

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে **ইউক্লিড** (খ্রী.পূ. ৩০০) জীবিত ছিলেন। সে যুগে ব্যবহারযোগ্য জ্যামিতিক সকল সমস্যা সমাধানে ইউক্লিড ৫টি মাত্র **পসটুলেট** প্রতিষ্ঠিত করেন। এগুলো নিম্নরূপ:

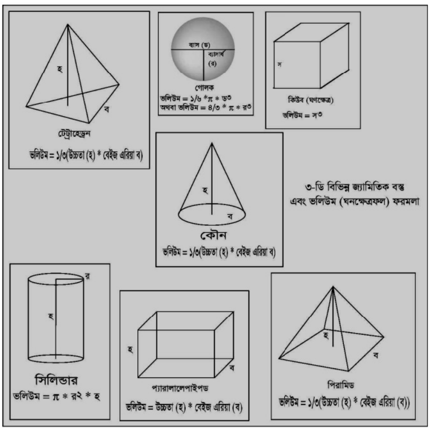
১. যে কোন দু'টি পয়েন্টের মধ্যে একটি সরল রেখা অঙ্কন করা যাবে।
২. একটি সরল রেখা সীমিত দৈর্ঘ্য হতে পারে কিংবা তা অসীমিত দৈর্ঘ্য হতে পারে।
৩. কোন বিশেষ পয়েন্টকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত নির্দিষ্ট ব্যসার্ধ দ্বারা অঙ্কন করা যাবে।
৪. সকল ৯০ **ডিগ্রী** কোণ্ (**রাইট-আঙ্গুল**) হলো সর্বসম (**কংগ্রুয়েন্ট**)।
৫. দু'টি সরল রেখার উপর যদি অপর একটি সরল রেখা পতিত হয় এবং ভেতরের কোণ্ দু'টি ৯০ ডিগ্রীর কম থাকে তাহলে ঐ দু'টি রেখার অপরপ্রান্ত একটি পয়েন্টে যেয়ে মিলিত হবে।

প্লেইন জিওমেট্রি

জ্যামিতির এই শাখাকে **'ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি'** নামেও সম্বোধন করা হয়। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে প্রাচীন গ্রীসে ইউক্লিড এই জ্যামিতির উদ্ভাবন করেন। এই জ্যামিতি দ্বারা দুই বিস্তৃতিসম্পন্ন কোন চিত্রের বিভিন্ন মাপ নির্ণয় করা যায়।



বায়ের ছবিতে আমরা মৌলিক কিছু জ্যামিতিক ফিগার ও এদের ক্ষেত্রফল দেখতে পাচ্ছি। সাধারণ মাপ-জোক যেমন কক্ষের দেয়ালের আয়তন কিংবা ফুটবল ফিল্ডের ক্ষেত্রফল অথবা বহিঃপরিসীমা **(পেরিমিটার)** নির্ণয়ে এই জ্যামিতির ব্যবহারই যথেষ্ট। তবে বক্রতাসম্পন্ন স্থান বা সারফেসের ক্ষেত্রে এই জ্যামিতি অগ্রহণযোগ্য বিধায়, উনিশ শতকে নতুন এক জ্যামিতির জন্ম হয় যাকে সাধারণত **নন-ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি** বলে। **স্পেরিক্যাল** (গোলকারক) ও **টপোলজি** এই নতুন জ্যামিতির অন্তর্ভুক্ত। একটু পরই আমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।



সলিড জিওমেট্রি

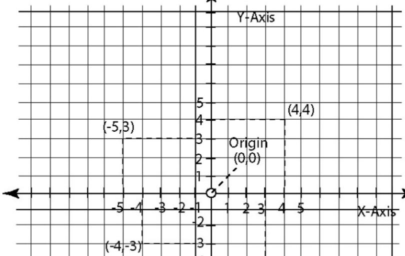
এই জ্যামিতি দ্বারা তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন বস্তুর (বা সলিডের) বিভিন্ন মাপ নির্ণিত হয়। আমরা নিম্নের নক্সায় এরূপ কিছু বস্তু ও এদের **ভলিউম** বা ঘনফলের বিভিন্ন সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি। **সলিড জিওমেট্রি** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে কোন **ইঞ্জিনিয়ারিং** ডিজাইনে এর ব্যবহার অপরিহার্য।

অ্যানালিটিক জিওমেট্রি

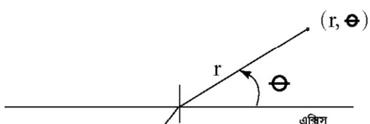
জ্যামিতির এই শাখাকে **কো-অরডিনেট জিওমেট্রি**ও বলে। কিছু কিছু জ্যামিতিক ফিগার আছে যেগুলোর বিভিন্ন **পয়েন্ট গ্রাফের** মধ্যে বীজগণিতের সমীরকরণ দ্বারা উপস্থাপন সম্ভব। ফরাসী গাণিতিক **রেনি ডেসকারটেস** (১৫৯৬ - ১৬৫০) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত **কারটেসিয়ান কো-অরডিনেট সিস্টেম** এই জিওমিট্রিতে ব্যবহৃত হয়।

যে কোন **কো-অরডিনেট সিস্টেমে** আমরা দুই কিংবা তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন স্থানকে উপস্থাপন করতে পারি। সাধারণত উপর থেকে নীচের দিকের বিস্তৃতিকে y, বায়ে থেকে ডানের বিস্তৃতিকে x এবং গভীরত্বের বিস্তৃতিকে z **এক্সিস** (বা অক্ষরেখা) দ্বারা গ্রাফ কাগজে দেখানো হয়। নীচের নক্সাটি স্ট্যাডি করলে ব্যাপারটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হবে। দুই বিস্তৃতিসম্পন্ন কোন বস্তু যেমন একটি বৃত্ত সহজেই আমরা গ্রাফের মধ্যে এক্স-ওয়াই **পয়েন্ট** নির্দিষ্ট করে দেখাতে পারি। একইভাবে তিন বিস্তৃতিসম্পন্ন যে কোন বস্তুকে এক্স-ওয়াই-জেড এর মাধ্যমে **পয়েন্ট** দ্বারা দেখাতে সক্ষম হবো।

পোলার কো-অরডিনেট সিস্টেমে পয়েন্টকে আমরা বৃত্তের কেন্দ্র থেকে একটি রেখা ও কোণ্ দ্বারা উপস্থাপন করি। এভাবে করার মধ্যে আলাদা কিছু উপকার আছে। একটি স্থির **পয়েন্ট** থেকে উক্ত পয়েন্টকে জানার ফলে কিছু সমীরকরণ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। দৃষ্টান্তঃ **কারটেসিয়ান কো-অরডিনেট সিস্টেমে** বৃত্তের সমীকরণ হলো, $\mathbf{x^2 + y^2 = d^2}$; কিন্তু **পোলার কো-অরডিনেটে** এটা হবে, $r = d$.- এখানে d হলো বৃত্তের ব্যাসার্ধ।



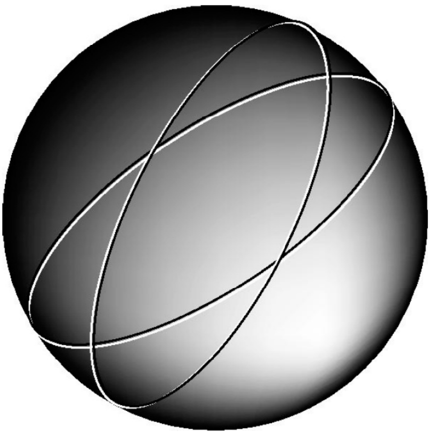
দুই-বিস্তৃতিসম্পন্ন কারটেসিয়ান কো-অরডিনেট সিস্টেম



পোলার কো-অরডিনেট সিস্টেম

গোলকাকার (স্ফেরিক্যাল) জ্যামিতি

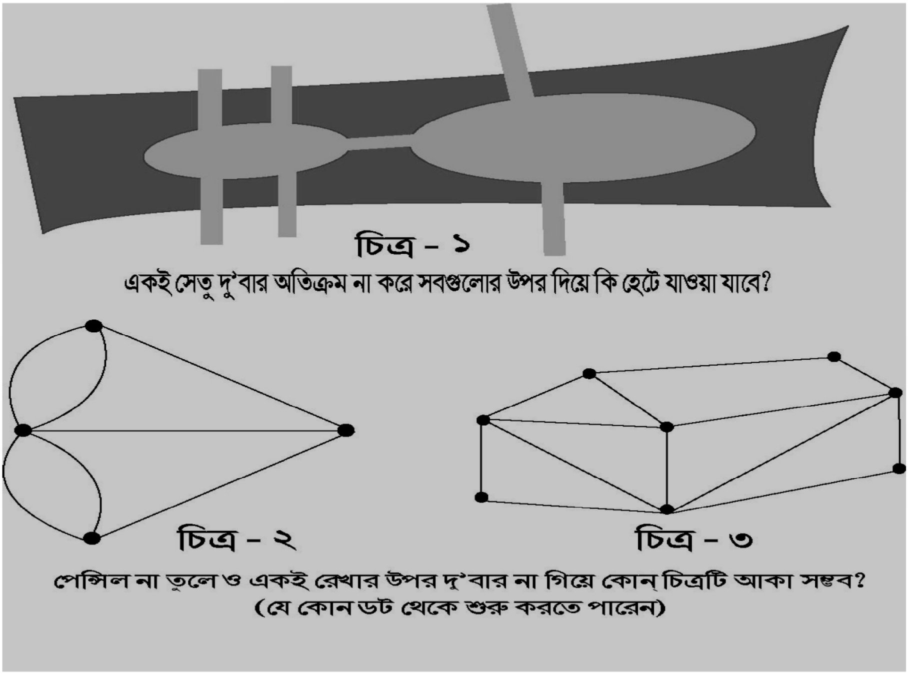
আধুনিক যুগে এসে বিভিন্ন গাণিতিক ইউক্লিডের প্রতিষ্ঠিত জ্যামিতির মধ্যে কিছু মৌলিক ভুল-ত্রুটি আবিষ্কার করেন। বিশেষ করে ইউক্লিডের **প্লেইন** জ্যামিতি যে মূলত স্বভাবের কোন কোন ক্ষেত্রে অকেজো তা তারা নির্দিষ্ট করে একটি নতুন জ্যামিতির জন্ম দেন। এই জ্যামিতির মূলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো বাস্তব ত্রিমাত্রিক জগতটি আসলে বক্রতাপূর্ণ। ইউক্লিডের জ্যামিতি পারফেক্ট বক্রতাহীন ফ্ল্যাট স্থানে ব্যবহারযোগ্য হলেও গোলকাকার স্থানে তা ফেইল করে। গোলকাকার জ্যামিতিতে সকল সরল রেখা মূলত বৃহৎ বৃত্ত। এরূপ সারফেসে দু'টি **প্যারেলাল** (বা সমান্তরাল) লাইন অঙ্কন অসম্ভব। নীচের চিত্রটি দেখুন। সুতরাং সাধারণতঃ প্রাত্যহিক অভিজ্ঞাসম্পন্ন জগতে আমরা ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি ব্যবহার করতে পারি এবং এতে আমরা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ফলাফল পাবো। তবে বৃহৎ দূরত্ব যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাপকাটিতে এই জ্যামিতি গ্রহণযোগ্য হয় না। এছাড়া আইনস্টাইনের প্রতিষ্ঠিত **রিলেটিভিটিতে** (আপেক্ষিকতায়) **ইউক্লিডিয়ান** জ্যাতিমি অকেজো। আপেক্ষিকতাবাদে বক্র স্থান-কালের হিসাব-নিকাশে একমাত্র **রেইমেনিয়ান** (গোলকাকার) **জিওমেট্রি** ছাড়া বিকল্প নেই।



দৈশিক জ্যামিতি

জ্যামিতির এই শাখাটিও আধুনিক যুগের উদ্ভাবন। ১৯৩০ সালে **টপোলজি** শব্দ সর্বপ্রথম জ্যামিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। দৈশিক জ্যামিতিকে **রাবার-ব্যন্ড, রাবার-শীট, রাবার-স্পেইস** কিংবা **ইলাস্টিক জ্যামাতি**ও বলা হয়। এর কারণ হলো জিওমেট্রিক বস্তুর বিভিন্ন দিকের স্থানকে লম্বাকরণ বা বেটেকরণ করে এ সম্পর্কে গবেষণা করা হয়ে থাকে। একটা প্রখ্যাত দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হবে। মনে করুন আমাদেরকে দু'টি দ্বীপসম্পন্ন একটি নদীর উপরে স্থাপিত ৭টি সেতুর

প্রত্যেকটির উপর দিয়ে হেটে যেতে হবে। তবে একই সেতুর উপর দিয়ে দু'বার যাওয়া চলবে না। এটা কি সম্ভব? দেখুন নীচের নক্সাটি। এই একই সমস্যাকে আমরা পেন্সিলের মাধ্যমে ছবি এঁকেও দেখাতে পারি। চেষ্টা করে দেখুন একটি পেন্সিলের মাধ্যমে দ্বিতীয় ছবিটি পেন্সিল না তুলে এক টানে আঁকতে পারেন কি না- অবশ্যই একই লাইনের উপর দিয়ে দু'বার পেন্সিল চালনা চলবে না। বাস্তবে এরূপ করা অসম্ভব। তবে তৃতীয় ছবিটি আঁকা যাবে। দেখুন চেষ্টা করে। গাণিতিকরা দেখিয়েছেন এরূপ সমস্যার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক আইন আছে যা মানলে কিছু কিছু ছবি উপরোক্ত নিয়মে (পেন্সিল না তুলে ও একই লাইনের উপর দু'বার পেন্সিল না চালিয়ে) আঁকা সম্ভব।



চিত্র – ১

একই সেতু দু'বার অতিক্রম না করে সবগুলোর উপর দিয়ে কি হেটে যাওয়া যাবে?

চিত্র – ২ চিত্র – ৩

পেন্সিল না তুলে ও একই রেখার উপর দু'বার না গিয়ে কোন্ চিত্রটি আকা সম্ভব?
(যে কোন ডট থেকে শুরু করতে পারেন)

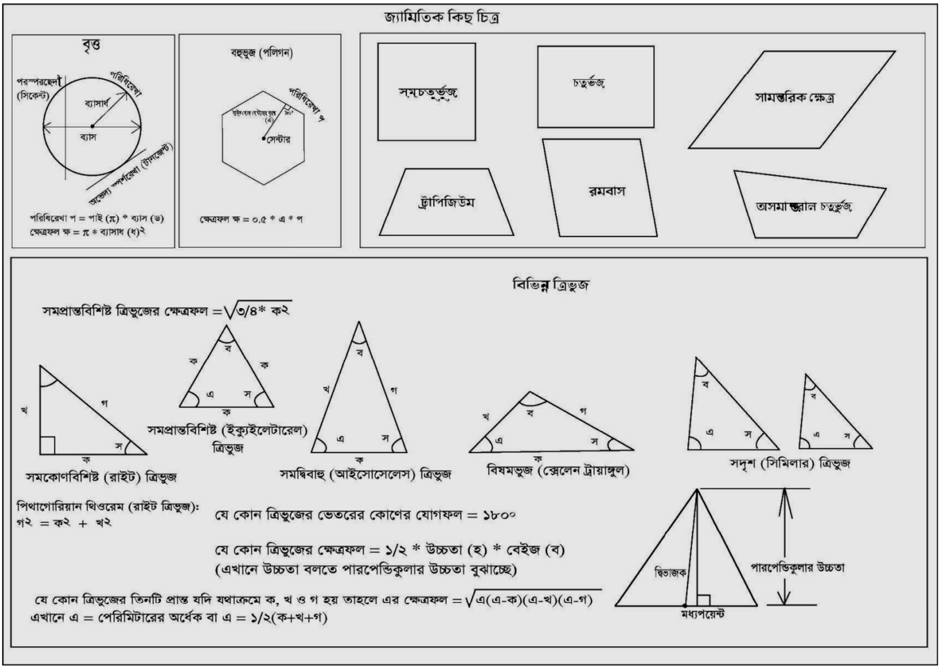
টপোলজির মাধ্যমে আমরা আরো কিছু সমস্যার সমাধান খুঁজতে পারি। একটি প্রখ্যাত সমস্যা হলো পৃথিবীর মানচিত্রে মোট ক'টি রং লাগবে? অর্থাৎ ক'টি রং হলে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক দেশের মানচিত্র আলাদাভাবে রঙ্গিন করে আঁকা সম্ভব? এই সমস্যাটির সামধান ১৯৭৬ সালে কেনেথ অ্যাপেল ও উলফ্গ্যাং হাকেন নামক

দুই গাণিতিক কম্পিউটারের সাহায্যে করেছিলেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে একটি মানচিত্রে চতুর্দিকে যতোটিই অন্য দেশের মানচিত্র আঁকা হোক না কেন, মাত্র ৪টি ভিন্ন রং হলেই প্রতিটি মানচিত্র আলাদা রং দ্বারা অঙ্কন সম্ভব। নীচের চিত্রে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে।



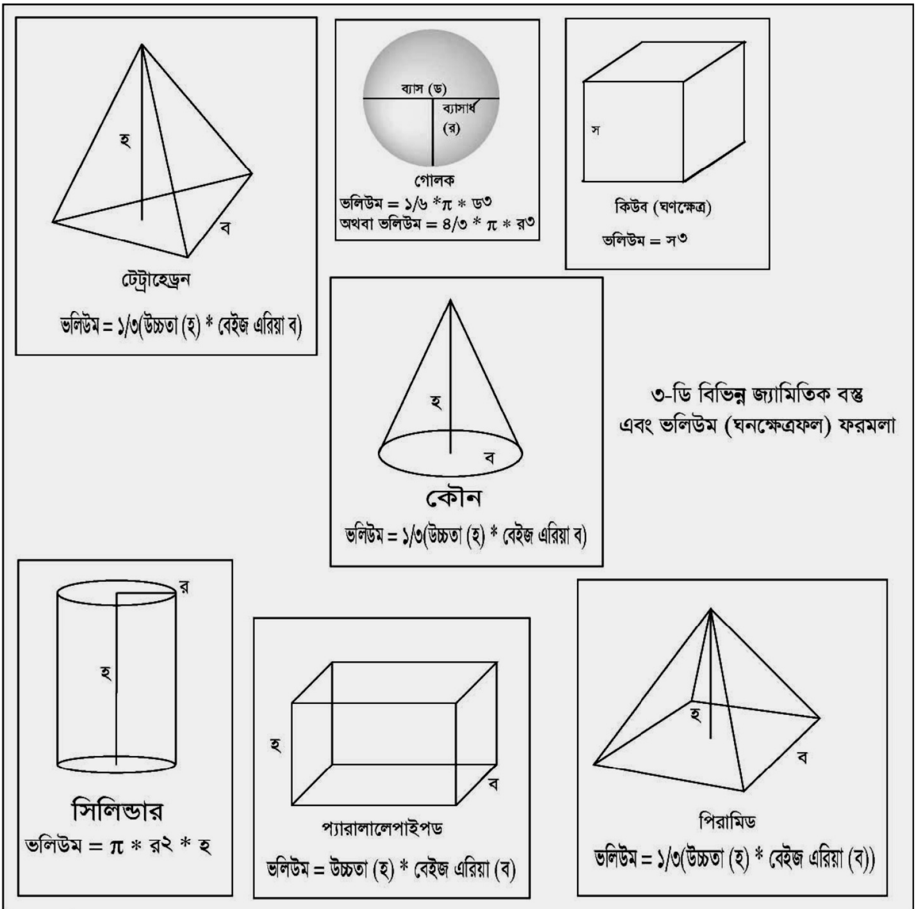
দুই-বিস্তৃতিসম্পন্ন চিত্র

আমরা যে জগতে বাস করি তা আসলে তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন বলেই মনে করা হয়। [আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এ জগতটি আসলে চার-বিস্তৃতিসম্পন্ন। দৈর্ঘ্য, প্রস্ত ও উচ্চতা ছাড়াও কাল (বা টাইম) হলো চতুর্থতম বিস্তৃতি।] কিন্তু কোন বস্তুর বাইরের সারফেসকে আমরা সাধারণত দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত এই দু'টি মাত্র মাপ দ্বারা বুঝতে পারি। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এ মাপগুলো আমাদের প্রাত্যহিক কর্মে যথেষ্ট হয়। তাই এরূপ কিছু বিশেষ চিত্রের উপর জ্যামিতিক গবেষণা আদি কাল থেকেই হয়েছে। এসব চিত্র বা ফিগারগুলো হলো বৃত্ত (সার্কেল), বহুভুজ (**পলিগন**), ত্রিভুজ (তিন-বাহুসম্পন্ন ট্রায়াঙ্গুল) এবং চতুর্ভুজক্ষেত্র (**কুয়াড্রিলেটারেল**)। নীচের চিত্রে আমরা এগুলো অঙ্কন করে দেখিয়েছি। যে কোন সারফেসকে এসব চিত্রের মাধ্যমে ভাগ করে এর বিভিন্ন মাপ বের করা সম্ভব। এরপর জ্যামিতির মাধ্যমে আমরা এর ব্যাস, ব্যাসার্ধ, ক্ষেত্রফল, বিভিন্ন কোণের পরিমাণ ইত্যাদি বের করতে পারি।



তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন বস্তু

আমরা অহরহ তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা এই তিন মাপের) বস্তু নিয়ে বিভিন্ন কাজ ও এগুলো ব্যবহার করে থাকি। জীবনচলার ক্ষেত্রে এসব বস্তুর বিভিন্ন মাপ যেমন **ভলিউম** বা ঘনফল জানা আমাদের জন্য জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। তখন আমাদেরকে কিছু বিশেষ রুল-আইন মেনে এসব ফলাফল বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জ্যামিতির সাহায্য নেওয়া একান্ত জরুরী। কিছু বিশেষ বস্তু আছে যেগুলো **স্ট্যান্ডার্ড** জ্যামিতিক বস্তু বলে পরিচিত। এ বস্তুগলো হলো: ১. গোলক (**স্ফেয়ার**), ২. বহুতলক (**পলিহেড্রন**), ৩. ত্রিপার্শ্বকাচ (**প্রিজম**), ৪. **পিরামিড**, ৫. **সিলিন্ডার** ও **কৌন** (নিম্নের পরের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন)।

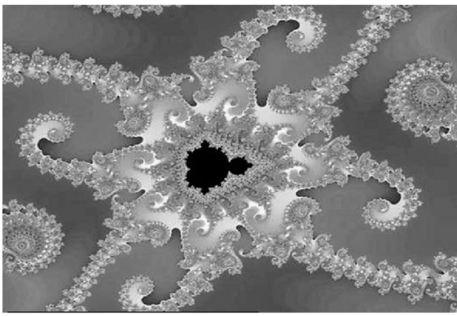


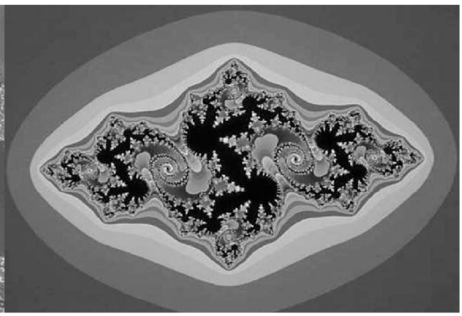
মাপকাঠি : গোলকের ক্ষেত্রফল = ৪*পাই*ব্যাসার্ধ*ব্যাসার্ধ; গোলকের ঘনফল = ৪/৩*পাই*ব্যাসার্ধ*ব্যাসার্ধ*ব্যাসার্ধ; মোট ৫টি মাত্র **রেগুলার পলিহেড্রন** (সব সাইড সমান মাপ ও একই ধরনের) সম্ভব (৪ সাইড- **টেট্রাহেড্রন**, ৬ সাইড **কিউব**, ৮ সাইড **অকট্রাহেড্রন**, ১২ সাইড **ডডেকাহেড্রন** এবং ২০ সাইড **আইকোসাহেড্রন**)। সব পলিহেড্রনের (রেগুলার ও ইরেগুলোর) একটি অত্যাশ্চর্য প্রোপার্টি আছে: এর মোট **ফেইস** (ফ্লাট সারফেইসেস) + মোট ভারটিসেস = মোট প্রান্তসংখ্যা (এইজেজ) + ২। যেমন কিউবে আছে ৬ (ফেইস) + ৮ (ভারটিসেস) = ১২ (প্রান্তসংখ্যা) + ২ = ১৪ ।; প্রিজমের **ভলিউম** = **বেইজ** এরিয়া * উচ্চতা ।; যে কোন পিরামিডের **ভলিউম**

= ১/৩ * **বেইজ** এরিয়া * উচ্চতা।; যে কোন সিলিন্ডারের **ভলিউম** = **বেইজ** এরিয়া * উচ্চতা; কৌনের **ভলিউম = ১/৩ * বেইজ** এরিয়া * উচ্চতা।

অঙ্ক শাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা জ্যামিতির উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক আলোচনা এখানেই শেষ। বিষয়টির জটিলতায় না গিয়ে আমরা এ পর্যন্ত যা কাভার করেছি তাতে অবশ্যই পাঠকদের ধারণা জন্মামে জ্যামিতির গুরুত্ব সম্পর্কে। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতকে জানার ক্ষেত্রে মৌলিক ক'টি উপায়-উপাধানের মধ্যে সবকিছুর সঠিক মাপকাঠি জানাও একান্ত প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজনীয়তা মেটাতে মানুষ আদিকাল থেকেই বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণে সৃষ্টি করেছে অঙ্কশাস্ত্রের শাখা জ্যামিতি। সুতরাং এই বিষয়ের উপর অবগত না থাকলে বিজ্ঞানকেই বুঝা যাবে না। মূলত অঙ্কশাস্ত্রের প্রত্যেকটি মূল শাখার উপর আমাদের জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। আসুন তাহলে অঙ্কের অরো একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ত্রিকোণমিটি বা **ট্রিগোনোমেট্রির** উপর আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনায় নিবিষ্ট হই।

আপনি জানেন কি: নিম্নের ছবি দু'টো **'জ্যামিতিকভাবে'** সৃষ্ট। এটাকে বলে **'ফ্রাকশেল'**। এই অদ্ভুত ডিজাইনের গুণাবলীর মধ্যে একটি হলো যখন একে বড় করে দেখা হবে তখন পুর্বের মতোই এটাকে দেখা যাবে। এ ছবিটিকে বলে **'মেনডেলব্রট সেট'**। এটা মূলত একটি গাণিতিক সমীকরণের জ্যামিতিক রূপায়ণ। ফরাসী গাণিতিক বিনোইট মেনডেলব্রট সর্বপ্রথম **ফ্রাকশেল** শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তাই তার নামানুসারে এই সেটের নামকরণ করা হয়েছে। আধুনিক কম্পিউটারের মাধ্যমে এরূপ সেট এর অতি সুন্দর ও জটিল রঙ্গিন ছবি অঙ্কন করা যায়।





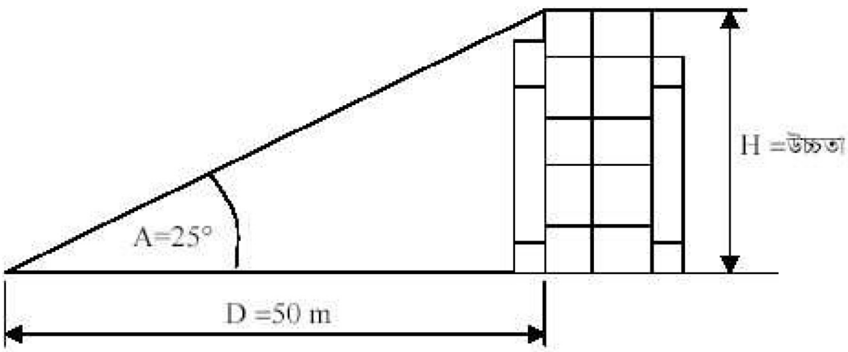
পরিচ্ছেদ ৪

ত্রিকোণমিতি

মনে করুন আপনি একটি বিল্ডিংয়ের সঠিক উচ্চতা নির্ণয় করবেন। চিন্তা করে দেখুন এ কাজটি কিভাবে সম্ভব? আপনি হয়তো ভাববেন, বল্ডিংয়ের উপরে উঠে এর নীচ পর্যন্ত ফিতা ধরে মাপ দিলেইতো কাজটি সারে। সঠিক কথা। তবে সমস্যা হচ্ছে আপনার নিকট সীমিত রিসোর্স বিদ্যমান। আপনাকে দূর থেকে বিল্ডিংয়ের উচ্চতা মাপতে হবে। হয়তো আপনি বিল্ডিং থেকে আপনার দূরত্ব মেপে নিতে পারেন তবে কোনো উপায়েই বিল্ডিংয়ের উপরে ওঠা যাবে না। এ ক্ষেত্রে অঙ্কশাস্ত্রের একটি শাখা যাকে বলে ত্রিকোণমিতি- আপনি তা ব্যবহার করে সমাধান বের করতে পারেন। নীচের চিত্রটির দিকে খিয়াল করুন। বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড লেবেল থেকে আপনার দূরত্ব ও আপনার নিকট থেকে বিল্ডিংয়ের সর্বোচ্চ **পয়েন্ট** বরাবর লাইন টেনে এর কোণটি আপনাকে জেনে নিলেই কাজ সারে। কারণ, ত্রিকোণমিতি আপনাকে বলছে:

টানজেন্ট অব কোণ A = উচ্চতা (H) / বেইজের দূরত্ব (D)

এখন যেহেতু আপনি কোণের মাপ ও বেইজের দূরত্ব জানেন তাই এই সমীকরণ দ্বারা বিল্ডংটির উচ্চতা সহজেই বের করতে পারবেন। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে ত্রিকোণমিতি বলতে ত্রিভুজের কোণ ও সাইড নিয়ে গবেষণাকে বুঝায়। এছাড়া কোণের মধ্যকার ত্রিমাত্রিক বিভিন্ন **ফাংশন্স** এর উপর গবেষণার ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



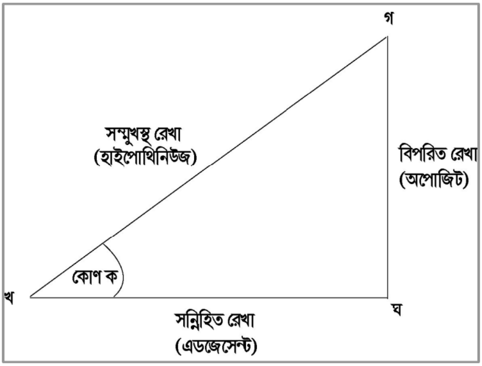
ত্রিকোণমিতির দু'টি প্রধান উপশাখা আছে: **১. প্লেইন** (সমতল) ত্রিকোণমিতি ও ২. **স্ফেরিক্যাল** (গোলকাকার) ত্রিকোণমিতি। প্রথমটি ঐসব চিত্র নিয়ে জড়িত যেগুলো দুই-বিস্তৃতিসম্পন্ন প্লেইনের উপর স্থাপিত থাকে- যেমন, সমতল ক্ষেত্রে অঙ্কিত একটি ত্রিভুজ। দ্বিতীয়টি অসমতল ক্ষেত্র তথা গোলকজাতীয় ক্ষেত্র নিয়ে গবেষণা করে। আমরা এবার উভয়টির উপর আরো একটু বিশে- ষণাত্মক আলোচনা করবো।

সমতল ত্রিকোণমিতি

ইতোমধ্যে আমরা এই উপশাখার উপর শুধু পরিচিত হয়েছি তা-ই নয়, এটা ব্যবহার করে একটি প্রাকটিক্যাল সমস্যার সমাধান করেছি। আমরা ত্রিভুজ অঙ্কন করে একটি বিল্ডিংয়ের উচ্চতা নির্ণয় করেছি এই সমতল ত্রিকোণমিতির সাহায্যে। এবার আরেকটি **স্ট্যান্ডার্ড** ত্রিভুজ এঁকে এর ত্রিকোণমাত্রিক বিভিন্ন সম্পর্ক আমরা জেনে নেবো। নিম্নের (অপরপৃষ্ঠার) চিত্রটির উপর ক'টি মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট ৬টি জানার ব্যাপার আছে, তথা তিনটি কোণ ও তিনটি প্রান্ত (রেখা)। ত্রিকোণমিতি আমাদেরকে এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক দিয়েছে নিম্নরূপ:

১. **সাইন** ক = বিপরিত রেখার দৈর্ঘ্য / **হাইপোথিনিউজ** (রেখার দৈর্ঘ্য)
২. কো**সাইন** (কোজ) ক = **এডজেসেন্ট** (রেখার দৈর্ঘ্য) / **হাইপোথিনিউজ** (রেখার দৈর্ঘ্য)
৩. **টানজেন্ট** (টান) ক = বিপরিত রেখার দৈর্ঘ্য / **এডজেসেন্ট** (রেখার দৈর্ঘ্য)
৪. কো**টানজেন্ট** (কট) = **এডজেসেন্ট** (রেখার দৈর্ঘ্য) / বিপরিত রেখার দৈর্ঘ্য
৫. **সিকেন্ট** (সেক) = **হাইপোথিনিউজ** (রেখার দৈর্ঘ্য) / **এডজেসেন্ট** (রেখার দৈর্ঘ্য)
৬. কোসিকেন্ট (কোসেক) = **এডজেসেন্ট** (রেখার দৈর্ঘ্য) / বিপরিত রেখার দৈর্ঘ্য

জেনে নিন যে, **সাইন, কোসাইন, টানজেন্ট, কোটানজেন্ট, সিকেন্ড** ও **কোসিকেন্ড** হলো '**ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন্স**'। এই নামগুলোর অর্থ সমীকরণের ডানের সম্পর্ককে বুঝায়। এখন কেউ যদি ডানের দু'টি মাপ তথা রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে নেয় তাহলে সে কোণের মাপ পাবে আর একটি রেখার মাপ ও কোণের মাপ



জানা থাকলে সহজেই অপর রেখার দৈর্ঘ্য বের করতে সক্ষম হবে। **প্লেইন** ত্রিকোণমিতির আরো অনেক আইন-কানুন আছে যা জানা থাকলে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করতে পারি। যে কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটি আইন আমরা ত্রিকোণমিতি থেকে পাই। যথা:-

১. ক / **সাইন** কোণ ক = খ / **সাইন** কোণ খ = গ / **সাইন** কোণ গ (একে বলে **সাইন** আইন)

২. ক*ক = খ*খ + গ*গ − ২*খ*গ * ক্লোজ কোণ ক (একে বলে কো**সাইন** আইন)

৩. (ক − খ) / (ক + খ) = (টান ১/২ (কোণ ক − কোণ খ)) / (টান ১/২ (কোণ ক + কোণ খ)) [একে বলে **টানজেন্ট** আইন]

ত্রিকোণমিতির উপর আমাদের সংক্ষিপ্ত কথার এখানেই শেষ। বিষয়ের জটিলতার উপর আলোচনায় যাওয়া আসলে ইচ্ছে নেই কারণ, কাঠিন্যতা হেতু আপনি পাঠকের আগ্রহে কিছুটা ব্যঘাত ঘটে যেতে পারে যা স্বেচ্ছায় সৃষ্টির কোন পরিকল্পনা বা প্রয়োজনীয়তা নেই। তা-ই আসুন আমরা পরবর্তী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করি।

আপনি জানেন কিঃ ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত কোণ্ মাপের **ইউনিট ‘ডিগ্রী’** ও সময় মাফের জন্য ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। কোন বৃত্তের অংশ মাপের জন্য **ডিগ্রী** ব্যবহৃত হয়। তবে এক ডিগ্রীতে আছে ৬০ মিনিট = ১/২১,৬০০ অব বৃত্তের পরিধিরেখার মাপ। আবার প্রতি মিনিটকে ৬০ সেকেণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে যা ১/১,২৯৬,০০০ অব বৃত্তের পরিধিরেখার মাপ। একটি ঘড়ির ডায়ালকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করে ৬০ মিনিট করা হয়েছে। আবার প্রতি মিনিটকে বিভক্ত করে ৬০ সেকেণ্ড করা হয়েছে। ত্রিকোণমিতি অনুসারে একটি বৃত্তের মধ্যে মোট ৩৬০ ডিগ্রী আছে। সুতরাং আমরা যদি ৩৬০ কে ৬০ দ্বারা ভাগ করি তাহলে ঘড়ির ডায়ালে এক মিনিট (৩৬০/৬০) সমান ৬ **ডিগ্রী** হবে। আর এক সেকেণ্ড সমান ৬/৬০ = ১/১০ **ডিগ্রী** হবে।

পরিচ্ছেদ ৫

অঙ্কশাস্ত্র : অন্যান্য শাখা-প্রশাখা

গণিতের মূল ক'টি শাখার উপর আমরা ইতোমধ্যে অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছি। তবে গণিত একটি ব্যাপক বিষয়। বিজ্ঞানের প্রতিটি ফিল্ডে এর বিচরণ। এছাড়া এটা একটি পরিবর্তনশীল শাস্ত্র। অর্থাৎ সর্বদাই গণিতের নতুন কিছু বিষয়াদি আবিস্কৃত হচ্ছে এবং পুরাতনগুলোর সংস্কার ও স্কোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের উপর শুধু ন্যূনতম কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি।

কালক্যুলাস

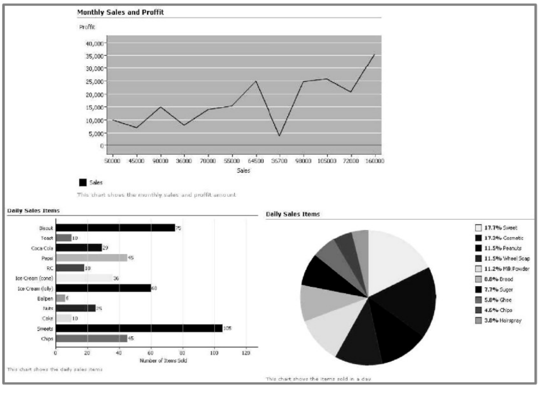
এটি উচ্চ গণিতের একটি শাখা। এটা মূলত দু'টি পরিবর্তনশীল বস্তুর মধ্যে সম্পর্কনির্ণয়, কোন বক্ররেখার নিম্নস্থ ক্ষেত্রফল বেরকরণ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত সূক্ষ্ম গাণিতিক গবেষণা। অর্থাৎ **সিস্টেম এ্যনালিসিস** এর সঙ্গে **কালক্যুলাস** জড়িত। এছাড়া সমাজবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে অঙ্কশাস্ত্রের এ শাখাটি ব্যবহৃত হয় বেশী। কালক্যুলাসের উপর আর অতিরিক্ত আলোচনা অত্র গ্রন্থের স্কোপের বাইরে, সুতরাং এ সম্পর্কে জটিলতায় যাচ্ছি না। যারা উচ্চগণিত নিয়ে গবেষণা করেন, কিংবা বিজ্ঞানের কোন বিশেষ ফিল্ডে বিচরণ করছেন তাদের ক্ষেত্রেই এই শাস্ত্রটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা প্রযোজ্য। যেহেতু এই গ্রন্থটি সর্বসাধারণ্যের উদ্দেশ্যে রচিত তাই স্পেশালাইজড্ বিষয়ের গভীরে না যাওয়াই উত্তম। একই কারণে গণিতের আরোও কিছু বিশেষ শাখা-প্রশাখা যেগুলোর সহজ সংজ্ঞাসহ নাম উল্লেখ করাই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে।

সম্ভাব্যতা ও স্টেটিসটিক্স

যে কোন ঘটনা বা পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল আমরা গবেষণা করতে পারি। যেমন একটি **ডাইস** (পাশা) নিক্ষেপের ফলাফল ১ থেকে ৬ পর্যন্ত হতে পারে। এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে ডাইসটি নিক্ষেপের পর ফলাফল ৪ আসবে - এটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? যেহেতু ৬টি ফলাফলের যে কোন একটি আসতে পারে তাই সম্ভাব্যতা = ১/৬ হবে। এরূপ যদি বলা হয় ৪ কিংবা ৫ আসার সম্ভাব্যতা কি? উত্তর হবে ২/৬ = ১/৩। মোট কথা কোন বিশেষ ফলাফল হবেই- এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা

= ১ এবং হবেই না এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা ০ হবে। সুতরাং আমাদের দৃষ্টান্তে যে কোন একটি আসবেই তাই অঙ্কে আমরা লিখবো ৬/৬ = ১। আসবেই না- এরূপ শুধু ঐ ক্ষেত্রেই সম্ভব যদি বলা হয় ৭ বা ০ আসার সম্ভাবনা কি? **প্রবাবিলিটি** বা সম্ভাব্যতা তাই অঙ্ক শাস্ত্রের ঐ শাখাকে বলে, যার দ্বারা কোন বিশেষ ঘটনার সম্ভাব্য ফলাফল কি হতে পারে তার উপর ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

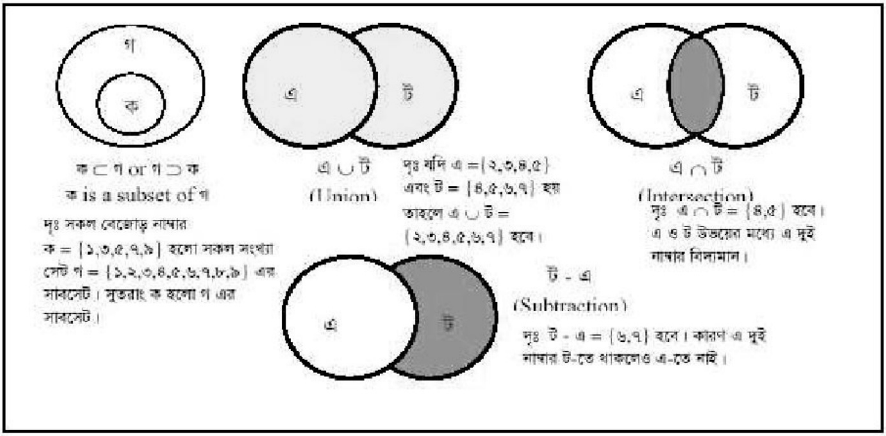
বড় মাপের বিভিন্ন **ডাটা** বা তথ্যাদির উপর আমরা গাণিতিক গবেষণা চালিয়ে অনেক ব্যাপার জেনে নিতে পারি। মনে করুন কোন বিশেষ ডিপার্টমেন্টাল দোকানের মাসিক বিক্রয়ের উপর আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করলাম। এ তথ্যগুলো হলো, তারিখ, বিক্রিত বস্তু ও এর সংখ্যা। এখন আমরা একটি চার্টে এই তথ্যাদি অঙ্কন করে দেখাতে পারি। এতে মাসের কোনদিন ক'টি কোন জাতের বস্তু বিক্রয় হয়েছে তা জানা যাবে। এ থেকে আমরা ভবিষ্যতে কোন্ মালটি কখন বেশি মওজুদ করবো তা জানতে পারবো। এ উপায়ে আমরা বিভিন্ন তথ্যাদির উপর গবেষণা করে উপকৃত হতে পারি। যেমন: আদমশুমারী, পরীক্ষার ফলাফল, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যাপারে তথ্যাদি জানা ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে এই শাস্ত্রের ব্যবহার সম্ভব।



সেট থিওরী ও লজিক

গণিতের এই শাখাদ্বয় হচ্ছে আধুনিক যুগের উদ্ভাবন। মডার্ন গণিতে এগুলো ব্যবহার করা হয়। সেট হচ্ছে কোন বিশেষ ক্লাস, সমষ্টি কিংবা বস্তুর সমাহার। এগুলোকে এককভাবে সেটের একেকটি উপাদান ধরা হয়। সাংকেতিকভাবে $a \subset S$ বলতে উপাদান a সেট S এর সঙ্গে অঙ্গীভূত কিংবা এর মধ্যে বিদ্যমান বুঝায়। সেট থিওরীতে ব্যবহৃত অন্যান্য সংকেত নীচের নক্সায় তুলে ধরা হলো। **সেট থিওরী** ও **লজিক** বা যুক্তিবিদ্যা একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পৃক্ত। গাণিতিক লজিকে **'এন্ড'** (এবং), **'অর'** (অথবা) এবং **'নট'** (নয়) এই তিনটি শব্দ ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন অবস্থা বুঝানো হয়। যেমন, আমরা বলতে পারি 'যদি ট **এবং** ক = ১০ হয়', 'যদি ক **অথবা**

ট = ১০ হয়’ কিংবা ‘যদি ট = ক **নয়** (ইজ নট) হয়’ ইত্যাদি। এরূপ সহজবোধ্য **লজিক** দ্বারা আমরা বিভিন্ন অবস্থার উপর পরীক্ষা চালিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল খুঁজতে পারি। ১৮৪৭ সালে বৃটিশ গাণিতিক জর্জ বূল এই **লজিক** আবিষ্কার করেছিলেন, তাই তার নামানুসারে এটাকে **‘বুলিয়ান লজিক’** বলা হয়। **কম্পিউটার** বিজ্ঞানে বুলিয়ান লজিকের ব্যবহার অপরিহার্য। এই লজিকের সঙ্গে গাণিতিক সংকেত = (সমান), ≠ (সমান নয়), < (থেকে কম), > (থেকে বেশি), <= (থেকে কম বা সমান), >= (থেকে বেশি বা সমান) ইত্যাদি সম্পৃক্ত।



সংখ্যা থিওরী

গণিতের এই শখা দ্বারা সংখ্যার বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে গবেষণা করা হয়। মৌলিকভাবে সংখ্যা বা নাম্বার বলতে আমরা যাবতীয় অভিবক্ত নাম্বার সেটকেই বুঝি: ১, ২, ৩, ৪, ... ইত্যাদি। গণিতে অবশ্য নাম্বার **পজিটিভ** (+), **নেগিটিভ** (-) অথবা শূন্য (০) হতে পারে। যেমন, .. -৩, -২, -১, ০, +১, +২, +৩ ... এই সিরিজ হচ্ছে আস্ত নাম্বার সেট। সাধরণত **পজিটিভ** নাম্বারের পূর্বে প্লাস (+) চিহ্ন লেখা হয় না। এখন ছোট ছোট **ইন্টেজার** বা অভিবক্ত সংখ্যার গুণফলও কি **ইন্টেজার** হতে পারে? দেখা গেছে তা হতে পারে যেমন: ৬ হলো ২ x ৩। কিন্তু কিছু নাম্বার আছে যেগুলো এভাবে ভাগ করা যায় না। যেমন, ৭। সুতরাং ১, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯ ... এই সিরিজের কোন সংখ্যাকেই অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায়

না। এসব সংখ্যাকে বলে **'প্রাইম নাম্বার'**। এটা গণিত দ্বারা প্রমাণিত যে **প্রাইম** নাম্বারের সংখ্যাও সাধারণ ইন্টেজারের মতো অসীমিত।

বিশুদ্ধ গণিতে নাম্বার **থিওরী** থেকে একাধিক ঐতিহাসিক গাণিতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে উনবিংশ শতকের জার্মান গাণিতিক জর্জ রেইম্যান [১৮২৬-১৮৬৬] **'রেইম্যান্‌স কনজেকচার** [ধারণালব্ধ থিওরী]' এবং সপ্তদশ শতকের ফ্রেঞ্চ গাণিতিক পিয়েরে ডি ফারমেট [১৬০১-৬৫] **'ফারটে্‌স লাস্ট থিওরেম'** সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত সমস্যাটি সৃষ্টি হয় যখন রেইম্যান ইতোমধ্যে বর্ণিত **প্রাইম** নাম্বার নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি পুরো নাম্বার সেটের মধ্যে এই বিশেষ নাম্বারগুলোর অবস্থান বা বণ্টন নিয়ে চিন্তাভাবনা শেষে বললেন, এগুলো একটি বিশেষ ফাংশনের **রুট্‌স** (বর্গমূল) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই রুট্‌সকে পরবর্তীতে **'রেইম্যান্‌স জিটা ফাংশন'** নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রেইম্যান্‌স যদিও এ কথাটি বলেছিলেন কিন্তু এর গাণিতিক কোন প্রমাণ তিনি দেন নি। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গাণিতিকরা **'রেইম্যান্‌স কনজেকচার'** এর প্রমাণ খুঁজছেন তবে এখনও কেউ সফল হন নি।

দ্বিতীয় সমস্যাটি সম্পর্কে ব্যাখ্য হলো এই: ফারমেট একটি লেখায় মন্তব্য করেন যে, তিনি একটি সমীকরণের বিশেষ প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন কিন্তু তা কি, পরিষ্কারভাবে বলেন নি। তার বক্তব্য ছিলো, বীজগণিতের সমীকরণ $a^n + b^n = c^n$ -এতে যদি সকল নাম্বার **ইন্টেজার** (আস্ত) হয় তাহলে এটা শুধুমাত্র $n=2$ এর ক্ষেত্রে সত্য হবে। অর্থাৎ $n > 2$ হলে সমীকরণের a কিংবা b নাম্বারগুলো আস্ত নাম্বার হবে না। $n=2$ হলে দৃষ্টান্ত হিসেবে a যদি ৩ হয় ও b যদি ৪ হয় তাহলে সমীকরণ হবে $৩^২ + ৪^২ = ৫^২$, ৩*৩ (৯) + ৪*৪ (১৬) = ৫*৫ (২৫)। লক্ষ্য করুণ এই সমীকরণে প্রতিটি নাম্বারই অভিবক্ত রাশি। এই একই কথা $n > 2$ (n ২ থেকে বড়) হলে সত্য হবে না। গাণিতিকভাবে প্রমাণ ছাড়াই ফারমেট এ মন্তব্য করে গিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর থেকে বিংশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত গাণিতিকরা এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। অবশেষে ১৯৯৪ সালে বৃটিশ গাণিতিক আনড্রু ওয়াইল্‌স ফারমেট্‌স লাস্ট **থিওরেম** এর গাণিতিক প্রমাণ করতে সক্ষম হন। উল্লেখ্য আধুনিক যুগে **'ক্রিপ্টোগ্রাফি'** নামক একটি আলাদা গাণিতিক শাখার জন্ম হয়েছে। এ শব্দটির সঙ্গে সাংকেতিক ম্যাসেজ বা কোডেড ম্যাসেজ জড়িত। অর্থাৎ কোড বা সংকেত দ্বারা যোগাযোগকে **'ক্রিপ্টোগ্রাফি'** বলে। কোডকে ভাঙ্গার বা বুঝার ক্ষেত্রে **প্রাইম** নাম্বার ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। বাস্তবে বড় নাম্বারের ভগ্নাংশ বের করার সঙ্গে কোড ভাঙ্গা সম্পৃক্ত। সুতরাং স্বভাবতই আমেরিকান সরকার আজকাল গণিতের **'নাম্বার থিওরী'** গবেষণার জন্য সর্বাধিক বেশি অর্থ ব্যয় করে যাচ্ছে।

সিস্টেম অ্যানালিসিস

যে কোন **সিস্টেম** এর গাণিতিক গবেষণাকে **সিস্টেম অ্যানালিসিস** বলে। বিশেষকরে **কম্পিউটার নেটওয়ার্ক** (যেমন **ইন্টারনেট**) ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কে **সিস্টেম অ্যানালিসিস** একটি জরুরী অংশ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। গাণিতিকভাবে আমরা অনেক অবস্থাকে বীজগণিতের সমীকরণ দ্বারা বুঝাতে পারি। যেমন ***ক = ফ(ট)*।** এখানে আমরা বলছি যে, **ক** হলো **ট** এর একটি **ফাংশন** (বা আপেক্ষক)। এই সমীকরণ দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে উভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। এভাবে গাণিতিক **'মডেল'** বানিয়ে অনেক ব্যাপারই গবেষণা করা যায় বটে, কিন্তু সবগুলো করা যায় না। **সিস্টেম** যখন জটিল থেকে জটিল হয়ে ওঠে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন সিস্টেমের সার্বিক (**কালেক্টিভ**) অবস্থা নিয়ে ভাবনাই হবে প্রযোজ্য। যেমন ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে আমরা যদি নেটওয়ার্কের সকল **কম্পিউটার** সম্পর্কে গবেষণায় যাই তাহলে বিরাট সমস্যা দাঁড়াবে- কারণ যে কোন মুহূর্তে কতোটি **কম্পিউটার** নেটওয়ার্কে আছে সেটা নির্ণয়ই সবসময় সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেরকে কালেক্টিভভাবে চিন্তা করতে হবে- অর্থাৎ একক কম্পিউটারের ভাবনা ছেড়ে পুরো **নেটওয়ার্ক** নিয়ে ভাবতে হবে। পুরো **সিস্টেম** নিয়ে এভাবে গবেষণার নামই হলো **সিস্টেম অ্যানালিসিস**।

কেওস থিওরী

কেওস শব্দ দ্বারা অরাজকতাও বুঝায়। বাস্তবে ব্যাপারটা তা-ই। গণিতের ক্ষেত্রে অবশ্য রাজনীতিক কিংবা সামাজিক অরাজকতা থেকে কিছুটা ভিন্নতা বিদ্যমান। **সিস্টেম অ্যানালিসিস** দ্বারা বেশ কিছু **'বড় জটিল'** সিস্টেমের উপর গবেষণা করা গেলেও কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা গাণিতিকভাবে গবেষণা মোটেই সম্ভব নয়। এসব সিস্টেমকেই কেওটিক বা বিশৃঙ্খল অবস্থা বলে। তবে মজার ব্যাপার হলো গাণিতিকভাবে যেসব ব্যাপার গবেষণা সম্ভব নয় বলা হচ্ছে তা-ই আবার **'কেওস থিওরী'** নামক একটি অত্যাধুনিক **থিওরী** সৃষ্টি করে এটাকে **'গাণিতিক'** বলে উল্লেখিত

হচ্ছে। বাস্তাবে এই থিওরীকে আমরা **‘গাণিতিক অরাজকতা থিওরী!’** বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কেওটিক সিস্টেমের সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত হলো আবহাওয়া। **কেওস থিওরী** দ্বারা পুরো গ্রহের আবহাওয়ার উপর পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞানীরা এই পূর্বাভাস **‘মডেল’** তৈরীতে মহাকাশে প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম আবহাওয়া উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করছেন।

কেওস থিওরী অতি সাম্প্রতিককালের ব্যাপার। বাস্তবে ষাট দশকে **এডওয়ার্ড লরেন্‌জ** নামক একজন আবহাওয়াবিদ এই **থিওরী** উদ্ভাবন করেন। তিনি আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা কয়েকটি বিশেষ গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালান। অবশেষে তিনটি **‘বিশৃংখল’ ডিফারেন্সিয়াল** সমীকরণের মাধ্যমে পুরো **থিওরী** উপস্থাপন করেন যাকে এখন **‘লরেন্‌জ এট্রাকটার’** বা **‘স্ট্রেঞ্জ এট্রাকটার’** বলা হয়। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থার মূলে একটি ক্রিয়া কাজ করে থাকে। তিনি এই মৌলিক কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করেন: **“ব্রাজিলে একটি ছোট্ট প্রজাপতির পাখার নড়াচড়া থেকেই কি আমেরিকার টেক্সাসে টর্নেডোর জন্ম হয়?”**

প্রথম এ অধ্যায়ের মূল বিষয় অঙ্কের উপর আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ। তবে অধ্যায়ের ইতি এখনও হয় নি। মৌলিক বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রধান শাখাগুলোর উপর আমাদেরকে সম্যক অবগত হতে হবে। রসায়ন, পদার্থ, জীববিদ্যা ইত্যাদি **‘শাস্ত্রীয়’** নামকরণের অনুসরণ না করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কথা ও চিত্রের সাহায্যে তথ্যভিত্তিক বর্ণনা দ্বারা পাঠকদের মনের খোরাক যোগানোর চেষ্টা চালিয়েছি। এতে আশা করা যায় বিজ্ঞান দ্বারা আবিস্কৃত প্রকৃতির স্বরূপ জানার মধ্যে সবার অন্তরে পুলক ও আরো জানার আগ্রহ জন্মাবে- যা এই গ্রন্থ রচনার একটি মৌলিক লক্ষ্য।

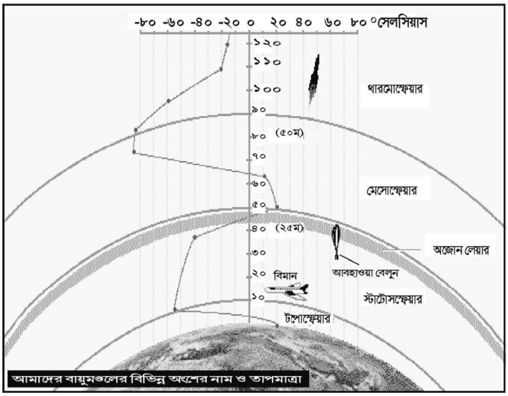
আপনি জানেন কি: বিজ্ঞানীরা কিছু সিস্টেমকে **‘কেওটিক’** বা বিশৃঙ্খল বলে মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ এসব **সিস্টেম** যদিও সার্বিকভাবে গণিতের মাধ্যমে বুঝানো যায় কিন্তু মৌলিকভাবে এগুলো যাচ্ছেতাই চরিত্রের অধিকারী। এগুলোর মধ্যে **‘ইলেকট্রিক সার্কেট**, **‘মিজেল্‌স বা ফেরার প্রাদুর্ভাব’**, **‘লেইজার’**, **‘একাধিক গিয়ারের সংঘর্ষ’**, **‘হৃদযন্ত্রের স্পন্দন’**, **‘মস্তিষ্কে ইলেকট্রিক ক্রিয়া’**, **‘জীব-জন্তুর সংখ্যা’** ও **‘কেমিক্যাল রিয়েকশন’** উল্লেখযোগ্য। এসব কথার অর্থ এটাই, বিজ্ঞান অনেককিছু সঠিকভাবে বুঝাতে অপারগ।

পরিচ্ছেদ ৬

বাতাস

আমরা যে গ্রহের অধিবাসী, তাকে ঘিরে রেখেছে বাতাসে পরিপূর্ণ একটি সাধারণভাবে অদৃশ্য বিরাট বায়ুমণ্ডল। বাতাস বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা শ্বাস-নিশ্বাস নিই এবং আমাদের গায়ে অনুভব করি অদৃশ্য এক শক্তি যা মৃদু শিহরণ জাগরণী থেকে ঘর-বাড়ি ধ্বংসাত্মক প্রবল হয়ে থাকে। এই শক্তিটি হচ্ছে বাতাস। বাতাস আসলে একাধিক **গ্যাস** বা বাষ্পের সমন্বয়ে গঠিত। এ বাষ্পগুলো হলো প্রধানত **নাইট্রোজেন, অক্সিজেন** ও **আরগন** এবং ছোট্ট অঙ্কের অন্যান্য ক'টিও আছে। অন্যান্যগুলোর মধ্যে **হাইড্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড**, জলীয় বাষ্প, **হিলিয়াম, নিওন, ক্রিপটন** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাতাসের কারণে অবশ্য আমাদের জীবনরক্ষা হয়। শুধু তাই নয়, পৃথিবী নামক এই নীল গ্রহটির উপর বাতাস না থাকলে কোনো প্রাণীই জীবিত থাকতে পারতো না। যদিও বায়ুমণ্ডলের প্রতিটি গ্যাসই আমাদের জীবনরক্ষার্থে বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে- তথাপি একটি **গ্যাস** হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িত সকল প্রাণীর জন্য একান্ত জরুরী। সে গ্যাসটির নাম হলো **অক্সিজেন**।



আমাদের বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের নাম ও তাপমাত্রা

আমাদের বায়ুমণ্ডলে **২১% অক্সিজেন** আছে। তবে নাইট্রেজেনের মাত্রা অনেক বেশী- প্রায় ৭৮%। বাকী **১%** বিভিন্ন গ্যাসে মিলে হয়েছে। যেমন, ০.৯% **আরগন**, ০.০৩% **কার্বন ডাইঅক্সাইড** এবং **হাইড্রোজেন**, জলীয় বাষ্প, **নিওন**, **অজোন**, **ক্রিপটন**, **হিলিয়াম** ইত্যাদি সবক'টি মিলে ০.০৭%।

বায়ুমণ্ডলের বাতাস আমরা শুধুমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ব্যবহার করি না- আধুনিক যুগে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাতাস থেকে ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় **গ্যাস** নির্গত করে থাকে। যেমন, সার তৈরীতে **নাইট্রোজেন,** ইস্পাত কারখানায় জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত **অক্সিজেন** এবং ভাস্বর (**ইনকেনডেসেন্ট**) লাইট-বাল্বে ব্যবহৃত **আরগন** বা **নিওন গ্যাস** ইত্যাদি।

বাতাসকে সরাসরি ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এর একটি হলো, **কমপ্রেস্ড এয়ার** (চাপা বাতাস)। যে যন্ত্রের মাধমে তা করা হয় একে বলে **কমপ্রেসার**। কমপ্রেস্ড বাতাসে চালিত যন্ত্রপাতিকে বলে, **নিউম্যাটিক টুল্স**। এগুলোর মধ্যে আলপিন বন্দুক (**নেইল গান**), **গ্রাইন্ডার, রোটারী ড্রিল** ও **জ্যাক-হামার** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ট্রেনের ব্রেকেও কমপ্রেস্ড বাতাস ব্যবহৃত হয়। বাতাসকে অবশ্য আরও বিভিন্ন উপায়ে কাজে লাগানো হয়। যেমন বিমানের জেট ও প্রপেলার **ইঞ্জিন** মূলত বাতাসকে ব্যবহার করে থাকে।

আপনি জানেন কি: বাতাস হলো শব্দতরঙ্গের মাধ্যম। সুতরাং আপনার বন্ধু যদি অতি নিকটেই থাকে এবং আপনার সাথে কথা বলে তাহলে বাতাস ছাড়া কিছুই শোনতে পারবেন না। এ কারণেই মহাকাশে নভোচারীরা একে অন্যের সাথে কথা বলার জন্য **রেডিও** ব্যবহার করেন। সেখানে বাতাস নেই। জানা থাকা দরকার যে রেডিও **ওয়েভ** শূন্যস্থানের (বা ভাকিউমের) মধ্যেও চলতে পারে যেমনটি পারে আলোকরশ্মিও।

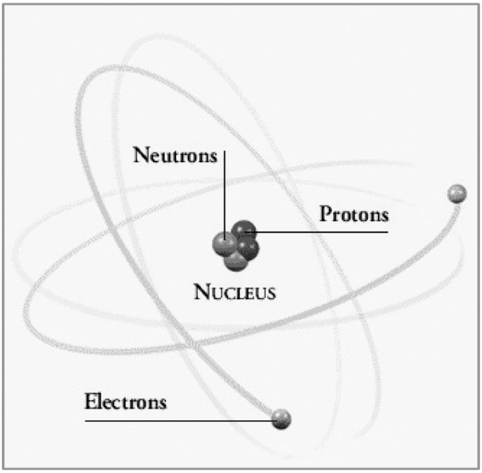
পরিচ্ছেদ ৭

অণু

বস্তুজগতের একটি ক্ষুদ্র অংশের নাম অণু। নিশ্চয়ই আপনারা **'এটম'** শব্দটি কি তা জানেন। বিশেষকরে আনবিক বোমা বা **এটম** বোমা সম্পর্কে সবাই অবগত আছেন অবশ্যই। বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত মানুষ ভাবতো বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে **এটম** বা অণু। তবে এটা এখন আর সঠিক বলে বিবেচিত নয়- কারণ, পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতিটি অণু একাধিক আরোও ক্ষুদ্রকায় বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং অণুকে পূর্ণভাবে জানতে-চিনতে হলে এর ভেতরে বসবাসকারী সকল বস্তুকেও জানতে-চিনতে হবে। আর অণুকে সঠিকভাবে জানার মধ্যেই নিহীত পুরো বস্তুজগতকে জানার চাবিকাঠি। তাহলে আসুন আধুনিক বিজ্ঞান অণু সম্পর্কে কি বলে তা বিস্তারিত আলোচনা করে দেখি।

এটোমিক থিওরী ঃ এটম বা অণুর গঠনপ্রণালী

অনেকের ধারণা **এটম** হচ্ছে বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু এ কথাটি আসলে সত্য নয়। প্রতিটি এটমও একাধিক আরও ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা সৃষ্ট। বাস্তবে এ পর্যন্ত জানা তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন মোট তিনটি পরমাণু দ্বারা **এটম** তৈরী হয়েছে। এগুলো হলো, **ইলেকট্রন**, **প্রটন** ও **নিউট্রন**। আগেই বলেছি এটমের কেন্দ্রকে **এটম** সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের প্রদক্ষিণ-স্বরূপ ঘুর্নমান আছে। **নিউক্লিয়াস** বা কেন্দ্র **প্রটন** ও **নিউট্রন** দ্বারা সৃষ্ট। **এটম** ও প্রটনে **ইলেকট্রিক চার্জ** বিদ্যমান কিন্তু নিউট্রনে কোন **চার্জ** নাই। ইলেকট্রনের চার্জটি হলো **নেগেটিভ** (-) ও প্রটনের **চার্জ** হলো **পজটিভ** (+)। প্লাস ও মাইনাস সংকেত ব্যবহার এখানে শুধুমাত্র এদের মধ্যে চার্জের ক্ষেত্রে বৈপরিত্য বুঝাচ্ছে। আসলে একটা আরেকটাকে দু'টি চুম্বকের বিপরীত মেরুর মতো আকর্ষণ করে। নিউক্লিয়াসে বসে থাকা **পজিটিভ** চার্জসম্পন্ন **প্রটন নেগেটিভ** চার্জসম্পন্ন ঘুর্নমান ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে ধরে রাখে- তাই এটমটি অস্তিত্ব বজায় রাখছে। কিন্তু **এটম** যদি ঘুর্নমান থাকতো না, তাহলে তা নিউক্লিয়াসে যেয়ে পতিত হতো। যেমনটি গ্রহগুলো ঘুর্নন ছাড়া সূর্যের উপর পতিত হবে।



এটমের প্রায় সব ওজন **(ম্যাস)** নিউক্লিয়াসেই বিদ্যমান। কিন্তু কেন্দ্র পুরো এটমের তুলনায় খুব অল্প স্থান দখল করে রেখেছে। বাস্তাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এটমের পুরো আয়তনের তুলনায় **নিউক্লিয়াস** মাত্র ১/১০০,০০০ অংশ দখল করে রাখে। বাকী সবই **এটম** ক্লাউড দ্বারা অধিকারভুক্ত থাকে। এই স্কেলে যদি কোন এটমকে আমরা একটি ফুটবল মাঠের সমান বড় করে দেখি তাহলে কেন্দ্রটির অবস্থান হবে একটি আঙ্গুরের মতো ছোট্ট বস্তুর সমপরিমাণ জায়গায়। বাকী সবই **এটম** দখল করে নেবে। এখন আমরা একে একে **ইলেকট্রন**, **প্রটন** ও **নিউট্রন** সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ইলেকট্রন

আগেই বলেছি **ইলেকট্রন** এটমের নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে। এর মধ্যে নিহিত **নেগেটিভ চার্জ** -১ দ্বারা বুঝানো হয়। **ইলেকট্রন** স্বভাবের একটি অতি ক্ষুদ্রকায় বস্তু। এক ফোটা পানিতে এক **বিলিয়ন, বিলিয়ন, বিলিয়ন ইলেকট্রন** বিদ্যমান। পদার্থবিদদের ধারণা ইলেকট্রনকে ভাগ করা সম্ভব নয়। বাস্তবে এটা আয়তনশূন্য বস্তু যা স্থানের মধ্যে বিস্তৃতিহীন একটি **পয়েন্ট** দখল করে রাখে। সুতরাং ইলেকট্রনের ব্যাসার্ধ নেই- তা আসলে ০। আর এ কারণেই **ইলেকট্রন** অন্যসব সচরাচর বস্তু থেকে ভিন্নভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে। এটা **ওয়েভ** (তরঙ্গ) এবং **পার্টিকেল** (পরমাণু) এ উভয় অবস্থায় থাকতে সক্ষম।

ইলেকট্রন বিরাট ওজনসম্পন্ন নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে ঠিকই তবে, গ্রহের মতো এর কোন নির্দিষ্ট প্রদক্ষিণপথ নেই। এভাবে প্রদক্ষিণের মূল কারণ হচ্ছে তার ঐ তরঙ্গের মতো অস্তিত্বশীল হওয়ার ক্ষমতা।

প্রটন

নিউক্লিয়াসে বসে থাকা প্রটনে একটি **+১ পজিটিভ চার্জ** বিদ্যমান। যে কোন এটমে এক বা একাধিক **প্রটন** থাকতে পারে। এটমের নিউক্লিয়াসে ক'টি **প্রটন** আছে সেটা নির্ণয় করবে এটমে মোট **পজিটিভ** চার্জের মাত্রা কতটুকু। ইলেকট্রিকভাবে **নিউট্রেল** (স্থিতিশীল) এটমে **প্রটন** ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে। এতে প্লাস ও মাইনাস **চার্জ** ব্যালান্স হয়ে যিরো হয়ে যায়। একেকটি **প্রটন** কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক ভারী। ইলেকট্রনের তুলনায় এর ওজন **১৮৪০** গুণ।

নিউট্রন

সবশেষে তৃতীয় যে পরমাণু এটমের কেন্দ্রে অবস্থান করে সেই **নিউট্রন** হচ্ছে প্রায় প্রটনের মতোই, কিন্তু সামান্যতম ভারী। নিউট্রনের কাজ হলো কেন্দ্রকে স্থিতিশীল রাখা। **নিউট্রন** ছাড়া কেন্দ্রের অপর পরমাণুগুলো (অর্থাৎ প্রটনের দল) নিজেদের **পজিটিভ চার্জ** দ্বারা দু'টি একই মেরুর চুম্বকের মতো ঋণাত্মক **ফোর্স** সৃষ্টি করে কেন্দ্রটি ভেঙ্গে দিত। নিউট্রনে **চার্জ** নাই ঠিক- কিন্তু তাতে বিদ্যমান স্বভাবের একটি মৌলিক শক্তি (**ফান্ডামেন্টাল ফোর্স অব নেচার**) যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'স্ট্রং ফোর্স'** বলা হয়। আমরা সময়মতো এই **ফোর্স** নিয়ে আরো কিছু আলোচনা করবো। এই **ফোর্স** দ্বারাই সে তার ডিউটি পালন করে যাচ্ছে। স্বভাবে বেশিরভাগ **এটম** (তথা বস্তু) স্থিতিশীল। কিন্তু কিছু বস্তু আছে যাদের **এটমিক নিউক্লিয়াস** অস্থিতিশীল। ফলে তা ভেঙ্গে অন্য **এটম** তথা বস্তুতে রূপান্তর হয়।

এবার আমাদেরকে একটু দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করা দরকার। ইতোমধ্যে আমরা **এটম** বা অণুর তিনটি মৌলিক অংশ বা সাব-**এটমিক** পার্টিকেলগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমরা বলেছি এটমকে **ইলেকট্রন** নামক **পার্টিকেল** প্রদক্ষিণ করে। এর কেন্দ্রে আছে দু'টি পরমাণু তথা **প্রটন** ও **নিউট্রন**। উভয়ের কিছু ডিউটি আছে। এগুলো হলো যথাক্রমে **পজিটিভ চার্জ** ও **নেগিটিভ** চার্জের মধ্যে ব্যালান্স সৃষ্টি করা এবং **নিউক্লিয়াস** বা কেন্দ্রকে স্থিতিশীল রাখা। আমরা এটাও উল্লেখ করেছি যে, ইলেকট্রনকে ভাঙ্গা যাবে না। সুতরাং এটা হচ্ছে স্বভাবের একটি মৌলিক **পার্টিকেল**। এখন এই একই কথা **প্রটন** ও নিউট্রনের বেলায়ও কি সত্য? উত্তর- না। কেন্দ্রের উভয় **পার্টিকেল** মৌলিক নয়- এগুলো বাস্তবে আরও কিছু ক্ষুদ্রতম পার্টকেল দ্বারা গঠিত। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় ওগুলোকে বলে **'ক্যুয়ার্ক'**। আমি সব সময় ভাবতাম

বিশ্বখ্যাত **কম্পিউটার পেইজ লে-আউট প্রেগ্রাম 'ক্যুয়ার্ক এক্সপ্রেস'** নামটি কোন্ নামটির অনুসরণে রাখা হয়েছে? উপরোক্ত তথ্য থেকে তা সবার নিকট পরিষ্কার হলো।

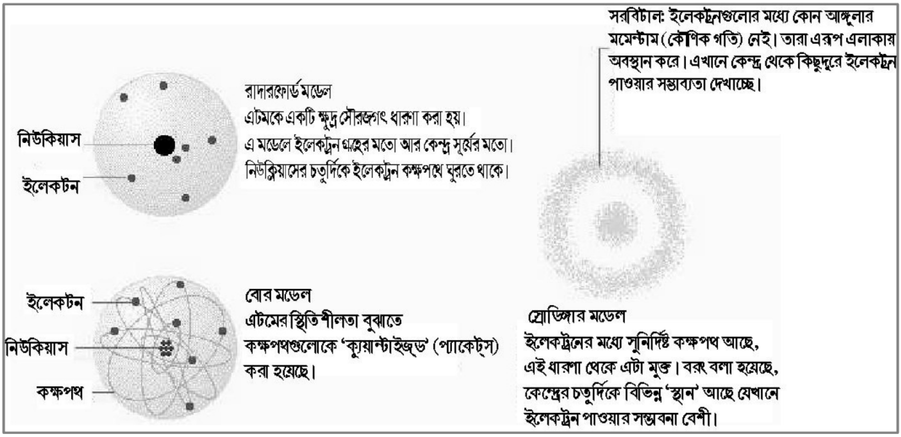


ক্যুয়ার্কস: বস্তুর মূলে আছে ক্যুয়ার্ক। ৬টি ভিন্ন নামধারী **ক্যুয়ার্ক** আছে: **আপ** (উপর), **ডাউন** (নীচ), **চার্ম** (আকর্ষণীয়), **স্ট্রেঞ্জ** (অদ্ভুত), **টপ** (উপরিস্থ) ও **বটম** (নিম্নস্থ)। একাধিক **ক্যুয়ার্ক** দ্বারা তৈরী হয় **বারিওন** এবং **ক্যুয়ার্ক** ও **এ্যান্টিক্যুয়ার্ক** মিলে হয় **মেজন**। মেজনের দৃষ্টান্ত হলো, **পজিটিভ** ও **নেগিটিভ কেওন**।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ৬টি ভিন্ন **ক্যুয়ার্ক** সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এখন দেখুন এই **ক্যুয়ার্ক** নামক বস্তুগুলো আসলে কি- এগুলো বাস্তবে একের চেয়ে কম **ইলেকট্রিক চার্জ**। বিজ্ঞানীরা এদের মধ্যে ভিন্নতা বুঝাতে 'Up Quark' এবং 'Down Quark' বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রতিটি **নিউট্রন** ও **প্রটন** এই উভয় জাতের **ক্যুয়ার্ক** দ্বারা সৃষ্ট। এসব ক্যুয়ার্কে যে **চার্জ** বিদ্যমান তা সর্বদাই একের নীচে হয়ে থাকে। ভগ্নাংশ দ্বারা এসব **চার্জ** বুঝানো হয়। যেমন: আপ ক্যুয়ার্কে আছে +২/৩ চার্জ। অপরদিকে ডাউন ক্যুয়ার্কে আছে -১/৩ চার্জ। সুতরাং একটি পুরো **নেগেটিভ চার্জ** (- ১) করতে যেয়ে ২টি আপ ও একটি ডাউন **ক্যুয়ার্ক** লাগবে। যথা:- +২/৩ +২/৩ -১/৩ = -১। আগেই বলেছি নিউক্লিয়াসে বসে থাকা **নিউট্রন** নামক পরমাণু ইলেকট্রিক্যালী **নিউট্রেল** অর্থাৎ চার্জশূন্য। এবার লক্ষ করুন তার কারণ। **নিউট্রন** একটি আপ **ক্যুয়ার্ক** ও দুটি ডাউন **ক্যুয়ার্ক** দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং এর মধ্যকার **চার্জ** হলো: +২/৩ -১/৩ -১/৩ = ০। সুতরাং **নিউট্রন ইলেকট্রিক্যালী নিউট্রেল**। বাস্তাবে এর নাম '**নিউট্রন**' হওয়ার কারণও এই চার্জশূন্যতা।

এটম নিয়ে আরো গবেষণা

এটমের কয়েকটি মৌলিক গুণ আছে। এগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। বস্তুর স্বরূপ উন্মোচন ও তা টেকনোলজির মাধ্যমে আমাদের কাজে লাগাতে যেয়ে এটমকে সঠিকভাবে জানার বিকল্প নেই। তবে একথা জোর গলায় কেউ এখনও বলতে পারছেন না যে, **এটম** সম্পর্কে **'যাবতীয়'** তথ্য জানা হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে অণু সম্পর্কিত আরো বেশ কিছু তথ্যাদি জানা হবে। যা হোক, ইতোমধ্যে আমরা অণুর গঠনপ্রণালীর উপর আলোচনা করেছি। এর তিনটি **পার্টিকেল** তথা **ইলেকট্রন, প্রটন** ও **নিউট্রন** সম্পর্কে জেনেছি। এছাড়া **প্রটন** ও নিউট্রনের বিল্ডিং ব্লক্স **ক্যায়ার্ক** সম্পর্কেও অবগত হয়েছি। প্রতিটি পার্টিকেলের কাজ কি তা-ও আমরা জেনেছি। এবার তার অন্যান্য গুণাবলীর উপর আলোচনা অপরিহার্য।



এটমিক নাম্বার

স্বভাবে প্রাপ্ত প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বা ইলেমেন্টের এটমের কেন্দ্রে একক আলাদা এক বা একাধিক **প্রটন** বিদ্যমান। ক'টি **প্রটন** আছে তার হিসাবকে বলে **এটমিক নাম্বার**। আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, স্থিতিশীল এটমে **প্রটন** ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে- যার ফলে এটমের চার্জে ব্যালান্স সৃষ্টি হয়। সুতরাং **এটমিক নাম্বার** যেহেতু ক'টি **প্রটন** আছে তাকে বুঝাচ্ছে তাই এর দ্বারা আমরা এটমের মধ্যকার ইলেকট্রনের সংখ্যাও জেনে নিতে পারি। অর্থাৎ স্থিতিশীল এটমের **এটমিক নাম্বার** তার ইলেকট্রনের সংখ্যাকেও বুঝায়। এখন এই নাম্বারটি জানার মধ্যে ফায়দা

কি? ফায়দা অনেক- কারণ, এই নাম্বারই (অর্থাৎ ক'টি **এটম** আছে) এটমের অনেক **ফিজিক্যাল** ও **রসায়নিক** গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বভাবে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা বেশী ও সিম্পুল পদার্থ হাইড্রোজেনের কথা উল্লেখ করতে পারি। এর **এটমিক** নাম্বার হলো **১**। এর অর্থ, এতে একটি **প্রটন** আর যদি তা ইলেকট্রিক্যালী **নিউট্রেল** হয়ে থাকে তাহলে এতে একটি মাত্র **ইলেকট্রন** আছে। অপরদিকে স্বভাবে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা ভারী **এটম** হলো **বিজমাথ** যার **এটমিক নাম্বার** ৮৩। তবে অস্থিতিশীল আরও ভারী **এটম** আছে। কিন্তু তারা সময়ে ভেঙ্গে যেয়ে অন্য বস্তুতে রূপান্তর হয়। পদার্থ বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে খুব ভারী অস্থিতিশীল **এটম** তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এগুলো সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে।

এটমের ম্যাস (ওজন) নাম্বার

এটমের অপর আরেকটি গুণ আছে যা **ম্যাস** নাম্বার দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে এই নাম্বারটি হলো মোট **প্রটন** ও **নিউট্রনের** যোগফল। আগেই বলেছি ইলেকট্রনকে ওজনশূন্য মৌলিক পর্টিকেল হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং নিউক্লিয়াসে স্থিতিশীল **প্রটন** ও **নিউট্রন** মিলেই এটমের ওজন নির্ণিত হয়। তাই এই উভয় পার্টিকেলের সংখ্যা জেনে নিলেই এটমের ওজন বা **ম্যাস** জানা হবে। এরপরও বিজ্ঞানীরা এই নাম্বারকে **'প্রায় সত্য'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ আমরা একটু পরই জানবো যে **ম্যাস** নাম্বারই এটমের পুরো ওজন, তা সঠিক নয়। যা হোক, **ম্যাস নাম্বার** দ্বারা অবশ্যই এটা বুঝায় না যে এটমের নিউক্লিয়াসে সমান পরিমাণ **প্রটন** ও **নিউট্রন** আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখিত স্বভাবে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা ভারী স্থিতিশীল পদার্থের **ম্যাস** কি জেনে নিতে পারি। ভারী এই পদার্থ অবশ্য **বিজমাথ**। এর **এটমিক** নাম্বার (তথা **প্রটন** সংখ্যা) হলো ৮৩। বড় অংকের প্রটনগুলোতে ব্যালান্স সৃষ্টি করতে যেয়ে এর নিউক্লিয়াসে বাস করে **১২৬** টি **নিউট্রন।** সুতরাং এর **ম্যাস** সংখ্যা হলো ৮৩ + ১২৬ = ২০৯।

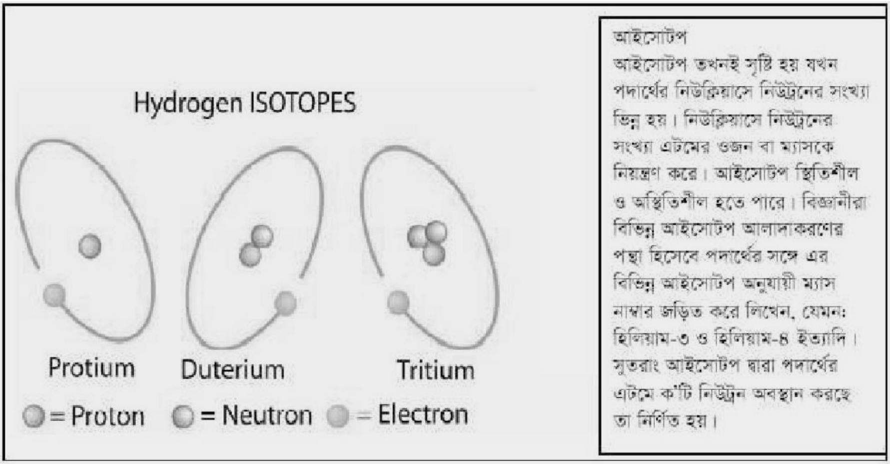
এটমিক ম্যাস ওজন

উপরে আমরা **ম্যাস নাম্বার** নিয়ে আলোচনা করেছি। এটমের আরেকটি হিসাব আছে যার দ্বারা এর আরো কিছু গুণাগুণ প্রকাশ পায়। এ হিসাবটি হলো তার **এটমিক ম্যাস ওজন**। এটা আসলে প্রায় **এটমিক ম্যাস** নাম্বারের সমান। বিজ্ঞানীরা **কার্বন** এটমের সঙ্গে তুলনা করে এই মাপ করে থাকেন। একটি **কার্বন** এটমের তুলনায় **এটমিক ম্যাস**

ইউনিট = ১/১২। উল্লেখ্য **কার্বন** এটমে মোট ৬টি **প্রটন** ও ৬টি **নিউট্রন** আছে। সুতরাং এ থেকে একটি প্রটনের ওজন ১.০০৭২৮ **এএমইউ (Atomic Mass Unit)** এবং নিউট্রনের ওজন ১.০০৮৬৬ **এএমইউ** হয়।

আইসোটপ্‌স

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, **এটমিক নাম্বার** হলো এটমের নিউক্লিয়াসে ক'টি **প্রটন** আছে তার একটি হিসাব। কোন বিশেষ পদার্থে এই নাম্বারটি সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকে। তবে নিউক্লিয়াসের অপর সদস্য নিউট্রনের সংখ্যা সর্বদা একই হয় না। এতে যদিও **রসায়নিক** দিক থেকে পদার্থের গুণাগুণ সমান থাকে কিন্তু এটমের ওজনে তারতম্যের সৃষ্টি হয়- এ থেকেই তৈরী হয় **'আইসোটপ'**। যেমন স্বভাবের সর্বাপেক্ষা সিম্পুল পদার্থ হাইড্রোজেনের মোট তিনটি **আইসোটপ** আছে, যথা:- **প্রটিয়াম (নিউট্রন** নেই), **ডিউটারিয়াম** (একটি **নিউট্রন**) এবং **ট্রিটিয়াম** (দু'টি নিউট্রন)। লক্ষ্য করুন, হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে সর্বাবস্থায় একটি **প্রটন** বিদ্যমান [নীচের নকশাটি দেখুন]।



আইসোটপ: আইসোটপ তখনই সৃষ্টি হয় যখন পদার্থের নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন হয়। নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা এটমের ওজন বা ম্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে। **আইসোটপ** স্থিতিশীল ও অস্থিতিশীল হতে পারে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন **আইসোটপ**

আলাদাকরণের পন্থা হিসেবে পদার্থের সঙ্গে এর বিভিন্ন **আইসোটপ** অনুযায়ী **ম্যাস নাম্বার** জড়িত করে লিখেন, যেমনঃ **হিলিয়াম-৩** ও **হিলিয়াম-৪** ইত্যাদি। সুতরাং **আইসোটপ** দ্বারা পদার্থের এটমে ক'টি **নিউট্রন** অবস্থান করছে তা নির্ণিত হয়।

এটা এখন জানা গেছে যে যাবতীয় পদার্থের মধ্যে অস্থিতিশীল **আইসোটপ** আছে। এতে **এটমিক** স্ট্রাকচারে পরিবর্তন ঘটে। আর যেহেতু এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিউক্লিয়াসে ক'টি **প্রটন** আছে তা বদলে যায় তাই পুরো পদার্থই একটা থেকে আরেকটায় রূপান্তর হয়। তবে আইসোটপের এই পরিবর্তনে নির্দিষ্ট সময় লাগে- যা পদার্থের উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায় সব পদার্থ একই রেইটে রূপান্তর হয় না। এখন আমরা যদি জানতে চাই কোনো বিশেষ পদার্থ বদলে যেয়ে অন্য পদার্থে রূপান্তর হতে কতটুকু সময় লাগবে, তখন আমরা একটি বিশেষ টেকনিক ব্যবহার করতে পারি যাকে বলে **হাফ-লাইফ** (অর্ধ-জীবন)।

সংক্ষেপে একটি আইসোটপের অর্ধ-জীবন হলো এর অর্ধেক পরিমাণ **সাম্পুল** পরিবর্তন হতে যেটুকু সময় অতিবাহিত হয়। বিজ্ঞানীরা প্রায় সবক'টি ইলেমেন্টের অর্ধ-জীবন নির্ধারণ করে নিয়েছেন। অর্ধ-জীবন জানা থাকার ফলে আমরা অতীত ঘটনাবলীর সঠিক তারিখ নির্ণয় করতে পারি। এই প্রযুক্তির নাম **'কার্বন-১৪ তারিখ নির্ধারণ'** বা **কার্বন-১৪ ডেইটিং**।

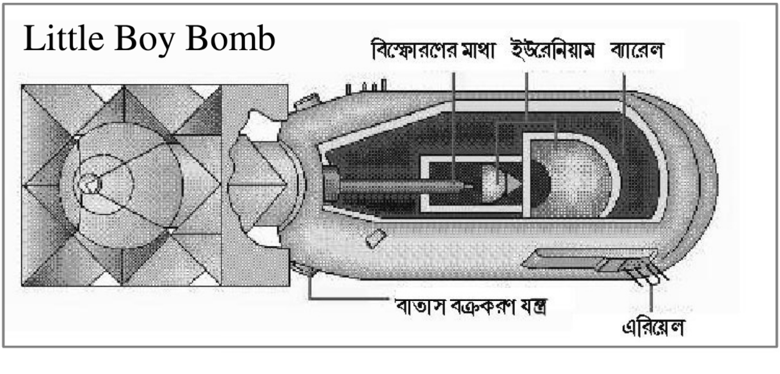
কার্বন-১৪ ডেইটিং

সকল জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে **কার্বন** নামক পদার্থ বিদ্যমান। সুতরাং সুদূর অতীতে মৃত কোন প্রাণীর **ফসিল** বা জীবাশ্ম পরীক্ষা করে আমরা অর্ধ-জীবন নির্ণয় করে নিতে পারি এবং এ থেকে প্রাণীটি কতদিন পূর্বে জীবিত ছিল তা মোটামুটিভাবে জানতে সক্ষম হই। **কার্বন-১৪** পদার্থ প্রাণীর মধ্যে অল্প থাকে- তবে এর ক্ষয়ের হার জানাটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

সাধারণত কার্বনের তিনটি **আইসোটপ** বিদ্যমান। এগুলো হলো **কার্বন-১২, কার্বন-১৩** ও **কার্বন-১৪**। প্রথমোক্ত দু'টি **আইসোটপ** স্থিতিশীল। কিন্তু **কার্বন-১৪** অস্থিতিশীল। এর অর্ধ-জীবন হলো ৫,৭৬০ বছর। সকল প্রাণীর মধ্যে এই অস্থিতিশীল **কার্বন আইসোটপ (কার্বন-১৪)** ধীরে ধীরে বদলে যেয়ে **নাইট্রোজেন-১৪**-তে রূপান্তর হয়।

কিন্তু এ ক্ষয় বা পরিবর্তন প্রাণীটি জীবন্ত থাকাবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে। এর কারণ হলো, শ্বাস-নিঃশ্বাস ও খাদ্যের দ্বারা প্রত্যেক প্রাণী এই ক্ষয়ের ভর্তুকি দিয়ে ফেলে। এতে নেট ক্ষয় হয় শূন্য। কিন্তু মৃত্যুর পর এই ক্ষয়কে আর থামানোর পথ খোলা থাকে না। তখন প্রাণীটি ফসিলে রূপান্তরিত হয়। **কার্বন-১৪** তার রেইটে বদলাতে থাকে। বিজ্ঞানীরা **কার্বন-১৪** এর ক্ষয়ের হার জানেন এবং ক্ষয়ের সময় যে **এটম কার্বন-১৪** ছেড়ে দেয় (বা **এমিট** করে) তা-ও তারা যন্ত্রের মাধ্যমে মেপে নিতে সক্ষম। এই ইলেকট্রনগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করে নিলেই ফসিলের বয়স জানা যাবে, কারণ পুরাতন ফসিলে যেহেতু কম **কার্বন-১৪** ছিল এবং সেসময় **এটম** এমিশনও কম ছিল। **এটম** এমিশনের তারতম্য থেকে তারা ফসিলের বয়স নির্ণয় করে নিতে পারেন।

আপনি জানেন কি: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা জাপানের হিরোশিমায় ইতিহাসের প্রথম **এটম** বোমা নিক্ষেপ করে হাজার হাজার মানুষকে মাত্র ক'মিনিটের মধ্যে হত্যা করেছিল। এ বোমাটির নাম ছিল **'লিট্‌ল বয় বোম্ব'** (নীচের চিত্র দেখুন)। ছোট্ট ছেলে বোমার ক্ষমতা কী বড়ই না ছিল! এখন অবশ্য **'বিগ বয় বোম্ব'** এর অভাব নেই। ইতোমধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে **হাইড্রোজেন** ও **নিউট্রন** বোমা। মানুষ মানুষকে মারতে এতো উদগ্রীব, আশ্চর্য মানুষ আমরা!



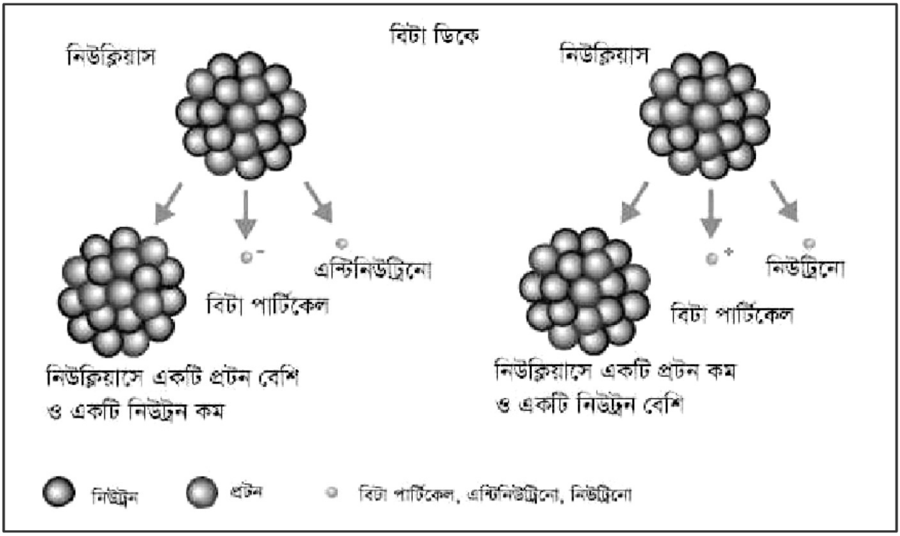
পরিচ্ছেদ ৮

রেডিওএক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়া

স্বভাবে সকল বস্তুর **এটমিক নিউক্লিয়াস** বা কেন্দ্র স্থিতিশীল নয়। কিছু কিছু বস্তু আছে যেগুলোর নিউক্লিয়াসে ক্ষয় সাধিত হয়ে তা শেষ পর্যন্ত স্থিতিশীলতা অর্জন করে। যে উপায়ে তা সংঘটিত হয় তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'রেডিওএক্টিভিটি'** বলে। এই প্রক্রিয়া **আইসোটোপ** বদলে অপর পদার্থে রূপান্তর থেকে ভিন্ন। প্রাকৃতিক কিছু বস্তু তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন আর বিজ্ঞানীদের সৃষ্ট কিছু বস্তুও আছে যেগুলো **রেডিওএক্টিভ**। তেজস্ক্রিয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা আরোও বলতে পারি, এটমের কেন্দ্র থেকে কিছু **পার্টিকেল** নির্গত হওয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রটির ক্ষয়কে বুঝায়। নির্গত পার্টিকেলগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমনঃ **আলফা ও বিটা পার্টিকেল**। এছাড়া **ইলেকট্রমেগনেটিক রে** (বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় রশ্মি) হিসেবেও তেজস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া হতে পারে যেমন, **এক্স-রে** ও **গামা রে**।

কোন কোন **এটমিক** কেন্দ্রে একটি অতিরিক্ত **প্রটন** থাকায় তা নির্গত হয়। একটি **নিউট্রন** থাকলেও একইভাবে তা নির্গত হয়। তবে সাধারণত তেজস্ক্রিয়ায় কেন্দ্র থেকে একই সঙ্গে দু'টি **প্রটন** ও দু'টি **নিউট্রন** নির্গত হয়। আর এই চারটি মিলে তৈরী হয় **হিলয়াম-৫ আইসোটোপ**। এভাবে নির্গত হওয়াকেই বলে **আলফা ক্ষয়**। অতীতে এ তথ্য জানা ছিলো না যে, **আলফা ডিকে (আলফা ক্ষয়)** বাস্তবে **হিলিয়াম-৪**, তাই এ ক্ষয়কে **'আলফা পার্টিকেল'** নামে ডাকা হতো।

সাধারণত কোন **নিউক্লিয়াস** যখন তার অতিরিক্ত **নিউট্রন** বা **প্রটন** নির্গতকরণের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করা শুরু করে তখন সে প্রটনকে নিউট্রনে ও নিউট্রনকে প্রটনে রূপান্তর করে থাকে। এই ক্রিয়ার নাম হলো **'বিটা ডিকে'**। সুতরাং **'আলফা ডিকে'** অর্থ হচ্ছে **হিলিয়াম-৪** নির্গত করা এবং **বিটা ডিকে** হলো **নিউট্রন** বদলে **প্রটন বানানো** এবং **প্রটন** বদলে **নিউট্রন** বানানো। উভয় অবস্থায় কিন্তু **এটমিক চার্জ** সমান থাকতে হবে। **বিটা ডিকে** একটি জটিল ক্রিয়া। তবে চেষ্টা চালাচ্ছি বুঝিয়ে বলার। বাকী অংশ পাঠের সময় নীচের চিত্রটির দিকে খিয়াল রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।



দু'টি উপায়ে **বিটা ডিকে** নামক **রিয়েকশন** হয়ে থাকে [বায়ের **নিউক্লিয়াস**]। কেন্দ্রের একটি **নিউট্রন,** একটি **এন্টিনিউট্রিনো** ও **নেগিটিভ** চার্জসম্পন্ন **বিটা পার্টিকেল** (যা আসলে **ইলেকট্রন**) নির্গত করে বদলে যেয়ে প্রটনে রূপান্তরিত হয়। অপরদিকে (ডানের **নিউক্লিয়াস**) কেন্দ্রের একটি **প্রটন,** একটি **নিউট্রিনো** ও **পজিটিভ** চার্জসম্পন্ন **বিটা পার্টিকেল (পজিট্রন)** নির্গত করে বদলে যেয়ে নিউট্রনে রূপান্তরিত হয়। ক্রিয়া শেষে নিউক্লিয়াসে- হয় একটি বেশী কিংবা কম **প্রটন** বিদ্যমান থাকবে। উল্লেখ্য বর্ণিত **পজিট্রন পার্টিকেল** আসলে ইলেকট্রনের মতোই কিন্তু এর মধ্যে **নেগেটিভ** না হয়ে **পজিটিভ চার্জ** থাকে। এটাকে **এন্টি-ইলেকট্রনও** বলে। **নিউট্রিনো** হলো **ইলেকট্রিক্যালী নিউট্রেল** (চার্জশূন্য) **পার্টিকেল**। এগুলোর বিপরীতধর্মী পার্টিকেলই হলো **এন্টিনিউট্রিনো**। জানা থাকা দরকার **নিউট্রিনো** ও এন্টি**নিউট্রিনো** একীভুত হলে উভয়টি ধ্বংস হয়ে যায় এবং একই কথা **ইলেকট্রন** ও **এন্টিইলেকট্রনের** বেলাও সত্য। এখানে এর চেয়ে আর বেশী বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। **নিউক্লিয়ার সাইন্স** বিজ্ঞানের একটি আলাদা শাখা। মাত্র ক'টি কথায় তেজস্ক্রিয়ার মতো **এটমিক রিয়েকশন** বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা পর্যায়ে চলে যায়! তবে আমি আশাকরি পাঠকরা **এটম** সম্পর্কে অত্যল্প হলেও অতিরিক্ত কিছু জেনে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

স্বভাবে সর্বাপেক্ষা বেশী যেসব তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন বস্তু পাওয়া যায় তার মধ্যে **পটাসিয়াম-৪০, থোরিয়াম-২২** এবং **ইউরেনিয়াম-২৩৮** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তেজস্ক্রিয়া মানুষের জন্য মারাত্মকও বটে। এ থেকে দূরারোগ্য ক্যান্সারের জন্ম নিতে পারে।

আইসোটপ ডিকে থেকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীসহ অনেককিছুর বয়স জানতে পারেন। যে উপায়ে তা করা হয় তাকে বলে **রেডিওএক্টিভ ডেইটিং**। এটা **কার্বন-১৪ ডেইটিংয়ের** অনুরূপ।

রেডিওএক্টিভ ডেইটিং বা তেজস্ক্রিয়া তারিখ নির্ধারণ

কার্বন-১৪ ডেইটিং এর দ্বারা **ফসিলাইজড** মৃত প্রাণী কত বছর পূর্বে জীবিত ছিল তা জানা যায়। একইভাবে **রেডিওএক্টিভ ডেইটিং** দ্বারা **মিনারেল্‌স** ও কঠিন শিলা পাথরের বয়সও বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেন। এ উপায়েই পৃথিবী কত বছর পূর্বে জন্ম নিয়েছিল তার একটি ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে। অধিকাংশ মতে পৃথিবীর বয়স ৪.৬ বিলিয়ন (এক হাজার মিলিয়ন সমান এক বিলিয়ন) বছর। এবার দেখা যাক **রেডিওএক্টিভ ডেইটিং** বলতে কি বুঝায়।

কোন কোন এটমের **নিউক্লিয়াস** কোটি কোটি বছর স্থিতিশীল থাকার পর আলফা কিংবা বিটা তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বদলে অন্য বস্তুর নিউক্লিয়াসে রূপান্তর হয়ে থাকে। যেমন **ইউরেনিয়াম-২৩৮** কিংবা **থোরিয়াম-২২**। **রেডিওএক্টিভ ডেইটিং** করতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা প্রথমে কোন বিশেষ **মিনারেল** বা শিলাখণ্ডের **আইসোটপ** তা সৃষ্টির সময় কতটুকু ছিলো তার একটি **'ধারণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত'** নেন। এরপর জানা রেইট হিসেবে কতটুকু ইতোমধ্যে ক্ষয় **(ডিকে)** হয়েছে তা মেপে এর বয়স নির্ধারণ করেন। জানা থাকা প্রয়োজন যে এভাবে বয়স নির্ধারণ সঠিক না-ও হতে পারে। কারণ প্রথমেই সাম্পুলের আইসোটপের পরিমাণ **'ধারণা'** করে নির্ধারণ করতে হয়- আর এতে যদি হেরফের থাকে তাহলে শেষ ফলাফলেও হেরফের থাকবে।

আমরা **এটম** বা অণু নামক বস্তুর ক্ষুদ্র অংশের উপর আলোচনা করে ইতোমধ্যে অনেকদূর এগিয়েছি। অণুর গঠনপ্রণালী, রদবদল, স্থিতিশীলতা, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদির উপর আমরা অল্প-বিস্তর বলেছি। অণু সম্পর্কে জানার শেষ কিন্তু হয় নি!

তাহলে আসুন, আরোও একটু জেনে নিই- বিশেষ করে অণুর মধ্যে যেসব **ফোর্স** বা শক্তি ক্রিয়াশীল আছে তা জানা একান্ত প্রয়োজন।

আপনি জানেন কিঃ রেডিওএক্টিভিটির আবিষ্কারক ছিলেন পোলেন্ডে জন্মনেওয়া ফরাসী মহিলা **মেরী কিউরি (১৮৬৭-১৯৩৪)**। তেজস্ক্রিয়া স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক। এ থেকে দুরারোগ্য **ক্যান্সার** হতে পারে। এর প্রমাণ ছিলেন তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কারক স্বয়ং **মেরি কিউরি,** তিনি লিউকেমিয়া নামক **ক্যান্সার** রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ রোগ হওয়ার পেছনে কারণ ছিল, তেজস্ক্রিয়ার উপর লেবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা পরিচালনা।



এটাই হলো হিরোশিমায় পতিত প্রথম এটম বোমা।

পরিচ্ছেদ ৯

অণুর অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহ

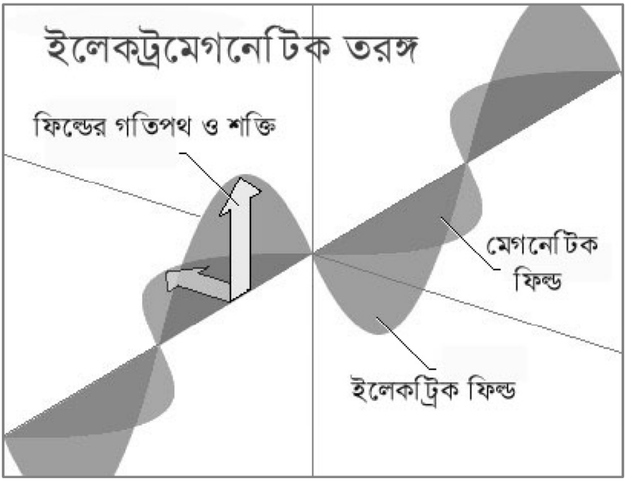
পদার্থবিদ্যায় **ফোর্স** শব্দটির অর্থ একটু ভিন্ন। ইংরেজী শব্দ **'পুশ'** এবং **'পুল'** যা বাংলায় যথাক্রমে ধাক্কা ও টান বলা যায়। পদার্থবিজ্ঞানে এ দু'টো শব্দের সঙ্গে **ফোর্স** বা শক্তি নিহিত। পুরো স্বভাব বা প্রকৃতিতে মোট চারটি মৌলিক **ফোর্স** ক্রিয়াশীল আছে। এগুলোর মধ্যে তিনটিই বস্তুর এটমের মধ্যে বিদ্যমান। বাকী একটি যাকে আমরা মহাকর্ষ বলি- সর্বত্র ক্রিয়াশীল থেকে সমগ্র জগতকে অস্তিত্বশীল রাখছে। যে তিনটি **ফোর্স** এটমের মধ্যে বিদ্যমান এগুলোকে **ইলেকট্রমেগনেটিক, স্ট্রং ও উইক ফোর্স** বলে। এই ফোর্সগুলোই এটমকে স্থিতিশীলতা প্রদান করে ও অস্থিতিশীল **এটম** কিভাবে ক্ষয় হবে কিংবা স্থিতিশীলতা অর্জন করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং এই তিনটি **ফোর্স** দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব বজায় থাকে।

ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স এটমের মধ্যে ইলেকট্রনকে ধরে রাখে। সবল **ফোর্স** এটমের নিউক্লিয়াসে ক্রিয়াশীল থেকে সেখানকার **প্রটন** ও নিউট্রনকে জড়িয়ে রাখে। আর দুর্বল **ফোর্স** নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে ঐসব **নিউক্লিয়াস** যেখানে অতিরিক্তি **প্রটন** কিংবা **নিউট্রন** আছে তা **ডিকে** বা ক্ষয় হবে। চতুর্থ **ফোর্স** মহাকর্ষ। এটা **এটমিক** স্কেলে ধরা দেয়না তবে তা বড় বড় বস্তুর ক্ষেত্রে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে। এই পৃথিবীর বুকে আমরা বিচরণ করতে সমর্থ হই এই ফোর্সটির কারণেই। এছাড়া এটাই নিয়ন্ত্রণ করছে সৌরজগতসহ মহাকাশের যাবতীয় বস্তু। এবার আমরা এই চারটি ফোর্সের উপর আরও একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। এগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মালে বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেকটা বর্ধিত হয়ে যাবে।

ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স

এ মৌলিক ফোর্সকে আমরা বাংলায় বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় শক্তি বলতে পারি। এ শক্তিটির ফলেই **স্টেটিক ইলেকট্রিসিটির** জন্ম হয়। একটি চিরুনিতে যে চুম্বকের মতো আকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি হয় চুল আঁচড়ানোর পর, তা হলো এই মৌলিক শক্তির ফলাফল। **ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স** বিপরীতধর্মী **ইলেকট্রিক** চার্জে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। সুতরাং

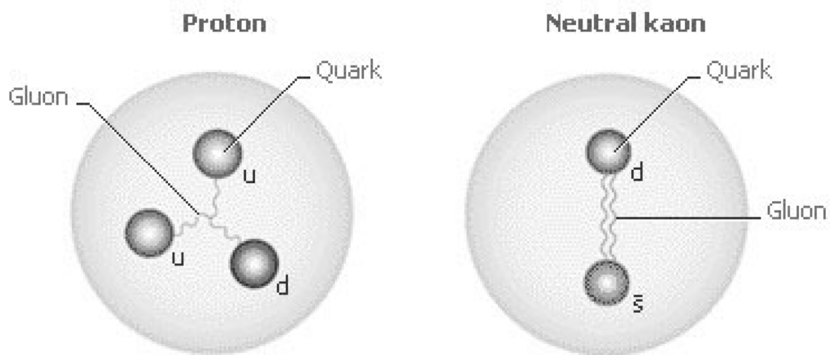
এটাই এটমের নিউক্লিয়াসে **পজিটিভ** চার্জসম্পন্ন প্রটনের সঙ্গে বাইরের **নেগিটিভ** চার্জসম্পন্ন ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই ফোর্সই ইলেকট্রনকে এটমের মধ্যে ধরে রাখে। চার্জের দূরত্ব যতো নিকটবর্তী হবে **ইলেকট্রমেগনেটিক** ফোর্সের মাত্রাও ততো শক্তিশালী হবে। এর ফলে বিপরীত চার্জসম্পন্ন **পার্টিকেল** খুব শক্তভাবে একটা আরেকটার মধ্যে **বন্ড** বা আকর্ষণ বজায় রাখে। **ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স** একই ধরনের চার্জসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে বিকর্ষণও সৃষ্টি করে। অর্থাৎ **পার্টিকেল** যদি উভয়ই **পজিটিভ** হয় তাহলে এই **ফোর্স** পার্টিকেলদ্বয়কে একটা আরেকটা থেকে দূরে ঠেলে দেবে। **নেগিটিভ** চার্জসম্পন্ন **এটম** একটা আরেকটা থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ হেতু তা পারে না। অপরদিকে প্রটনও যেহেতু **পজিটিভ** চার্জসম্পন্ন তাই একটা আরেকটা থেকে দূরে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু এখানে **স্ট্রং ফোর্স** নামক আরেকটি মৌলিক শক্তি এগুলোকে ধরে রাখাতে সক্ষম হয়। **ইলেকট্রমেগনেটিক** ফোর্সের ফলেই বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয়া ও রশ্মির জন্ম হয়। যেমন: আলো, **রেডিও-ভিডিও সিগনাল**, **আলফা-বিটা-গামা রে, এক্স-রে** ইত্যাদি।



আমরা এই মৌলিক ফোর্সের উপর সংক্ষিপ্ত এ আলোচনায় যা শিখেছি তা হলো, এই ফোর্সের আসল কাজ হচ্ছে এটমের মধ্যে ব্যালান্স সৃষ্টি। **এটম** ও প্রটনের মধ্যে আকর্ষণ ও **প্রটন-প্রটন** এবং **ইলেকট্রন-ইলেকট্রনের** মধ্যে বিকর্ষণ সৃষ্টি। এবার আমরা এটমের নিউক্লিয়াসে ক্রিয়াশীল শক্তিশালী আনবিক শক্তি বা **স্ট্রং ফোর্সের** উপর কিছুটা তথ্যাদি তুলে ধরবো।

স্ট্রং ইন্টারেকশন

এই ফোর্সের ফলেই **প্রটন** ও **নিউট্রন** এটমের কেন্দ্রে জড়িত থাকে। আগেই বলেছি প্রটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল **ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স** থেকে সৃষ্ট বিকর্ষণকে এই ফোর্সটিও ক্যানসেল বা নিষ্ক্রিয় করে। **স্ট্রং ফোর্স** প্রটনে বিদ্যমান আছে কিন্তু তা **ইলেকট্রমেগনেটিক** শক্তিকে প্রতিহত করতে যথেষ্ট নয়। তাই সেখানে তৈরী করা হয়েছে চার্জশূন্য **পার্টিকেল নিউট্রন**। এতে **স্ট্রং** শক্তি থাকলেও **ইলেকট্রমেগনেটিক** শক্তি তার উপর ক্রিয়াশীল হয় না যেহেতু সে কোন **চার্জ** ক্যারী করে না।

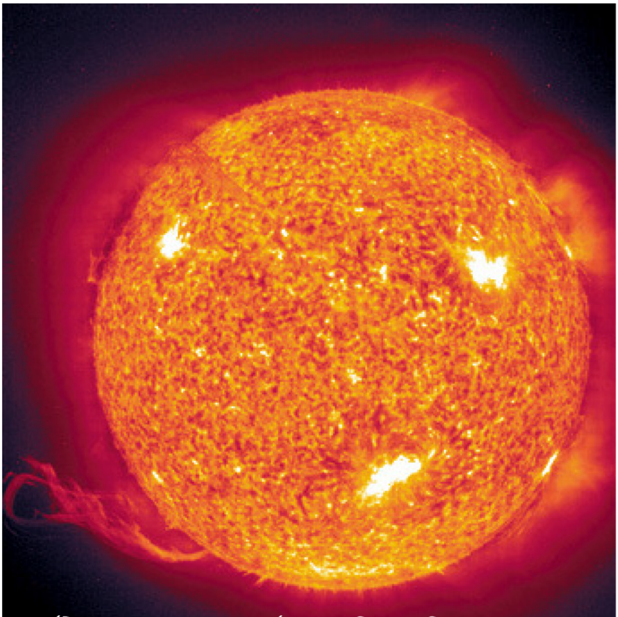


ক্যুয়ায়েৰ্কর তৈরী প্রতিটি প্রটন ও নিউট্রনে যে শক্তিটি সক্রিয় আছে তা হলো 'সবল আনবিক শক্তি' বা 'স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স'।



আমরা **স্ট্রং** ফোর্সের ডিউটি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কিন্তু এটমকে পুরোদমে স্থিতিশীল রাখার জন্য আরোও একটি **ফোর্স** ক্রিয়াশীল আছে। এই ফোর্সের নামই হলো উইক বা দুর্বল শক্তি। তবে এ সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে **স্ট্রং** ফোর্সের উপর আরোও কিছু কথা ব্যক্ত করার প্রয়াস পাচ্ছি। পাঠকরা এ থেকে আশাকরি বিষয়টির উপর আরও জ্ঞাত হবেন।

নিউক্লিয়াসে ক্রিয়াশীল **স্ট্রং ইন্টারেকশন** বাস্তবে অত্যল্প রেঞ্জের ভেতর প্রভাব বিস্তার করে। এ ফোর্সের রেঞ্জ বা প্রভাবের দূরত্ব বিজ্ঞানীরা খুব ছোট্ট একটি মাপার **ইউনিট** দ্বারা নির্ধারণ করেন যাকে বলা হয় **'ফেমটোমিটার'**। **১ ফেমটোমিটার** = 1×10^{-15}m মাত্র (4×10^{-14} ইঞ্চি)। জানা থাকা প্রয়োজন যে 1×10^{-15} আসলে ০.০০০০০০০০০০০০০০১ এই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে বুঝায়। **স্ট্রং** ফোর্সের প্রভাব **নিউক্লিয়াস** থেকে মাত্র **২ ফেমটোমিটার** দূরত্ব পর্যন্ত বিদ্যমান। সুতরাং **স্ট্রং ফোর্স** মহাকর্ষ ও **ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স** থেকে এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেষোক্ত উভয় শক্তির প্রভাব দূরত্বের সঙ্গে কমে আসলেও তা কোটি কোটি আলোক বৎসর দূরেও ক্রিয়াশীল আছে। উল্লেখ্য এক আলোক বৎসর হলো প্রতি সেকেন্ডে **১** লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ছুটে এক বৎসরে আলোক রশ্মি যতটুকু দূরত্বে ভ্রমণ করে তাকেই বুঝায়। আমরা মহাকাশ বিজ্ঞানের উপর আলোচনার সময় এই আলোক বৎসরের হিসাব অহরহ ব্যবহার করবো।



সূর্যটি জ্বলন্ড়ে আছে 'দুর্বল আনবিক শক্তির' মাধ্যমে।

উইক ফোর্স

দুর্বল এ শক্তিটিও **এটমিক** স্কেলে ক্রিয়াশীল হয়। দুর্বল বলতে সত্যিই তা অতি দুর্বল। এই শক্তির প্রভাব মাত্র ০.০১ **ফেমটোমিটার** দূর পর্যন্ত বিদ্যমান। অন্যগুলোর তুলনায় এই ফোর্সের আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য আছে- এটা অণুর প্রতিটি পরমাণুতে ক্রিয়া করে। আমরা জেনেছি যে **ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স** শুধুমাত্র **ইলেকট্রন** ও প্রটনে ক্রিয়া করে আর **স্ট্রং ফোর্স** ক্রিয়া করে **প্রটন** ও নিউট্রনের মধ্যে। এছাড়া দুর্বল হলে কি হবে, এই ফোর্সই পার্টিকেলকে রূপান্তর করার মতো ক্ষমতা রাখে। এটা দরকার পড়ে তখনই

যখন নিউক্লিয়াসে অতি বেশী **প্রটন** কিংবা **নিউট্রন** জড়ো হয়ে পড়ে যার ফলে তা স্থিতিশীল থাকে না তখন দুর্বল **ফোর্স** এসে কিছু পার্টিকেলকে প্রয়োজন মাফিক বদলে অন্য ধরনের পার্টিকেলে রূপান্তর করে দেয়। এই রদবদল সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি কিন্তু তখন বলি নি কোন্ শক্তিটি এর জন্য দায়ী। এখন তা আমরা জেনে নিলাম।

আপনি জানেন কি: পুরো বস্তুজগৎ উপরে বর্ণিত মৌলিক চারটি শক্তির উপর নির্ভরশীল। এই মুহূর্তে যদি এ শক্তিগুলোর একটির মধ্যে হেরফের ঘটে তাহলে কিয়ামত ঘটে যাবে! কারণ প্রতিটি **এটম** এই চার শক্তি থাকার কারণে অস্তিত্ব বজায় রাখছে- সুতরাং প্রাকৃতিক আইন-কানুনে বিঘ্ন ঘটলে সবকিছু অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। এ জন্যেই অনেক বিজ্ঞানী স্বভাব নিয়ে খেল-তামাশা পছন্দ করেন না। স্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্য সত্যিই অপূর্ব- একে জানা-চেনা ও কৌশলে কাজে লাগানো কোন সমস্যা নেই, কিন্তু একে রদবদল করার চেষ্টা আত্মঘাতী হতে পারে।

পরিচ্ছেদ ১০

ক্যুয়ান্টাম থিওরী : বস্তু ও এনার্জির স্বরূপ

এনার্জি শব্দটির সঙ্গে ইতোমধ্যে আমরা কয়েকবার পরিচিত হয়েছি। **এনার্জি** বা উদ্যম স্বভাবের যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেখানে বস্তু সেখানে এনার্জি। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা **এনার্জি** ও বস্তুর সম্পর্ক তথা জগতে এগুলো কিভাবে ক্রিয়া করে এ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার ক্ষেত্রে যে থিওরীর উপর নির্ভর করেন তাকে বলে **ক্যুয়ান্টাম থিওরী**। **'ক্যুয়ান্টাম'** শব্দটি (একবচনে ক্যুয়ান্টা) এই থিওরীর **সেন্ট্রাল** বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে। এই **থিওরী** দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় **এনার্জি** ও বস্তুকে ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে, এগুলো আসলে একক **ইউনিট** বা প্যাকেট- আর এই প্যাকেটকে বলে **'ক্যুয়ান্টা'**। **ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স** দ্বারা আমরা জগতের অনেক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা দিতে পারি যেমন, একটি গাড়ির গতি, ত্বরণ, **ফ্রিকশন**, মহাকর্ষ ইত্যাদি। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা **এটমিক** স্কেলে গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে ভিন্নভাবে সবকিছুকে বুঝানোর প্রয়োজন দাঁড়ায়। **ক্যুয়ান্টাম ফিজিক্স** এই অভাব পূরণ করেছে। তবে সর্বসাধারণ্যের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানের এই অত্যাধুনিক শাখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আদৌ সঠিক হবে না। কারণ এটা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। সুতরাং **ক্যুয়ান্টাম** ফিজিক্সের উপর আমরা এখানে কিছু তথ্য উপস্থাপন করছি যা থেকে থিওরীর মৌলিক বিষয়াদি সবার বোধগম্য হয়ে ওঠবে এটাই আশা।

ক্যুয়ান্টাম থিওরীর উদ্ভাবকরা এটমের মধ্যে বিভিন্ন পার্টিকেলের তরঙ্গের মতো যাচ্ছেতাই **(চান্স-লাইক)** চরিত্র অবলোকন করে একটি উপায় খুঁজে বের করেছেন, যার মাধ্যমে কোন একটি মুহূর্তে ঐসব **পার্টিকেল** কোথায় কোন অবস্থায় বিরাজ করছে, তার একটা **'প্রায় সঠিক'** ধারণা বের করা যায়। এই **থিওরী** দ্বারা একটি **মডেল** তৈরী হয়েছে যা সঠিকভাবে এটমের গঠনপ্রণালী ও ক্রিয়া-কলাপ ব্যাখ্যায়িত হয়। এছাড়া এই **থিওরী** দ্বারা বিজ্ঞানীরা বিশ্বের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত বৃত্তান্ত, সূর্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, এটা কিভাবে আলো প্রদান করে, বস্তুর **কেমিষ্ট্রি** ইত্যাদি অনেককিছু জেনে নিয়েছেন এবং গবেষণা করছেন। **ক্যুয়ান্টাম থিওরী** ছাড়া বিজ্ঞানীরা **নিউক্লিয়ার এনার্জি** সৃষ্টি এবং কম্পিউটারের **মাইক্রচীপ** আবিষ্কার করতে পারতেন না।

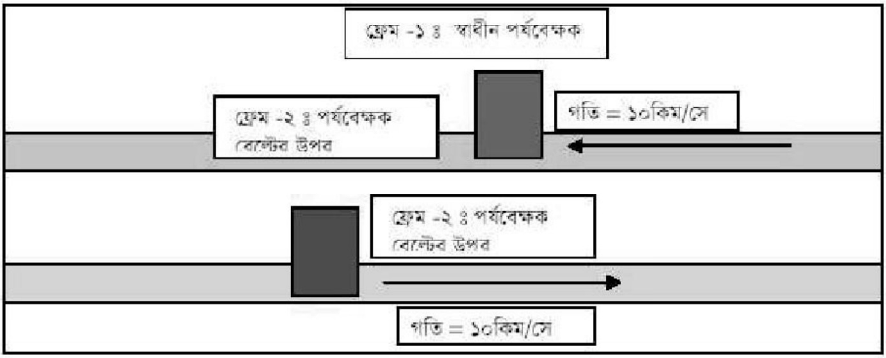
মোটকথা অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূলে যে থিওরীটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তা-ই হচ্ছে এই **ক্যুয়ান্টাম থিওরী**।

আপনি জানেন কি: 'ক্যুয়ান্টাম কম্পিউটার' নামক একটি অত্যাধুনিক **কম্পিউটার** শীঘ্রই বাজারে আবির্ভুত হবে। এই **কম্পিউটার** বর্তমানের তুলনায় কোটিগুণ গতিশীল হবে। এতে থাকবে **ক্লোরোফর্ম মলিকিউল (হাউড্রোজেন** ও **ক্লোরিন এটম)** এবং **এমআরই (মেগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং) প্রসেসিং**- সুতরাং কম্পিউটারটি **মলিকিউলার** লেবেলে কার্য করবে। জানা থাকা দরকার **এমআরই সিস্টেম** এখন **মেডিকেল** বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পরিচ্ছেদ ১১

রিলেটিভিটি : সবকিছু আপেক্ষিক

বিংশ শতকের শুরুতে **আলবার্ট আইনস্টাইন** এই **থিওরী** প্রকাশ করেন। **রিলেটিভিটি** বা আপেক্ষিকতা বলতে মূলত এটাই বুঝায় যে, যে কোন ঘটনা একমাত্র অবলোকনকারীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোন ঘটনা কিভাবে দেখাবে তা বাস্তাবে অবলোকনকারীর গতি, অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর এবং তা ভিন্ন অবস্থান বা **ফ্রেম অব রেফারেন্স** থেকে অবলোকন করলে, একই ঘটনা ভিন্নভাবে দেখাবে। মোটকথা **এবস্যুলুট** কোন ঘটনা নেই, সবই আপেক্ষিক। সকল অবলোকনকারীর জন্য কোন পর্যবেক্ষণ **এবস্যুলুট** বা একক হবে না। আইনস্টাইন এই সত্যটি আবিষ্কার করে পুরো **ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স** ও বিজ্ঞানকে পাল্টে দিয়েছেন। আমরা সব ঘটনা **রিলেটিভ** বা আপেক্ষিক হওয়ার কারণ সম্পর্কে এবার কিছু বাস্তব অবস্থার বর্ণনা করবো।



প্রথমেই আমরা কোন পর্যবেক্ষকের নিকট কিভাবে একই গতিসম্পন্ন বস্তু ভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হবে তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা চালাবো। মনে করুন আপনি একজন নভোচারী মহাকাশে ভ্রমণ করছেন উদ্দেশ্যহীনভাবে কিংবা কোন গ্রহে যাওয়ার লক্ষ্যে। হঠাৎ আপনি দেখলেন দুটি **কনভেয়ার বেল্ট** সমান্তরাল দূরত্বে থেকে বিপরীত দিকে চলমান আছে। আপনি সরাসরি এর উপরে এসে নিজের নভোযানটি **স্টেশনারী** (স্থির) করে বেল্টগুলো সম্পর্কে আরোও জানতে ইচ্ছে করলেন [দেখুন উপরের নক্সাটি]।

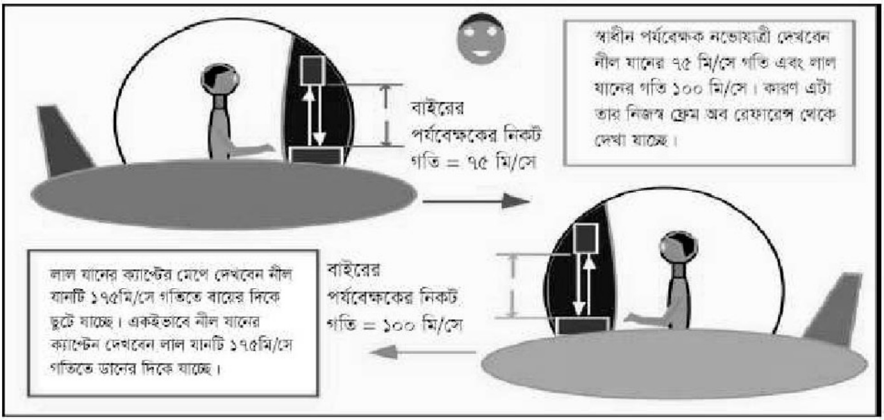
পর্যবেক্ষক হিসেবে আপনি প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ফ্রেম ১-এ স্থির হয়ে দেখবেন (উভয় বেল্টের গতি যদি ১০কি.মি/সেকেন্ড হয়) উভয় বাক্স ১০ **কিলোমিটার** বেগে বিপরীত দিকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ফ্রেমে অর্থাৎ যে কোন বেল্টে দাঁড়িয়ে অপর বাক্সটির গতি দেখবেন ১০+১০ কি.মি./সেকেন্ড আর আপনার বেল্টের গতি ০। তাহলে বাক্সের গতি আসলে কোনটি? বাস্তবে উভয় গতিই সত্য। কারণ আপনি যদি গতিগুলো মেপে নেন তাহলে উপরোক্ত ফলাফলই পাবেন। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে বাস্তবে চূড়ান্ত বা **এবস্যুলুট** গতি বলতে কিছুই নেই। গতি নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের নিজের গতি ও ফ্রেম অব রেফারেন্সের উপর। এই অতি সাধারণ বিষয়টি হাজার হাজার বছর যাবৎ বিজ্ঞানীরা ভাবেন নি। **আইজাক নিউটন** (১৬৪২-১৭২৭) তিনশত বছর পূর্বে তার মহাকর্ষ **থিওরী** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি **এবস্যুলুট** গতি এবং **এবস্যুলুট টাইম** আছে বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ এ কথাটি আর সত্য নয়। **আলবার্ট আইনস্টাইন** (১৮৭৯-১৯৫৯) প্রমাণ করেছেন যে, গতি ও সময় বাস্তবে আপেক্ষিক। কোন চূড়ান্ত গতি বা সময় এ মহাবিশ্বে কোথাও নেই।

এখন বস্তুর গতি যদি এরূপ হয় তাহলে কিভাবে সময় ও আলোর গতি গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করা যায়? আমরা এবার এসব প্রশ্নের জবাবের দিকে মনোযোগ দেব। পাঠকদেরকে আগেই বলে রাখি আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছে আরও কিছু সাপ্রাইজ!

কোন ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখন এটা কোথায় ঘটেছে তা জানার সাথে সাথে কোন সময় ঘটেছে তা-ও জানতে হবে। এখন একই ঘটনা ভিন্ন পর্যবেক্ষক ভিন্নভাবে দেখতে পারবে- এমনকি ভিন্ন সময়ে তা পরিলক্ষিত হতে পারে। সুতরাং কোন ঘটনা যখন ঘটে তখন তার পুরো বর্ণনায় স্থান (অর্থাৎ তিন বিস্তৃতিসম্পন্ন বা ত্রিমাত্রিক বিশ্বের যে কোন জায়গা) ও কাল উভয়টি থাকতে হবে। অন্য কথায় স্থান-কালসহ একটি **স্পেইস-টাইম কনটিনিউয়ামে** এই মহাবিশ্ব অস্তিত্বশীল আছে। স্থানকে সময় ছাড়া পুরোদমে ব্যাখ্যা অসম্ভব। অপরদিকে সময়কেও স্থানের সঙ্গে জড়াতে হবে- তবেই পুরো বর্ণনা বা ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো।

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি **ফ্রেম অব রেফারেন্স** ছাড়া বাস্তবে কোন বস্তুর গতি নির্ণয়ই সম্ভব নয়। এটাকে যদি আমরা আরোও একটু বুঝিয়ে বলতে চাই তাহলে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মনে করুন আপনি ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে দেখলেন

একখানা ইন্টারসিটি ট্রেন দ্রুত স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। এখন কেউ যদি বলে আপনিসহ পুরো স্টেশনটি দ্রুত বিপরীত দিকে চলে গেছে আর ট্রেনটি স্থির ছিল! তাহলে আপনি তাকে পাগল ছাড়া আর কী বলবেন? কিন্তু সে যদি আপেক্ষিকতার উদ্ধৃতি দিয়ে বসে তাহলে তাকে জিনিয়াস না বলে পারবেন না। কারণ, বাস্তবে স্টেশনটিতো অবশ্যই সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ হেতু দ্রুত (২৮কি.মি. প্রতি মিনিট) ছুটে চলছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, সৌরজগতের গতি, আমাদের তারাজগত তথা **মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির** গতি ইত্যাদি সবকিছু মিলে কোন্ বস্তুটি স্থির আছে যাকে স্থিরবিন্দু হিসেবে **রেফারেন্স** বানিয়ে সময়, গতি ইত্যাদি মাপবেন? সুতরাং সময়, ঘটনা ও গতি আপেক্ষিক। বাস্তবে সবকিছু লকেল, **এবস্যুলুট** বলতে কিছুই নেই।

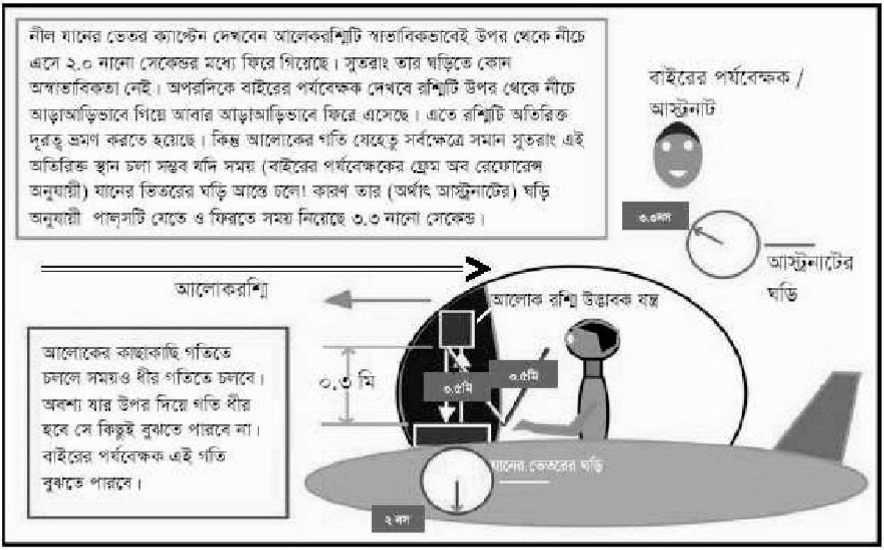


বিশেষ থিওরী অব রিলেটিভিটি

আলবার্ট আইনস্টাইন **১৯০৫** সালে প্রথমে বিশেষ **থিওরী অব রিলেটিভিটি** প্রকাশ করেন। এতে অনেকগুলো সাপ্রাইজের মধ্যে একটি হলো আলোকের গতি বিভিন্ন অবস্থায় সর্বদাই একই থাকে। এই ফলাফল থেকে উচ্চ গতিতে বস্তু চলার ক্ষেত্রে কিছু অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়- যা বিশ্বাস করার মতো নয়। আমরা এখানে দু'একটি এরূপ অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো।

আলোকের অপরিবর্তিত গতি হলো ৩,০০,০০০ **কিলোমিটার** প্রতি সেকেন্ড [১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড]। এখন, মনে করুন দু'জন পর্যবেক্ষক একে অন্য থেকে আপেক্ষিকভাবে গতিশীল আছে। উভয়ের গতির পরিমাণ ১,৬০,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড। তারা উভয়ে একটি আলোক রশ্মির গতি পরীক্ষা করে একই ফলাফল পাবে। অর্থাৎ তা হবে ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড। এই অদ্ভুত ফলাফল কিভাবে হতে পারে তা **রিলেটিভিটি** থেকে জবাব মেলে। নীচের চিত্রগুলোর দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এবং ক্যাপশন পাঠ করে নিন।

উপরের (পূর্বের পৃষ্ঠার) ছবিটির দিকে আরও একবার আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। আমরা এ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, গতি কোথা থেকে মাপা হচ্ছে সেটাই জরুরী। নভোযানের ভেতরে এটা মাপা হলে এর যাত্রী বা ক্যাপ্টেন নিজেকে স্থীর হিসেবে ধরে মাপবে। কিন্তু তিনি তো আসলে স্থির নন। সুতরাং স্থির হিসেবে মাপার ফলে বিপরীত দিক থেকে ধেয়ে আসা ঐ নীল যানের গতি ও নিজের গতির যোগফল হবে তার মাপার ফলাফল। কারণ তিনি এই গতিহি লক্ষ্য করবেন। একইভাবে নীল যানের নাবিকও তার গতিমিটারে দেখবেন তার নিজস্ব **ফ্রেম অব রেফারেন্স** অনুযায়ী লাল যান তার দিকে নিজের গতি ও লাল যানের গতির যোগফল দেখাচ্ছে। এটুকু পর্যন্ত আমরা আগেই বুঝিয়ে বলেছি। এবার নির্দিষ্ট করুন নীল যানের মধ্যে যে আলোক-ঘড়ি আছে তাতে একটি **আপ-ডাউন পাল্‌স** সংঘটিত হতে কতটুকু সময় লাগবে বাইরের আস্ট্রনাটের ঘড়িতে ও যানের ভেতরের ঘড়িতে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যেহেতু লাইট বা আলোকের গতি সর্বাবস্থায় এক- সুতরাং গতিশীলতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী এবং সময়ও কি বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের জন্য আপেক্ষিক? এ দু'টো প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদেরকে নিম্নের দ্বিতীয় ছবিটি স্ট্যাডি করতে হবে।



আমাদের নীল যানটি এক পর্যায়ে আলোকের ৮০% গতিতে উন্নীত হলো। অর্থাৎ এটা প্রতি সেকেন্ডে ২,৪০,০০০ কিমি/সেকেন্ড গতিতে ছুটতে লাগলো। এই অবস্থায় যদি বিভিন্ন **ফ্রেম অব রেফারেন্স** থেকে আলোকের গতি নির্ণয় করি তাহলে কি হবে? আমাদের **আস্ট্রনাট** এর গতি ৩,০০০,০০০ কিমি/সেকেন্ড ঠিকই দেখবে। তবে নীল যানের ক্যাপ্টেন এর নিকট এর গতি কি হবে? এ প্রশ্নের জবাব রিলেটিভিটির পূর্বে সকলেই বলতেন, ৫,৪০,০০০ কিমি/সেকেন্ড। কারণ তার **ফ্রেম অব রেফারেন্স** থেকে এটাই হওয়ার কথা। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যানের ভেতরের ক্যাপ্টেনও গতি মেপে সেই ৩,০০০,০০০ (তিন লক্ষ) কিমি/সেকেন্ড পাবে। সুতরাং আলোকের গতি সবার নিকট সমান। এটাই জগতের একমাত্র **এবস্যুলুট** গতি যার মধ্যে কোন অবস্থাতেই কোন পবিবর্তন নেই- যদি না তা কৃত্রিম উপায়ে বদলানো হয়। এবার প্রশ্ন করুন, আলোকের গতি যেহেতু আমাদের গতিশীল যানের ভেতর ও বাইর জগত উভয় ক্ষেত্রে সমান তাহলে কিভাবে আলোক রশ্মি দু'টি ভিন্ন দূরত্ব সমান সময়ের ভেতর ভ্রমণ করতে পারবে? বাস্তবে তা অসম্ভব। তাহলে এই অতিরিক্ত সময় কোত্থেকে বের হবে? **রিলেটিভিটি থিওরী** এর জবাবে বলে, বাস্তবে গতিশীল যান বা বস্তুর মধ্যে যে ঘড়ি আছে তা বাইরের ঘড়ির তুলনায় আস্তে চলে। অর্থাৎ আলোকের কাছাকাছি গতিতে চললে সেই গতিশীল বস্তুর উপর দিয়ে সময় ধীরে ধীরে চলবে। গতি যতো বেশী হবে এই ধীরে চলা ততো বেশি হবে। আলোকের অতি কাছাকাছি

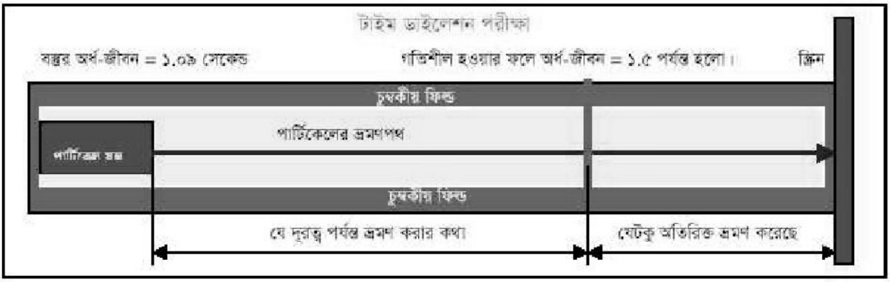
গতিতে কোন বস্তু যদি চলতে পারে তাহলে সময় প্রায় স্থির হয়ে পড়বে। আলোকের গতির সঙ্গে সময়ের এই সম্পর্ক সত্যিই আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, এসব কথার প্রমাণ কি?

উপরের ছবিটি আরোও একবার স্ট্যাডি করুন। যেহেতু আমাদের **আস্ট্রনাট** দেখছেন যানের ভেতরের পাল্সটি উপর থেকে আয়না পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে যাচ্ছে (কারণ যানটি একই সময় দ্রুত সামনের দিকে এগুচ্ছে) তাই এই দূরত্ব দাঁড়াবে ০.৫ মিটার। ফিরে আসতে আরও একটি আড়াআড়ি লাইন যার দূরত্ব ০.৫ মিটার। সুতরাং আলোক রশ্মিটি মোট ১.০ মিটার ভ্রমণ করেছে। এটা **আস্ট্রনাট** তার নিজস্ব চোখে দেখতে পাবেন। অপরদিকে যানের ক্যাপ্টেন দেখছেন আলোকরশ্মিটি সোজা নীচের দিকে নেমে আবার উপরে উঠলো। এতে ০.৩+০.৩ = ০.৬ মিটার দূরত্ব ভ্রমণ করতে হয়েছে। সুতরাং রশ্মিটি যেহেতু উভয় ক্ষেত্রে একই গতিতে (অর্থাৎ ৩,০০০,০০০ কিমি/সে) চললো তাহলে সে আস্ট্রনাটের ফ্রেম অব রেফারেন্সে অতিরিক্তি ০.৪ মিটার ভ্রমণ করার সময় পেল কোত্থেকে? **আস্ট্রনাট** তার ঘড়ি দ্বারা সময় ঠিকই মেপেছেন কারণ, টাইম = দূরত্ব / আলোকের গতি = ১ মি / ০.৩মি প্রতি **নানো** সেকেন্ড = ৩.৩ **নানো** সেকেন্ড। এই একই **ফর্মুলা** ভেতরের ক্যাপ্টেনও ব্যবহার করবেন, সুতরাং টাইম = ০.৬ মি/০.৩ প্রতি **নানো** সেকেন্ড = ২.০ **নানো** সেকেন্ড।

আমরা উপরোক্ত যুক্তি ও অঙ্ক দ্বারা প্রমাণ করলাম যে, আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন কোন বস্তুর উপর দিয়ে সময় বাইরের জগতের তুলনায় আস্তে চলে। আমাদের **আস্ট্রনাট** সময় মেপে দেখলেন যে তার চোখের সামন দিয়ে দ্রুত ভ্রমণরত একটি নভোযানের ভেতর সময় ৩.৩-২.০ = ১.৩ **নানো** সেকেন্ড কমে গেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপারটি ভবিষ্যৎ নভোচারীরা নিজেদের সুবিধার্থে কাজে লাগাতে পারবেন। পৃথিবী থেকে দূরের একটি তারায় ভ্রমণকালে যদি তারা আলোকের কাছাকাছি গতিতে চলতে সক্ষম হন তাহলে তাদের বয়স তেমন একটা বাড়বে না। কারণ সময় তাদের উপর দিয়ে অনেকটা ধীরে চলবে। অপরদিকে পৃথিবীতে ইতোমধ্যে বেশ কয়েক বছর বা যুগ অতিবাহিত হয়ে যাবে। এই ভবিষ্যতের দিকে **'টাইম-ট্রাভেল'** এর বাস্তব সম্ভাবনা **রিলেটিভিটি থিওরী** থেকে আমরা পেয়েছি। এরূপ টাইম-ট্রাভেল আর বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক উপন্যাসের কাহিনী নয়- বরং বিজ্ঞানসম্মত সত্য ব্যাপার। এখন আমরা তো

থিওরিটিক্যালী টাইম ডাইলেশন বা সময় ধীরে চলার প্রমাণ করলাম কিন্তু তা কি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে? অবশ্যই। আসুন এবার সেই প্রমাণ কবে কখন হয়েছে তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করি।

টাইম ডাইলেশন বা সময় খাঁটো হওয়ার **থিওরী ১৯০৫** সালে আইনস্টাইন প্রকাশ করলেও তা বেশ পরে পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে। **গেল** শতকের ৭০ দশকে এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা চূড়ান্ত প্রমাণ করেন। আগেই বলেছি এই এফেক্ট তখনই পুরোদমে পরিলক্ষিত হয় যখন বস্তুর গতি আলোকের গতির উল্লেখযোগ্য অংশ পর্যন্ত উন্নীত হবে। যেহেতু আজকের প্রযুক্তি এখনও সেরূপ উন্নত হয় নি, যেখানে কোন বস্তুকে আলোকের গতির সাথে তুলনামূলক গতিসম্পন্ন করা যায়, তাই বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন **সাব-এটমিক পার্টিকেল** তথা **ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রটন** ইত্যাদি কোন পার্টিকেলকে কোনভাবে উচ্চ গতিসম্পন্ন করা যায় কি না। এ চিন্তা থেকে শেষ পর্যন্ত **পার্টিকেল এক্সেলেরেটর** সৃষ্টির ধারণা জন্মে এবং **১৯৫৫** সালে একটি উন্নতমানের **পার্টিকেল এক্সেলেরেটর** ইউরোপীয় ইউনিয়নের সকল সদস্যের যৌথ উদ্যোগে সুইজারল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়।



এই এক্সেলেটরে বিরাট চুম্বকীয় ফিল্ডের মাধ্যমে পার্টিকেলকে আলোকের কাছাকাছি গতিতে চালানো যায়। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি কিভাবে বস্তুর মধ্যে অর্ধ-জীবন মাপা যায়। কোন কোন বস্তু আছে যার অর্ধ-জীবন কয়েক সেকেন্ড হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ একটি বস্তুর এটমকে যদি আমরা **রিলেটিভিস্টিক** গতির মতো গতিশীল করতে পারি তাহলে বাইরের জগতের ঘড়িতে বস্তুর অর্ধ-জীবন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যাওয়ার কথা। কারণ, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আমাদেরকে বলছে, আলোকের কাছাকাছি গতিশীল কোন বস্তুর অভ্যন্তীর ঘড়ি বাইরের স্বাভাবিক ঘড়ির তুলনায় আস্তে

চলবে। বিজ্ঞানীরা **পার্টিকেল** গতিশীল করে প্রমাণ করেছেন যে, সত্যিই দ্রুত গতিশীল হওয়ার ফলে পার্টিকেলের অর্ধ-জীবন অনেকটা বেড়ে গেছে। এই **এক্সপেরিমেন্ট** একাধিকবার করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বারই **টাইম ডাইলেশন** প্রক্রিয়া প্রমাণিত হয়েছে [দেখুন উপরের ছবিটি]।

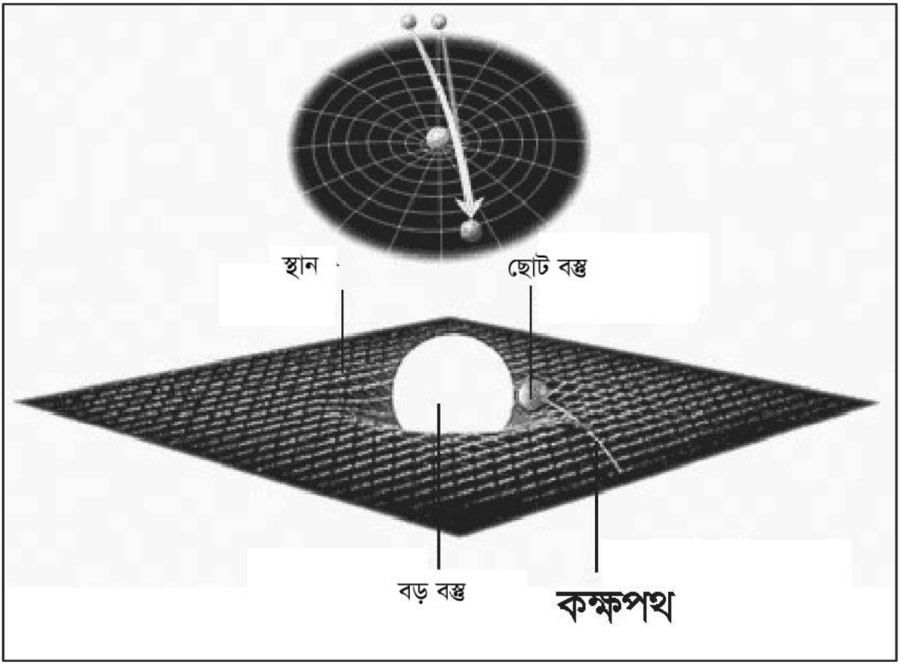
সুতরাং এখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এটা সত্য বলে বিবেচিত যে, ভবিষ্যতের **রিলেটিভিস্টিক** আস্ট্রনাটরা শত শত আলোক বৎসরের পথ পাড়ি দিতে পারবে যদি তাদের গতি আলোকের কাছাকাছি পর্যন্ত উচ্চগতিশীল হয়। এদিকে পৃথিবীতে অবশ্য সময় স্বাভাবিকভাবেই চলবে, সুতরাং এরা ফিরে আসবে শত শত বছর পর- কিন্তু তারা নিজেরা সামন্য বেশি বয়স্ক হবে মাত্র। সময়ের উপর এরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু গতিশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আইনস্টাইন **১৯১৫** সালে এই থিওরীর সঙ্গে মহাকর্ষকে সংযুক্ত করে একটি সার্বিক বিশ্বতত্ত্ব বিজ্ঞান মহলে প্রকাশ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেন। এই থিওরীর নাম হচ্ছে '**জেনালের থিওরী অব রিলেটিভিটি**'। আসুন এবার এটা সম্পর্কে আলোচনায় যাই।

জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি

এই থিওরীর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মহাকর্ষ। আমরা **নিউটনিয়ান মেকানিক্স** বা **ফিজিক্স** থেকে জানি যে, গ্রাভিটি হচ্ছে দু'টি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ। নিউটন এই আকর্ষণকে নির্ণয়ের জন্য একটি **ফর্মুলা** বা সমীকরণ আবিষ্কার করেন, আর তাহলো: $\mathbf{F=GMm/d^2}$। এখানে F অর্থ ফোর্স, G একটি **কন্সটেন্ট** (অপরিবর্তনশীল নাম্বার) যাকে **ইউনিভার্সেল কন্সটেন্ট অব গ্রাভিটেশন** বলে, M ও m হলো প্রতিটি বস্তুর ওজন (**ম্যাস**) এবং d হচ্ছে উভয় বস্তুর মধ্যে দূরত্ব। নিউটনের এই আইনকে মানুষ শত শত বছর যাবৎ বিনা প্রশ্নে মেনে আসছিলো। এবং বাস্তবে দেখা গেছে গ্রহ-উপগ্রহের গতিশীলতার সঙ্গে উক্ত **ফর্মুলা** সামঞ্জস্যশীলও বটে। কিন্তু এই **থিওরী** সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিলো না। আলবার্ট আইনস্টাই তা **১৯১৫** সালে তার **জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটির** মাধ্যমে প্রমাণ করেন।

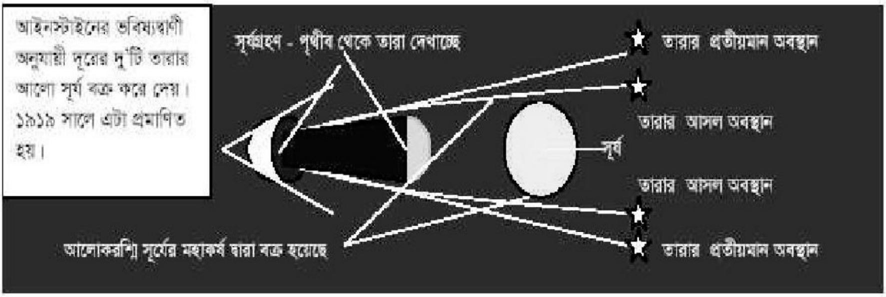
এই **থিওরী** অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি একটি সম্পূর্ণ **ফ্রিকশন ফ্রি** (বা সম্পূর্ণ পিচ্ছিল) কোন রেল ট্রাকের উপর গাড়িতে স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের মাধ্যমে চলে এবং গাড়ির সকল জানালা বন্ধ থাকে যাতে সে বাইরের কিছুই দেখতে পারে না- তাহলে সে স্থির না

গতিশীল আছে সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে না। বাস্তবে গাড়ির ভেতরে সে কোন ধরনের বোধগম্য পরীক্ষা চালিয়ে তার গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। এছাড়া সে যদি কোন কোণ ঘুরে যায় কিংবা তার গাড়ির গতি কমে আসে তাহলে সে কোনভাবেই নির্ধারণ করতে পারবে না, এ রদবদল (যা সে অনুভব করবে) তা মহাকর্ষ না ত্বরণ (**এক্সেলেরেশন**) গতির ফলে সংঘটিত হয়েছে। এই গবেষণা দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মহাকর্ষ কিংবা ত্বরণ একই জিনিস। অন্তত উভয়ের এফেক্টের মধ্যে তারতম্য নেই।



এই সমতা থেকেই আইনস্টাইন তার **থিওরী** প্রতিষ্ঠা করে বলেছেন যে, বাস্তবে মহাকর্ষ হচ্ছে **স্পেইস-টাইমের** একটি বিশেষ অবস্থার নাম। বস্তু তার মধ্যে নিহিত **ম্যাস** বা ওজন অনুযায়ী তার চতুর্দিকের স্থান-কালকে **বেন্ড** (বক্র) করে ফেলে। সুতরাং কোন ছোট্ট বস্তু যদি (যেমন একটি গ্রহ) বড় কোন বস্তুর নিকটবর্তী হয়

(যেমন সূর্য) তাহলে ওই বস্তু বক্র স্থান-কালের উপর দিয়ে চলবে (যেমনটি গ্রহ তার কক্ষপথে চলে)। আইনস্টাইন তার এই **থিওরী** থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলেন, কোন দূরবর্তী তারা থেকে আগত আলোকরশ্মি সূর্যের পাশ কেটে আসার সময় তা ঐ বক্র স্থান-কালের ফলে **বেন্ড** বা বক্র হয়ে যাবে। এতে তারাটি তার আসল অবস্থান থেকে কয়েক **ডিগ্রী** দূরত্বে দেখাবে। আইনস্টাইন দু'টি বিশেষ তারার ক্ষেত্রে অঙ্ক কষে ওগুলো কতটুকু দূরে দেখাবে তা-ও বলে দিয়েছিলেন। তার এই ভবিষ্যদ্বাণী **১৯১৯** সালে প্রখ্যাত এক পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হয় [দেখুন নীচের ছবিটি]।



আপনি জানেন কি: আইনস্টাইন ছিলেন নবেল পুরষ্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী। তবে তিনি এই নবেল পুরষ্কার তার জগতকাঁপানো **রিলেটিভিটি** থিওরীর জন্য পান নি বরং আলোকরশ্মির স্বরূপের উপর গবেষণার জন্য পেয়েছিলেন। আলোকবিজ্ঞানের এই থিওরীর নাম হলো "**ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট**"।

পরিচ্ছেদ ১২

জীবাণূ

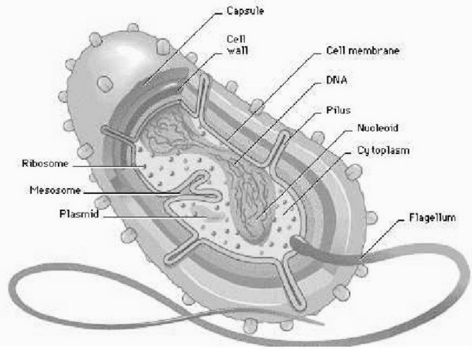
আমরা বস্তুজগতের উপর আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে বায়োলজির দিকে এখন মনোনিবেশ করবো। বস্তু জগতের উপর এ গ্রন্থে বাকী আর যা বলার আছে তা হলো জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব বা **কজমোলজি।** এই জটিল বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে আগে জেনে নিই কিভাবে আপনার-আমার দেহটি কাজ করে। সুতরাং আসুন আমরা প্রথমেই প্রাকৃতিক একটি ক্ষুদ্র জীবী **বেকটেরিয়া** বা জীবাণূ বলতে কি বুঝায় সেসম্পর্কে কিছুটা তথ্যাদি তলিয়ে দেখি।

প্রত্যেক জীবীর বিল্ডিং ব্লকস্ হচ্ছে **সেল** বা কোষ নামক বস্তু। আমাদের পুরো দেহটি কোষে কোষে পরিপূর্ণ- কোটি কোটি কোষের সমাহার। আমরা একটু পরই কোষ সম্পর্কে আরো জেনে নেবো। এ মুহূর্তে কোষ সম্পর্কে শুধু বলে রাখাই যথেষ্ট- আর এর কারণ হলো আমরা যে প্রাণীর কথা নিয়ে ভাবছি সেই জীবাণূ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত। তবে এদের সংখ্যা অগণিত- এরা সর্বত্র বসবাস করে। আমাদের সঙ্গে তো আছেই- পৃথিবীর উপর, ভেতর, বায়ুমণ্ডল, মহাসাগরের গভীর তলদেশ ইত্যাদি এমন কোন স্থান নেই যা জীবাণূমুক্ত। তারা সব জায়গায় বিচরণ করছে কিন্তু তাদের আয়তন এতোই ছোট্ট যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কেউ তাদেরকে দেখতে পায় না।

আগেই বলেছি জীবাণূরা অতি ক্ষুদ্রকায় জীবী। এবার শোনে নিন তাদের আয়তন কতো অল্প। বিজ্ঞানীরা **মাইক্রোমিটার** নামক একটি ছোট্ট **ইউনিট** দ্বারা এদের সাইজ নির্ণয় করেন। এক **মাইক্রোমিটার** হলো ০.০০০০০০১ মিটার বা ০.০০০৩৯ ইঞ্চি। এখন একটি জীবাণূর দৈর্ঘ্য **১ মাইক্রোমিটার** মাত্র। আপনি যদি কয়েক লক্ষ জীবাণূ একত্রিত করেন তাহলে তারা কলম দিয়ে অঙ্কিত একটি ছোট্ট পয়েন্টের মধ্যে স্থান করে নিবে।

এতো গেলো তাদের আয়তনের ধারণা। এবার জেনে নিন এরা দেখতে কেমন। সাধারণত তিন ধরনের জীবাণূ পাওয়া যায় - চক্রাকার, বোতল খোলার স্ক্রু এর মতো

পেঁচানো ও রডের মতো লম্বাকৃতির। এদের প্রতিটিই কিন্তু একেকটি **সেল** বা কোষ। কোষের বাইরে একটি দেয়াল আছে যা একে রক্ষা করে। ভেতরে **'ডিওক্সিরিবোনিউক্লিয়িক এসিড'** (সংক্ষেপে **ডিএনএ**) নামক কিছু বস্তু ভেসে বেড়ায়। কোন কোন জীবাণূর মধ্যে আবার লেজের মতো একটি বস্তু জড়িত থাকে। বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন, **ফ্লাগেলা**। ক্ষুদা মেটাতে যেয়ে জীবাণূটি এই ফ্লাগেলার মাধ্যমে চলতে পারে খাদ্যের খোঁজে। এছাড়া সম্ভাব্য দুশমনদের হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও জীবাণূরা এটির মাধ্যমে পালাতে পারে। নীচের চিত্রে আমরা জীবাণূর বিভিন্ন অংশ দেখতে পাচ্ছি। জীবাণূ শব্দটি শোনলে আমরা কিছুটা ভয় পাই। এর কারণ হলো জীবাণূর মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে। তবে সবাই এরূপ মারাত্মক তা কিন্তু মোটেই নয়। কিছু কিছু জীবাণূ আছে যাদের সাহায্য ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকাই মুশকিল হবে। আমাদের খাবার যখন পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছে তখন এক ধরনের জীবাণূ এই খাদ্যকে পাক বা **ডাইজেস্ট** করতে সাহায্য করে। অনেক জীবাণূ আছে, যেগুলো আসলে রোগের প্রতিরোধ কার্যে নিয়োজিত থেকে আমাদেরকে রোগমুক্ত রাখছে। কিছু মাটির নীচে বাসকারী জীবাণূ আছে যারা বৃক্ষলতাকে সাহায্য করে থাকে। এরা মৃত প্রাণীদেরকে ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় এবং প্রাণী থেকে নির্গত মল-মূত্রকেও মাটিতে পরিণত করে ছাড়ে। ক্ষয় যাওয়া বস্তু থেকে জীবাণূরা সৃষ্টি করে **কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস**। আরো কিছু জীবাণূ আছে যাদের কাজ হলো বাতাস থেকে **নাইট্রোজেন গ্যাস** আহরণ করতে বৃক্ষাদিকে সাহায্য করা। জানা থাকা প্রয়োজন যে, বৃক্ষ-তরু-লতা **কার্বন ডাইওক্সাইড** ও **নাইট্রোজেন গ্যাস** ছাড়া বাঁচবে না।



একটি সাধারণ বেক্টেরিয়া

তবে হ্যাঁ, অনেক জীবাণূ আছে যেগুলোর নামের পূর্বে একটি অতিরিক্ত শব্দ আমরা যোগ করে থাকি- তা হলো রোগ। রোগ জীবাণূ দ্বারা আমরা প্রায়ই আক্রান্ত হয়ে পড়ি। সতর্কতা অবলম্বন করলে অবশ্য অনেকটা নিরাপদ থাকা যায়। রোগ জীবাণূই খাদ্যের মাধ্যমে বিষক্রিয়া **(ফুড পয়জোনিং),**

নিউমোনিয়া, টিবি এবং আরো অনেক ধরনের রোগের জন্য দায়ী। কিছু জীবাণূ আছে যাদের কাজ হলো আপনার আমার সুন্দর দাঁতগুলো নষ্ট করা। এছাড়া রোগ জীবাণূ দ্বারা বৃক্ষ-লতা ও পশু-পক্ষীরা রোগাক্রান্ত হতে পারে।

এবার জেনে নিন জীবাণূরা কিভাবে বেড়ে ওঠে। আসলে এদের বৃদ্ধির হার খুব উঁচু- একটি জীবাণূ বিভক্ত হয়ে দু'টিতে পরিণত হতে মাত্র ক'মিনিট সময় লাগে। এরপর এই দু'টি বিভক্ত হয়ে চারটি, চারটি বিভক্ত হয়ে আটটি এভাবে দ্রুত জীবাণূর সংখ্যা মিলিয়ন-বিলিয়নে গিয়ে পেঁছে যায়। তবে সুখের বিষয় যে বেঁচে থাকতে যেয়ে জীবাণূরা খাদ্যের জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতা করে, ফলে জীবাণূ দ্বারা পুরো বিশ্বটা একেবারে ছেয়ে যাচ্ছে না। যদি মুক্তভাবে এরা বাড়তে পারতো তাহলে এ গ্রহটি একমাত্র তাদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। তখন আমরা কিভাবে বেঁচে থাকতে পারতাম তা একমাত্র আল্লাহ্ মা'লুম।

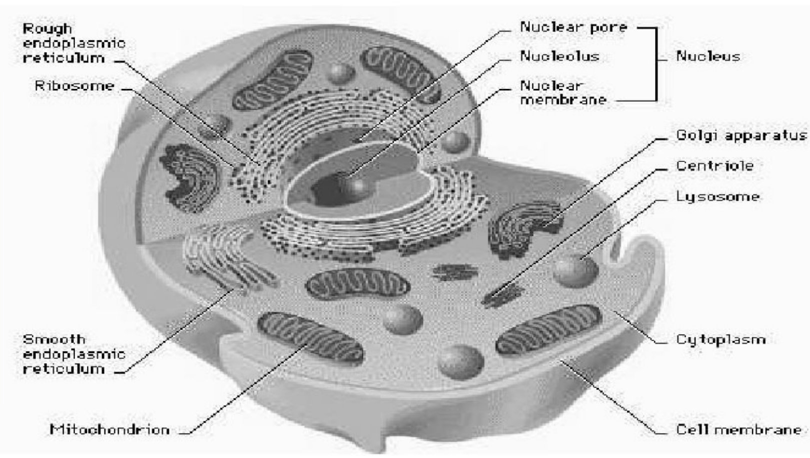
আপনি জানেন কি: আমাদের দেহকে বিদেশী হয়েনাদের আক্রমণ ও দখল থেকে মুক্ত রাখতে একদল সৈন্য সর্বদা ডিউটি দিচ্ছে। এরা হলো কোষ, **মলিকিউল** ও বিভিন্ন দেহযন্ত্রাদি। এই ডিফেন্স সিস্টেমকে বলে **'ইমিউন সিস্টেম'** বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বিদেশী দখলদারদের যারা দেহে রোগ ছড়াতে পারে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জীবাণূ, **ভাইরাস** ও **ফাঙ্গি**। **ইমিউন সিস্টেম** এগুলোর সন্ধান পেলেই আক্রমণ চালিয়ে এদের নির্মুল করে দেয়। আমাদের স্বাস্থ্য অনেকটা এই আত্মরক্ষামূলক ডিফেন্স সিস্টেমের শক্তি কতটুকু আছে তার উপর নির্ভরশীল।

পরিচ্ছেদ ১৩

সেল বা কোষ

আগের পরিচ্ছেদে আমরা জীবাণূ সম্পর্কে জেনে নিয়েছি। আমরা এখন জানি প্রতিটি জীবাণূ মূলত একেকটি কোষ বা **সেল**। জীবাণূদের **সেল** ও সাধারণ সেলে কিন্তু পার্থক্য বিদ্যমান। **সেল** বা কোষ দ্বারা সকল প্রাণীর দেহকাঠামো তৈরী হয়েছে। কোষকে না বুঝলে আমরা দেহকে বুঝতে পারবো না।

আপনার আমার দেহে যে কোষ আছে ওগুলো খুব ছোট্ট। তবে কোন কোনটি খুব বড়োও আছে, যেমন পাখীর ডিম। এসব ডিম মূলত বিরাট আয়তনের একক কোষ। আমরা জেনে নিলাম **সেল** বা কোষের আয়তন। এবার আমাদেরকে জানতে হবে এসব সেলের কাজ কি? এগুলো দেখতে কেমন ও কিভাবে বেঁচে থাকে ইদ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকাও দরকার।



কোষ বা সেলের বিভিন্ন অংশ

আসলে প্রতিটি **সেল** একেকটি জীবন্ত প্রাণী। কারণ প্রত্যেক সেলের জন্ম-মৃত্যু, খাদ্য গ্রহণ, বর্জ্য ফেলে দেওয়া ও নতুন প্রজন্ম সৃষ্টির ক্ষমতা আছে। এসব কার্যাদি মূলত **'প্রাণী'** বলতে যা বুঝায় তার জন্য শর্তাবলী। **বেকটেরিয়া** বা জীবাণূরা হলো **ইউনিসেলুলার** প্রাণী অর্থাৎ, এরা একটি মাত্র কোষের দ্বারা সৃষ্ট। বৃক্ষ, পশু-পক্ষী ও মানুষসহ সকল জাতের জীব-জন্তু হলো **মাল্টিসেলুলার** প্রাণী অর্থাৎ, এরা মিলিয়ন-বিলিয়ন কোষের সমন্বয়ে সৃষ্ট। এ ক্ষেত্রে কোষগুলো একত্রে মিলেমিশে তাদের কার্যাদি সম্পাদন করে। প্রথমোক্ত **ইউনিসেলুলার** প্রাণী ঐ একটি মাত্র বিশেষ কোষ ও তার যাবতীয় কার্যাদিকেই বুঝায়।

কোষের দ্বারাই প্রাণী ও বৃক্ষরাজি বেঁচে থাকে। আমাদের পুরো দেহকাঠামোই মূলত কোষের তৈরী। বিভিন্ন সেলের বিভিন্ন **ফাংশন** বা ডিউটি আছে। মানব দেহ ২০ থেকে ৩০ ট্রিলিয়ন (এক হাজার বিলিয়ন সমান এক ট্রিলিয়ন) কোষের সমষ্টি। কয়েকটি ভিন্ন জাতের কোষ আছে যাদের দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশ সৃষ্ট। যেমন একটি বিশেষ গ্রুপের **সেল** আছে যার মধ্যে কয়েক দশক ভিন্ন **সেল** একত্রে কাজ করে- বিজ্ঞানের ভাষায় এই গ্রুপটির নাম **টিস্যু**। শরীরের হাড্ডিগুলো মূলত এরূপ **টিস্যু** দ্বারা গঠিত। এছাড়া দেহের সকল যন্ত্রাংশ যেমন হৃদযন্ত্র **(হার্ট)**, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক ইত্যাদি **টিস্যু** জাতীয় সেলের তৈরী। পেশী ও **নার্ভ সেল** কিছুটা ভিন্ন। তবে মৌলিকভাবে সকল কোষেরই কিছু বস্তু ও তাদের কার্যাদি প্রায় একই ধরনের বলেই দেখা যায়। সুতরাং আমরা যদি এক দু'টো কোষ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই তাহলেই প্রাণী ও উদ্ভিদ এই উভয়বিদ জীবনের বিল্ডিং ব্লক্স- কোষ সম্পর্কে আমাদের বেসিক ধারণা জন্ম নেবে।

প্রতিটি সেলের মাঝখানে বাস করে তার কমান্ড হেডকোয়ার্টার ও তথ্য লাইব্রেরী। এই **সেন্ট্রাল** বস্তুকে বলে **'সেল নিউক্লিয়াস'**। এতে আছে **জিনেটিক** তথ্যাদি যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত চলন্ত। পুরো সেলের **১০% ভলিউম** নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান। **ডিএনএ মলিকিউল** নিউক্লিয়াসে বাস করে যাতে আছে **জিনেটিক** তথ্যাদি।

উপরের (৮৯ পৃষ্ঠার) ছবিতে একটি **সেল** ও এর বিভিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে। আমরা এবার এসব অংশের মৌলিক **ফাংশন** সম্পর্কে যেটুকু সম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা

চালাচ্ছি। সেলটি **'মেমব্রেন'** দ্বারা আবৃত যার কাজ হলো সেলকে অপ্রীতিকর বস্তুর হামলা থেকে রক্ষা করা। আমরা ইতোমধ্যে **'নিউক্লিয়াস'** সম্পর্কে বলেছি। **'মিটাকোন্ড্রিয়া'** সেলের জন্য প্রয়োজনীয় **এনার্জি** বা শক্তির যোগান দেয়। **'রিবোসাম্‌স' প্রটিন** নামক গুরুত্বপূর্ণ **রসায়নিক** বস্তু তৈরী করে। **রিবোসাম্‌স** বাস করে **'রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকোলামে'**। **'গোলজি এপারেটাস'** এর কাজ হলো **প্রটিন** সংস্কার, প্যাকেজকরণ ও যাতায়াত ব্যবস্থার আঞ্জাম দেওয়া। **'লাইসোসাম'** এর কাজ হলো **'এনযাইম'** নামাক বস্তুকে জমা করে রাখা যা খাদ্য হজম করার জন্য জরুরী।

আমরা ইতোমধ্যে প্রাণীজীবনের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক **'সেল'** বা কোষের পরিচিতিমূলক কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছি। আসলে **সেল** হচ্ছে প্রভুর সৃষ্ট এক অপূর্ব বস্তু। প্রতিটি **সেল** একটি প্রাণীর জীবনব্যাপী তার কার্যাদি আঞ্জাম দিচ্ছে। অবশ্য সেলের বয়স আর প্রাণীর বয়স সমান নয়- কিন্তু **সেল** মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বে সে এটা নিশ্চিত করে যায় যে তার মতো আরেকটি **সেল** যেন কার্যাদি অব্যাহত রাখে। যে উপায়ে সে নতুন সেলের জন্ম দেয় তাহলো ডিভিশন বা ভাগ। **সেল** বিভক্ত হয়ে নতুন আরেকটি সৃষ্টি হয়। এভাবে প্রাণীর জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত **সেল-ডিভিশন** হতে থাকে।

আপনি জানেন কি: পুঁজ আপনার জন্য বিরাট উপকার করে। এগুলো আসলে সাদা রক্ত কোষ। এদের কাজ হলো যেখানেই **ইনফেকশন** থাকে সেখানে ছুটে আসা ও ক্ষতিকর দখলদার বাহিনীকে হত্যা করা। তাদের হাতিয়ার হলো বিষজাতীয় বস্তু। অবশ্য এই বিষের প্রতিক্রিয়ায় তারা নিজেরাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সুতরাং পুঁজ হলো **'সুয়িসাইড মিশনারী'** একদল কোষ। আশারাখি পুঁজকে এখন থেকে সুদৃষ্টিতে দেখবেন!

পরিচ্ছেদ ১৪

রসায়নিক পদার্থ

আমরা এবার স্বভাবের মৌলিক বস্তু পদার্থ নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি। তবে বলে রাখি, পদার্থবিজ্ঞান (ইংরেজীতে **ফিজিক্স**) এর উপর এ মুহূর্তে বিশদ ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য নয়। বাস্তবে ইতোমধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক শাখা-প্রশাখার উপর আলোচনা হয়ে গেছে। এখানে যা বলার তা হলো **কেমিক্যাল** বা **রসায়নিক** দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থের উপর আলোচনা। মূলত আমরা মৌলিক পদার্থের পরিচিতিমূলক প্রখ্যাত **ডাটা-টেবিল 'পিরিওডিক টেবিল'** এর উপর বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরবো। তবে প্রথমে পদার্থ বলতে কি বুঝায় সেটা জানা দরকার।

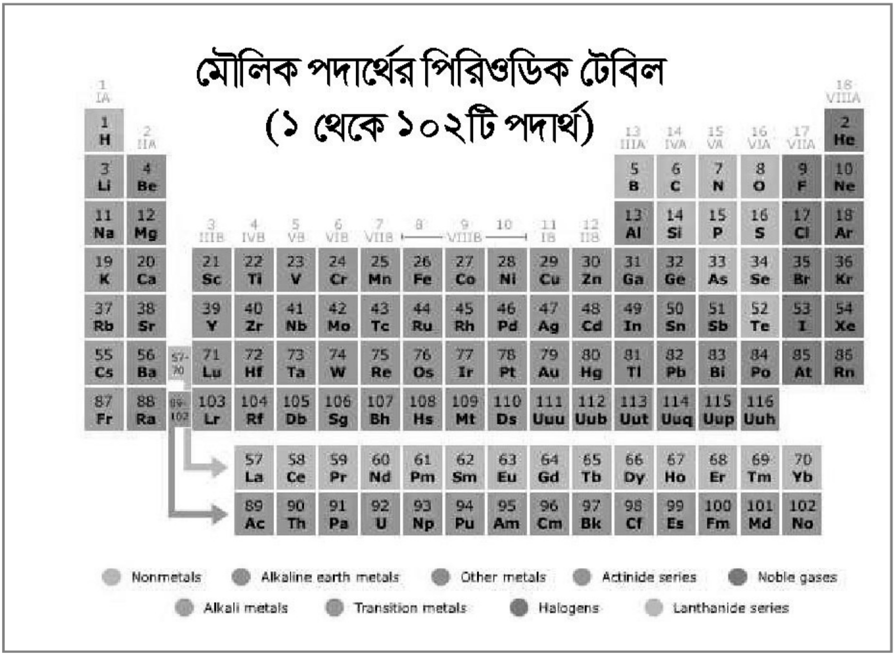
যেসব বস্তু **রসায়ন** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙ্গে বিভক্ত করা কিংবা পরিবর্তন সম্ভব নয় ওগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক **কেমিক্যাল ইলেমেন্টস্** বা **রসায়নিক** পদার্থ। একসময় বিজ্ঞানীরা মনে করতেন পদার্থই স্বভাবের ক্ষুদ্রতম অংশ কিন্তু পরে জানা গেছে, পদার্থও মূলত আরোও ক্ষুদ্রতম একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এসব বস্তুকে সার্বিকভাবে **'ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল্স'** বা মৌলিক কণা বলে। আমরা ইতোমধ্যে এগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি যেমন, **এটম, ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রটন, পজিট্রন, ক্যুয়ার্ক** ইত্যাদি। এ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান শতাধিক মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। পুরো বিশ্বটাই এসব পদার্থ দ্বারা গঠিত। কিছু কিছু পদার্থ আছে যেগুলো শুধুমাত্র কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারে সৃষ্টি করা যায় মাত্র। এগুলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'ট্রান্সসুরানিয়াম ইলেমেন্ট'** বলে। নিম্নের **'পিরিওডিক টেবিল'** এর উপর আলোচনায় যেয়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

রসায়নিক পদার্থ দু ধরনের হয়ে থাকে, যথাঃ- **১. মেটালস্** বা ধাতু ও **২. নন-মেটাল্স** বা অ-ধাতব। তবে একদল পদার্থ আছে যেগুলো এ উভয় দল থেকে কিছুটা ভিন্ন। এদের গুণাগুণ মধ্যম ধরনের হওয়ায় এগুলোকে **'মেটালয়েডস্'** বলা হয় এবং কেউ কেউ এগুলোকে মৌলিক পদার্থের তৃতীয় দল বলেও আখ্যা দিয়েছেন। যা হোক, ধাতু ও অ-ধাতব পদার্থগুলোর একটি গুণ হলো, একটির **'ইলেকট্রপজিটিভ' এটম**

অপরটির **'ইলেকট্রনেগিটিভ'** এটমের সঙ্গে সহজেই মিলিত হয়ে **'কম্পাউন্ড'** বা যুক্ত পদার্থ গঠিত হতে পারে। প্রাকৃতিকভাবে বিদ্যমান পদার্থ সম্পর্কে অতিরিক্ত জানতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই **পিরিওডিক টেবিল** এর উপর ওয়াকিফহাল হতেই হবে। আসুন, এবার সে টেবিলটির উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাই।

পিরিওডিক টেবিল অব ইলেমেন্ট

আগেই বলেছি, এ টেবিলে স্বভাবের সকল মৌলিক বস্তু পদার্থকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। এ টেবিলে প্রতিটি পদার্থের অনেক তথ্যাদি দেওয়া আছে। নিম্নে আমরা **পিরিওডিক** টেবিলের ছবি তুলে ধরেছি। লক্ষ্য করুন একেকটি গ্রুপকে কিভাবে একেকটি আলাদা গ্রেস্কেল শেড দ্বারা অঙ্কিত করা হয়েছে। টেবিলের নীচে প্রতিটি ইলেমেন্টের উপর আরোও বিস্তারিত তথ্য দিয়েছি। এ থেকে এটাই আশা করছি যে, পাঠকরা সহজেই যে কোন পদার্থ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।



এটমিক নং	নাম আবিষ্কার বছর	সংকেত	**এটমিক** ওজন	গ্রুপ
১	**হাইড্রোজেন** (উদ্‌জান) ১৭৬৬	H	১.০০৭৯	অ-ধাতব
২	**হিলিয়াম** ১৮৬৮	He	৪.০০২৬	**নোবল** গ্যাস
৩	লিথিয়াম ১৮১৭	Li	৬.৯৪১	আলকালি ধাতু
৪	বেরিলিয়াম ১৭৯৮	Be	৯.০১২২	আলকালি আর্থ ধাতু
৫	বোরোন ১৮০৮	B	১০.৮১	অ-ধাতব
৬	**কার্বন** (অঙ্গারব) আদি যুগ	C	১২.০১১	অ-ধাতব
৭	নাইট্রোজেন ১৭৭২	N	১৪.০০৬৭	অ-ধাতব
৮	**অক্সিজেন** (অম্□জান) ১৭৭৪	O	১৫.৯৯৯৪	অ-ধাতব
৯	ফ্লোরিন ১৭৭১	F	১৮.৯৯৮৪	হলোজেন
১০	নিয়ন ১৮৯৮	Ne	২০.১৭৯৮	**নোবল** গ্যাস
১১	সোডিয়াম ১৮০৭	Na	২২.৯৮৯৮	আলকালি ধাতু
১২	মেগনেসিয়াম ১৭৫৫	Mg	২৪.৩০৫১	আলকালি আর্থ ধাতু
১৩	এলুমিনিয়াম ১৮২৪	Al	২৬.৯৮১৫	অন্য ধাতু

১৪	সিলিকন ১৮২৩	Si	২৮.০৮৫৫	অ-ধাতব
১৫	ফসফোরাস ১৬৭৪	P	৩০.৯৭৩৮	অ-ধাতব
১৬	সলফার (গন্ধক) আদি যুগ	S	৩২.০৬৭	অ-ধাতব
১৭	ক্লোরিন ১৭৭৪	Cl	৩৫.৪৫২৮	হালোজেন
১৮	আরগন ১৮৯৪	Ar	৩৯.৯৪৮	**নোবল** গ্যাস
১৯	পটাসিয়াম ১৮০৭	K	৩৯.০৯৮৩	আলকালি ধাতু
২০	ক্যালসিয়াম (খটিক) ১৮০৮	Ca	৪০.০৭৮	আলকালি আর্থ ধাতু
২১	স্কানডিয়াম ১৮৭৬	Sc	৪৪.৯৫৫৯	ট্রানজিশন ধাতু
২২	টিটানিয়াম ১৭৯০	Ti	৪৭.৮৬৭	ট্রানজিশন ধাতু
২৩	ভানাডিয়াম ১৮০১	V	৫০.৯৪১৫	ট্রানজিশন ধাতু
২৪	ক্রোমিয়াম ১৭৯৭	Cr	৫১.৯৯৬২	ট্রানজিশন ধাতু
২৫	মেঙ্গানিজ ১৭৭৪	Mn	৫৪.৯৩৮	ট্রানজিশন ধাতু
২৬	আয়রন (লৌহ) আদি যুগ	Fe	৫৫.৮৪৫	ট্রানজিশন ধাতু
২৭	কোবল্ট ১৭৩০	Co	৫৮.৯৩৩২	ট্রানজিশন ধাতু

২৮	নিকেল ১৭৫১	Ni	৫৮.৬৯৩৪	ট্রানজিশন ধাতু
২৯	কোপার (তামা) আদি যুগ	Cu	৬৩.৫৪৬	ট্রানজিশন ধাতু
৩০	জিন্‌ক (দস্তা) আদি যুগ	Zn	৬৫.৪০৯	ট্রানজিশন ধাতু
৩১	গালিয়াম ১৮৭৫	Ga	৬৯.৭২৩	অন্য ধাতু
৩২	জার্মেনিয়াম ১৮৮৬	Ge	৭২.৬১	অন্য ধাতু
৩৩	আর্সেনিক আদি যুগ	As	৭৪.৯২১৬	অ-ধাতব
৩৪	সেলিনিয়াম ১৮১৭	Se	৭৮.৯৬	অ-ধাতব
৩৫	ব্রমিন ১৮২৬	Br	৭৯.৯০৪	হালোজেন
৩৬	ক্রিপটন ১৮৯৮	Kr	৮৩.৭৯৮	**নোবল** গ্যাস
৩৭	রুবিডিয়াম ১৮৬১	Rb	৮৫.৪৬৭৮	আলাকালি ধাতু
৩৮	স্ট্রনটিয়াম ১৮০৮	Sr	৮৭.৬২	আলকালি আর্থ ধাতু
৩৯	ইট্রিয়াম ১৭৯৪	Y	৮৮.৯০৬	ট্রানজিশন ধাতু
৪০	জারকোনিয়াম ১৭৮৯	Zr	৯১.২২৪	ট্রানজিশন ধাতু
৪১	নাইওবিয়াম ১৮০১	Nb	৯২.৯০৬৪	ট্রানজিশন ধাতু

৪২	মলিবডেনাম ১৭৮১	Mo	৯৫.৯৪	ট্রানজিশন ধাতু
৪৩	টেকনেশিয়াম ১৯৩৭	Tc	(৯৮)	ট্রানজিশন ধাতু
৪৪	রুথিনিয়াম ১৮২৭	Ru	১০১.০৭	ট্রানজিশন ধাতু
৪৫	রডিয়াম ১৮০৪	Rh	১০২.৯০৫৫	ট্রানজিশন ধাতু
৪৬	পেলেডিয়াম ১৮০৪	Pd	১০৬.৪২	ট্রানজিশন ধাতু
৪৭	সিলভার (রৌপ্য) আদি যুগ	Ag	১০৭.৮৬৮২	ট্রানজিশন ধাতু
৪৮	ক্যাডমিয়াম ১৮১৭	Cd	১১২.৪১২	ট্রানজিশন ধাতু
৪৯	ইন্ডিয়াম ১৮৬৩	In	১১৪.৮১৮	অন্য ধাতু
৫০	টিন আদি যুগ	Sn	১১৮.৭১১	অন্য ধাতু
৫১	আন্টিমোনি আদি যুগ	Sb	১২১.৭৬০	অন্য ধাতু
৫২	টেলোরিয়াম ১৭৮২	Te	১২৭.৬০	অ-ধাতব
৫৩	আয়োডাইন ১৮১১	I	১২৬.৯০৪৫	হালোজেন
৫৪	জিনোন ১৮৯৪	Xe	১৩১.২৯	**নোবল** গ্যাস
৫৫	সিজিয়াম ১৮৬০	Cs	১৩২.৯০৫৪	আলকালি ধাতু

৫৬	বেরিয়াম ১৮০৮	Ba	১৩৬.৩০২৮	আলকালি আর্থ ধাতু
৫৭	লানথেনাম ১৮৩৯	La	১৩৮.৯০৫৫	লানথেনাইড সিরিজ
৫৮	সিরিয়াম ১৮০৪	Ce	১৪০.১১৫	লানথেনাইড সিরিজ
৫৯	প্রাইজিওডিনিয়াম ১৮৮৫	Pr	১৪০.৯০৮	লানথেনাইড সিরিজ
৬০	নিওডিনিয়াম ১৮৮৫	Nd	১৪৪.২৪	লানথেনাইড সিরিজ
৬১	প্রমিথিয়াম ১৯৪৫	Pm	(১৪৫)	লানথেনাইড সিরিজ
৬২	সামারিয়াম ১৮৭৯	Sm	১৫০.৩৬	লানথেনাইড সিরিজ
৬৩	ইউরোপিয়াম ১৯০১	Eu	১৫১.৯৬৬	লানথেনাইড সিরিজ
৬৪	গ্যাডোলিনিয়াম ১৮৮৬	Gd	১৫৭.২৫	লানথেনাইড সিরিজ
৬৫	টারবিয়াম ১৮৪৩	Tb	১৫৮.৯২৫৩	লানথেনাইড সিরিজ
৬৬	ডিসপ্রোজিয়াম ১৮৮৬	Dy	১৬২.৫০০	লানথেনাইড সিরিজ
৬৭	হলমিয়াম ১৮৭৯	Ho	১৬৪.৯৩০৩	লানথেনাইড সিরিজ
৬৮	এরবিয়াম ১৮৪৩	Er	১৬৭.২৬	লানথেনাইড সিরিজ
৬৯	তুলিয়াম ১৮৭৯	Tm	১৬৮.৯৩৪২	লানথেনাইড সিরিজ

৭০	ইট্রেরবিয়াম ১৮৭৮	Yb	১৭৩.০৪	লানথেনাইড সিরিজ
৭১	লিউটেশিয়াম ১৯০৭	Lu	১৭৪.৯৬৭	ট্রানজিশন ধাতু
৭২	হাফনিয়াম ১৯১৩	Hf	১৭৮.৪৯	ট্রানজিশন ধাতু
৭৩	টানটেলাম ১৮০২	Ta	১৮০.৯৪৮	ট্রানজিশন ধাতু
৭৪	টাংস্টেন ১৭৮৩	W	১৮৩.৮৪	ট্রানজিশন ধাতু
৭৫	রেনিয়াম ১৯২৫	Re	১৮৬.২০৭	ট্রানজিশন ধাতু
৭৬	অজমিয়াম ১৮০৪	Os	১৯০.২৩	ট্রানজিশন ধাতু
৭৭	ইরিডিয়াম ১৮০৪	Ir	১৯২.২১৭	ট্রানজিশন ধাতু
৭৮	প্লাটিনাম ১৫৫৭	Pt	১৯৫.০৮	ট্রানজিশন ধাতু
৭৯	গোল্ড (স্বর্ণ) আদি যুগ	Au	১৯৬.৯৬৬৫	ট্রানজিশন ধাতু
৮০	মারকারি (পারদ) আদি যুগ	Hg	২০০.৫৯	ট্রানজিশন ধাতু
৮১	থালিয়াম ১৮৬১	Tl	২০৪.৩৮৩৩	অন্য ধাতু
৮২	লেড (সীসা) আদি যুগ	Pb	২০৭.২	অন্য ধাতু
৮৩	বিজমাথ আদি যুগ	Bi	২০৮.৯৮০৪	অন্য ধাতু

৮৪	পলোনিয়াম ১৮৯৮	Po	(২০৯)	অন্য ধাতু
৮৫	আসটাটিন ১৯৪০	At	(২১০)	হ্যালোজেন
৮৬	রেডন ১৯০০	Rn	(২২২)	নোবল গ্যাস
৮৭	ফ্রান্সিয়াম ১৯৩৯	Fr	(২২৩)	আলাকালি ধাতু
৮৮	রেডিয়াম ১৮৯৮	Ra	(২২৬)	আলাকালি ধাতু
৮৯	এক্টিনিয়াম ১৮৯৯	Ac	(২২৭)	এক্টিনাইড সিরিজ
৯০	থোরিয়াম ১৮২৯	Th	২৩২.০৩৮১	এক্টিনাইড সিরিজ
৯১	প্রটাকটিনিয়াম ১৯১৩	Pa	২৩১.০৩৬	এক্টিনাইড সিরিজ
৯২	ইউরেনিয়াম ১৭৮৯	U	২৩৮.০২৮৯	এক্টিনাইড সিরিজ
৯৩	নেপটুনিয়াম ১৯৪০	Np	(২৩৭)	এক্টিনাইড সিরিজ
৯৪	প্লুটোনিয়াম ১৯৪০	Pu	(২৪৪)	এক্টিনাইড সিরিজ
৯৫	আমেরিসিয়াম ১৯৪৪	Am	(২৪৩)	এক্টিনাইড সিরিজ
৯৬	কিউরিয়াম ১৯৪৪	Cm	(২৪৭)	এক্টিনাইড সিরিজ
৯৭	বারকেলিয়াম ১৯৪৯	Bk	(২৪৭)	এক্টিনাইড সিরিজ

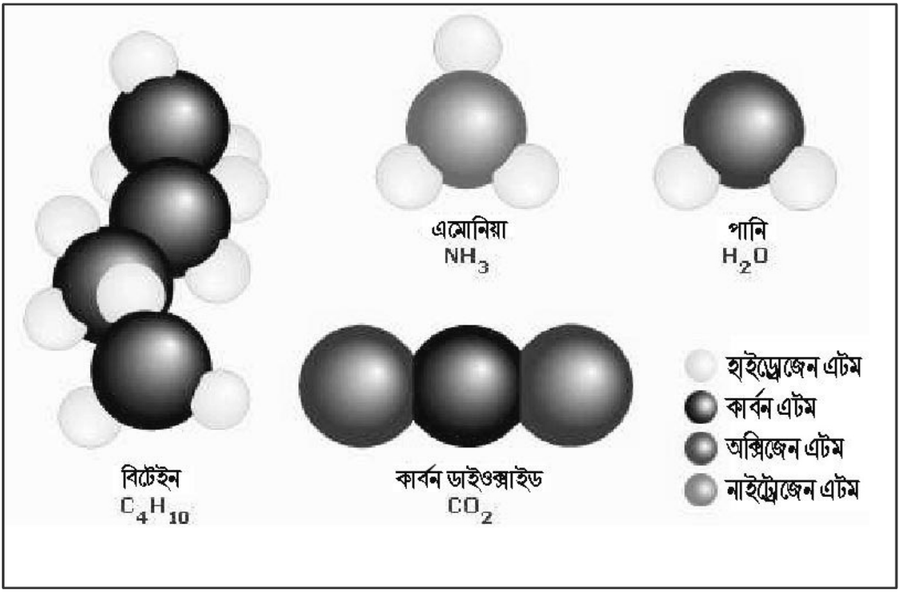
৯৮	কালিফোর্নিয়াম ১৯৫০	Cf	(২৫১)	এক্টিনাইড সিরিজ
৯৯	আইনস্টেনিয়াম ১৯৫২	Es	(২৫২)	এক্টিনাইড সিরিজ
১০০	ফার্মিয়াম ১৯৫৫	Fm	(২৫৭)	এক্টিনাইড সিরিজ
১০১	মেন্ডেলেভিয়াম ১৯৫৫	Md	(২৫৮)	এক্টিনাইড সিরিজ
১০২	নবেলিয়াম ১৯৫৮	No	(২৫৯)	এক্টিনাইড সিরিজ
১০৩	লরেনসিয়াম ১৯৬১	Lr	(২৬০)	ট্রানজিশন ধাতু
১০৪	রাদারফোর্ডিয়াম ১৯৬৯	Rf	(২৬১)	ট্রানজিশন ধাতু
১০৫	ডাবনিয়াম ১৯৭০	Db	(২৬২)	ট্রানজিশন ধাতু
১০৬	সিবোর্জিয়াম ১৯৭৪	Sg	(২৬৬)	ট্রানজিশন ধাতু
১০৭	বোরিয়াম ১৯৭৬	Bh	(২৬২)	ট্রানজিশন ধাতু
১০৮	হাসিয়াম ১৯৮৪	Hs	(২৬৩)	ট্রানজিশন ধাতু
১০৯	মেইটনারিয়াম ১৯৮২	Mt	(২৬৮)	ট্রানজিশন ধাতু
১১০	ডামস্টেডটিয়াম ১৯৯৪	Ds	(২৭১)	ট্রানজিশন ধাতু
১১১	আনুনিউনিয়াম ১৯৯৪	Uuu	(২৭২)	ট্রানজিশন ধাতু

১১২	আনউনবিয়াম ১৯৯৬	Uub	(২৭৭)	ট্রানজিশন ধাতু
১১৪	আনউনকোয়াডিয়াম ১৯৯৮	Uuq	(২৮৫)	ট্রানজিশন ধাতু
১১৬	আনউনহেক্সিয়াম ২০০০	Uuh	(২৯২)	ট্রানজিশন ধাতু

(উপরের টেবিলে **১১৩** ও **১৫৫** এ দু'টি **এটমিক** সংখ্যা অনুপস্থিত। এর কারণ হলো এখনও এ দু'টো নাম্বারযুক্ত পদার্থ আবিষ্কার হয় নি।)

মলিকিউল

প্রাকৃতিকভাবে অস্তিত্বশীল সকল বস্তুই একাধিক অণুর সমন্বয়ে গঠিত অসংখ্য ছোট্ট বস্তুর সমষ্টি, যার নাম হলো **'মলিকিউল'**। আমরা সব সময় বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একাধিক গুণাগুণ লক্ষ্য করে থাকি। কোনটা কঠিন, কোনটা তরল ও কোনটা গ্যাস। বস্তুর মধ্যে ভিন্নতা ও ভিন্ন গুণাগুণ নির্ভর করে কিভাবে এর মলিকিউলগুলো গঠিত।



জগতব্যাপী কোটি কোটি ভিন্ন **মলিকিউল** আছে। তবে কিছু আছে যাদের **এটম** একই ধরনের। যেমন অক্সিজেনের মলিকিউলে আছে দু'টি মাত্র **অক্সিজেন এটম।** মলিকিউলের এটমসমূহ একটি আরেকটির সাথে খুব শক্তভাবে জড়ো হয়ে থাকে যাকে বলে **কেমিক্যাল বন্ড**। ভিন্ন একাধিক এটমের তৈরী **মলিকিউল** হতে পারে। এরূপ মলিকিউলকে বলে **কম্পাউন্ড** পদার্থ বা যুক্ত পদার্থ। দৃষ্টন্ত স্বরূপ আমরা পানির কথা বলতে পারি। পানি একটি যুক্ত পদার্থ। এতে আছে দু'টি **হাইড্রোজেন এটম** ও একটি **অক্সিজেন এটম। কেমিক্যালী** আমরা পানির মলিকিউলের **ফর্মুলা** লিখি এভাবে: $\mathbf{H_2O}$। লক্ষ করুন, এইচ এর সঙ্গে সংখ্যা ২ **সাবস্ক্রিপ্ট** হিসেবে লিখে বুঝাতে চেয়েছি যে পানির **মলিকিউল** গঠিত হয়েছে দু'টি **হাইড্রোজেন এটম** এবং একটি মাত্র **অক্সিজেন এটম** নিয়ে। বুঝে নিন, একটি মাত্র **এটম** হলে আর **সাবস্ক্রিপ্ট** দিয়ে সংখ্যা ১ দেখানোর প্রয়োজন নেই। অন্যান্য কিছু কমন **মলিকিউল** হলো: ১. NH_3 **(এমোনিয়া),** ২. C_4H_{10} **(বুটেন)** ও ৩. CO_2 **(কার্বন ডায়োক্সাইড)** ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এসব ফর্মুলায় ব্যবহৃত N হচ্ছে **নাইট্রোজেন,** O **অক্সিজেন,** H **হাইড্রোজেন** ও C হলো **কার্বন** এর সংকেত (দেখুন **পিরিওডিক টেবিল**)।

কেমিক্যাল রিয়েকশন বা রসায়নিক প্রতিক্রিয়া

এখন যেহেতু আমরা **মলিকিউল** বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে মোটামুটি জেনে নিয়েছি তাই **রসায়ন** প্রতিক্রিয়ার উপর কিছু কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কোন বিশেষ বস্তুর **রসায়নিক** গুণাগুণ পরিবর্তন করা সম্ভব। বাস্তবে যা হয় তাহলো বস্তুর এটমগুলোকে পরিবর্তন-পরিমার্জন করে অন্যভাবে সাজিয়ে তোলা- এতে এর **মলিকিউলার** অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। **কেমিক্যাল** রিয়েকশনের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হলো লোহার মধ্যে জঙ্গ বা **রাস্ট** ধরা। এই **রাস্ট** বাস্তবে **কেমিক্যাল** বস্তু **আয়রোন অক্সাইড**। রিয়েকশনটি বাতাসে অবস্থিত **অক্সিজেন** ও লোহার মধ্যে ঘটে থাকে। এই রিয়েকশনের নাম **অক্সিডেশন**। এটাতো গেল স্বাভাবিক রিয়েকশন। **কেমিস্টরা** সর্বদাই বিভিন্ন কৃত্রিম রিয়েকশনের মাধ্যমে নতুন **'সিনথেটিক'** বস্তু তৈরী করে যাচ্ছেন। ঔষধ তৈরীতেও এরূপ **রিয়েকশন** ব্যবহৃত হয়।

রিয়েকশনের ফলে আগুন ধরে। আসলে আগুনে কিছু পুড়ার সময় খুব দ্রুত গতিতে **কেমিক্যাল রিয়েকশন** হয়। তবে এর চেয়ে আরো দ্রুত যে **রিয়েকশন** ঘটে তাহলো

বিস্ফোরণ। অবশ্য কোন কোন **রিয়েকশন** অনেক মন্থরও বটে। উপরে উল্লেখিত **অক্সিডেশন রিয়েকশন** সময় সময় কয়েক বছরে সংঘটিত হতে পারে।

আপনি জানেন কিঃ হীরা ও কয়লা একই উপাদানে সৃষ্ট। হীরা হলো জগতের সর্বাপেক্ষা শক্ত ও মূল্যবান পদার্থ। অপরদিকে কয়লা জ্বালানি থেকে চিত্রকরের ছবি আঁকার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উভয় বস্তুর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান থাকলেও তাদের মৌলিক উপাদান কিন্তু একই- যার নাম **কার্বন**। এই **কার্বন** কিন্তু আপনার-আমার দেহেরও মৌলিক পদার্থ। তাহলে কোন্ কারণে একটি এত শক্ত ও দামী এবং অপরটি এতো নরম ও তুলনামূলকভাবে মূল্যহীন? সবকিছু নির্ভরশীল **কার্বন** মলিকিউলের সজ্জিতকরণের উপর। হীরা ও কয়লার মলিকিউলের মধ্যে তফাৎ থাকায়ই একটি হীরা ও অপরটি কয়লা।

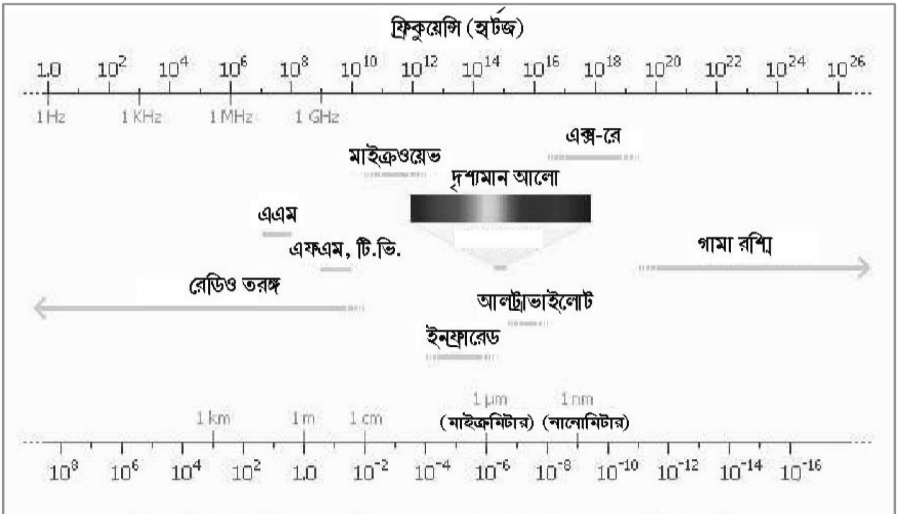
পরিচ্ছেদ ১৫

রং

কতো রংয়ে পরিপূর্ণ আমাদের এই নীল গ্রহটি! নীল আকাশ আর ধূসর মাটির উপর সবুজ বৃক্ষ-তরু-লতা এবং বসন্তের ছোঁয়ায় কী সুন্দর মন-মাতানো সুগন্ধিতে ভরপুর নানা রংয়ের ফুলের ছড়াছড়ি। বাড়ি, গাড়ি ও পারিপার্শ্বিকতায় সর্বত্রই আমরা বিভিন্ন রং দেখতে পাই- বাস্তবে পুরো এ পৃথিবীটাই রংয়ের খেলা। তবে রং আসলে কোন্ জিসিনটির নাম?

একটু পরই আমরা বুঝতে পারবো যে মৌলিক ক'টি মাত্র রংয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে দৃশ্যমান যাবতীয় রং ও কোটি কোটি রংয়ের ছায়া। তবে আরো গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা জেনে নেবো যে, আসলে রং আলোকরশ্মি ও যার উপর সে পতিত হয় তাদের সমষ্টিগত একটি কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

রংকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে আলোক সম্পর্কে জানতে হবে এবং বিশেষকরে আলোকের দৃশ্যমান অংশ কি, তার উপর পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। পুরো এ জগতব্যাপী অসংখ্য তরঙ্গ বিচরণশীল আছে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় **ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন** বা বৈদ্যুতিক-চুম্বকীয় তেজস্ক্রিয়া বলে। তবে এই রেডিয়েশনের অল্প একটি অংশ আমাদের চোখের দৃষ্টির ভেতর বিদ্যমান আছে যাকে বলে '**ভিজিবুল রেঞ্জ**' বা দৃশ্যমান বিস্তৃতি। নীচের ছবিতে আমরা **ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামটি** দেখতে পাচ্ছি।

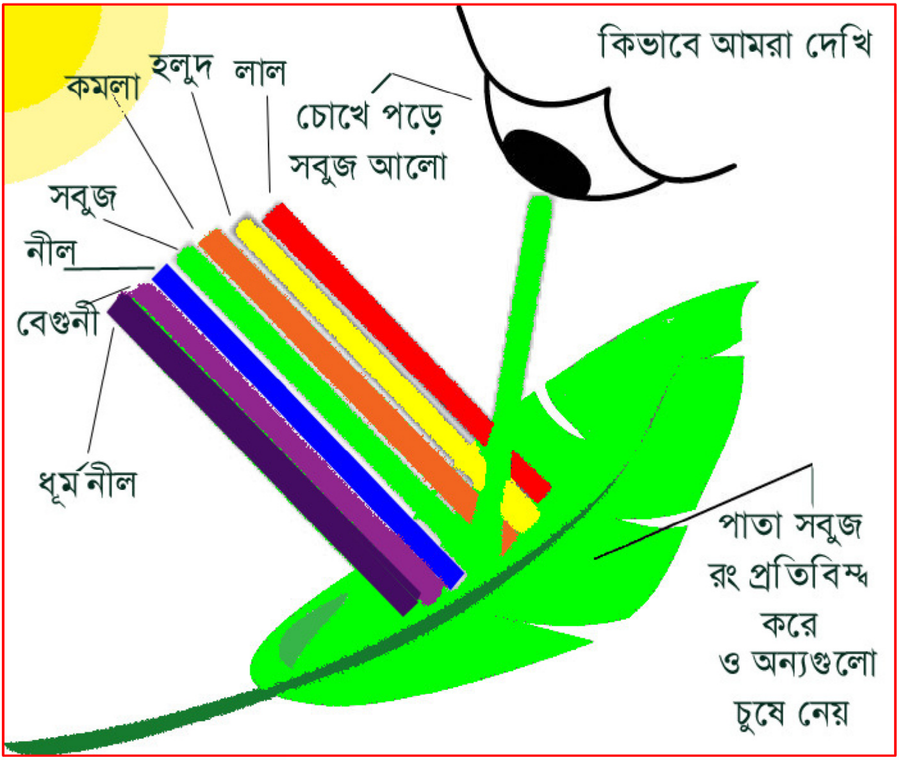


ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামে দৃশ্যমান আলো ও অন্যান্য রশ্মির ব্যাপ্তি

লক্ষণীয় যে আমাদের চোখের আয়ত্বাধীন অংশটি কতো ছোট্ট। এ জগতে আমাদের চোখের দৃষ্টির বাইরে অনেক কিছু আছে। দৃষ্টির ভেতরে আলোকরশ্মিটুকু আবার ৭টি রংয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট। এগুলো হলো লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, ধূর্মনীল ও বেগুনী। সাদা বলতে কোন রং বা আলোকরশ্মি নেই। ইংরেজীতে একটি ছোট্ট বাক্য আছে যা মুখস্ত করে নিলে সহজেই এই নামগুলো মনে থাকবে। বাক্যটি হলো **R**ichard **O**f **Y**ork **G**one to **B**attle **I**n **V**ain। লক্ষ্য করুন **বল্ড** (অতিরিক্ত কালো) অক্ষরগুলো হলো প্রতিটি রংয়ের প্রথম অক্ষর। যথা:- **R**-Red, **O**-Orange, **Y**-Yellow, **G**-Green, **B**-Blue, **I**-Indigo, **V**-Violet।

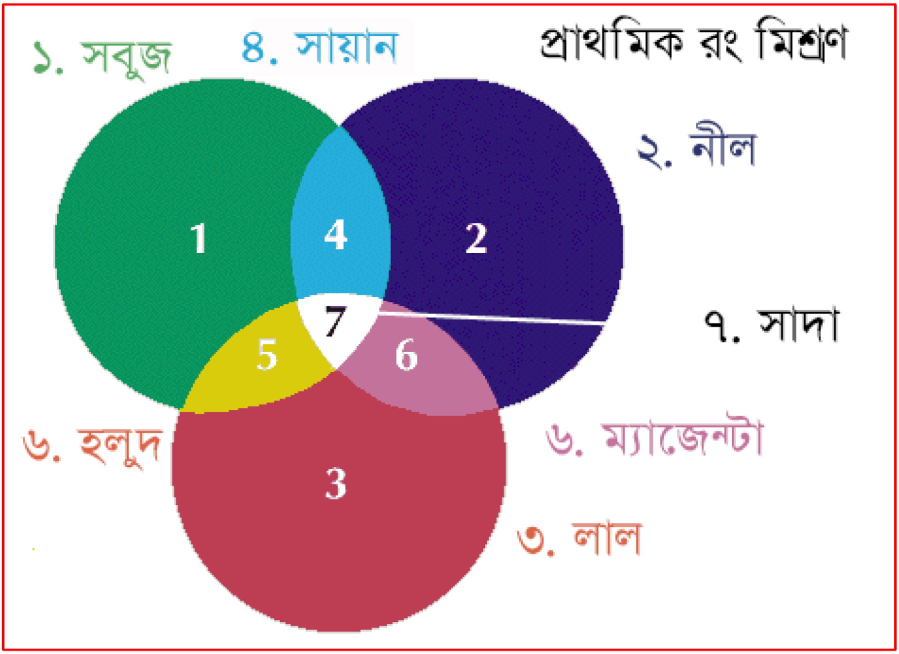
এখন দেখা যাক আমরা কিভাবে বিভিন্ন রং দেখি। আসলে বিভিন্ন বস্তু পতিত আলোকরশ্মিকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ ও বর্জন করে। যেমন লাল রংবিশিষ্ট কোন বস্তুর মৌলিক একটি গুণ হলো, তার উপর পতিত আলোক রশ্মির মধ্যে বিদ্যমান সবক'টি রংয়ের মধ্যে একমাত্র লাল ছাড়া বাকীগুলো চুষে নেয়া। অর্থাৎ লাল রংয়ের আলো পতিত হয়ে প্রতিবিম্ব হয় এবং আমাদের চোখে ঢুকে- সুতরাং আমরা লাল রংটি দেখতে পাই। তাহলে বুঝা গেল কোন্ জিনিস কোন্ রংয়ের তা নির্ভর করে সেই বস্তুটি কোন্ রংটি ধরে রাখে আর কোনটি ছেড়ে দেয়। যেটি ছেড়ে দেয় (বা প্রতিবিম্ব

করে) সেটিই আমাদের চোখে পড়ে, আর আমরা তা দেখে বলি, এটি এই-সেই রংয়ের। বাস্তবে বিভিন্ন রং যেতেহু আলোকরশ্মির **ওয়েভলেন্থ** (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) এর মধ্যে ব্যবধানের ফলে হয়, তাই যে কোন বস্তুর উপর পতিত ৭টি রংসম্পন্ন রশ্মি ঐ বস্তু নিজেরটা ছাড়া বাকীগুলো প্রতিবিম্ব করে না। নীল রংয়ের বস্তু হলে সে নীল রংবিশিষ্ট ওয়েভকে প্রতিবিম্ব করে নিজের রং কি তা দেখিয়ে দেয়। আমাদের চোখে এই **ওয়েভ** ঢুকে নীল **রিসেপটারকে** জাগ্রত করে, ফলে আমরা নীল রং দেখি। এভাবে বিভিন্ন রংয়ের মিশ্রণে তৈরী বিভিন্ন রং দেখে থাাকি। বস্তু যদি যাবতীয় রং প্রতিবিম্ব করে তাহলে বস্তুটি আমাদের নিকট সাদা দেখায় আর সব রং চুষে নিলে তা হয় কালো।



প্রাইমারী বা মৌলিক রং তিনটি

সকল রং মৌলিক তিনটি রংয়ের মিশ্রণে তৈরী হয়ে থাকে। এই রং তিনটি হলো লাল, নীল ও সবুজ। আমাদের চোখ মূলত এই তিনটি মৌলিক রং দেখে থাকে। অর্থাৎ চোখের মধ্যে এই তিন রংয়ের **'রিসেপটার'** বিদ্যমান। আর বিভিন্ন রংয়ের আলো যখন মিশ্রিত হয় তখন আমরা বিভিন্ন রং দেখি। নীচের ছবিটি দেখুন।



আপনি জানেন কি: ক্রিকেটাররা সাদা কাপড় পরেন নিজেদেরকে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য। সূর্যের আলো সাদা বা উজ্জ্বল কাপড়ে পতিত হয়ে প্রতিবিম্ব হয় বেশি- এতে সূর্যালোকের তাপ এনার্জির অনেকটাই আবার ফিরে যায়। অপরদিকে কালো বা গাঢ় রংয়ের কাপড়ের উপর সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত তাপ **এনার্জি** প্রতিবিম্ব কম হওয়ায় তা সহজেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং রৌর্দ্রের গরম থেকে বাঁচার জন্য আর কালো ছাতা নয়- সাদা ছাতার দরকার।

পরিচ্ছেদ ১৬

বিদ্যুৎ

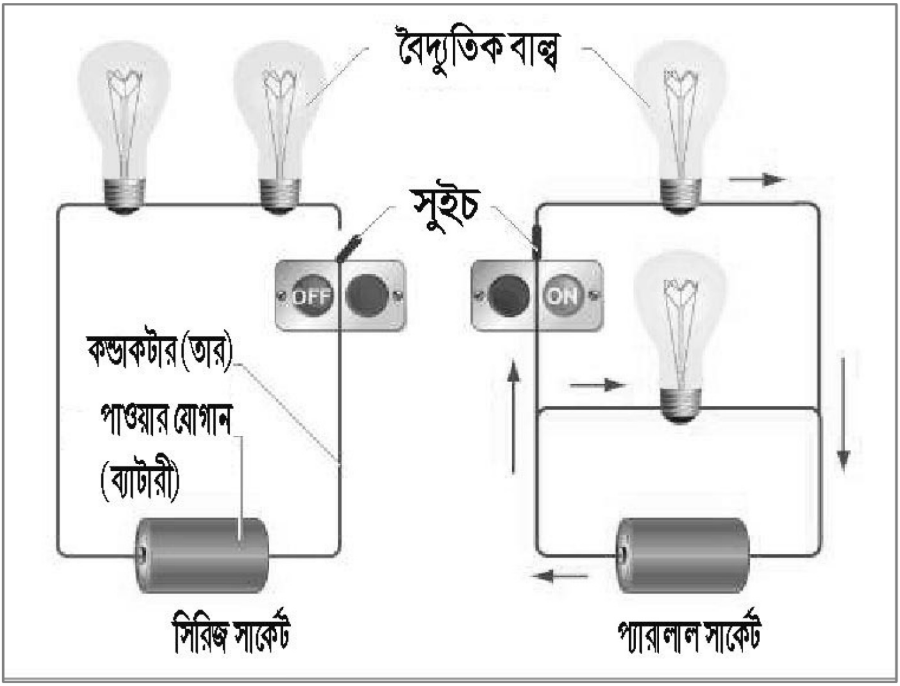
সকলেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখেছেন, সুইচ টিপে বাল্ব জ্বালিয়েছেন, **রিমোর্ট কন্ট্রোল** টিপে **টিভি** চালিয়েছেন এবং ছকেটের ভেতর প্লাগ ঢুকিয়ে মোবাইলের ব্যাটারি **রিচার্জ** করেছেন। এ সবগুলোর মূলে কোন্ জিনিসটি কাজ করে- এটা হলো বিদ্যুৎ। পুরো পৃথিবীব্যাপী আজ বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে আধুনিক সভ্যতা এই বিদ্যুতের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। যে দেশে যতো বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার হচ্ছে সে দেশকে ততো বেশী উন্নত বলেই আমরা জানি। কারণ বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল প্রত্যেক দেশের ভারী থেকে পাতলা সব ধরনের শিল্প। সুতরাং শিল্পোন্নত দেশ বলতে ওসব দেশকেই বুঝায় যেখানে বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার খুব বেশী।

বিদ্যুৎ মূলত প্রাকৃতিক একটি শক্তিশালী **এনার্জি** সূত্র। পুরো জগতব্যাপী বিদ্যুতের খেলা চলছে। প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। এমনকি এই বিদ্যুতের ফলে আপনি-আমি হাঁটতে চলতে পারছি। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে প্রতি মুহূর্তে লাখ লাখ বৈদ্যুতিক **সিগনাল** দেহের সর্বত্র চলমান আছে। হাঁটতে হলে ঐ **সিগনাল** পদযুগলে যেয়ে আমাদেরকে ক্রিয়াশীল করে তুলে, লিখতে গেলে হাতের অঙ্গুলির মধ্যে **সিগনাল** আসে। এভাবে বিদ্যুতের **সিগনাল** দ্বারা সবকিছু চলমান আছে। এককথায় মানবদেহের প্রতিটি পেশী মস্তিষ্কের **সিগনাল** দ্বারা পরিচালিত হয়। বিদ্যুৎ দ্বারা অবশ্য শত ধরনের কৃত্রিম যন্ত্রপাতিও চলে। **মোটর, পাম্প, কম্পিউটার, টেলিফোন, মোবাইল** ফোন ইত্যাদি সবকিছুর মূলে বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছু নয়। এবার ভেবে দেখার বিষয়, এই বিদ্যুৎ কোত্থেকে আসে?

বিদ্যুৎ আসে স্বভাবের একটি ক্ষুদ্র অংশ অণু বা **এটম** থেকে। এটমের মধ্যে **ইলেকট্রন** নামক যে পরমাণু আছে সেটিই হচ্ছে বিদ্যুতের মূল। **এটম চার্জ** হয়ে বিদ্যুতের সৃষ্টি করে। সাধারণত একটি এটমের মধ্যে দু’ ধরনের **চার্জ** থাকে- **পজিটিভ** ও **নেগিটিভ**। উভয় চার্জের ফলাফল যিরো হয়। **পজিটিভ চার্জ** এটমের কেন্দ্রে ও **নেগিটিভ চার্জ** ইলেকট্রনে বিদ্যমান থাকে। যখন কোন **নেগিটিভ** চার্জসম্পন্ন **ইলেকট্রন এটম** থেকে

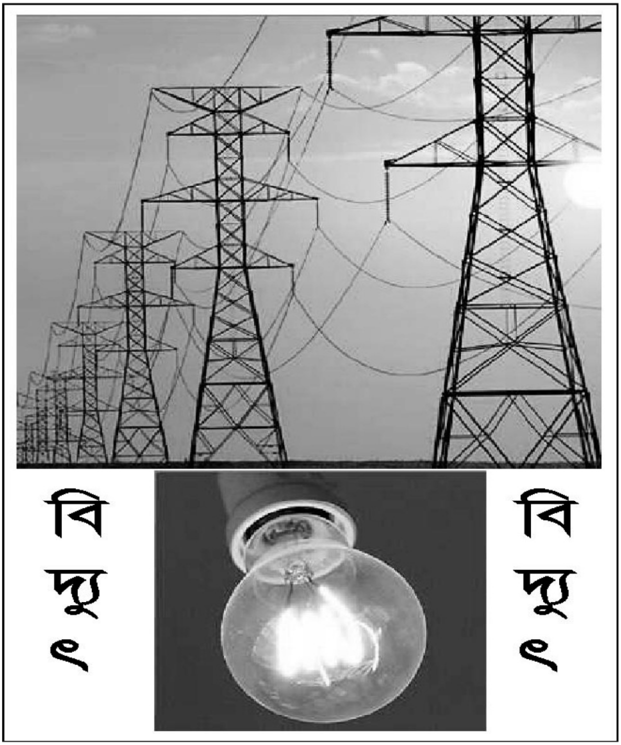
সরে পড়ে তখনই এই এটমে চার্জের জন্ম হয়। এই চার্জকে বলে **নেগিটিভ** চার্জ। অপরদিকে **নিউক্লিয়াস** বা কেন্দ্র থেকে **পজিট্রন** নামক পরমাণু সরে গেলে তা **পজিটিভ** চার্জে রূপান্তর হয়। স্বভাবের নিয়ম হলো **পজিটিভ চার্জ** ও **নেগিটিভ চার্জ** একে অন্যের প্রতি আকর্ষিত হওয়া- ঠিক যেভাবে চুম্বক হয়। এই **চার্জ** সৃষ্টির ফলে দু' ধরনের বিদ্যুতের জন্ম নেয়- প্রথমটি হলো **স্টেটিক** (বা স্থিত) ও দ্বিতীয়টি **কারেন্ট** (চলন্ত)।

এটম থেকে **ইলেকট্রন** সরিয়ে নিলে **স্টেটিক** বিদ্যুত সৃষ্টি হয়। আপনি নিজেও তা সৃষ্টি করতে পারেন। প্লাস্টিকের তৈরী একখানা চিরুনী দিয়ে আপনার শুকনো ও পরিষ্কার চুল ভালকরে আঁচড়ান। এতে চুল থেকে কিছু **ইলেকট্রন** লাফ মেরে মেরে আপনার চিরুনীর মধ্যে জড়োত হবে। যেহেতু ইলেকট্রনে **নেগিটিভ চার্জ** বিদ্যমান তাই আপনার চিরুনীটিও এখন **নেগিটিভ** চার্জে পরিণত হবে। অপরদিকে কিছু **এটম** হারিয়ে আপনার চুলগুলোতে সৃষ্টি হবে **পজিটিভ** চার্জ। চুল থেকে এটটু দূরে চিরুনীটি ধরে রাখুন। দেখুন কিভাবে কিছু চুল খাড়া হয়ে ওঠে চিরুনীকে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। কি হচ্ছে? বাস্তবে চুলগুলো চিরুনীর সঙ্গে মিলনের সন্ধানে রত। কারণ **পজিটিভ** ও **নেগিটিভ** চার্জসম্পন্ন যে কোন কিছুই একে অন্যের সাথে মিলতে আগ্রহী। এটাকেই বলে স্থিত বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতের ফলেই বজ্রপাত হয়। সেক্ষেত্রে মেঘ ও পৃথিবীর উপরিভাগের মাটির মধ্যে সৃষ্ট **পজিটিভ** ও **নেগিটিভ** চার্জের প্রচণ্ড টানে সৃষ্টি হয় বিরাট বড় **ইলেকট্রিক স্পার্ক** (বল)। আরো ক'টি উপায়েও বজ্রপাতের সৃষ্টি হতে পারে যেমন, **পজিটিভ** ও **নেগিটিভ চার্জ** একটি মেঘখণ্ডে, দু'টি মেঘখণ্ডে কিংবা মেঘখণ্ড ও বাসাতের মধ্যে বিদ্যমান থাকার ফলে। এবার বুঝে নিন, আপনার কক্ষের **ইলেকট্রিক** বাল্বটি কিভাবে কোত্থেকে শক্তি পেয়ে জ্বলে উঠে।



আসলে যাবতীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চলে-জ্বলে বিদ্যুৎ চলমান থাকার ফলে। একটি বিরাট চক্কর দেয় **ইলেকট্রিক** তারে চলমান বিদ্যুৎ তথা চার্জযুক্ত ইলেকট্রনগুলো। সুতরাং **কারেন্ট** বলতে এই ইলেকট্রনের চলন্তাবস্থাকেই বুঝায়। কিন্তু এগুলোর পেছনে কোন শক্তি না থাকলে কে তাদেরকে ঠেলা দিয়ে চালাবে? ঠেলা দিয়ে চালানোর নামই হলো **কারেন্ট জেনারেশন**। যে যন্ত্রের সাহায্যে তা হয়ে থাকে তাকে বলে **ইলেকট্রিক জেনারেটর**। অপর আরেক যন্ত্র এই **'ধাক্কার'** কাজ করতে পারে যার নাম হলো ব্যাটারি। তবে আপনার বাড়িতে সাধারণত ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ আসে না- কিন্তু আপনি যদি **আইপিএস (ইন্সটেন্ট পাওয়ার সাপ্লাই**- বার বার **চার্জ** করা যায় এরূপ ব্যাটারি) কিংবা সৌরবিদ্যুৎ (সূর্যের শক্তি দ্বারা ব্যাটারি **চার্জ** করা) ব্যবহারকারী হয়ে থাকেন তাহলে ভিন্নকথা। আপনার বাড়িতে জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে বিরাট বড় বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে **ইলেকট্রিসিটি** আসে। আমরা বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উপর আলোচনাকালে অবশ্য এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলবো।

মৌলিক বিজ্ঞানের উপর সাধারণ পরিচিতির অংশ হিসাবে বিদ্যুৎ সম্পর্কে বর্তমানে এ পর্যন্ত যাকিছু বলেছি তা-ই আমাদের জন্য আপাতত যথেষ্ট।



আপনি জানেন কি: ইলেকট্রিক সিগনালের কারণে আমরা চোখ দিয়ে সবকিছু দেখতে পাই। আমরা যখন কোন বস্তুর দিকে তাকাই তখন সেটা থেকে আগত আলোকরশ্মি চোখের ভেতর ঢুকে। এই রশ্মির মধ্যে থাকে রং ও আলোকের উজ্জ্বলতা এবং আচ্ছন্নতা। এগুলো **ইলেকট্রিক** সিগনালে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের মস্তিষ্কের **'ভিজ্যুয়েল করটেক্সে'** (বা দেখার অংশে) যেয়ে পৌঁছার পর আমরা বস্তুটি তার রংর-রূপ-আকার-দূরত্বসহ দেখি। তাহলে দেখা মানে আলোকরশ্মির কারসাজি ও **ইলেকট্রিক সিগনাল** বৈ কিছু নয়।

পরিচ্ছেদ ১৭

আগুন

এটা আপনার ঘরে বাতি হিসেবে আলো দান করে, চুলায় তাপের যোগান দেয় আবার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতেও তা পটু। হ্যাঁ, আমরা আগুনের কথা বলছি। আদি কাল থেকেই মানুষ আগুন ব্যবহার করে আসছে। তবে এই আগুন আসলে কী। আসুন তাহলে আগুন নামক এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই।

আগুন মূলত **রসায়নিক** প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়। জ্বালানি ও অক্সিজেনের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া ঘটে। যেমন **পেট্রোল, ডিজেল**, কাষ্ঠ, **কেরোসিন** ইত্যাদিতে অক্সিজেনের মাধ্যমে খুব দ্রুত একটি **কেমিক্যাল রিয়েকশন** হয়। সাধারণত **অক্সিজেন** যখন অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে, তাকে বলা হয় "**অক্সিডেশন**"। তবে যে **রিয়েকশন** থেকে আগুনের সৃষ্টি হয় তার নাম হলো, "**কমবাছশন**"। কমবাছশনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আলো, গ্যাস, তাপ ও ছাই। ঠিক কিভাবে এই আগুন সৃষ্টির কর্মটি ঘটে তা একটু তলিয়ে দেখা যাক।



বেশ ক'টি আলাদা ফেক্টর একই সাথে ক্রিয়াশীল থেকে আগুনের সৃষ্টি করে। প্রথমত কোনো ধরনের জ্বালানি তো থাকতেই হবে। এরপর দরকার **অক্সিজেন** যা সাধারণত বাতাসে বিদ্যমান থাকায় সেখান থেকেই সাপ্লাই হয়। অবশেষে আগুন ধরানোর জন্য **'ইগনিশন'** এর প্রয়োজন। এটা হতে পারে ম্যাচের কাটি, স্ফুলিঙ্গ বা এমনকি খুব গরম কোন কিছু। ইগনিশনের পরই জ্বালানি ও অক্সিজেনে মিলে একটি **রিয়েকশন** বা প্রতিক্রিয়া শুরু করে যাকে বলে, **চেইন রিয়েকশন**। এর ফলে কমবাছশনের (অর্থাৎ আগুনের) সৃষ্টি হয়। আমরা সাধারণত মনে করি কয়লা বা কাষ্ঠ জ্বলে- কিন্তু আসলে ঠিক তা নয়। যে কোন জ্বালানি থেকে প্রথমে একটি গ্যাসের সৃষ্টি হয় যা বাতাসে বিদ্যমান অক্সিজেনের সঙ্গে **রসায়নিক** প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আগুনের জ্বালানি হিসাবে কাজ করে। যেমন, মোমবাতি জ্বলার সময় মোম গলে তা থেকে **গ্যাস** বের হয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। এই জ্বালানির উপযোগী গ্যাসকে বলে **'ভলেটাইল'**। সুতরাং **ভলেটাইল** যতোসব বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান আছে ওগুলো সবই জ্বলবে। কাষ্ঠ সরাসরি **ভলেটাইল** সৃষ্টি করে। এতে তা জ্বলতে থাকে। বেশিরভাগ জ্বালানিতে থাকে যুক্ত পদার্থ যার মূলে আছে **কার্বন** ও **হাইড্রোজেন**। যেমন কাগজ, কাষ্ঠ ও সূতায় যে জ্বালানি উপাদান আছে তাকে বলে **'সেল্যুলোজ'**। এতে আছে **অক্সিজেন, কার্বন** ও **হাইড্রোজেন**। কিছু কিছু মানবতৈরী বস্তু যেমন **প্লাস্টিক** আগুনে জ্বলে। **পিবিসি (পলিভাইনেলক্লোরাইড), নাইলন** ও **পলিস্টাইরিন** আগুনে জ্বলার কারণ হলো এগুলোতে আছে মৌলিক পদার্থ **কার্বন** ও **হাইড্রোজেন**। এখন বুঝে নিন আগুন থেকে আমরা ফলাফল হিসাবে কি কি পাই।

আগুন জ্বললে একাধিক প্রোডাক্ট মিলে। এগুলো হলো: **১. আলো, ২. তাপ, ৩. গ্যাস ও ৪. ছাই**। বলতে পারেন ধূঁয়ার কথা বলছি না কেন। আসলে ধূঁয়া ঐ ছাই ও গ্যাসের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। সুতরাং ধূঁয়া আলাদা কিছু নয়। আগুন থেকে আলোকরশ্মি **রেডিয়েশন** হিসেবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য কি পরিমাণ আলো হবে তা নির্ভর করে জ্বালানি থেকে সৃষ্ট তাপমাত্রার উপর। তাপ বেশি হলে আলোও বেশি হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আগুন থেকে যে তাপের সৃষ্টি হয় তার মাত্রা থাকে ১২০০ থেকে **১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড**।

আগুন থেকে একাধিক গ্যাসের জন্ম নিতে পারে। এদের কিছু আছে নিরাপদ আবার অন্যগুলো বিষাক্ত। যেমন **কার্বন ডাইওক্সাইড** ও জলীয় বাষ্প হলো দু'টি নিরাপদ

গ্যাস যা আগুন থেকে সৃষ্টি হতে পারে। তবে এই আগুন থেকে বিষাক্ত **গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরিড, সালফার ডাইওক্সাইড** ও **হাইড্রোজেন সাইনাইড** ইত্যাদিও পরিপার্শ্বিকতায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। ছাই মূলত কার্বনের গুড়ো। অধিকাংশ আগুন থেকে অন্তত কিছুটা ছাই **বাইপ্রোডাক্ট** হিসেবে তৈরী হয়। কি পরিমাণ ছাই তৈরী হবে তা নির্ভর করে জ্বালানি, পারিপার্শ্বিকতা ও পুড়ার রেইটের উপর। যেমন কাষ্ঠ থেকে বেশি ছাই তৈরী করে **প্লাস্টিক**। **প্লাস্টিক** খুব তাড়াতাড়ি জ্বলবেও। সবশেষে সবাইকে শতর্ক করছি যে, আগুন যদিও আমাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত তবে তা সময় সময় খুব নিষ্ঠুর হতেও পারে। আগুন বাড়ি-ঘর, বিল্ডিং-ইমারত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে সক্ষম- এসাথে অনেক মানুষের জীবনও আগুন থেকে অকালে ঝরে পড়তে পারে। সুতরাং সবাইকে আগুনের সঠিক ব্যবহার ও এর অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করা জরুরী। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হিফাজত করুন।

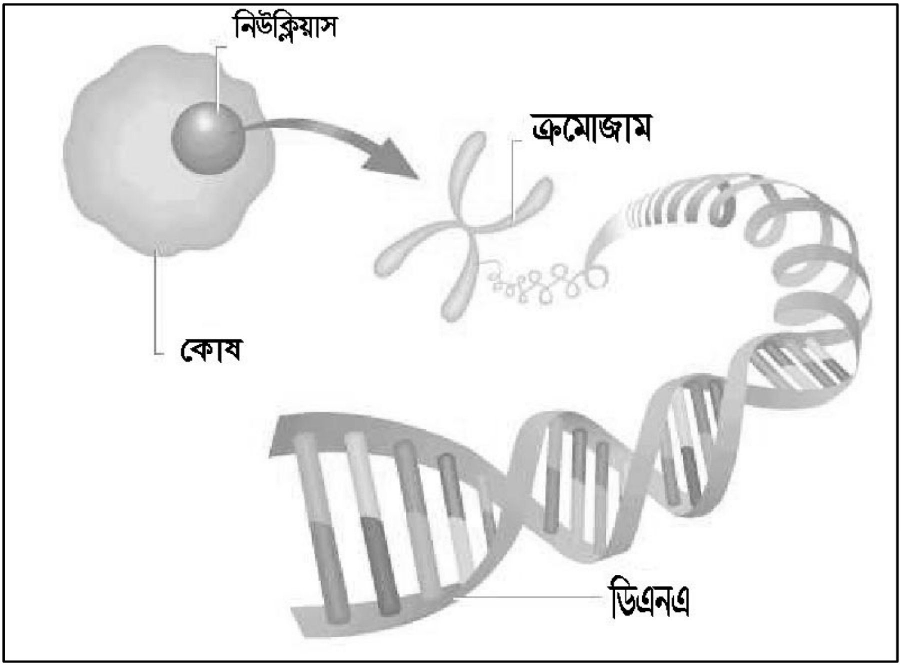


আপনি জানেন কি: জোনাকীদের ইংরেজীতে বলে **ফায়ারফ্লাই**। পৃথিবীতে অন্তত **১১০০** ধরনের জোনাকী আছে। তবে এদের পেট থেকে আগুন বের হয় না। বাস্তবে জোনাকীরা আলো সৃষ্টি করে একটি **কেমিকেল** রিয়েকশনের মাধ্যমে। বাতাস থেকে **অক্সিজেন** গ্রহণ করার পর তা **লুচিফারিন** নামক এক ধরনের বস্তুর সাথে মিশে যাওয়ার সাথে সাথেই এই **রিয়েকশন** হয়। এই অক্সিডেশনের ফলাফল স্বরূপ নীল ও সবুজ রংয়ের আলো সৃষ্টি হয়, তাপ ছাড়া।

পরিচ্ছেদ ১৮

জীন্‌স ও বংশ

জগতে যাকিছু **'জীবন্ত'** আছে তাতে **জীন** নামক বস্তু বিদ্যমান। আমরা ইতোমধ্যে জীবণূ সম্পর্কে আলোচনায় **ডিএনএ** নামক একটি **কেমিক্যাল** বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এটা একটি **মলিকিউল** যা কোষের কেন্দ্রে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এবার আমরা জেনে নেবো এই **ডিএনএ** কি জিনিস তৈরী করে।

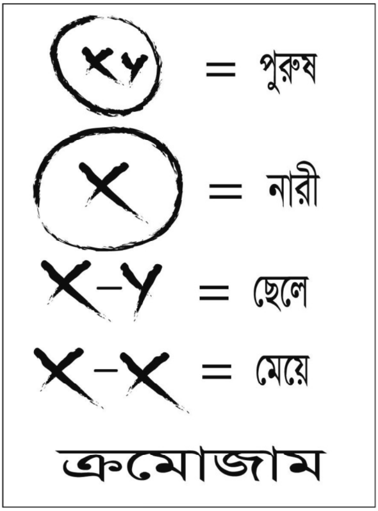


প্রতিটি **ডিএনএ** মূলত **জীন** তৈরী করে। এতে থাকে আপনার আমার দেহকাঠামো সৃষ্টির সকল নির্দেশনা। আসলে জীনের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক নির্দেশনা বিস্তারলাভ করে। অর্থাৎ আপনার পিতামাতার নিকট থেকে বিভিন্ন জৈবিক বৈশিষ্ট্যাবলী আপনার মধ্যে বিস্তার লাভ করে এই জীনের মাধ্যমে। আমরা সবাই আমাদের মায়ের কাছ

থেকে অর্ধেক ও পিতার কাছ থেকে অর্ধেক **জীন** পেয়ে থাকি। এখন একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন এই জীনগুলো আসলে কি জিনিস?

মূলত প্রতিটি **জীন** হলো এক ধরনের **'কোড'** বা বিশেষ নির্দেশনা। যেমন একটি বৃক্ষের **জীন** বলে দেবে কোথায় কিভাবে ও কোন ধরনের পাতা তৈরী হবে। একটি কুকুরের **জীন** নির্দেশ করে চামড়ার উপর কোন রংয়ের কতটি লোম হবে। আমাদের চোখের **জীন** বলে দেবে চোখের রং কালো, বাদামী না অন্য কোনকিছু হবে। মোটকথা জীবীর যাবতীয় দেহকাঠামো সৃষ্টির মূলে এই **জীন** ও তা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশের উপর নির্ভরশীল। এগুলো হলো জীবনের **কোড- কোড অব লাইফ**।

যেখানে **ডিএনএ** ও **জীন** বাস করে তার নাম হলো **ক্রমোজাম**। মানুষের কোষের কেন্দ্রে এরূপ ২৩ জোড়া **ক্রমোজাম** আছে। মানবদেহের যাবতীয় কোষে এই ২৩ জোড়া **ক্রমোজাম** বিদ্যমান, তবে এর মধ্যে ২২টি জোড়া একই ধরনের। ২৩ নাম্বার জোড়া ভিন্ন- কারণ, এটা থেকে জন্ম নেয় নতুন শিশু। বিজ্ঞানীরা এর নামকরণ করেছেন যৌন **ক্রমোজাম**। এই ক্রমোজামের মাধ্যমেই নতুন শিশু মায়ের পেটে জন্ম নেওয়ার সময় সে পুরুষ না নারী হবে তা নির্দিষ্ট হয়। এটা নিশ্চিতভাবে জানা গেছে যে, শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ভর করে **'একমাত্র পিতার উপর'**। সুতরাং মায়ের কারণে ছেলে হয় না, কিংবা মেয়ে হয় না এরূপ ধারণা থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে। এখনও অনেকে ছেলেসন্তানের আশায় নতুন বিবাহ করে- কারণ বর্তমান স্ত্রীর গর্ভে শুধু শুধু মেয়েদের জন্ম হচ্ছে। এটা নারীদের প্রতি ভীষণ অন্যায়। বাস্তবে এসব ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তি তো স্বামী নিজেই। এবার আমরা দেখে নেবো কিভাবে শিশু ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়ার জন্য পুরুষ সম্পূর্ণরূপে দায়ী।



আগের পৃষ্ঠার চিত্র থেকে আমরা ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে সক্ষম হলাম যে পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান এক্স ও ওয়াই এই উভয় **ক্রমোজাম**। অন্যদিকে নারীর মধ্যে আছে দু'টি শুধুমাত্র এক্স **ক্রমোজাম**। সুতারং যেহেতু মেয়েরা দু'টি এক্স **ক্রমোজাম** পায় তাই তার জন্য সে তার পিতার কাছ থেকে একটি ও মাতার কাছ থেকে অপর এক্স **ক্রমোজাম** পেয়ে থাকে। অপরদিকে ছেলেরা পায় একটি এক্স (মাতার কাছ থেকে) ও একটি ওয়াই (পিতার কাছ থেকে)। এখন ওয়াই ছাড়া ছেলে হয় না আর ওয়াই এর মালিক একমাত্র পুরুষ। অপরদিকে নারীর মধ্যে বিদ্যমান এক্সের সাথে পুরুষের এক্স ছাড়া মেয়েও হয় না। তাহলে বুঝা গেল- পুরুষ যেটি সাপ্লাই দেবে সে অনুসারে নতুন শিশু ছেলে কিংবা মেয়ে হবে। সুতরাং নতুন শিশুর সেক্স কি হবে তা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল।

অবশেষে আমরা জেনে নিই কিভাবে নারীদের ডিম্বকোষ ও পুরুষদের **স্পার্ম** কোষ থেকে নতুন শিশুর সৃষ্টি হয়। নারীদের ডিমে থাকে মোট ২২টি **ক্রমোজাম** এবং একটি মাত্র এক্স **ক্রমোজাম**। পুরুষদের **স্পার্ম** কোষে থাকে **২২টি ক্রমোজাম** ও একটি এক্স কিংবা ওয়াই **ক্রমোজাম**। এখানে ব্যবধানটি লক্ষ্য করুণ। গর্ভধারণের সময় নারীদের কোন ডিম যদি ওয়াই ক্রমোজামযুক্ত পুরুষের কোন স্পার্মের সাথে মিলিত হয় তাহলে সন্তান হবে ছেলে। অপরদিকে কোন ডম্বিকোষ যদি এক্স ক্রমোজামযুক্ত পুরুষের কোন **স্পার্ম** থেকে গর্ভধারণ করে তাহলে সেই শিশুটি হবে মেয়েসন্তান। এখন বিষয়টি আশাকরি পরিষ্কার হয়েছে যে, ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়া একমাত্র পুরুষের উপর নির্ভরশীল।

আপনি জানেন কি: জিনেটিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আধুনিক যুগে অনেক ক্রিমিনালদের শ্রীঘরে পাঠানো হচ্ছে। প্রত্যেক মানুষের **ডিএনএ**-এর মধ্যে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং অপরাধীর রক্ত, চুল, চামড়া, বীর্য ইত্যাদি ক্রাইম সীন থেকে সংগ্রহ করে তার **ডিএনএ 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট'** নেওয়া যেতে পারে। এরপর এটা কোর্টে প্রমাণস্বরূপ দেখিয়ে অপরাধীকে সনাক্ত করা যায়।

পরিচ্ছেদ ১৯

মহাকর্ষ

আমি পাঠকদেরকে কিছু এক্সারসাইজ করার জন্য অনুরোধ করছি। তবে এই এক্সারসাইজে গড়াগড়ি কিংবা মুড়ামুড়ি নেই। যা আছে তাহলো লাফালাফি। লাফ মেরে যতো সম্ভব উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করুন। আপনি যতো বেশিই চেষ্টা করুন না কেন, সব সময়ই কিছুক্ষণের মধ্যে আবার মাটিতে পতিত হবেন। কেন? আপনি দশ তলা বিল্ডিংয়ের উপর লাফ মেরে উঠতে পারেন না কেন? সবকিছুই উপর থেকে মাটির দিকে পতিত হয় কেন? এসব প্রশ্নের জবাব **'মহাকর্ষ'** নামক একটি অদেখা শক্তির সাথে সম্পর্কিত।

পৃথিবীর উপর আমরা বিচরণ করছি নির্বিঘ্নে এই মহাকর্ষের বদৌলতে। যদি এ শক্তি মুহূর্তের জন্যও অনুপস্থিত থাকে তাহলে লঙ্কা কাণ্ড ঘটে যাবে। আমরা উর্ধ্বাকাশের দিকে ছুটে চলবো। পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। পাহাড়-পর্বত তুলার মতো উড়ে যাবে দিকবিদিক। সুতরাং মহাকর্ষের গুরুত্ব আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এবার বুঝে নিই বাস্তবে এই শক্তিটি কি?

আসলে মহাকর্ষ প্রাকৃতিক চারটি মৌলিক শক্তির একটি। আমরা ইতোমধ্যে অণু বা **এটম** নিয়ে আলোচনাকালে তিনটি মৌলিক শক্তির উপর বিস্তারিত বলেছি। ওগুলো মূলত অণুর অভ্যন্তরে ক্রিয়া করে। তবে মহাকর্ষের ক্রিয়া সর্বত্র। সে অণু থেকে দূর-দূরান্তের তারাজগত ও **গ্যালাক্সি** জগতে ক্রিয়াশীল আছে। এটা এমন একটি শক্তি বা **ফোর্স** যার কাজ হলো দু'টি বস্তুকে একটা আরেকটার দিকে আকর্ষণ করা। যেমন আমাদের দেহ ও পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ বিদ্যমান। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আমরা সবাই আকর্ষিত আছি। এর ফলেই আমরা উপরের দিকে লাফ মেরে বেশীদূর ওঠতে পারি না। ঐ শক্তি আবার আমাদেরকে পৃথিবীর উপর টেনে এনে পতিত করে।

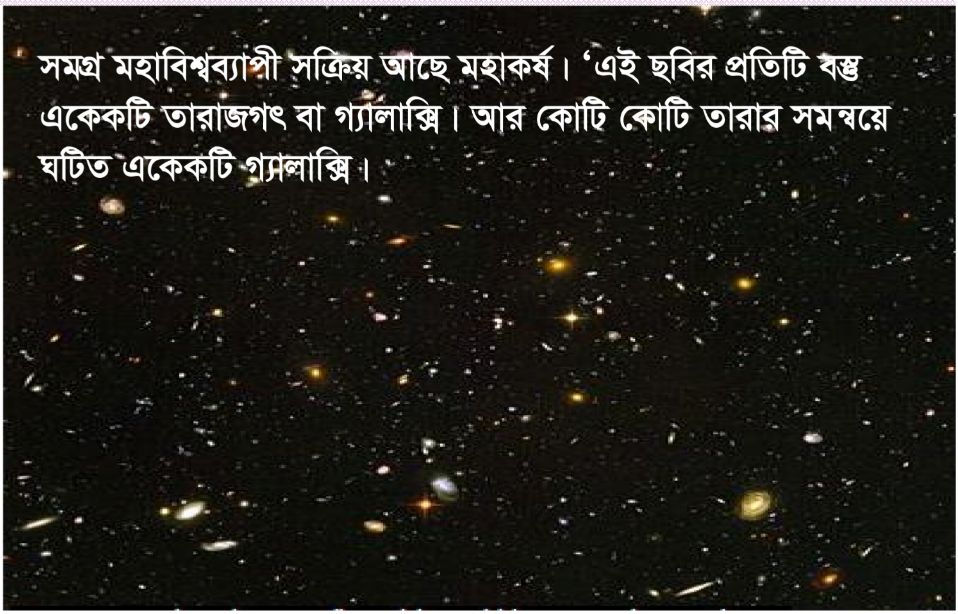


আগেই বলেছি মহাকর্ষ পুরো মহাবিশ্বের সর্বত্র ক্রিয়াশীল আছে। আমাদেরকে যেভাবে পৃথিবী তার নিজের কেন্দ্রের দিকে টেনে রেখেছে ঠিক এভাবে পৃথিবী তার একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্রকেও তার নিজের দিকে টেনে আনতে সদাসচেষ্ট আছে। তবে কক্ষপথে ঘুর্ণনের ফলে চন্দ্র পৃথিবীর উপর পতিত হচ্ছে না। যে বস্তুর ওজন বা **ম্যাস** যতো বেশী তার মধ্যে তত বেশী মহাকর্ষ শক্তি থাকবে। আর স্বভাবের এটি একটি নিয়ম যে, বড় বস্তুর চতুর্দিকে ছোট বস্তু ঘুরে। তাই আমরা লক্ষ্য করি, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চন্দ্র আর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সূর্যের চতুর্দিকে। এভাবে পুরো সৌরজগতের সকল গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে- কারণ সূর্যের ওজন সবার তুলনায় অনেকগুণ বেশী। আর সকল গ্রহের যাবতীয় উপগ্রহ তথা চন্দ্রসমূহ নিজ নিজ গ্রহকে কেন্দ্র করে কক্ষপথে ঘুরে। আমরা **'স্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান'** পরিচ্ছেদে অনেক গ্রহেরই যে একাধিক চন্দ্র আছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরবো।

সৌরজগতের মধ্যেই মহাকর্ষ সীমাবদ্ধ নয়। এই মহাকর্ষের প্রভাব এক তারা থেকে আরেক তারা, এক **গ্যালাক্সি** বা তারাজগৎ থেকে আরেকটি ইত্যাদি সর্বত্র বিদ্যমান। এতে পুরো বিশ্বব্যাপী গতিময়তা ও ব্যালান্স সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এব্যাপারে বিস্তারিত

আলোচনায় পরে যাচ্ছি। এ মুহূর্তে মহাকর্ষের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাই উদ্দেশ্য। মহকর্ষের ক্রিয়া সম্পর্কে জানলেও এটা কিভাবে কোত্থেকে জন্ম নিয়েছে বা এর আসল স্বরূপ কি, তা কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার নয়। অবশ্য ইতোমধ্যে বর্ণিত **'জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি'** হচ্ছে মহাকর্ষকে বুঝিয়ে দেওয়ার অত্যাধুনিক **থিওরী।**

আপনি জানেন কিঃ আপনার ওজন (এবং সকল বস্তুর ওজন) কতটুকু তা নির্ভর করে মহাকর্ষের ওপর। আপনি যাদি চন্দ্রে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন তাহলে মনে রাখবেন, পৃথিবীতে ৬০ কেজি ওজনের লোক হলেও সেখানে আপনি অনেকটা পাতলা হয়ে যাবেন। বাস্তবে চন্দ্রে ১ কেজি ওজনের কোন বস্তু মাত্র ১/৬ বা ০.১৬৭ কেজি হবে। সুতরাং আপনার ওজন চাঁদের উপর ৬০*১/৬ =১০ কেজিতে নেমে আসবে। তবে জুপিটারের উপর আপনি অনেক ভারী হয়ে পড়বেন। সেখানে ১ কেজি = ২.৫ কেজি। সুতরাং চন্দ্রের উপর যদিও আপনি ২০ ফুট লাফ মারতে সক্ষম হতে পারেন কিন্তু জুপিটারের উপর আপনার ২.৫*৬০ = ১৫০ কেজি ওজন নিয়ে পা তুলতেও সক্ষম হবেন কি না সন্দেহ আছে।



পরিচ্ছেদ ২০

তাপ

রড বা লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত আগুনে পুড়তে দিলে ধীরে ধীরে তা উত্তপ্ত হয়ে অপরপ্রান্তও গরম হয়ে পড়ে। হেমন্তকালে শীতের রাতে গ্রমাঞ্চলের মানুষ জমিনে পড়ে থাকা খড় জমা করে আগুন ধরিয়ে চতুর্দিকে দাঁড়ায়, আর উষ্ণতা অনুভব করে আরাম পায়। চুলায় আগুন দিয়ে পানি গরম করা হয় চা তৈরীর জন্য। আগুন থেকে সৃষ্ট তাপ থেকে এভাবে আমরা উপকৃত হই অহরহ- আর এসব ব্যাপার বলার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই- কারণ, এগুলো আমাদের জীবনচলার পথে নিত্যনৈমিত্তিক কার্যাদি বৈ নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সচরাচর জানা-চেনা এ কথাগুলো ব্যক্ত করার পেছনে কারণ নিহিত আছে। আমরা তো বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছি। আর বিজ্ঞান হচ্ছে এমন এক বিষয় যার মূলে এভাবে সচরাচর সংঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী কেন ঘটে, তার সঠিক জবাব বের করার পেছনে লেগে থাকা।

উপরে বর্ণিত উষ্ণতা বা গরম হওয়ার কারণ, সঠিক মাপজোখ, কিভাবে তাপ বিস্তার, চলাচল ও পরিবর্তিত হয় এসব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে গবেষণার নাম হলো তাপ-বিজ্ঞান। পৃথিবীতে তাপের প্রাইমারী সূত্র হলো সূর্য। তবে ঘর্ষণ থেকেও আমরা তাপ পেতে পারি, এছাড়া আগুন তো আছেই। বিদ্যুৎ থেকেও তাপের জন্ম নেয়। তাহলে আসুন, আমরা তাপ সম্পর্কে আরোও বিস্তারিত আলেচনায় যেয়ে বিষয়টির রহস্যাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করি।

তাপের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হলো: **'এনার্জি বা উদ্যম এক স্থান বা দেহ থেকে অন্য স্থান বা দেহে স্থানান্তর'**। **এনার্জি** বলতে এখানে তাপের অনুভুতিকে বুঝাচ্ছে। অবশ্য **এনার্জি** শব্দের অর্থ ব্যাপক। বিজ্ঞান বলে পুরো বিশ্বটাই এনার্জিতে ভরপুর। বাস্তবে বস্তু ও **এনার্জি** অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। একটা ছাড়া আরেকটা অস্তিত্বহীন। অর্থাৎ বস্তু বলতেই **এনার্জি**। এখন, তাপ সৃষ্টি হয় বস্তর মধ্যে ঘর্ষণ, **রসায়নিক** কিংবা আনবিক রিয়েকশনের মাধ্যমে। এরপর এটা বিস্তারলাভ ও স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। সাধারণত

তিনটি পদ্ধতিতে তাপ স্থানান্তরিত হয়। এগুলো হলো: **১. কন্ডাকশন** (পরিবহন), **২. কনভেকশন** (পরিচলন) ও **৩. রেডিয়েশন** (তেজস্ক্রিয়া)।



কন্ডাকশনের মাধ্যমে সাধারণত **'শক্ত'** বা কঠিন পদার্থে তাপ একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে স্থানান্তরিত হয়। আর এটা নিয়ম যে, উষ্ণ থেকে ঠাণ্ডার দিকে এ ট্রান্সফার হয়। ঠিক কোন্ পদ্ধতিতে এ ট্রান্সফার হয়ে থাকে তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নি। তবে অনেকের ধারণা বস্তুর অভ্যন্তরে এটমগুলোর মধ্যে যেসব **'ফ্রি' ইলেকট্রন** আছে ওগুলো ঠাণ্ডার দিকে গিয়ে উষ্ণ করে। এ **থিওরী** অবশ্য হয়তো সত্যের কাছাকাছি হবে- কারণ, দেখাগেছে ভালো ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকটারের মধ্যে তাপও সমভাবে ট্রান্সফার হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভালো বৈদ্যুতিক **কন্ডাকটার** উত্তম তাপ **কন্ডাকটার**ও।

কনভেকশনের মাধ্যমে সাধারণত কঠিন বস্তু ও তরল বস্তু বা বাষ্পের মধ্যে তাপ স্থানান্তরিত হয়। যেমন একটি কেতলি আগুনের তাপে গরম হয়ে ভেতরের পানির

মলিকিউলে গতি সৃষ্টি করে। এতে পানি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখানে কনভেকশনের মাধ্যমে ট্রান্সফার হচ্ছে। একইভাবে কোন কক্ষে যদি হিটার বা গরম করার কোন উপাদান থাকে তাহলে কক্ষটি মূলত কনভেকশনের মাধ্যমেই উষ্ণ হবে। এর কারণ হলো হিটারের কাছের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে পুরো কক্ষের বাতাসকে গরম করবে। সুতরাং কনভেকশনের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তর হওয়ার অর্থ হলো তাপের সূত্রের কাছের তরল পদার্থ কিংবা **গ্যাস** প্রথমে গরম হয়ে পার্শ্ববর্তী **গ্যাস** বা তরল পদার্থ গরম করা- এতে একটি চক্রাকার গতিও সৃষ্টি হবে।

তৃতীয় যে পদ্ধতিতে তাপ স্থানান্তরিত হয় তা উপরের উভয়টি থেকে ভিন্ন। একে বিজ্ঞানের ভাষায় **রেডিয়েশন** বলে। উত্তপ্ত বস্তু কিংবা উৎস ও যে বস্তু এর দ্বারা গরম হবে তা দূরত্বেও থাকতে পারে। এমনকি মধ্যখানে যদি সম্পূর্ণ শূন্যস্থান (বা **ভাকিউম**) থাকে তথাপি রেডিয়েশনের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তরিত হতে পারে। সাধারণত যে রেডিয়েশনের মাধ্যমে তাপ ভ্রমণ করে তাকে বলে **'ইনফ্রারেড রেডিয়েশন'**। [তাপ ট্রান্সফারের বিভিন্ন উপায় বুঝতে উপরের ছবিটি স্ট্যাডি করুন]

আপনি জানেন কি: বর্তমানে তাপ মাপার জন্য ৫ ধরনের তাপ-**ইউনিট** ব্যবহৃত হচ্ছে: ১. **ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড** (বা **সেলসিয়াস**), ২. **ডিগ্রী ফারেনহাইট**, ৩. **কেলভিন**, ৪. **রেনকাইন** ও ৫. আন্তর্জাতিক **থার্মোডাইনামিক্স টেমপারেচার স্কেল**। তবে প্রথম দু'টিই সর্বসাধারণ্যের নিকট বোধগম্য। দু'টি বিশেষ ফরমুলার মাধ্যমে এদের একটি থেকে অপরটিতে তাপমান রূপান্তর করা যায়। এই ফরমুলাদ্বয় হলো: ১. $C = (F-32) * 100/180$; ২. $F = (C * 180/100) + 32$। এখানে C হলো **সেলসিয়াস** বা **সেন্টিগ্রেড** স্কেলে তাপের মান আর F হলো **ফারেনহাইট** স্কেলে তাপের মান। **সেন্টিগ্রেড** বা **সেলসিয়াস** স্কেলে পানির বরফাঙ্ক তাপমাত্রা ০° **সেলসিয়াস** ও ফুটনাঙ্ক তাপমাত্রা ১০০° **সেলসিয়াস**। **ফারেনহাইট** স্কেলে বরফাঙ্ক তাপমাত্রা ৩২° **ফারেনহাইট** ও ফুটনাঙ্ক তাপমাত্রা ২১২° **ফারেনহাইট**।

পরিচ্ছেদ ২১

আলোকবিজ্ঞান

আলোক, এটা ছাড়া পৃথিবীর উপর প্রাণীজীবন বেঁচে থাকতে পারতো না। সূর্য হলো আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় **এনার্জি** সূত্র। এ থেকে আগত আলো পৃথিবীকে প্রাণীদের জন্য উপযুক্ত ও জরুরী উষ্ণতা দান করে। সূর্যের আলোর ফলেই বৃক্ষ-তরু-লতা বাঁচে ও বড় হয়। আর সবুজ বৃক্ষ থেকে সৃষ্টি হয় **অক্সিজেন** যা ছাড়া আপনি আমি কেউ বাঁচবো না। আলোক রশ্মি বস্তুর উপর পতিত ওয়ার পর প্রতিবিম্ব হয়ে আমাদের চোখে আসে তাই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। রাতের বেলা শহরে বৈদ্যুতিক বাতি থেকে দূরে কোন নিভৃত পল্লীতে যেয়ে মেঘে ঢাকা খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালে বুঝা যাবে অন্ধকার কাকে বলে। কারণ আলোক ছাড়া সত্যিই এ পুরো জগৎ অন্ধকারে পড়ে থাকতো। কোথাও কোন জীবনের স্পন্দন খোঁজে পাওয়া যেতো না- সবকিছু নির্জীব-নিষ্প্রাণ হতো। তাহলে আলোক নামক এই জিনিসটি থেকে আমরা অসীমভাবে উপকৃত হই, তাতো অবশ্যই সবাই স্বীকার করবেন- কিন্তু আসলে এই জিনিসটি কী?

আলো কোত্থেকে আসে

অধিাকাংশ ক্ষেত্রে আলোকের সৃষ্টি হয় আগুন বা তাপ থেকে। অকৃত্রিম আলো আসে সূর্য, তারা ও কোন কোন জীব-জন্তুর দেহ থেকে। তবে মানবতৈরী আলো বৈদ্যুতিক বাল্ব, জ্বলন্ত আগুন, মোমবাতি ইত্যাদি থেকে তৈরী হয়ে থাকে। কৃত্রিম বা অকৃত্রিম যেভাবেই আলোকরশ্মির বিকিরণ হোক না কেন, তা সৃষ্টি হয় বস্তুর মধ্যস্থ **এটম** বা অণূর ভেতর। যখন কোন কারণে এটমগুলো অস্থির হয়ে উঠে তখন এগুলো আলোকরশ্মি বিকিরণ করে। বিজ্ঞানের ভাষায় এ ক্রিয়াকে বলে **লাইট এমিশন** বা আলো নির্গত হওয়া। আমরা ব্যাপারটি আরও একটু বুঝার জন্য নীচের নক্সাটির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করছি।



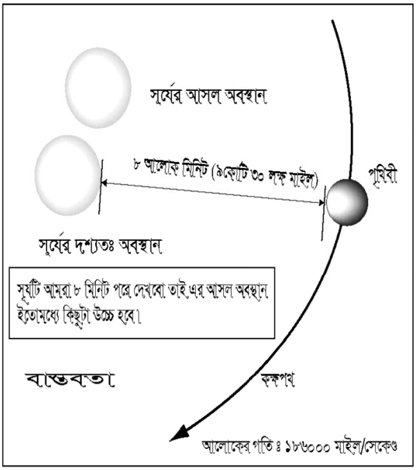
উপরের ছবিতে অতি সংক্ষেপে অণু থেকে আলোক রশ্মি নির্গত ও অণুর মধ্যে তা শুষে যাওয়ার ক্রিয়াটি অঙ্কিত হয়েছে। আলোক রশ্মির মধ্যে দু'টি উপাদান বিদ্যমান থাকে- এর একটি হলো **প্যাকেটস্ অব এনার্জি** যাকে বলে **ফটোন** আর অপরটি হলো **ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন**- যা **এনার্জি ওয়েভ** বা তরঙ্গ। এই উভয়ের সমন্বয়ে আলো বিকিরণ হয়। এখন **ফটোন** যখন এটমে এসে পতিত হয় তখন ঐ এটমের একটি **ইলেকট্রন** কিছুটা উচ্চ **এনার্জি লেভেলে** (বাইরের দিকে) লাফ মারতে পারে। এ অবস্থায় এটমটি **'অস্থির'** হয়েছে বলা হয়। ইলেকট্রনটি লাফ মারার সময় আগত **ফটোন** এটমের মধ্যে শুষে যায়। ইংরেজীতে একে বলে **এবজরফ্শন**। এ উপায়ে পতিত আলো বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া করে।

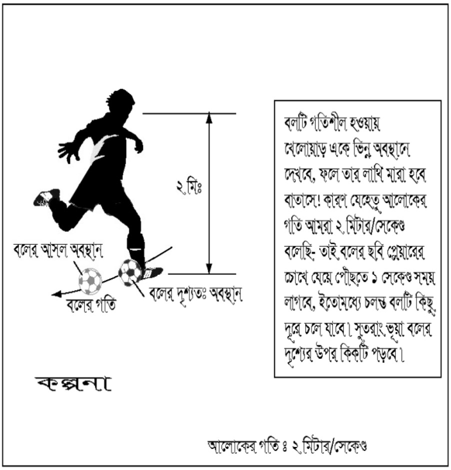
নক্সা মুতাবিক দ্বিতীয় যে ক্রিয়া এটমে সৃষ্টি হয় তারই মাধ্যমে আলোকের সৃষ্টি ও বিকিরণ ঘটে। এনার্জির মাধ্যমে যখন কোন **এটম 'অস্থির'** হয়ে ওঠে তখন **ইলেকট্রন**

উপরের **এনার্জি লেভেল** থেকে নিম্নের লেভেলে লাফ মারে। এতে সৃষ্টি হয় **ফটোন** যা **ইলেকট্রমেগনেটিক** তরঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাইরের দিকে বিকিরণ হয়- অর্থাৎ আলোকরশ্মি বস্তু থেকে বেরিয়ে আসে। এই ক্রিয়াকে ইংরেজীতে **এমিশন** বলে। সুতরাং আমরা এখন বুঝতে পারলাম কিভাবে আলোকের জন্ম ও বিকিরণ ঘটে এবং বস্তুর উপর পতিত আলো কিভাবে শুষে যায়। তবে আলোকবিজ্ঞান একটি বিরাট বিষয়। আলোকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবটুকু জানা আমাদের জন্য সম্ভব নয়- তবে আরো কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে বলছি এতে অতিরিক্ত কিছু জানা হয়ে যাবে, এটাই আশা।

আলোকের গতি

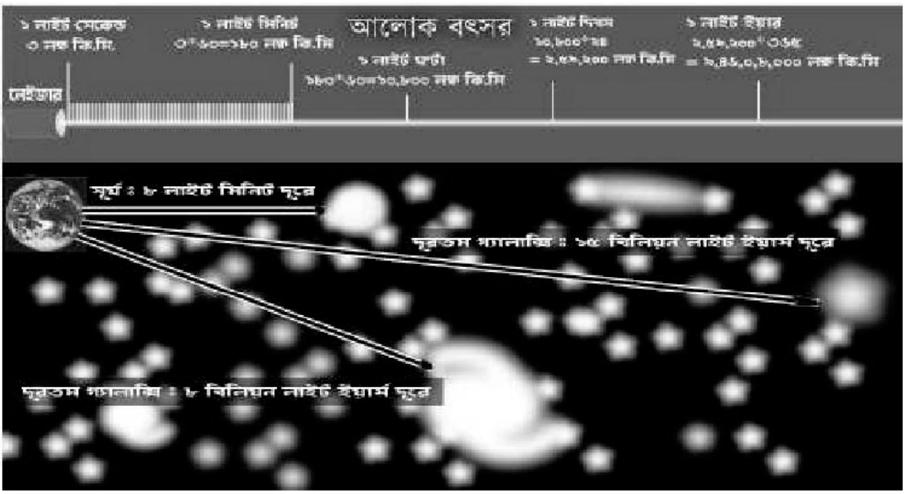
এ পর্যন্ত জানা সকল তথ্যাদি থেকে এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে সমগ্র মহাবিশ্বে সর্বোচ্চ গতিশীল জিনিস হলো আলো। এক সেকেণ্ডে আলো ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) **কিলোমিটার** বা ১,৮৬,০০০ (এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার) মাইল পাড়ি জমায়। শব্দতরঙ্গ আলোকের গতি থেকে অনেক কম গতিতে চলে। এর প্রমাণ আমি ছোটবেলা দেখেছি। অবশ্য তখন তো আর ব্যাপারটি বুঝতে পরি নি। আমাদের গ্রামের দক্ষিণে একটি ছোট্ট হাওর আছে। হাওরের মাঝখানে অনাবাদি কিছু পতিত জমির উপর অনেকেই নিজেদের গরু-গাভি লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে খুঁটি গেড়ে ঘাস খেতে দিতেন। মাটিতে খুঁটি গাড়ার সময় ভারী কোন বস্তু দিয়ে খুঁটির উপর আঘাত হানার সাথে স্বভাবতই শব্দ হয়। আমি আমাদের বাড়ির দক্ষিণের সড়কের উপর দাঁড়িয়ে প্রায়ই লক্ষ্য করতাম ব্যক্তিরা খুঁটির উপর আঘাত হানছেন কিন্তু এ থেকে সৃষ্ট শব্দটি ক্ষণকাল পরে আমি শ্রবণ করছি- ইতোমধ্যে অবশ্য আঘাত হানার দৃশ্য চোখে এসে যেতো। আমি তা দেখে মনে মনে প্রশ্ন করতাম- লোকটি খুঁটিতে বাড়ি মারার সময় শব্দটি শোনছি না কেন? তখন অবশ্য জানতাম না আলোক কিংবা শব্দের মধ্যে গতি আছে। ব্যাপারটি এরূপ দেখাতো শব্দ ও আলোকের গতির মধ্যে বিরাট তফাৎ থাকায়। আলোকরশ্মির মাধ্যমে দৃশ্য বা ছবিটি আমাদের চোখে খুব তাড়াতাড়ি আসলেও শব্দ তরঙ্গ বাতাসের মাধ্যমে পৌঁছাতে কিছু অতিরিক্ত সময় লাগে। তাই আমরা দেখি আগে কিন্তু শোনি পরে। এ কারণেই আকাশে বর্জপাতসহ বিদ্যুৎ চমকালে বিদ্যুতের আলো চোখে এসে পৌঁছার বেশ পরে এ থেকে সৃষ্ট গর্জনটি শোনা যায়। ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন কি?





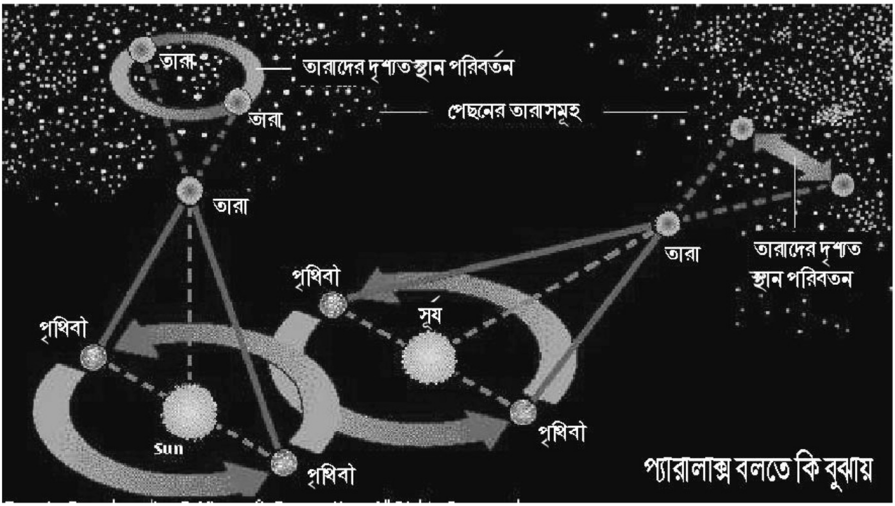
আলোক বৎসর, আস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট ও পারসেক

ইতোমধ্যে আমি আলোকের গতি বুঝাতে যেয়ে **লাইট ইয়ার** বা আলোক বৎসর কথাটি বলেছি। পাঠকরা অবশ্য বুঝতে পেরেছেন- এ কথাটির অর্থ কি। তবুও আবার বুঝিয়ে দেওয়া জরুরী মনে করছি।



আমাদের এই মহাবিশ্ব সত্যিই **'মহা'**- অর্থাৎ আশ্চর্যজনকভাবে বিরাট। ইতোমধ্যে বলেছি, নিকটতম তারার দূরত্ব প্রায় চার আলোক বৎসর। **'আলোক বৎসর'** বলতে একটি সৌর বছরের মধ্যে আলোকরশ্মি যতটুকু দূরত্বে ভ্রমণ করে তাকে বুঝায়। মহাকাশ বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই আলোক বৎসর ইউনিটটি দূরত্ব মাপার জন্য সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে এক আলোক বৎসর খুব বড় অঙ্কের একটি নাম্বার। উপরের ছবিটি একটু মনোযোগসহ দেখে নিন। আমরা সংখ্যায় বলতে পারি এক আলোক বৎসর = ৯,৪৬১,০০০,০০০,০০০ **কিলোমিটার**। **ইম্পিরিয়াল** হিসাবে তা ৫,৮৮০,০০০,০০০,০০০ মাইল।

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বিশেষ সুবিধার্থে **আস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট** নামক আরেকটি মাপ ব্যবহার করে থাকেন। **১ আস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (এইউ)** = সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব যা হিসেব করে দেখা গেছে **১৪৯,৬০০,০০০ কিলোমিটার** (বা ৯২,৯৫৬,০০০ মাইল)। সাধারণত সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে দূরত্ব নির্ণয়ে এই হিসাবটি ব্যবহৃত হয়।



মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারা ও গ্যালাক্সির বিরাট বিরাট দূরত্ব মাপার জন্য অপর আরেকটি **ইউনিট** ব্যবহার করে থাকেন যার নাম হলো, **'পারসেক'**। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীটি কক্ষপথে ঘুর্ণনের ফলে দূরবর্তী তারার অবস্থান ভিন্ন স্থানে দেখা যায়। এই

দৃশ্যত স্থান-পরিবর্তকে বলে **স্টেলার প্যারালাক্স**। এটা প্রতি ৬ মাস অন্তর সর্বাপেক্ষা বেশী লক্ষ্যণীয়। এসময় অবশ্য পৃথিবী তার কক্ষপথের দুই বিপরিত দূরত্বে থাকে। বিজ্ঞানীরা **স্টেলার প্যারালাক্স** থেকে তারাটির দূরত্ব মাপেন। তারার আসল ও দৃশ্যত অবস্থানের মধ্যে কোণের ভিন্নতা সিহাব করে বের করে তারার দূরত্ব একটি **স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট** দ্বারা নির্ণয় করেন। যে **ইউনিট** দ্বারা মাপা হয় তাকে বলে **পারসেক**। এক **পারসেক = ৩.২৬ আলোক বৎসর** (যা ২০৬,২৬৫ **এএউ**- উপরের নক্সাটি দেখুন)।

ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট

আলোক রশ্মির মধ্যে যে **এনার্জি** বা শক্তি আছে তা একটি বিশেষ উপায়ে অণুর মধ্যে ক্রিয়া করে। পতিত আলো অণুর ইলেকট্রনকে ফ্রি করে দেয়, ফলে এটা গতিশীল হয়ে ওঠে। আর কোন কিছু গতিশীল হলে তাতে থাকে গতিময়তার **এনার্জি** যাকে বলে **কিনেটিক** এনার্জি। যেসব ধাতুর মধ্যে **'লো এক্টিভেশন এনার্জি'** বা কম শক্তিতে ইলেকট্রনকে ফ্রি করার গুণাবলী আছে ওগুলো দ্বারা **সৌরব্যাটারি** বা **ফটোইলেকট্রিক সেল** ও ফটোনিরূপক হিসাবে যন্ত্র তৈরী হয়ে থাকে। নিশ্চয় আপনি **ইলেকট্রনিক** ঘড়ি ও কালকুলেটরে **সোলার** ব্যাটারি দেখেছেন। এগুলোতে এই **ফটোইলেকট্রিক ইফেক্ট** কাজে লাগানো হয়েছে।

ফটোকেমিক্যাল নিরূপণ

আমরা জানি আলোকরশ্মি মূলত **ফটোন** থেকে সৃষ্ট। **ফটোগ্রাফিক ফিল্মে** এই **ফটোন** থেকে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা একটি উৎকৃষ্ট উপমা। এটা **ফটোইলেকট্রিক ডিটেকশন**। ফিল্মে পতিত আলোর মধ্যে বিভিন্ন এনার্জিসম্পন্ন **ফটোন** থেকে **নেগিটিভ** অঙ্কিত হয়। ক্যামেরার মতো আমাদের চোখও কাজ করে। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন **ফটোন** চোখের মধ্যে পতিত হয়ে **কেমিকেল** পরিবর্তন ঘটায় যা নার্ভসেলের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যেয়ে ছবিতে পরিণত হয়। আমরা এব্যাপারে পরে আলোচনা করবো।

অন্যান্য ইফেক্ট

আলোকবিজ্ঞানে আরো অনেক কিছু গবেষণা হয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি কিভাবে আলো তৈরী হয়ে ভ্রমণ করে ও কিছু কিছু বিশেষ বস্তুর উপর পতিত হয়ে ব্যবহারযোগ্য শক্তির সৃষ্টি করে। আলো বিভিন্ন বস্তুতে পতিত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়া করে

যা বস্তুর স্বরূপের উপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি বিশেষ ইফেক্টের কথা অত্যল্প ব্যাখ্যাসহ বলে রাখবো মাত্র।

রিফ্রেকশনঃ আলো যখন এক **মিডিয়াম** বা মাধ্যম থেকে অপর ভিন্ন গুণসম্পন্ন মিডিয়ামে ভ্রমণ করে তখন তা বক্র হয়। এই বক্র হওয়ার নাম হলো **রিফ্রেকশন** বা প্রতিসরণ। যেমন পানি থেকে বাতাসে ভ্রমণের সময় উভয় মিডিয়ামের মিলনস্থলে আলো কিছুটা বাঁকা হয়ে যাওয়া। এরূপ হওয়ার কারণ হলো উক্ত মিডিয়ামদ্বয়ে আলোকরশ্মির ভ্রমণ গতির মধ্যে ভিন্নতা।

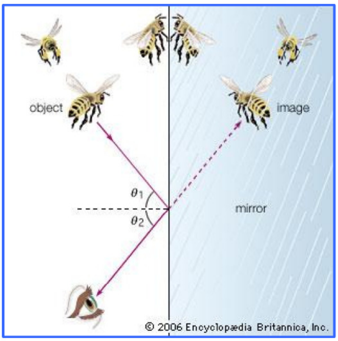


বাতাসে যে গতিতে আলো চলে তার তুলনায় পানিতে অনেক কম গতিতে ভ্রমণ করে। সুতরাং একটি থেকে অপরটিতে পদার্পনের সময় গতি পাল্টাতে হয়। এ থেকেই বক্রতার সৃষ্টি হয়। কিভাবে কতটুকু **রিফ্রেকশন** হবে তা নির্ভর করে বস্তুর **রিফ্রেকটিভ ইনডেক্সের** উপর। শূন্যস্থানে (বা **ভাকিউমে**) ও বস্তুর ভেতরে আলো চলার গতির মধ্যে যে তারতম্য বিদ্যমান তার হিসাবই হলো **রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স**।

বাস্তবে, **রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স = আলোকের গতি (ভাকিউম) / আলোকের গতি (বস্তুর ভেতর)**। নিম্নে কিছু সচরাচর বস্তুর **রিফ্রেকটিভ ইনডেক্স (আরআই)** দেওয়া হলো।

বস্তু	**আরআই**
শূন্যস্থান (ভাকিউম)	১.০০০০
বাতাস	১.০০০৩
বরফ	১.৩০৯০
পানি	১.৩৩০০
ইথিল আলকহল	১.৩৬০০
গ[illegible]াস	১.৪৬ - ১.৫২
লবন (সোডিয়াম ক্লোরিড)	১.৫৪০০
হীরা	২.৪২০০

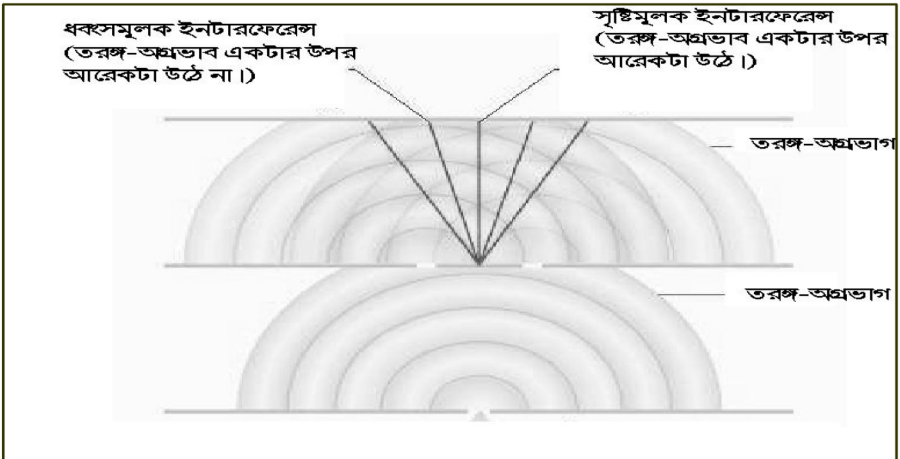
রিফ্লেকশন: দু'টি বস্তুর মিলনস্থলে **রিফ্লেকশন** বা প্রতিফলন হয়। ভ্রমণকালে আলো প্রথমে যে মিডিয়ামের উপর ছিল দ্বিতীয়টিতে পতিত হয়ে কিছুটা সেটিতে প্রতিফলিত হবে। কোন সোজা লাইনে পতিত আলোকরশ্মি সোজা লাইনে আবার প্রতিফলিত হবে। তবে যে **ডিগ্রী** কোণে তা পতিত হবে ঠিক সে **ডিগ্রী** কোণে তা আবার প্রথম মিডিয়ায় প্রতফিলিত হবে- যেমনটি হয় একটি বল মাটিতে পতিত হয়ে লাফিয়ে ওঠার সময়। রিফ্লেকশনের মাধ্যমে আয়না ও নীরব পানিতে প্রতিচ্ছবি দেখায়।



স্কাটারিং: আলোকরশ্মির মধ্যে তরঙ্গ বিদ্যমান। এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য থেকেও অধিক দূরত্বের মধ্যে যদি কোন আলোকভেদ্য (**ট্রান্সপারেন্ট** - যেমন কাচ) বস্তুর অণুগুলো সমভাবে বিস্তৃত না থেকে, দলে দলে বিভিন্ন স্থানে থাকে, তাহলে এরূপ বস্তুর মধ্যে পতিত আলো স্কাটার বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়। অর্থাৎ বস্তুটির মধ্যকার মলিকিউলগুলো যদি সমভাবে সাজানো না থাকে তাহলে এর ভেতর আলোক পতিত হয়ে চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে। সুতরাং এরূপ কোন কাচের অপরপ্রান্তের সবকিছু ঝাপসা-ঝাপসা লাগবে।

সূর্যের আলো আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পতিত হয়ে উপরে বর্ণিত কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ফলে আকাশটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সূর্যের আলো যেহেতু বিভিন্ন রংবিশিষ্ট আলোকরশ্মির সমন্বয়ে গঠিত তাই বায়ুমণ্ডল বিশেষ কোন রংয়ের আলো অপরটি থেকে বেশি স্কাটার করে। যেমন **ভাইলোট** আলো বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের চোখ এই আলো দেখতে অপারগ। কিন্তু এর পরবর্তী বেশি স্কাটার করা আলো হচ্ছে নীল- যা আমাদের চোখ দেখতে পারে ঠিকই। এ কারণে আকাশটি নীল দেখায়। কোন্ ধরনের আলো কোন্ ধরনের বস্তু বেশি বা কম স্কাটার করে তা মাপা যায়। বিজ্ঞানীরা আলোকের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে দূরে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহের বায়ুমণ্ডলে কি কি বস্তু এবং কতটুকু আছে তা নির্ণয় করতে পারেন।

ইন্টারফেরেন্স: দুই বা ততোধিক আলোক রশ্মির তরঙ্গ একত্রিত হলে এই ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। যখন কোন আলোকরশ্মি একটি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে যায় তখন তরঙ্গের সমানদিক অপরপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্রিয়াকে বলে **ডিফ্রেকশন**। কিন্তু যখন এই তরঙ্গ দু'টি পাশাপাশি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চলে অপরপ্রান্তে যাবে তখন দু' ধরনের **ইন্টারফেরেন্স** ঘটবে। এর একটি হলো **কন্সট্রাকটিভ**- বা গঠনমূলক আর অপরটি হলো **ডিস্ট্রাকটিভ** বা ধ্বংসাত্মক [দেখুন, নীচের ছবিটি]। আলোকরশ্মির এই



গুণটিও মানুষ কাজে লাগিয়েছে। **'হলোগ্রাফি'** নামক তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন এক ধরনের ফটোগ্রাফি আছে। নিশ্চয় পাঠকরা তা দেখে থাকবেন। কোন কোন টাকা-পাউণ্ডের নোটে এরূপ **'হলোগ্রাম'** ছবি থাকে যাতেকরে নোটকে নকল করা সম্ভব না হয়।

আপনি জানেন কিঃ সূর্যকে আমরা তার সঠিক স্থানে কখনও দেখতে পাই না। এর কারণ হলো সূর্য থেকে আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ৮ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। এর ফলে যেখানে আমরা সূর্যকে দেখি সে আসলে ওখানে নয়! আট মিনিট পূর্বে এখানে ছিল। সুতরাং সর্বদাই সূর্যের সত্যিকার অবস্থান কিছুটা উপরে থাকে। এভাবে তারাগুলোও আমরা তাদের সঠিক স্থানে দেখি না। অতীতে যেখানে ছিল সেখানে দেখতে পাই। নিকটতম তারা চার আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করছে। সুতরাং এই তারাটি এখন দেখছি আমরা যে স্থানে সেখানে সে চার বৎসর পূর্বে ছিল- কারণ তার ছবি (আলোকরশ্মি) আমাদের চোখে এসে পৌঁছতে ইতোমধ্যে চার বছর পার হয়ে গেছে (চার আলোক বৎসর)। প্রিয় পাঠক! একটু ভাবুন- আমাদের দেখাও যে সঠিক নয় তা কি এবার অনুধাবন করেছেন? ভাগ্যিস! আলোকের গতি এতো বেশী। যদি তা না হয়ে এক মিটার প্রতি সেকেণ্ড হতো তাহলে একটু চলমান কাছের জিনিসও ধরতে যেয়ে আমাদেরকে বেগ পোহাতে হতো। কারণ আলো ছাড়া বস্তু দেখা যায় না। আলো আসতে যে সময় লাগে সে সময়ের ভেতর বস্তুটি কিছুদূর চলে যেতো। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস আর হকি- এসব খেলা গুল্লায় যেতো। ব্যাপারটি বুঝার জন্য নিম্নের পরের পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখুন।



আলো, বস্তু ও দেখা

পরিচ্ছেদ ২২

চুম্বক ও চুম্বকবিদ্যা

নিশ্চয় আপনি চুম্বক কি জিনিস জানেন। অনেকে হয়তো চুম্বক নিয়ে খেলা করেছেনও। চুম্বকের মধ্যে এক অদেখা শক্তি বিদ্যমান থাকে। পানিতে ভাসমান চুম্বক উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর দিকে ঘুরে যায়। দু'টি বিপরীত (একটি **পজিটিভ** ও অপরটি **নেগিটিভ**) চুম্বক একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে এবং একই মেরুর (পজিটিভ-**পজিটিভ** কিংবা **নেগিটিভ-নেগিটিভ**) দু'টি চুম্বক একে অন্যকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। চুম্বকের সাথে যারা পরিচিত তারা অবশ্যই এসব ব্যাপার লক্ষ্য করে থাকবেন। অবশ্য হয়তো অনেকের জানা নেই- চুম্বক ও তার গুণাবলীকে আজকের প্রযুক্তি খুব বেশি করে কাজে লাগাচ্ছে। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করবো। প্রথমে জেনে নিই চুম্বকের এই বিশেষ চরিত্রের আসল কারণগুলো কি।

চুম্বক শক্তি কি

চুম্বকের মধ্যে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তা স্বভাবের চারটি মৌলিক শক্তির একটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ শক্তির নাম **ইলেকট্রমেগনেটিজম**। চুম্বকের সঙ্গে অপর যে ব্যাপারটি জড়িত তাহলো বিদ্যুৎ। এ কারণেই উল্লেখিত শক্তির নামকরণ হয়েছে **ইলেকট্রমেগনেটিক ফোর্স**। চার্জকরা পরমাণু যেমন **ইলেকট্রন** যখন চলন্তাবস্থায় থাকে তখনই চুম্বকের মধ্যে অদেখা শক্তিটি জন্ম নেয়। প্রতিটি চুম্বকের চতুর্দিকে থাকে **'মেগনেটিক ফিল্ড'**। নীচের (পরের পৃষ্ঠার) ছবিতে এই ফিল্ডটি দেখা যাচ্ছে।



বিভিন্ন ধরনের ধাতু ও **গ্যাস** আছে যেগুলো চুম্বক হয় বা হতে পারে। কোন বস্তুর **মেগনেটিক** বৈশিষ্ট্যকে কয়েকটি আলাদা ক্যাটাগরীতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো: **১. ডায়ামেগনাটিক** (প্রতিক্রিয়াশীল চুম্বক)। এই চুম্বকের আসল গুণ হলো **মেগনেটিক** ফিল্ডকে নেগিটিভভাবে বিকর্ষণ করা। **বিজমাথ, বেনজীন** ইত্যাদি হলো **ডায়ামেগনাটিক** বস্তু। **২. প্যারামেগনেটিক** (সমান্তরাল চুম্বক)। এসব চুম্বক **মেগনেটিক** ফিল্ডের সঙ্গে সমান্তরাল (**প্যারালাল**) থাকে। **৩. ফেরোমেনগাটিক** (লৌহ চুম্বক)। শেষোক্ত চুম্বকটিই আমরা সচরাচর দেখে থাকি। এটি সাধারণত লৌহজাত ধাতু থেকে সৃষ্ট। লোহা, **নিকেল, কোবল্ট** ইত্যাদি বস্তু হলো **ফেরোমেগনাটিক**। লৌহজাত চুম্বকের স্থায়িত্বও বেশিদিন হয়। অবশ্য প্রচণ্ড তাপের মাধ্যমে লৌহজাত চুম্বকও আর চুম্বক থাকে না। সাধারণত ৭৭০ **ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১৩০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট)** কিংবা ততোধিক তাপমাত্রা হলে লোহার তৈরী চুম্বক তার গুণাবলী হারিয়ে ফেলে। এই তাপমাত্রাকে **'কিউরি টেম্পারেচার'** বলে। তেজস্ক্রিয়ার আবিষ্কারক মেরি কিউরীর স্বামী **পিয়ারে কিউরী (১৮৫৯-১৯০৬)** এই তাপমাত্রা সম্পর্কে **১৮৯৫** সালে অবগত হয়েছিলেন।

চুম্বকের ব্যবহার

আগেই বলেছি চুম্বকের ব্যবহার আজকাল সর্বত্র। চুম্বকের সঙ্গে **ইলেকট্রিসিটির** সম্পর্ক থাকায়ই তা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক যুগে বলতে গেলে যাবতীয় **ইলেকট্রিক** যন্ত্রপাতিতে কোনোও না কোনোভাবে চুম্বকের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। **অটোমেটিক চুইচিং** এর জন্য চুম্বকের জুড়ি নেই। এর কারণ হলো, **'রিলে'** নামক যে যন্ত্রটির মাধ্যমে এই **চুইচিং** হয়ে তাকে তা বাস্তবে একটি **ইলেকট্রমেগনেট**। **ইলেকট্রিক কারেন্ট** চললেই এই যন্ত্রটি একটি মেগনেটে রূপান্তর হয় এবং অপর

একখণ্ড ধাতুকে আকর্ষণ করে সুইচ অন কিংবা অফ অবস্থার সৃষ্টি করে। **কম্পিউটার** টেকনোলজিতেও **মেগনেটিক** বস্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টেপরেকর্ডারের টেপ ও **মেগনেটিক** ডিস্কেও তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। টেলিফোন, **মোবাইল** ইত্যাদি যন্ত্রপাতিতে **মেগনেট** ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন তো চুম্বক ছাড়া হবেই না- কারণ জেনারেটরের মৌলিক অংশ হচ্ছে চুম্বক। আর বিদ্যুৎ থেকে যখন **মেকানিকেল এনার্জি** বানানোর প্রয়োজন দাঁড়ায় তখন দরকার পড়ে **ইলেকট্রিক** মটরের। এই যন্ত্রেরও মৌলিক **পার্টস্** হলো চুম্বক।

উপরে উল্লেখিত ছোটখাটো যন্ত্রপাতিতেই যে চুম্বক ব্যবহৃত হয় তা মোটেই নয়। অত্যাধুনিক **ডায়াগনস্টিক** যন্ত্র যেমন **নিউক্লিয়ার মেগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (এনএমআরই** বা **এমআরআই), মেগনেটিক** ট্রেইন ও **পার্টিকেল এক্সেলেটর** ইত্যাদিতেও চুম্বক ও এর গুণাগুণকে কাজে লাগলো হচ্ছে মানবকল্যাণে।

আপনি জানেন কি: আমাদের এই পৃথিবীটি একটি বিরাট চুম্বক। গ্রহের অভ্যন্তরে লৌহজাত দ্রব্যের তরল একটি বড় অংশ বিদ্যমান। একে **কৌর** বা কেন্দ্র বলে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই লোহার তৈরী **কৌর** থাকায়ই পুরো পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাকাশে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি **মেগনেটিক** ফিল্ডের সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাশ থেকে আগত ক্ষতিকর **'কজমিক রে'** বা তেজস্ক্রিয়া ও সূর্য থেকে সৃষ্ট **'সোলার উইন্ড'** (সৌরবাতাস) থেকে এই **মেগনেটিক ফিল্ড** আমাদেরকে রক্ষা করে। এসব ক্ষতিকর বস্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং উপরিভাগে এসে পৌঁছতে পারে না।



পরিচ্ছেদ ২৩

বস্তু বা মেটার

ইতোমধ্যে আমরা অনেকবার সৃষ্ট জগতের উপাদান '**বস্তু**' সম্পর্কে বলেছি। এতে আমাদের বস্তু সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা জন্ম নিয়েছে। তবে বস্তু সম্পর্কে আরো অনেককিছু জানার আছে। এ পরিচ্ছেদে আমরা এসব অতিরিক্ত বিষয়ের উপর আলোচনায় যাচ্ছি।

বস্তুকে আগেকার দিনে যেভাবে দেখা হতো ঠিক সেরূপ আর হয় না। সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, "**মেটার বা বস্তু ঐ জিনিসকে বুঝায় যার গুণাবলীর মধ্যে স্থানকে দখল, মহাকর্ষ সৃষ্টি ও ইনারশা শক্তি বিদ্যমান**।" তিনটি গুণের প্রথম দু'টি সহজেই বোধগম্য তবে শেষোক্ত শক্তিটি বস্তুর মধ্যে কিভাবে জন্ম নিতে পারে সে ব্যাপারে আরো বলার আছে। বস্তু যখন চলন্ত কিংবা স্থির থাকে তখন অন্য কোন শক্তির অনুপস্থিতিতে তার এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। বস্তুর এই মৌলিক গুণকে **ইনারশা** বলে। ব্যাপারটি আরোও পরিষ্কার হবে আমরা যদি গতিবিদ্যার প্রথম আইনকে (**নিউটন্স ফার্স্ট লো অব মোশন**) এখানে ব্যক্ত করি। এতে বলা হয়েছে, "**কোন বস্তু স্থির থাকলে এ অবস্থায়ই থাকে, আর চলন্ত থাকলেও সোজা লাইনে চলতে থাকবে যদি অন্য কোন বাইরের শক্তি বস্তুটির উপর ক্রিয়া না করে**।" আমরা যখন গাড়ি কিংবা রেলে ভ্রমণ করি তখন এই **ইনারশা** শক্তি অনুভুত হয়। গড়িটা চলা শুরু করলেই আমাদেরকে উল্টো দিকের একটি শক্তি সীটের মধ্যে ঠেলে ধরে। এই শক্তিটিই হচ্ছে আমাদের দেহের **ইনারশা**। গাড়িটি একই গতিতে চলন্তাবস্থায় কিন্তু এই শক্তি আর থাকে না- তখন আমাদের দেহটি গাড়ির সাথে সোজা লাইনে চলতে থাকে। তবে কোনদিকে মোড় দিলে সেই **ইনারশা** আবার আত্মপ্রকাশ করে- কারণ সোজা লাইন থেকে আমাদেরকে গড়িটি বাঁকা করে নিচ্ছে।

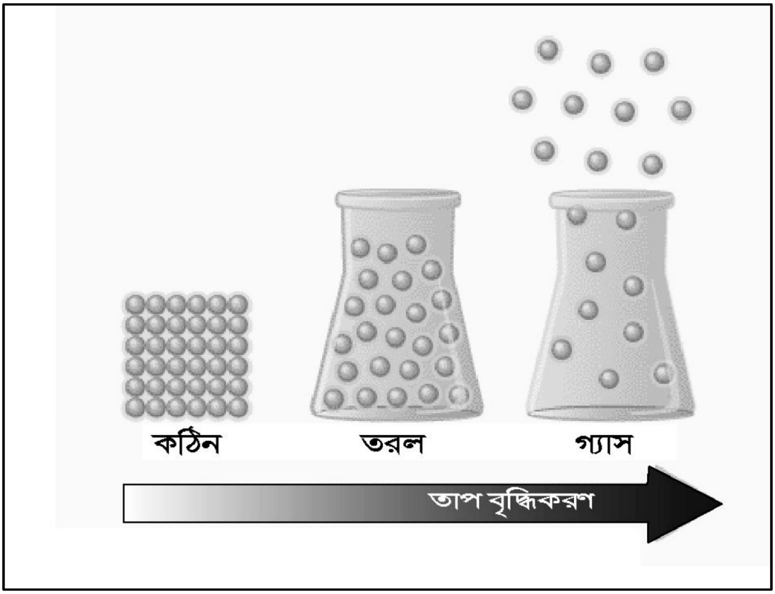
বস্তুর মৌলিক উপাদান

কিছু বিশিষ্ট পরমাণুর সমন্বয়ে গড়ে উঠে অণু বা **এটম**। এরপর এই এটমগুলো বিশেষভাবে **কেমিকেল বন্ড (রসায়নিক** সংযুক্তি) এর মাধ্যমে একত্রিত হয়ে গড়ে তুলে বস্তুর **মলিকিউল**। আর এই **মলিকিউল** কিভাবে সাঁজানো আছে এবং এতে ক'টি কোন্

ধরনের **এটম** বিদ্যামান ইত্যাদি থেকে নির্ণিত হয় বস্তুর ধরন ও গুণাবলী। বস্তুটি মৌলিক না যুক্ত পদার্থ, তার রং, রূপ, শক্তি, গন্ধ, স্বাদ, অবস্থা (কঠিন, তরল না বাষ্প) ইত্যাদি যাবতীয় গুণাবলী নির্ভর করে কিভাবে কোন্ কোন্ মৌলিক বস্তুর পদার্থ থেকে এটি সৃষ্ট।

বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা

ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানে বলা হতো, বস্তুর মৌলিক তিনটি অবস্থা আছে। এগুলো হলো কঠিন, তরল ও বাষ্প। আধুনিক যুগে এসে আমরা অপর একটি অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছি যাকে বলে **প্লাজমা**। সুতরাং বুঝা গেল, বস্তু মোট চারটি অবস্থার যে কোন একটি ধারণ করে অস্তিত্ব বজায় রাখে। আমরা এখন এই চার অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি।



কঠিন পদার্থ

কঠিন পদার্থ বা বস্তুর মধ্যে কিছু বিশেষ গুণাগুণ আছে যার ফলে তা তরল, বাষ্প কিংবা **প্লাজমা** থেকে ভিন্ন। প্রথমত এটা কোন ভারী জিনিস বহন করতে সক্ষম। কঠিন পদার্থ নিজস্ব আয়তন ও গঠন সংরক্ষণ করতে পারে। অধিকাংশ বস্তু অল্প গরম

হয়েও তা কঠিন পদার্থ হিসাবেই অস্তিত্ব বজায় রাখে। সাধারণত বস্তুর অবস্থার রদবদল ঘটে তাপের ফলে। কোন কঠিন পদার্থ তাপের ফলে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন পানি বরফ (একটি কঠিন পদার্থ) অবস্থায় থাকলে তাপমাত্রা ০ **ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড** কিংবা এর নীচে থাকবে। কিন্তু এর থেকে বেশি হলে তা গলে তরল পদার্থে রূপান্তরিত হবে। যে তাপমাত্রায় কোন বস্তু কঠিন থেকে তরল বস্তুতে রূপান্তরিত হয় তাকে বলে **'মেল্টিং পয়েন্ট'** (গলনাঙ্ক)। এরপর যে তাপমাত্রায় বস্তুটি বাষ্পে রূপান্তরিত হয় তাকে বলে, **'বয়েলিং পয়েন্ট'** (স্ফুটনাঙ্ক)।

তরল পদার্থ

তরল পদার্থের মলিকিউলগুলো কঠিন পদার্থের তুলনায় অনেকটা কম আঁটসাঁট, কিন্তু বাষ্প অবস্থা থেকে বেশি। অর্থাৎ এর **মলিকিউল** মধ্যম অবস্থায় বিরাজ করে। কোন একটি পাত্রে যদি তরল পদার্থ রাখা হয় তাহলে তা পাত্রের আকার ধারণ করবে। অবশ্য বাষ্পও তা-ই করে। ব্যবধান হলো তরল পদার্থ পাত্রে পড়ে একটি বিশিষ্ট আয়তন বা **ভলিউম** রক্ষা করবে কিন্তু **গ্যাস** পাত্রটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। মনে করুন এক লিটার তরল পদার্থ একটি দু'লিটার পাত্রে রাখলেন। ফলে পাত্রের আকার ধারণ করে বস্তুটি একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত ভরে ওঠবে। কিন্তু এই একই পরিমাণ **গ্যাস** যদি উক্ত পাত্রে রাখেন তাহলে তা সমগ্র পাত্রে ছড়িয়ে পড়বে।

অধিকাংশ বস্তু সঠিক তাপ ও চাপে তরল অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন পানি কক্ষতাপে (**রুম টেমপারেচার- ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড- ৬৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট**) ও সাধারণ বায়ুচাপে (বা সাগর লেবেলের বায়ুচাপে) তরল অবস্থায় থাকে। কিন্তু এই একই অবস্থায় **হিলিয়াম** একটি গ্যাসীয় বস্তু, এটাকে তরল করতে তার তাপমাত্রা অনেক কমাতে হবে না হয় উচ্চচাপ দিতে হবে। অপরদিকে ধাতু যেমন লোহা সাধারণভাবে (কক্ষতাপ ও বায়ুচাপে) একটি কঠিন পদার্থ। একে তরল করতে হলে তার তাপমাত্রা **১৩৩৫ ডিগ্রী** সেন্টিগ্রেডে নিয়ে যেতে হবে। সাধারণ কক্ষতাপ ও বায়ুচাপে মাত্র তিনটি **কেমিকেল** মৌলিক পদার্থ তরল অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এগুলো হলো **ব্রোমিন, গ্যালিয়াম** ও **মারকারি** (পারদ)। বাকী সব মৌলিক পদার্থ হয় ধাতু না হয় বাষ্প অবস্থায় অস্বিত্বশীল আছে।

তবে হ্যাঁ, অনেক **কম্পাউন্ড** বা যুক্ত পদার্থ অবশ্যই স্বাভাবিক তিনটির যে কোন একটি অবস্থায় থাকতে পারে। আগেই বলেছি, বস্তুর **মলিকিউল** কিভাবে আঁটসাঁট আছে তার উপর নির্ভর করে তার অবস্থা- সে কঠিন, তরল না বাষ্প। মলিকিউলগুলো যদি একটা থেকে আরেকটার অতি কাছে থাকে তাহলে বস্তুটি কঠিন পদার্থ, যদি কিছু দূরে থাকে তাহলে তা তরল ও বেশি দূরে থাকলে সেটা গ্যাসে পরিণত হবে। এই রদবদল করতে যেয়ে অবশ্যই পুরো বস্তুর মধ্যে **এনার্জি** যোগান দিতে হবে। বস্তুর অবস্থা দু' ধরনের **এনার্জি** দ্বারা রূপান্তর সম্ভব। এর একটি হলো তাপ আর অপরটি চাপ। তাপ কিংবা চাপ পেলে মলিকিউলগুলো একটা আরেকটা থেকে দূরে সরে পড়ে কঠিন থেকে তরলে রূপান্তর হয়। আরো বেশী তাপ/চাপের ফলে তা বাষ্পে পরিণত হবে। তাহলে আমরা এখন এটা নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে বস্তুর অবস্থা তরল, কঠিন বা বাষ্প হওয়া নির্ভর করে চাপ ও তাপের মাত্রার উপর। এখন একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। পানি সাধারণত রুমতাপ (২০$^\circ$ সেঃ) ও বায়ুচাপে (সাগর লেবেলে এই চাপের পরিমাণ **১ আতমোসস্ফিয়ার**) ১০০$^\circ$ সেঃ তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হলো **এভারেস্ট** (৮,৮৫০ মিঃ / ২৯,০৩৫ ফুঃ)। সেখানে মাত্র ৭০$^\circ$ সেঃ (১৫৮$^\circ$ ফাঃ) তাপমাত্রায় পানি বাষ্পে পরিণত হয়। এর কারণ হলো, এই পর্বতশৃঙ্গে বায়ুচাপের পরিমাণ মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ।

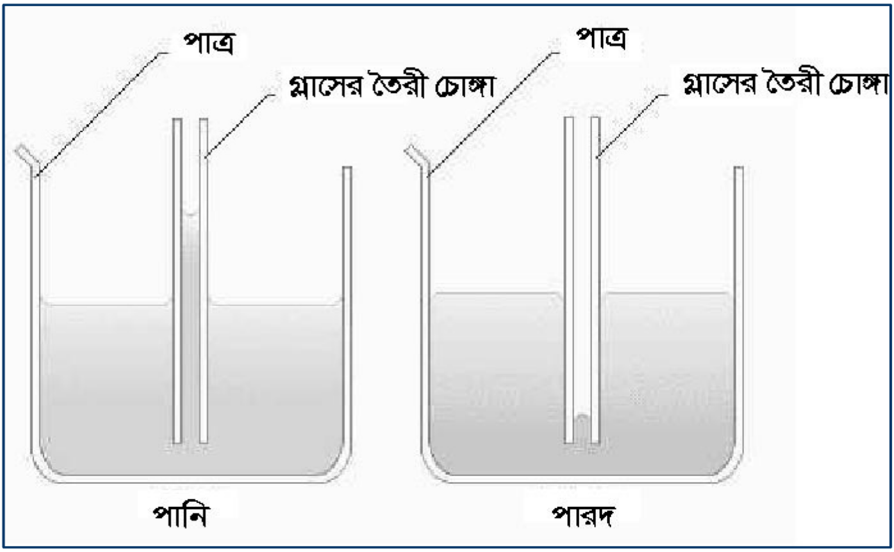
বস্তু যখন তরল অবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যে আরো কিছু গুণাবলী বিরাজ করে, যা গবেষণা করা হয়। আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ক'টির সংজ্ঞা দিচ্ছি মাত্র।

ফ্রিজিং পয়েন্ট ঃ ইতোমধ্যে এ সম্পর্কে বলেছি। তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরের জন্য যে পরিমাণ তাপমাত্রা নামানোর প্রয়োজন হয় তাকে বলে বস্তুর **ফ্রিজিং পয়েন্ট** বা হিমাঙ্ক। এই একই তাপমাত্রায় একটি কঠিন পদার্থ তরলে রূপান্তর হতেও পারে। তাপমাত্র বাড়লে তা তরল ও কমলে কঠিন পদার্থ হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে অধিকাংশ বস্তুর **ভলিউম ফ্রিজিং** পয়েন্টে তরল অবস্থা থেকে ১০% কমে যায় কারণ, তার মলিকিউলগুলো অনেকটা আঁটসাঁট হয়ে পড়ে।

ভিসকোসিটি ঃ তরল পদার্থকে চলন্তাবস্থায় নিতে কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তার একটি মাপকে **ভিসকোসিটি** বলে। বাংলায় বলা যায় বস্তুর পিচ্ছিলতার হিসাব। বস্তু যতো কম **ভিসকাস** হবে তার মধ্যে পিচ্ছিলতা ততো বেশি হবে।

সারফেস টেনশন ঃ বস্তুর বহির্ভাগে এক ধরনের শক্তি বিদ্যমান থাকে যার ফলে মনে হয় তাতে একটি চামড়া বিদ্যমান। বস্তুর এই গুণকেই বলে **'সারফের টেনশন'**। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বৃষ্টির ফোটার কথা বলতে পারি। ফোটাটি যেনো মনে হয় কোন অদৃশ্য বেলুনের ভেতরে আছে। বাস্তবে ফোটার চতুর্দিকে একটি শক্তি বিদ্যমান- আর এই ফোর্সই হচ্ছে **সারফেস টেনশন**। পুকুরে কিছু ছোট্ট পোকা দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো অনায়াসে পানির উপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে পারে, অথচ ডুবে যায় না। এসব পোকা পানির **সারফেস** নেটশনকেই কাজে লাগায়। তাদের দেহের ওজন সারফেসে বিদ্যমান শক্তির তুলনায় কম। বস্তুর ভেতরের প্রতিটি মলিকিউলের চতুর্দিকে সমপরিমাণ **মলিকিউল** থাকায় সেখানকার নেট শক্তি শূন্য হয়। কিন্তু বাইরের মলিকিউলগুলোর একদিকে তেমন বেশী অন্যান্য **মলিকিউল** না থাকায় নেট শক্তি শূন্য থেকে বেশী হয় ফলে **সারফেস** টেনশনের জন্ম নেয়।

কাপিলারি একশন ঃ তরল পদার্থের এই গুণকে বাংলায় কৈশিক আকর্ষণ বলে। তরল পদার্থের এই ক্রিয়াটি সত্যিই চিত্তাকর্ষক। বস্তুর মলিকিউলগুলো নিজেদের তুলনায় যে পাত্রে আছে সে পাত্রের মলিকিউলের প্রতি আকর্ষিত হওয়ায় এই ক্রিয়ার জন্ম নেয়। এতে বস্তুর কিছুটা একটি গ-াসের টিউবের মধ্য দিয়ে তরল বস্তু অনেকটা উপরের



দিকে বেয়ে ওঠে। বুঝা যায় যেনো তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটেছে। ব্যাপারটি বুঝতে নিম্নের ছবিটির প্রতি লক্ষ্য করুন। এই **কাপলিারী** একশনের কারণে **টিস্যু** কাগজ পানিতে ডুবালে অনেকটা উপর পর্যন্ত সিক্ত হয়ে যায়। আবার যদি কোন বস্তুর **মলিকিউল** নিজেদের প্রতিই বেশি আকর্ষিত হয় তাহলে এর উল্টো ক্রিয়া ঘটে। তখন টিউবের উপরে না ওঠে তা নীচে নেমে যায়।

মিসিবিলিটি ঃ এটা একাধিক তরল বস্তুর মিশ্রণ কতটুকু সম্ভব তার একটি হিসাব। বলা যায় মিশ্রণগুণ। পানি আর তৈল মিশে না। এর কারণ এদের **মিসিবিলিটি** অনেকটা কম। অপরদিকে এলকাহলের সাথে তা মিশে যাবে। বস্তুর **মলিকিউল** হয় **পোলার** না হয় **নন-পোলার** হয়ে তাকে। **পোলার** অর্থ এগুলোর মধ্যে **পজিটিভ** ও **নেগিটিভ** এই উভয় **চার্জ** বিদ্যমান। এর ফলে একটা আরেকটাকে আকর্ষণ করে রাখে। অপরদিকে **নন-পোলার** বস্তুর **মলিকিউল** একটা আরেকটার প্রতি তেমন আকর্ষণ অনুভব করে না। সুতরাং উভয় বস্তু যদি একই ধরনের হয় (অর্থাৎ **পোলার** বা **নন-পোলার**) তাহলে তারা মিশবে। একটি **পোলার** আর অপরটি **নন-পোলার** হলে মিশবে না।

গ্যাস

গ্যাসের কোন বিশেষ আকার কিংবা আয়তন নেই। গ্যাসের গুণাবলীর মধ্যে রং, গন্ধ, পানিতে মেশার ক্ষমতা, **কেমিকেল** প্রতিক্রিয়া, কাঠামো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ গ্যাসের রং নেই। তবে কিছু **গ্যাস** আছে যাদের রং সবুজ (**ফ্লোরিন**), হলুদ-সবুজ (**ক্লোরিন**), লালচে-বাদামী (**নাইট্রোজেন ডাইওক্সাইড**) ইত্যাদি হতে পারে। অনেক গ্যাসই গন্ধহীন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো **অক্সিজেন, হাইড্রোজেন** ও **নাইট্রোজেন**। এমোনিয়ায় কিন্তু গন্ধ আছে। কিছু ক্ষতিকর **গ্যাস** যেমন **মিথেইন, প্রপেন** ও **বিউটেন** গন্ধহীন। এগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত গন্ধযুক্ত **সালফার** মিশিয়ে দেওয়া হয় যাতে পাত্র থেকে কোন কারণে **গ্যাস** বের হয়ে গেলে সাথে সাথে তা বুঝা যায়।

অনেক গ্যাসই পানিতে মিশে না। তবে **কার্বন ডাইওক্সাইড** পানিতে মিশতে পারে। **নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন** ও **অক্সিজেন** সামান্য মাত্র মিশে। সাধারণত গ্যাসের তাপমাত্রা যতো বেশী হবে তার মেশার ক্ষমতাও ততো কমবে। **রসায়নিক** প্রতিক্রিয়া বা রিয়েকশনের মাধ্যকে কিছু **গ্যাস** আছে যা অন্য গ্যাসে রূপান্তর হতে পারে।

অক্সিজেন লোহার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে **রাস্ট** বা জং এর জন্ম দেয়। তবে নিয়ন কোন বস্তুর সঙ্গে **রিয়েকশন** করে না। সে যেরূপ আছে সেরূপই থাকে। **নোবল গ্যাস** যেমন **নিয়ন, হিলিয়াম** ইত্যাদি একক **এটম** থেকে সৃষ্ট। তবে অনেক **গ্যাস** আছে যেমন **কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন** ও **এমোনিয়া** একাধিক মৌলিক পদার্থের অণু থেকে সৃষ্ট। কেমিকেলী এগুলো জড়িত হয়ে **মলিকিউল** তৈরী করেছে।

প্লাজমা

প্লাজমা যদিও গ্যাসেরই একটি অবস্থা, বিজ্ঞানীরা একে বস্তুর চতুর্থ অবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। **প্লাজমা** ঐসব গ্যাসকে বলে যাদের আংশিক কিংবা সকল **এটম** অথবা **মলিকিউল 'আয়োনাইজ্‌ড'** অবস্থায় আছে। **আয়োনাইজ** অর্থ **চার্জ** হওয়া অবস্থা। তবে পৃথিবীতে বস্তুর এই অবস্থা স্বাভাবিকভাবে হয় না। অপরদিকে বিশ্বের অধিকাংশ স্থানের বস্তু **প্লাজমা** অবস্থায়ই আছে। **আয়োনাইজেশন** উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ঘটে। সুতরাং তারা ও সূর্যের ভেতরের বস্তু **প্লাজমা** অবস্থায় আছে।

আপনি জানেন কি ঃ অক্সিজেন একটি **গ্যাস** ও এটা ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচবে না। আমরা শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাস থেকে **অক্সিজেন** ভেতরে নিয়ে যাই। সেখানে ফুসফুসিতে আসা রক্ত **অক্সিজেন** পেয়ে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত **অক্সিজেন** সাপ্লাই দেয় দেহের প্রতিটি কোষ বা **সেলে। সেল** জীবিত থাকার খাদ্য হলো **অক্সিজেন**। পৃথিবীর উপর প্রাণী বলতে যা কিছুই বুঝায় তাদের সবার জীবন বাতাসে বিচরণরত **অক্সিজেন** গ্যাসের উপর নির্ভরশীল, আর এটা সৃষ্টি হয় বৃক্ষের সবুজ পাতা থেকে। সূর্যালোক পেয়ে গাছের পাতায় একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে যাকে বলে **ফটোসিনথেসিস**। গাছের পাতা নিজের খাদ্য তৈরী করতে যেয়ে **বাই-প্রোডাক্ট** হিসাবে বায়ুমণ্ডলে **অক্সিজেন গ্যাস** নির্গত করে দেয়। আর এই **গ্যাস** আমরা শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে ভেতরে নিয়ে জীবন রক্ষা করি। সুতরাং এখন থেকে বৃক্ষ রোপণ আরো জোরদার করবেন এটাই আশা।

পরিচ্ছেদ ২৪

স্থান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

স্থান বা **স্পেইস** শব্দটি ছোট্ট কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। আমরা যে বিশ্বে বাস করি তা স্থানবিশিষ্ট একটি চার-বিস্তৃতিসম্পন্ন জগৎ। স্থানের মধ্যেই সবকিছু। আপনার আমার দেহ থেকে পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বস্তুই স্থানের উপর অস্বিত্বশীল। স্থানকে বুঝতে গেলে আমাদেরকে জগতসৃষ্টির সূচনা থেকেই শুরু করতে হবে। অর্থাৎ আজকের বিজ্ঞান সৃষ্টি সম্পর্কে যেসব **থিওরী** প্রতিষ্ঠিত করেছে সেগুলোর উপর কিছুটা জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি। অনুগ্রহ করে কঠিন মনে ভেবে এটা এড়িয়ে যাবেন না- আমি খুব সরল ভাষায় ব্যাপারটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, সৃষ্টিতত্ত্ব সত্যিই **থিওরী** মাত্র। এর অর্থ হলো ভবিষ্যতে এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন সম্ভব, এমনকি সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক মতবাদও আবিস্কৃত হতে পারে। সুতরাং যা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে ব্যক্ত করেছি তা সৃষ্টিতত্ত্বের শেষ বা ফাইনেল কথা- তা কিন্তু কখনও ভাববেন না। সৃষ্টিতত্ত্বকে ইংরেজীতে **কজমোলজি** বলে। আমরা এই **কজমোলজি** থেকেই শুরু করছি।

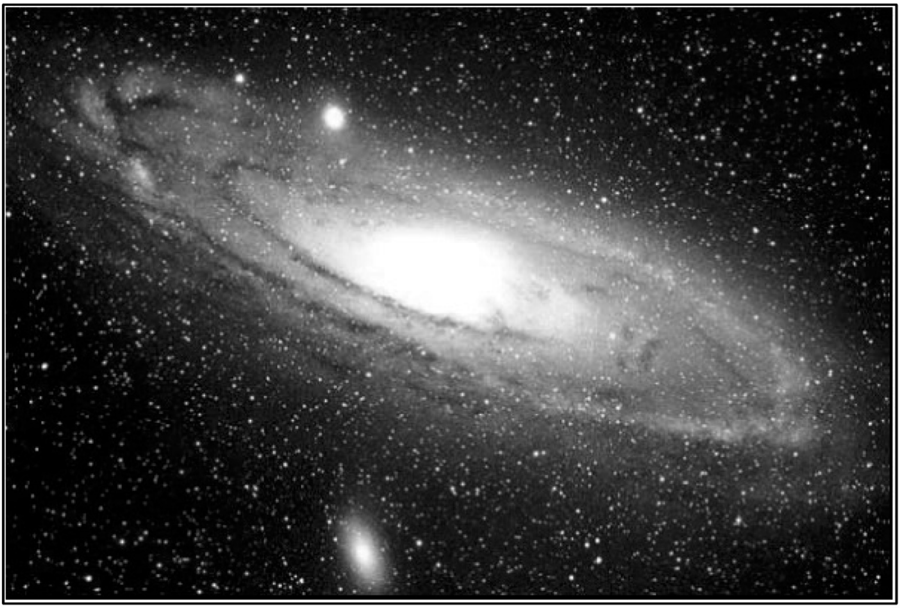
কজমোলজি ঃ বিশ্বের সৃষ্টি, কাটামো ও ধ্বংসের বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্ত

এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি অতীতে কোন এক সময় হয়েছিল আর ভবিষ্যতে কোন এক সময় তা আবার ধ্বংস হবে। জন্ম ও মৃত্যু- প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, বস্তুজগৎ ইত্যাদি সব জগতের ক্ষেত্রেই এটি একটি সার্বজনীন নীতি। কোন কিছুর জন্ম হলে তার মৃত্যুও অনিবার্য। কারণ এখানে কেউ বা কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। বিজ্ঞানের স্কোপ সৃষ্ট বস্তু, অস্তিত্ব ও সবশেষে ধ্বংসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ বিজ্ঞান দ্বারা আমরা প্রণালীবদ্ধভাবে বস্তু ও জীবনের সৃষ্টি, তার অস্তিত্বের স্থায়িত্বকাল ও মৃত্যু বা ধ্বংস পর্যন্ত যেসব **ফোর্স** থেকে তা নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত হয় তার উপর গভীর গবেষণা করি। এ গবেষণার ফলে অনেক অজানা কথা আমরা জানতে পারি, অনেক গোপন রহস্য আমাদের নিকট উদ্ঘাটন হয়। এসব ব্যাপারই হচ্ছে **সাইন্টিফিক ইনক্যুয়ারি** ও **টেকনোলজিক্যাল এপলিকেশন**। একদিকে আমরা স্বভাব থেকে **সাইন্টিফিক** গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা খুঁজে বের করি এবং অন্যদিকে প্রদত্ত প্রকাশ্য ও লুকানো শক্তিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর চেষ্টা

চালাই। কিন্তু বিজ্ঞানের এই স্কোপকে **গেল** শতকের শুরু থেকে কিছুটা বর্ধিতকরণের চেষ্টা চলে আসছে। মানুষের মনে তো অবশ্যই সেই আদি কাল থেকে প্রশ্ন জেগে আসছে যে, এই দৃশ্যমান মহাবিশ্ব কিভাবে জন্ম নিল আর এর অস্তিত্ব কিভাবে বজায় রয়েছে এবং কবে কিভাবে এর ইতি বা ধ্বংস হবে? এসব প্রশ্নের আংশিক জবাব মানুষ কিছুটা ধারণা, কিছুটা কল্পনা ও অনেকটা ধর্মবিশ্বাস থেকে খুঁজে পেয়েছে।

বিজ্ঞান উপরোক্ত সবক'টি বিশ্বাস থেকে মুক্ত থেকে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে। কিন্তু তাই বলে কোন অতীতকালের ধারণা বা বিশ্বাসকে এমনিতেই উড়িয়ে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। ঐ বিশ্বাসের মধ্যেও এমন কিছু থাকতে পারে যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক থিওরীবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এখানে আমরা একথা মোটেই বলছি না যে, সে যুগের মানুষের সকল ধারণাই অসত্য কিংবা কাল্পনিক।

যা হোক আধুনিক যুগে বিশ্বের সৃষ্টি, অস্তিত্ব ও ধ্বংস এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর গবেষণা ব্যাপকভাবে শুরু হয় **গেল** শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে যখন বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হলেন যে, এই মহাবিশ্ব একটি অবিশ্বাস্যভাবে বিরাট জগৎ। এখানে কোটি কোটি তারা ও তারা **সিস্টেম (গ্যালাক্সি)** অস্তিত্বশীল আছে। এসব অসংখ্য **সিস্টেম** একে অন্য থেকে বিরাট দূরত্ব বজায় রেখে নির্দিষ্ট কিছু আইন মেনে জগতব্যাপী ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ ইতোপূর্বে মানুষ ভাবতো, আমাদের নিকট-আকাশে দৃশ্যমান তারা**সিস্টেম (মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি)** হচ্ছে এ মহাবিশ্বের শেষ। কিন্তু আসলে তো তা ঠিক নয়। বিজ্ঞানীরা এখন বড় বড় **অপটিক্যাল** ও **রেডিও টেলিস্কোপ** ব্যবহার করে বিশ্বের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি উদ্ঘাটন করে যাচ্ছেন। আমরা বিস্ময়ে অবলোকন করছি সৃষ্ট এ মহাবিশ্বের স্বরূপ, বড়ত্ব ও কোটি কোটি তারাসিস্টেম। সুতরাং এই বিরাট জগতের উপর ব্যাপক গবেষণার সুযোগ আসে যখন এসব আশ্চর্যজনক তথ্যাদি নিত্যদিন মানুষ আবিষ্কার করা শুরু করলো। বিজ্ঞানের যে শাখা এ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে তাকেই বলে **কজমোলজি** বা বিশ্বতত্ত্ব। আমরা এখন এই কজমোলজির উপর অল্প-বিস্তর আলোচনায় যাচ্ছি। প্রথমেই বিশ্বের আয়তন যে কত বড় তার একটা ধারণা পাঠকদেরকে দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টির ইচ্ছে হচ্ছে!



বিশ্বের আয়তন

আমি ইতোপূর্বে ইচ্ছে পোষণ করেছিলাম, পাঠকদেরকে এই মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে তথ্যাদি দিয়ে কিছুটা বিস্মিত করতে। বাস্তবে আমাদের ধারণা দ্বারা জগতের বিরাটত্বের ব্যাপারটি ধরাই মুশকিল। আমরা যখন রাতের অন্ধকারে মেঘ ও চাঁদশূন্য আকাশের দিকে তাকাই তখন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি অগণিত তারকারাজি দেখে। কোনটা কাছে কোনটা দূরে। কোনটা উজ্জ্বল আবার কোনটা মিটুমিটু করছে- যেনো এই যায় যায়। ভাবি এগুলো হয়তো ছয়মাসের পথ, বছরের পথ না হয় একটু বেশী দূরে অবস্থিত - এই যা। কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। একেকটি তারাই আমাদের পৃথিবী থেকে লক্ষ নয়, এমনটি, কোটি নয় বরং কোটি কোটি মাইলের পথ। আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব কম না- কিন্তু দূরের তারাগুলোর তুলনায় কিছুই নয়। **আস্ট্রনোমিক্যাল** বস্তু যেমন তারা, তারা **ক্লাস্টার, গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সি ক্লাস্টার, ক্যুয়াইজার** ইত্যাদি এতোই দূরে অবস্থান করছে যে, এই দূরত্ব মাপা আমাদের মাইল-কিলোমিটারের হিসাবে কুলায় না। তাই বিজ্ঞানীরা জগতের সর্বোচ্চ গতি আলোকের গতির সাথে তুলনা করে এই দূরত্ব নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেছেন। তারা হিসাব করেছেন একটি আলোকরশ্মি এক বছর চলার পর কতটুকু দূরে ভ্রমণ করবে। আলোকের গতি

হলো ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) **কিলোমিটার** প্রতি সেকেন্ড। এ হিসাবে এক বছরে আলোকরশ্মি ভ্রমণ করবে ৩,০০,০০০ * [এক বছরে যতোটি সেকেন্ড আছে] = ৩,০০,০০০ * [একদিনে যতো সেকেন্ড আছে *৩৬৫] = ৩,০০,০০০ * [এক ঘণ্টায় যতো সেকেন্ড আছে * ২৪ * ৩৬৫] = ৩,০০,০০০ * [এক মিনিটে যতো সেকেন্ড আছে * ৬০ * ২৪ * ৩৬৫] = ৩,০০,০০০ * [৬০ * ৬০ * ২৪ * ৩৬৫] = ৯৪৬০৮০০০০০০০০০ কি.মি.। এ বিরাট সংখ্যাটি আপনি কথায় কিভাবে বলবেন? কঠিন। তবে একটু চেষ্টা চালিয়ে দেখা যাক। প্রথমে আমরা একক দশক ... ইত্যাদি গুণে কমাসহ সংখ্যাটি লিখে নিবো। যথা:- ৯,৪৬,০৮০,০০,০০,০০০। এখন কথায় বলতে যেয়ে আমরা কতো লক্ষ হাজার কেটি আছে তা বলতে হবে। যেমন:- নয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আশি কোটি কিলোমার হলো এক আলোক বৎসরের পথ।

আমারদের পৃথিবীর নিকটতম তারাটির দূরত্বই ৪.৩ আলোক বৎসর। এটার নাম **আলফা সেন্টোরী**। এ তারা থেকে আলোকরশ্মি আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ৪.৩ বছর সময় অতিবাহিত হয়। আমাদের পাশ্ববর্তী **গ্যালাক্সি** (তারাজগৎ) কয়েক মিলিয়ন আলোকবৎসর দূরে অবস্থিত। এখানেই বিশ্বের শেষ নয়, দূরতম **গ্যালাক্সি** **১৫** বিলিয়ন আলোক বৎসর দূরত্বে অবস্থান করছে। জগতের বড়ত্ব সম্পর্কে একটি ধারণার জন্য নীচের ছবিটির প্রতি দৃষ্টি দিন।



হিসাব করে দেখা গেছে **১** আলোক বৎসরকে যদি লক্ষ **কিলোমিটার** বেইস হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে তা হবে ৯৪৬০৮০০০০০০০০০/১০০০০০ = ৯,৪৬,০৮,০০০ (নয় কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ আট হাজার) লক্ষ কিলোমিটার। যারা মাইলের হিসেব এখনও ভালো বুঝেন তাদের জন্যও একটি ধারণা দিচ্ছি ঃ এক

আলোক বৎসর = এক বছরে যতোটি সেকেন্ড আছে * ১,৮৬,০০০ (আলোকের গতি ১,৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ড) = ৩১৫৩৬০০০ * ১৮৬০০০ = ৫৮৬৫৬৯৬০০০০০০০ মাইলের পথ। এ সংখ্যাকে আমরা ১০০০০০ (এক লক্ষ) দিয়ে ভাগ করে লক্ষ হিসাবে তা কথায় বলতে পারি, যেমন :- ৫৮৬৫৬৯৬০০০০০০০/ ১০০০০০ = ৫,৮৬,৫৬,৯৬০ (পাঁচ কোটি ছিয়াশি লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শত ষাট) লক্ষ মাইল। আমার মনে হয় এ সংখ্যাকে পুরোদমে কখায় বলায় চেষ্টা না করাই হবে উত্তম, কারণ তা বলতে হলে কিছুটা জটিলতা এসে যেতে পারে।

যা হোক আশাকরি পাঠকরা বিশ্বের সাইজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়ে গেছেন। এ মহাবিশ্ব এতোই বড় যে কেউ যদি আলোকের গতিতেই চলতে সক্ষম হয় (যা আইনস্টাইনের **থিওরী** মুতাবিক তা সম্ভব নয় বলে জানা গেছে) এবং সে ১ লক্ষ আলোক বৎসর দূরে কোন তারায় ভ্রমণে যায়, তাহলে তার নিজের কাছে সময় খুব অল্প ব্যয় হয়েছে বুঝা গেলেও ইতোমধ্যে বাইরের জগতে এক লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হবে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে যদি ঐ নভোচারী ২০১০ সালে ভ্রমণ শুরু করে তাহলে টার্গেটে পৌঁছে ফিরে এসে সে দেখবে ইতোমধ্যে পৃথিবীতে যদি কোন প্রাণী বেঁচে থেকেই থাকে, তারা তারিখ লিখতে গিয়ে বৎসরের জন্য এই সংখ্যাটি লিখছে ঃ ২,০২০১০ (দুই লক্ষ দুই হাজার দশ)। কারণ, ইতোমধ্যে দুই লক্ষ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে!

বিশ্বের কাঠামো

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, এ মহাবিশ্ব সত্যিই এক বিরাট জগৎ। গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, তারাজগৎ (**গ্যালাক্সি**), তারাজগতপুঞ্জ ইত্যাদি অসংখ্য বস্তু দ্বারা সমগ্র জগতটি গঠিত। এসব বস্তু একটা আরেকটা থেকে আয়তন মুতাবিক ছোট থেকে বিরাট দূরত্বে অবস্থান করছে। এখন আমরা থলিয়ে দেখবো বিশ্বের **স্ট্রাকচার** বা কাঠামোর স্বরূপ কি।



বিভিন্ন আকার ও আয়তনের গ্যালাক্সির ছবি।

বিশ্বের কাঠামো বা গঠনপ্রণালী সম্পর্কে মানুষ সত্যিকার অর্থে জ্ঞানার্জন শুরু করেছে **গেল** শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে। ১৯২৪ সালে **এডউইন হাব্‌ল** (১৮৮৯-১৯৫৩) নামক এক আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী বড় একটি **টেলিস্কোপ** ব্যবহার করে মহাকাশের ছবি তুলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, ইতোমধ্যে দূরের কিছু বস্তু যেগুলো খালি চোখে তারার মতোই দেখায়, আমরা এগুলোকে আমাদের নিজস্ব তারাজগতের সদস্য হিসেবে (অর্থাৎ তারাই) মনে করতাম। কিন্তু ওগুলো মোটেই তা নয়- বরং বাইর জগতের বড় বড় স্বাধীন তারা **সিস্টেম** বা **গ্যালাক্সি**। এ তথ্য জানার পর বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব নড়াচড়া শুরু হয়। জগত ও এর আয়তন এবং গঠনপ্রণালী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভাবার জরুরত দাঁড়ায়। হাব্‌ল শুধু ছবি তুলেই থামেন নি- অবশ্যই। তিনি জগতের **স্ট্রাকচার** ও বর্তমান গতিময়তার উপর গভীর গবেষণা শরু করেন। পর্যবেক্ষণ ও গণিত এ উভয় হাতিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি নাম্বার আবিষ্কার করেন যাকে বলে **‘হাবল্‌স কন্সটেন্ট’**।

হাবল্‌স আইন

উপরে আমি **হাবল্‌স কন্সটেস্ট** কথাটির উল্লেখ করেছি। এটি একটি অপরিবর্তনীয় সংখ্যা যার ব্যবহার হয়ে থাকে বিশ্বের আয়তন বৃদ্ধি জানার সমীকরণে। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী **এডইউন হাবল্‌** এর উদ্ভাবক। তিনি অনেক অঙ্ক ও পর্যবেক্ষণ শেষে একটি আইন প্রকাশ করেন যাকে বলে **হাবল্‌স আইন**। এতে বলা হয়েছে: **"পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এরূপ কোন গ্যালাক্সির গতি (v) পৃথিবী থেকে সেই গ্যালাক্সির দূরত্ব (d) এর সঙ্গে প্রপোরশন্যাল (বা আনুপাতিক)"**। দূরত্ব বাড়লে গতিও বাড়ে। আমরা এই আইনকে গাণিতিকভাবে লিখলে তা হবে: $\mathbf{v = H_0 d}$ । এই সমীকরণে H_0 হলো একটি অপিবর্তনলীশ সংখ্যা আর এরই নাম হলো **'হাবল্‌ কন্সটেন্ট'**। আমি যদিও একাধিকবার বলেছি **হাবল্‌ কন্সটেন্ট** একটি **ফিক্সড্‌** সংখ্যা কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও এই সংখ্যাকে সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন নি। বর্তমানে এটি ৬৪ থেকে ৭৮ **কিলোমিটার** প্রতি **মিলিয়ন পার্সেক** (বা ৪০ থেকে ৪৮ মাইল প্রতি মিলিয়ন **পর্সেক**) হবে বলে অনেকেই মানে করেন। উল্লেখ্য এক **পার্সেক** সমান ৩০.৮৬ ট্রিলিয়ন কি.মি. (বা ১৯.১৮ ট্রিলিয়ন মাইল)।

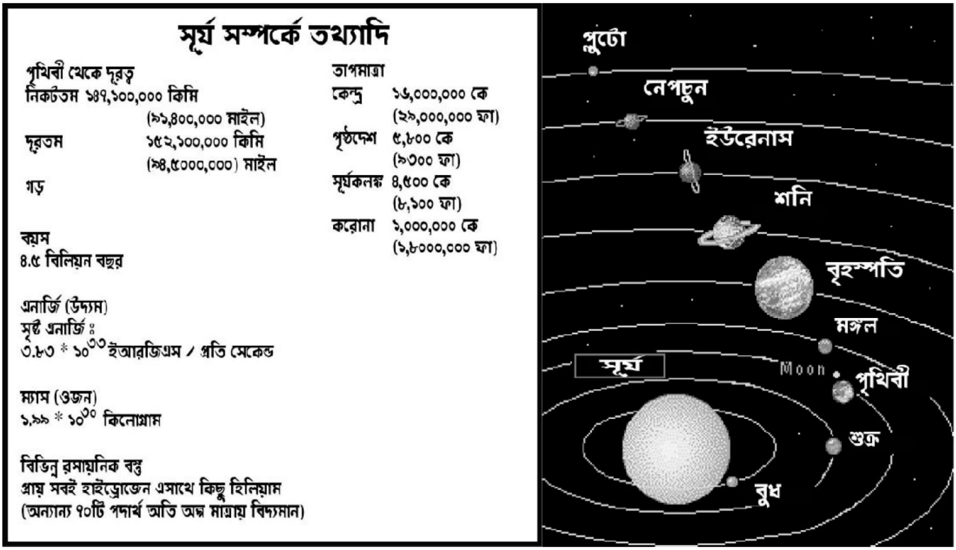
আপনি জানেন কি: বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২) তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানী জোহান্‌স কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) এর 'সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের' থিওরী সমর্থন করেছিলেন। তখনকার শক্তিশালী চার্চের নিকট এটা ছিলো বিরাট পাপ। ফলে গ্যালিলিওকে জীবনের শেষ ১০ বৎসর 'গৃহবন্দী' অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। চার্চের এই অনৈতিক, অমানবিক ও অবৈজ্ঞানিক শাস্তি থেকে শেষ পর্যন্ত ৩৪২ বৎসর পরে পোপ জন পল ২য় গ্যালিলিওকে 'মুক্তি' দেন। এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে খ্রিস্টান চার্চ বা ধর্মবিশ্বাস ছিলো সর্বাপেক্ষা বড়ো বাঁধার কারণ। অন্য কোন ধর্মবিশ্বাস কখনো এরূপ বাঁধার সৃষ্টি করে নি।

পরিচ্ছেদ ২৫

সৌরজগৎ থেকে গ্যালাক্সি

আমরা এই পৃথিবীর বাসিন্দা। পৃথিবী একটি বলের মতো গোলক- তবে উত্তর ও পশ্চিম দিক কিছুটা চাপানো। আমাদের নিজস্ব সাইজ বা আয়তনের তুলনায় পৃথিবীর গোলক যেহেতু অনেক বড় তাই এর উপর বিচরণ করে আমরা বুঝতে পারি না, কিভাবে এই গোলকটি মহাকাশে ভাসমান আছে। তুলনামূলকভাবে বহু গুণ বড় হওয়ায় পৃথিবীর দু'টি ডাইরেক্ট গতিও আমরা টের পাই না। বাস্তবে আমাদের এই নীল গ্রহটি একটি বড় **সিস্টেম** এর সদস্য- যাকে বলে সৌরজগৎ। পাঠকদের অনেকেই এ ব্যাপারে পুরো ওয়াকিফহাল আছেন, তা আমার জানা। এরপরও পরবর্তীতে যেসব হয়তো অনেকের কাছে অপেক্ষাকৃত নতুন কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবনের আশায় সৌরজগতের উপর মোটামুটি একটি বর্ণনা এখানে আমাকে দিতে হচ্ছে।

সূর্যকেন্দ্রিক আমাদের সৌরজগতের মধ্যে একটি তারা ও নয়টি গ্রহ [যদিও ইতোমধ্যে প্লুটোকে বিজ্ঞানীরা **'গ্রহ'** ক্লাস থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবরে প্রকাশ], এসাথে বেশ কিছু উপগ্রহ (মানে চন্দ্র), অসংখ্য **আস্ট্রেরয়েড** (গ্রহাণাপুঞ্জ) ও উল্কা ইত্যাদি **আস্ট্রোনোমিক্যাল** বস্তু বিদ্যমান। সূর্য একটি মধ্যম সাইজ ও বয়সী হলুদ তারা যার মধ্যে সৌরজগতের যাবতীয় বস্তুর তুলনায় ওজন বা বস্তু অনেক অনেক গুণ বেশী। নিম্নের (পরের পৃষ্ঠার) নক্সায় সূর্য সম্পর্কে কিছু জানা তথ্যাদি তুলে ধরছি।



উপরোক্ত ছবির ডানদিকে সৌরজগতের একটি নক্সা এঁকেছি [এটা অবশ্য স্কেলে আঁকা হয় নি]। এ থেকে পাঠকরা আশারাখি সূর্যকেন্দ্রিক আমাদের এ সৌরমণ্ডলের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হবেন। দেখাই যাচ্ছে সূর্যকে কেন্দ্র করে বাকি সবকিছু একেকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুর্নমান আছে। প্রতিটি বস্তুর আবার নিজস্ব আরেক গতি আছে যাকে বলে আহ্নিক বা দৈনিক গতি। এ গতিকে ইংরেজীতে স্পিনিং বলে। নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে এই গতি সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা পুরো সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছে একই সাথে এবং তখনই এই আহ্নিক গতির জন্ম হয়। আমাদের পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই গতি হলো ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা। এবার আরেকটি ছকে আমি সৌরজগতের বহু জানা তথ্যাদি তুলে ধরছি।

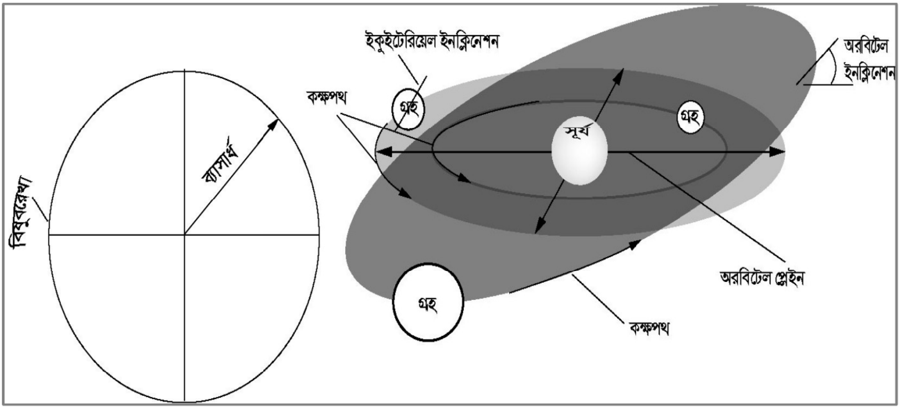
তথ্যাদি	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহ.	শনি	ইউ.	নেপ.	প্লুটো
বিষুবরেখার ব্যসার্ধ (*পৃথিবীর মান)	০.৩৮	০.৯৯	১ (৬,৩৭৮ কিমি)	০.৫৩	১১.২	৯.৪৫	৪.০০	৩.৮৮৩	০.১৯
বিষুবরেখার বক্রতা (ডিগ্রী)	০.০১	২.৬৪	২৩.৫	২৫.২	৩.১৩	২৬.৭	৮২.২	২৮.৩	৫৭.৪
ম্যাস (*পৃথিবীর	০.০৫৫	০.৮২	১ (৫.৯৭*১	০.১১	৩১৮	৯৫.২	১৪.৫	১৭.১	০.০০২

মান)			$০^{২৪}$ কি.গ্রা)						
গড় ঘনত্ব (গ্রা.সে.মি.^{৩})	৫.৪	৫.২	৫.৫	৩.৯	১.৩	০.৬৯	১.৩	১.৬	১.৮
আহ্নিক গতি (দিন)	৫৮.৬	-২৪০	১	১.০৩	০.৪১৪	০.৪৪	-০.৭১৮	০.৬৭	-৬.৪
বার্ষিক গতি (বৎসর)	০.২৪	০.৬১	১	১.৮৮১	১১.৮৬	২৯.৪৬	৮৪.০১	১৬৪.৮	২৪৮
সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (আইউ)	০.৩৯	০.৭২	১ (১৫০,০০০,০০০ কিমি)	১.৫২৪	৫.২০৩	৯.৫৯	১৯.১০	৩০	৩৯.৩
প্রদক্ষিনপথের এসেন্ট্রিসিটি (রেটিও)	০.২১	০.০০৬	০.০১৬৭	০.০৯৩৫	০.০৪৮৯	০.০৫৮	০.০৪৯৭	০.০০১	০.২৯
প্রদক্ষিণপথের ইনক্লিনেশন (ডিগ্রী)	৭	৩.৩৯	০.০০০৩	১.৮৫	১.৩০	২.৪৯	০.৭৭২	১.৭৭	১৭.২
মোট চন্দ্রের সংখ্যা (নাম্বার)	০	০	১	২	৩৯	৩২	২৭	৮	১

উপরের টেবিলে দেওয়া তথ্যাদি সম্পর্কে আরোও কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিম্নে আমরা বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার ও অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলাম।

বিষুবরেখার ব্যাসার্ধ: ব্যাসার্ধ শব্দের ইংরেজী হলো **রেডিয়াস**। কোন বৃত্তের ঠিক মধ্যম **পয়েন্ট** থেকে বাইরের রেখা পর্যন্ত মাপকে ব্যাসার্ধ বলে। উপরের টেবিলে ব্যাসার্ধ বলতে বিষুবরেখার উপর ভিত্তি করে এই ব্যাসার্ধ নেওয়া হয়েছে- এটাই বুঝাচ্ছে।

নীচের চিত্রে অঙ্কিত বৃত্তটির দিকে খেয়াল করুন। বৃত্তটি যদি আমরা গ্রহ মনে করি এবং এর সেন্টার পয়েন্টকে মেরুর সেন্টার **পয়েন্ট** ধরে নিই, তাহলে বাইরের লাইন পর্যন্ত দূরত্ব হলো এর ব্যাসার্ধ। উপরের টেবিলে বিভিন্ন গ্রহের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দেখানো হয়েছে। অন্য কথায়, নাম্বারকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সঙ্গে পূরণ করে গ্রহের ব্যাসার্ধ বের করতে হবে। এভাবে দেওয়ার কারণ হলো পৃথিবীর কত গুণ বা ভাগ বিভিন্ন গ্রহের ব্যাসার্ধ তা সহজে বুঝানো।



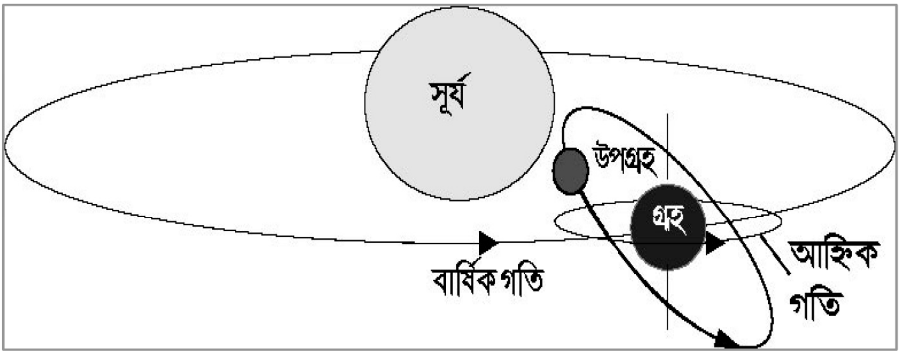
বিষুবরেখার বক্রতা: ইংরেজীতে **'ইক্যুয়েটেরিয়্যাল ইনক্লিনেশন'** এর বাংলা অনুবাদ বিষুবরেখার বক্রতা ছাড়া আর ভালো কোন শব্দ-প্রয়োগ আমি পাই নি। বাংলা একাডেমী ইংলিশ বেঙ্গলী ডিকশনারী এ ব্যাপারে একেবারে নীরব - অর্থাৎ **ইক্যুইটরিয়্যাল ইনক্লিনেশন** সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা নেই। আসলে এটা একটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের মান। উপরের চিত্রটি স্ট্যাডি করুন। আশাকরি এ থেকেই **বিষুবরেখার বক্রতা** বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

অরবিট্যাল ইনক্লিনেশন: প্রতিটি গ্রহ **অরবিট্যাল প্লেন** এর উপর ভিত্তি করে কক্ষপথে ঘুর্নমান আছে। তবে প্লুটোর কক্ষ পথ এই প্লেন থেকে অনেকটা ভিন্ন। এখন এই প্লেন থেকে সোজা উপরের দিকে যে লাইন গেছে সেটাই গ্রহের আহ্নিক গতির মধ্যশলাকা হওয়ার কথা। কিন্তু তা না হয়ে উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরু বছরের বিভিন্ন সময় কিছুটা সূর্যের দিকে টিল্ট বা কাত হয়ে পড়ে। এই কাত হওয়ার নামই **অরবিট্যাল ইনক্লিনেশন**। সোজা উপরের দিকের সরল রেখা থেকে কতটুকু কাত হয়ে পড়ে তার একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে টেবিলে। লক্ষ্য করুন পৃথিবী ও মঙ্গলের **ইনক্লিনেশন** সর্বাপেক্ষা বেশী ও প্রায় সমান। অপরদিকে বুধের নেই বললেই চলে। আসলে এই ইনক্লিনেশনের ফলেই পৃথিবীতে আবহাওয়ার তারতম্য ঘটে।

ম্যাস বা ওজন: এই ওজন বলতে বস্তুর পরিমাণ বুঝতে হবে। টেবিলে পৃথিবীর বস্তুর পরিমাণের সাথে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। গ্রহের মধ্যে কতটুকু বস্তু বা **ম্যাস**

আছে তা থেকেই মহাকর্ষের মাত্রা নির্ণিত হয়। সুতরাং পৃথিবীর এক কেজি ওজনের কোন বস্তু বৃহস্পতি গ্রহে অনেকগুণ বেশী হবে।

আহ্নিক ও বার্ষিক গতি: সব গ্রহের মধ্যে সরাসরি দু'টি গতি বিদ্যমান। এগুলোকে আহ্নিক (দৈনিক) ও বার্ষিক গতি বলে। নীচের চিত্রটি স্ট্যাডি করলেই এই গতিগুলোর স্বরূপ ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন। আহ্নিক গতি হলো দৈনিক গতি। পৃথিবী তার নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে দ্রুত চক্কর (স্পিন) দিচ্ছে। এই গতির ফলেই ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন হয়। পৃথিবীর উপরে স্থির কোন বস্তু তাই প্রতি মিনিটে ২৭ **কিলোমিটার** বেগে পূর্ব দিকে যাচ্ছে। উপগ্রহ বা চন্দ্রের মধ্যে তিনটি ডাইরেক্ট গতি বিদ্যমান। উপগ্রহ যেহেতু গ্রহের চতুর্দিকে (মাসে একবার করে) প্রদক্ষিণ করতে হয় তাই তার মধ্যে একটি অতিরিক্ত গতি বিদ্যমান থাকে। যা হোক, বুঝা **গেল** পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের দু'টি ও উপগ্রহের তিনটি ডাইরেক্ট গতি আছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আমরা একটু পরই দেখবো পুরো সৌরজগৎ কিভাবে আমাদের তারা **সিস্টেম মিল্কিওয়ে** গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে মহাকাশে এক অত্যাশ্চর্য উচ্চ গতিতে হু হু করে ঘুরছে।



ঘনত্ব বা ডেনসিটি: প্রতি গ্রাম কিউবিক সেন্টিমিটারে কতটুকু বস্তু আছে তার একটি হিসাব। লক্ষ্য করুন **টেরেস্ট্রিয়াল** (শক্ত মাটি আছে এমন) ভেতরের চারটি গ্রহের ঘনত্ব বাকী সব ক'টি **গ্যাসিয়াস** (বাস্পীয়) গ্রহের তুলনায় অনেক বেশী। ঘনত্ব বা **ডেনসিটি** দ্বারা আমরা নির্দিষ্ট ভলিয়মে কতটুকু ওজনের বস্তু স্বাভাবিকভাবে থাকে তার হিসাব পাই। পৃথিবীতে বিভিন্ন পদার্থ ও **কম্পাউন্ড** (যুক্ত পদার্থ) এই উভয়ের ক্ষেত্রে

বিভিন্ন **ডেনসিটি** বিদ্যমান। উপরোক্ত টেবিলে সকল পদার্থের ঘনত্বের গড় হিসাব দেওয়া হয়েছে।

সূর্য থেকে গড় দূরত্বঃ এখানে **আস্ট্রনোমিক্যাল ইউনিট (এইউ)** ব্যবহৃত হয়েছে। এ **ইউনিট** আসলে সূর্য থেকে **কিলোমিটার** হিসাবে পৃথিবীর দূরত্বকে বুঝায়। **এক এ.ইউ = ১৫০,০০০,০০০** (দেড়শ' মিলিয়ন) **কিলোমিটার**। পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করে দূরত্ব **এ.ইউ** ইউনিটে দেওয়া হয়েছে।

প্রদক্ষিণপথের এসেন্ট্রিসিটিঃ গ্রহগুলোর প্রদক্ষিণপথ ঠিক বৃত্তাকার **(সারকুলার)** নয় - বরং তা কিছুটা ডিম্বাকৃতির **(ইলিপট্রিক্যাল)** বা উপবৃত্তিক। এসব তথ্য দ্বারা কোন্ গ্রহের প্রদক্ষিণপথ কতটুকু ডিম্বাকৃতির তা জানা যায়।

প্রদক্ষিণপথের ইনক্লিনেশনঃ এটা দ্বারা গ্রহের প্রদক্ষিণপথ মূল **অরবিট্যাল প্লেইন** থেকে কত **ডিগ্রী** বেশকম আছে তা বুঝানো হয়েছে।

মোট চন্দ্রের সংখ্যাঃ বুধ ও শুক্রের কোন উপগ্রহ বা চন্দ্র নাই। এ টেবিলে দেওয়া চন্দ্রের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা তথ্যাদি থেকে সংগ্রহিত হয়েছে। দূরবর্তী গ্রহগুলোর চন্দ্রের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। অর্থাৎ নতুন চন্দ্র আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।


সৌরজগতের ন'টি গ্রহ ও কিছু চন্দ্র

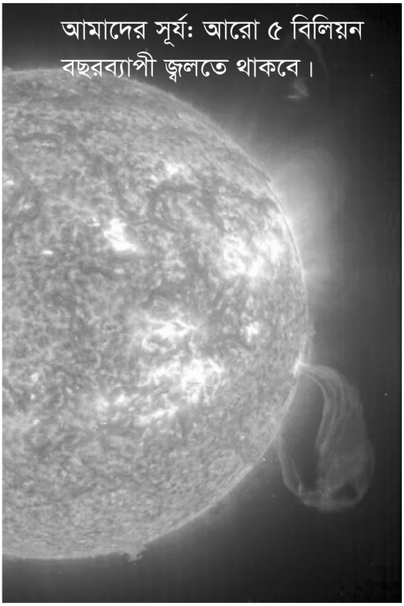
গ্যালাক্সিতে সৌরজগতের অবস্থান

আমাদের এ সৌরজগৎ আসলে একটি তারাসিস্টেমের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সূর্য একটি তারা। অনুরূপ কোটি কোটি তারা মিলে এ বিরাট **তারাসিস্টেম** মাহাকাশে ঘুর্নমান আছে। এটাকে আমাদের **গ্যালাক্সি** বা **মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি** বলে। এ সিস্টেমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব **১** লক্ষ আলোক বৎসর। সাধারণত **গ্যালাক্সি** তিন ধরনের হয়ে থাকে। এগুলো হলো, **ইলিপটিক্যাল** (ডিম্বাকৃতির), **স্পাইরাল** (পেছানো) ও **ইরেগুলার** (বিশেষ আকৃতিহীন)। **ইলিপটিক্যাল** গ্যালাক্সিতে সাধারণ পুরাতন বা বৃদ্ধ তারা থাকে। **স্পাইরাল গ্যালাক্সি** দেখতে অনেকটা ডিস্কের মতো লাগে। এগুলোতে একাধিক হাত (আর্মস) আছে যা পেছানো জলঘুর্নির মতো দেখায়। সাধারণত বৃদ্ধ, মধ্যম ও অল্প বয়সের তারা দ্বারা এরূপ **গ্যালাক্সি** গঠিত। এগুলোতে অনেক **'ইন্টারস্টেলার ডাস্ট'** বা আন্তঃতারা ধূলোবস্তু দেখতে পাওয়া যায়। এসব বস্তু থেকে নতুন তারার জন্ম হয়ে থাকে। **ইরেগুলার** গ্যালাক্সির কোন বিশেষ আকার নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা এগুলো অন্যান্য গ্র্যালাক্সির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এরূপ আকার ধারণ করেছে।


আমাদের গ্যালাক্সির একাংশ

গ্যালাক্সিতে আমাদের অবস্থান বাইরের দিকে। গ্যালাকটিক কেন্দ্র থেকে সূর্য **২.৬ * ১০^{১৭} কিলোমিটার** বা **১.৬ * ১০^{১৭}** মাইল (বা ২৭,৪৮২ আলোক বৎসর) দূরে

অবস্থান করে তার কক্ষপথে (গ্রহ, উপগ্রহ, **আস্ট্ররইড**, উল্কা ইত্যাদি সবকিছুসহ) হু হু করে ঘুরছে। সূর্যের এই গতিটি হলো ২২০ **কিলোমিটার** প্রতি সেকেন্ড (১৪০ মাইল প্রতি সেকেন্ড)। সমগ্র গ্যালাক্সির চতুর্দিকে একবার ঘুরে আসতে ২৫০ মিলিয়ন বছর অতিবাহিত হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা সৌরজগতের জন্ম হয়েছে ৪.৬ বিলিয়ন বছর পূর্বে। এ হিসাবে সূর্য তার পরিবারবর্গদের নিয়ে নিজস্ব গ্যালাক্সির চতুর্দিকে ১৮ বার বা তার চেয়ে একটু বেশি সংখ্যকবার ঘুরে এসেছে। সুতরাং সৌরজগতের বয়স মাত্র ১৮ গ্যালাক্টিক বছর হয়েছে। হয়তো তা আরো ১৮ বা ২০ গ্যালাক্টিক বছর জীবিত থাকবে- কারণ বিজ্ঞানীদের ধারণা সূর্য একটি মধ্যম বয়সের তারা। আরো ৪ বা ৫ বিলিয়ন বছর পরে তার মৃত্যু ঘটবে। প্রত্যেকেরই বাঁচার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। সূর্যের খাদ্য হচ্ছে **হাইড্রোজেন গ্যাস**। সে প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার টন **গ্যাস** পুড়িয়ে শেষ করছে। তবে তার মধ্যে হাইড্রোজেনের মাত্রা এতোই বেশী যে আরো ৫ বিলিয়ন বছর তা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের পরও শেষ হবে না।



সৌরজগতের উপর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত তথ্যানুসন্ধানের এখানেই শেষ। তবে, আরো দু'টি কথা বাকী আছে। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, সূর্যসহ পুরো সৌরজগৎ গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে ২২০ **কিলোমিটার** প্রতি সেকেণ্ড বেগে প্রদক্ষিণ করছে। সৌরজগতের মধ্যে আরো কিছু গতি বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, আমাদের **গ্যালাক্সি** প্রায় ত্রিশটি গ্যালাক্সির সমন্বয়ে গঠিত একটি বিরাট **গ্যালাক্সি** ক্লাস্টারের সদস্য যাকে বলে **'লকেল গ্রুপ'**। এই গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যই ঘুর্নমান আছে। অর্থাৎ আমাদের পুরো **গ্যালাক্সি** ঘুরছে, সুতরাং সৌরজগতের আরেকটি গতি আমাদের নিকট উন্মোচন হলো। দ্বিতীয় কথাটি

হলো, আমাদের লকেল গ্রুপও আরো কয়েকটি গ্রুপের সদস্য যাকে বলে **‘লকেল সুপারক্লাস্টার’**। লকেল সুপারক্লাস্টার **‘ভারগো’** নামক একটি বিরাট লকেল সুপারক্লাস্টারের সদস্য। সুতরাং এই পুরো লকেল সুপারক্লাস্টারও তার মহাকর্ষের কেন্দ্রকে ভিত্তি করে ঘুর্নমান আছে। জগতে এরূপ অনেক **সুপারক্লাস্টার** আছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, পুরো মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত চতুর্দিকে বর্ধিত হচ্ছে। সুতরাং এ মহাবিশ্বের কোথাও একটি স্থির বিন্দু নেই- সবই ঘুর্নমান, গতিশীল। যা হোক, দু’টি কথা বলতে যেয়ে অনেক কথা বলা হয়ে গেল। এবার আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি তুলে ধরছি।

আপনি জানেন কি: জগতের প্রতিটি বস্তুই ঘুর্ণমান, গতিশীল। এই গতি না থাকলে কোন কিছুই অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো না। স্রষ্টা কী অপূর্ব কৌশলে স্বীয় সৃষ্ট জগতকে স্থিতিশীল ও স্থায়ী করেছেন! ভাবার বিষয় নয় কি?

পরিচ্ছেদ ২৬

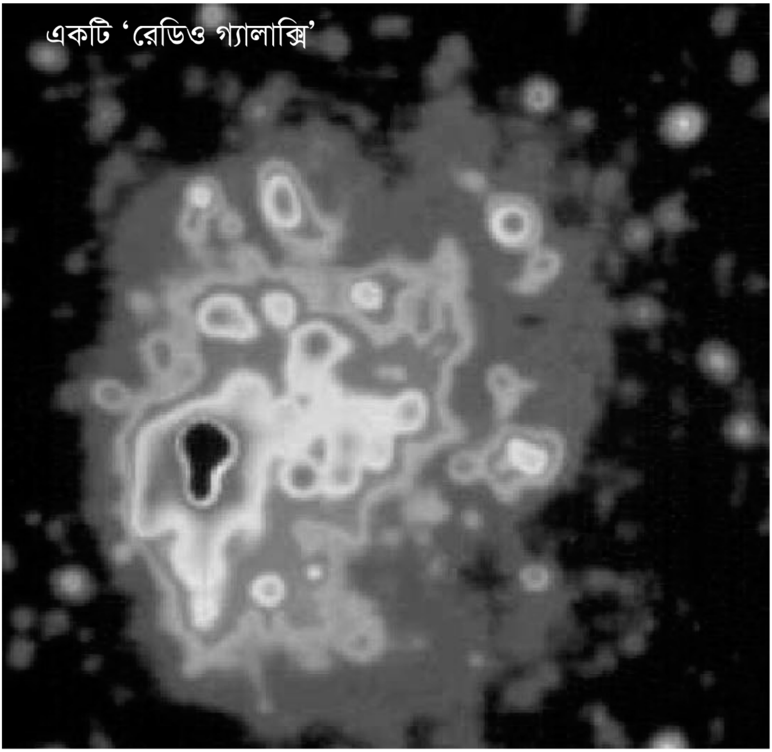
জগতসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক থিওরী

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ভবিষ্যতের উপর দু'টি সম্ভাব্য **থিওরী** তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে শক্তিশালী কেন্ডিডেট হলো **'বিগ ব্যাং থিওরী'** - বাংলায় যাকে আমরা **'মহাবিস্ফোরণ থিওরী'** বলতে পারি। দ্বিতীয় থিওরীটি হলো **'স্টেডি স্টেট থিওরী'**। এটা এখন প্রায় সবাই পরিত্যাগ করতে বসেছেন। এরপরও আমরা প্রথমে এই থিওরীর উপর সামান্য কিছু বলবো। আর কিসব কারণে এটা গ্রহণযোগ্যতা হারালো তা-ও তুলে ধরবো।

স্টেডি স্টেট থিওরী এ থিওরীকে বাংলায় **'স্থিতিশীল অপরিবর্তনীয় অবস্থা মতবাদ'** বলা যায়। আমরা কিছুক্ষণ পরই দেখবো যে, মহাবিস্ফোরণ **থিওরী** বলে, বিশ্বটা একটি বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। এই একই কথা **স্টেডি স্টেট থিওরী** বলে না। তবে এটা বিশ্বাস রাখে যে, বিশ্বটা আসলে সবদিক থেকেই একই ধরনের। প্রাথমিকভাবে এই **থিওরী** অপরিবর্তনীয় এক বিশ্বের কথা বলেছিল। এরপর ১৯২৭ সালে আমেরিকান আস্ট্রনোমার **এডউইন হাব্‌ল** আবিষ্কার করেন যে, পুরো বিশ্বটাই দিন দিন চতুর্দিকে বর্ধিত হচ্ছে। সুতরাং **স্টেডি স্টেট** থিওরীর সমর্থকরা এটাকে নতুনভাবে সাজাতে বাধ্য হোন। তারা তখন বললেন, জগতটা বর্ধিত হওয়ার কারণ হলো সব সময় নতুন বস্তু সৃষ্টি হচ্ছে। এ কথাটি **'কনজারভেশন আইন'** এর সঙ্গে সংঘাতময় হয়ে পড়ে- যাতে বলা হয়েছে, **'মহাবিশ্বের ম্যাস (ওজন) ও এনার্জির যোগফল সর্বদাই একই থাকতে হবে।'** আধুনিক যুগে এসে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আরো কিছু তথ্যাদি আবিষ্কার করেছেন যা এই থিওরীর বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

এই **থিওরী** বলে যে, মহাবিশ্ব এখন যেভাবে দেখাচ্ছে, বিলিয়ন বছর আগেও ঠিক এভাবে দেখাতো। কিন্তু আমরা জানি আলোকের গতি আছে এবং দূরের কোন তারা কিংবা **গ্যালাক্সি** থেকে আলো এসে পৌঁছতে হাজার হাজার এমনকি কোটি কোটি আলোক বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং এসব বস্তুর দিকে তাকানো মানে সুদূর অতীতের দিকে তাকানোর নামান্তর। এ থেকে দেখা গেছে, অতীতে বিভিন্ন গ্যালাক্সির গঠনপ্রণালী ভিন্ন ছিল। তাছাড়া কম বয়সের সময় বিশ্বের মধ্যে **'রেডিও গ্যালাক্সি'** ও

'ক্যুয়াইজার' নামক গ্যালাক্সিদের সংখ্যা বেশী ছিল। গ্যালাক্সির আকারও সময়ে বদলে গেছে। এসব তথ্য থেকে বিজ্ঞানীদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, পুরো মহাবিশ্বের মধ্যে প্রতিনিয়ত রদবল ঘটছে। অতীতে তা যেভাবে দেখাতো এখন সেটা ভিন্ন।



স্টেডি স্টেট থিওরীর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হলো **'মাইক্রোওয়েভ বেকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন'**। **১৯৬৫** সালে এই তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার করেন দু'জন আমেরিকান জ্যোতিবিজ্ঞানী আরনল্ড পেনযিয়াজ ও রবার্ট উইলসন। এই তেজস্ত্রিয়া জগতের সবদিক থেকে ক্রিয়াশীল আছে। এটার মাত্রা চরম হিমাঙ্ক থেকে **৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট)** উপরে। **বিগ ব্যাং** বা মহাবিস্ফোরণ থিওরীর প্রবক্তারা অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, সুদূর অতীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে জগত সৃষ্টির পর প্রাথমিক সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শেষে একটি বেকগ্রাউন্ড **রেডিয়েশন** থাকার কথা

এবং তা হবে ঐ ৩ **ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড**। এই তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে অধিকাংশ বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন যে, আসলে সত্যিই এ মহাবিশ্ব একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা তখন থেকে **স্টেডি স্টেট** থিওরীর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

বিগ ব্যাং থিওরী ঃ জগতসৃষ্টির সূচনা

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি জগতসৃষ্টি সম্পর্কে **স্টেডি স্টেট থিওরী** কিভাবে আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত কিছু তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় তা বিজ্ঞানমহলে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। অবশ্য যে কোন **থিওরী** ততক্ষণ পর্যন্তই ঠিকে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত অপর কোনো উন্নত **থিওরী** তার স্থলাভিষিক্ত না হয়। মহাবিস্ফোরণ **থিওরী** এরূপই একটি। বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানী এই থিওরীর উপর আস্থাশীল। তবে এ গ্রহণযোগ্যতা কতদিন বা কাল স্থায়ী থাকবে তা বলা মুশকিল। থিওরীটির পেছনে শক্তিশালী কিছু প্রমাণ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু পরবর্তীতে অন্য কেউ এসে এটা যে নির্ভুল নয় তা প্রমাণ করবেন না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এতটুকু বলার কারণ হলো, যে কোন বৈজ্ঞানিক থিওরীর ক্ষেত্রে এটা সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার যে, তা কখনও ফাইনাল নয়- যদি না **থিওরী** পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, লজিক, গণিত ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে বৈজ্ঞানিক ফেক্ট বা সত্যে পরিণত না করা হয়। একটা দৃষ্টান্ত হলো, মহাকাশে পৃথিবীর ঘুর্নন। এটা শত সহস্রবার পর্যবেক্ষণ, গণিত, গবেষণা ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, সৌরজেগতে পৃথিবীর দু'টি মৌলিক গতি আছে। এর একটা হলো (প্রদক্ষিণ পথের) বার্ষিক গতি আর অপরটি নিজস্ব মধ্যশলাকার উপর ভিত্তি করে লাটিমের মতো ঘুর্নন গতি যাকে আমরা আহ্নিক বা দৈনিক গতি বলি। এ দু'টো বিষয় এত শক্তভাবে প্রমাণিত যে, যদি কেউ বলে 'পৃথিবী ঘুরে না, সূর্য ঘুরে' কিংবা এসব গতির অস্তিত্ব নেই- তাহলে বুঝতে হবে এ লোকটি বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব অল্পই জ্ঞান রাখে। কারণ, এসব গতিবিধির উপর গাণিতিক হিসাব নিকাশ ছাড়া মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ ও (কক্ষপথে) নিয়ন্ত্রণ, কবে কখন সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে, মহাকর্ষের ফলে যে বিরটা টানশক্তি সূর্য পৃথিবীর উপর ফেলছে তার হিসাব, পৃথিবীর বার্ষিক গতি থেকে যে আঙ্গুলার মমেন্টাম সৃষ্টি হয় ইত্যাদি শতধা ব্যাপার অকেজো ও বাতিল হয়ে পড়বে। অথচ এগুলো কোনটাই বাতিল নয়, কারণ এসব হিসাব নিকাশ মহাকাশ বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন। সুতরাং পৃথিবীর উক্ত গতিদ্বয় অস্বীকার করার

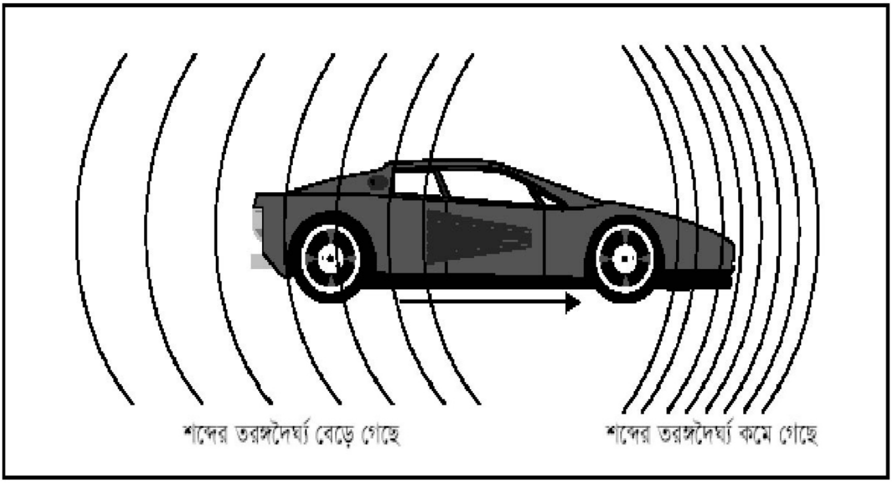
মানে হচ্ছে বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া। অপরদিকে কোন মতবাদ পরীক্ষিতভাবে প্রমাণিত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট বা সত্য বলে মানা স্বয়ং বিজ্ঞানেরই নীতিবিরুদ্ধ। যা হোক আমরা নীচে আধুনিক যুগে গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক **থিওরী 'বিগ ব্যাং থিওরী'** নিয়ে এখন আলোচনায় যাচ্ছি।


এভাবেই কি মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল?

আজ থেকে **১৩.৭** বিলিয়ন (১৩.৭ হাজার মিলিয়ন বা ১৩৭০ কোটি) বছর পূর্বে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে আমাদের এ মহাবিশ্ব আত্মপ্রকাশ করে। এরপর সেই থেকে এখন পর্যন্ত মহাবিশ্ব চতুর্দিকে বর্ধিত হচ্ছে ও অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে। এই থিওরীর মূলে আলবার্ট আইনস্টাইনের **'জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি'** ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত গাণিতিক সমীকরণসমূহ জড়িত। **১৯১৫** সালে প্রকাশিত এই সমীকরণসমূহকে **'ফিল্ড ইকুয়েসন্স'** বলে। ইতোমধ্যে আমরা **জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটির** উপর আলোকপাত করেছি। **১৯২২** সালে এসব সমীকরণের সমাধান রুশ বিজ্ঞানী **আলেকজান্ড্রার ফ্রিডম্যান** (১৮৮৮-১৯২৫) প্রকাশ করেন। তার এসব সমাধানের উপরই বর্তমান **বিগ ব্যাং থিওরী** অনেকটা নির্ভরশীল। এরপর **১৯২৯** সালে আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞানী এডউইন হাব্‌ল প্রমাণ করেন যে, দূরবর্তী সকল **গ্যালাক্সি** থেকে আগত আলো সর্বদাই **ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম** এর লালের দিকে স্থান পরিবর্তন করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **'রেড শিফ্‌ট'**। পাঠকদের অনেকেই হয়তো **রেড শিফ্‌ট** কিংবা **ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম** সম্পর্কে পুরোটা ওয়াকিফহাল নন, তাই এ সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করছি।

রেড শিফ্‌ট

আলোক রশ্মি তরঙ্গ দ্বারা সৃষ্ট। **রেড শিফ্‌ট** বলতে আমরা আলো সৃষ্টিকারী বস্তুর গতির ফলে ঐ তরঙ্গের মধ্যে রদবদলকে বুঝাচ্ছি। এই পরিবর্তন ঘটে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। **রেড শিফ্‌ট** সংঘটিত হওয়ার মূলে **'ডপলার এফেক্ট'** নামক একটি ক্রিয়া জড়িত। নীচের নক্সাটির দিকে লক্ষ্য করুন। **ডপলার এফেক্ট** আলো, শব্দ তথা তরঙ্গ জাতীয় সকল ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়।

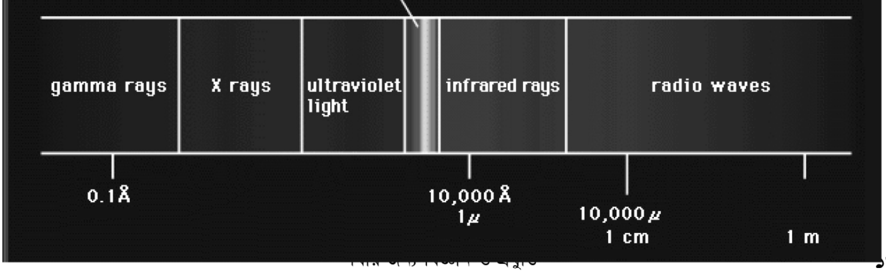


উপরের ছবিতে গাড়িটি দ্রুত ডান দিকে ছুটে চলছে। ইঞ্জিনের শব্দ ডানদিকে অনেকটা ভিন্ন হবে। কারণ শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় শব্দের মধ্যে উচ্চ **পিচ্‌** সৃষ্টি হবে। অপরদিকে বাম দিকে শব্দ তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দীর্ঘ হবে। এর ফলে **পিচ্‌** হবে অনেকটা কম। শব্দ বা তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোন বস্তু যেমন গাড়ি, ট্রেন ইত্যাদি যদি চলমান হয় কিংবা শ্রবণকারী চলমান হন তাহলে এরূপ ক্রিয়া সৃষ্টি হবে। গতির ফলে শ্রবণকারী বা পর্যবেক্ষকের নিকট এই ভিন্ন **পিচ্‌** পরিলক্ষিত হওয়ার নামই হলো **ডপলাট এফেক্ট। ডপলার এফেক্ট** শুধুমাত্র শব্দতরঙ্গের ক্ষেত্রেই ক্রিয়া করে না বরং যাবতীয় **ইলেকট্রমেগনেটিক** তরঙ্গের বেলায়ও তা ক্রিয়াশীল হয়। এই ব্যাপারটির আবিষ্কারক ছিলেন অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ **ক্রিস্টিয়ান জোহান ডপলার (১৮০৩-১৮৫৩)**। তারই নামানুসারে এটাকে **'ডপলার এফেক্ট'** বলে।

আলোক রশ্মির সূত্র যদি নিকটবর্তী হতে থাকে তাহলে ডপলার এফেক্টের কারণে তা **ব্লু শিফ্‌ট** হবে। আর যদি তা দূরে চলে যেতে থাকে তাহলে তা **রেড শিফ্‌ট** হবে। নীল শিফ্‌ট আর লাল শিফ্‌ট বুঝতে হলে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে **'ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম'** কি। সুতরাং এখন আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম

আজকাল **রেডিও, টিভি, মাইক্রওয়েভ, এক্স-রে** ইত্যাদির ব্যবহার প্রত্যন্ত অঞ্চলে শুরু হয়েছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বভাবের প্রদত্ত এসব **'তরঙ্গ'** এবং তার গুণাগুণ আমরা কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কি কখনো প্রশ্ন করি, এগুলো আসলে কি এবং কিভাবে এগুলো কাজ করে? বাস্তবে এগুলোর মূলে যে জিনিসটি ক্রিয়াশীল থাকে তাহলো **'এনার্জি তরঙ্গ'** যা সৃষ্টি হয় কোন **ইলেকট্রিক** চার্জের মধ্যে দোলন কিংবা কম্পন থেকে। অর্থাৎ **ইলেকট্রিক চার্জ** যখন কোন ফোর্সের কারণে যেমন কারো মুখ থেকে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ, দোলতে থাকে তখন **ইলেকট্রমেগনেটিক** রেডিয়েশনের জন্ম হয়। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের **'তরঙ্গ'** সৃষ্টি হতে পারে যা দূর দূরান্ত পর্যন্ত আলোকের গতিতে চলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। এরূপ যাবতীয় **ইলেকট্রমেগনেটিক** তরঙ্গকে আমরা একটি বিশেষ উপায়ে তরঙ্গের **ফ্রিক্যুয়েন্সি** (দোলনের রেইট) ও **ওয়েভলেন্থ** (তরঙ্গদৈর্ঘ্য) মুতাবিক একটি চার্ট তৈরী করে ব্যাখ্যা করতে পারি। এই চার্টকেই বলে **'ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম'**। এই **স্পেকট্রাম** দ্বারা বিভিন্ন তরঙ্গ যেমন রেডিও ও মাইক্র**ওয়েভ** ছাড়াও দৃশ্যমান আলো ও অদৃশ্য অন্যান্য রেডিও তরঙ্গ যেমন **ইনফ্রারেড** ও **আলট্রাভাইলোট** লাইট ইত্যাদিও ব্যাখ্যা করতে পারি। নীচের ছবিটি দেখুন।



উপরের ছবিতে **‘দৃশ্যমান আলো’** কতটুকু তা লক্ষণীয়। বাস্তবে চোখের দৃষ্টিশক্তির বাইরেই বেশিরভাগ তরঙ্গ বিরাজ করে। যেমন আমরা **রেডিও, মাইক্রওয়েভ, ইনফ্রারেড, আলট্রাভাইলোট, এক্স-রে, আলফা** ও **গামা** রশ্মি ইত্যাদি কিছুই স্বচক্ষে দেখতে অপারগ। দৃশ্যমান আলোকের ব্যাপ্তি স্পেকট্রামের অতি অল্প স্থান দখল করে রেখেছে।

উপরের বর্ণনা ও ছবি দ্বারা সমর্থিত তথ্যাদি থেকে আমরা **রেড শিফ্‌ট** বলতে কি বুঝি তার একটি ধারণা পেয়ে যাবো আশারাখি। এরপরও আরো একটু ব্যাখ্যা দিচ্ছি যা থেকে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হবে। দূরের কোন **গ্যালাক্সি** থেকে যখন আলোকরশ্মি এসে আমাদের স্পেকট্রোমিটারে (স্পেকট্রাম গবেষণার যন্ত্রে) এসে পৌঁছে তখন আমরা লক্ষ্য করি আলোকরশ্মি স্থান পরিবর্তন করে লালের দিকে যাচ্ছে। এ থেকে **ডপলার এফেক্ট** মুতাবিক এটাই জানা **গেল** যে, আলোকরশ্মির সূত্র ঐ গ্যালাক্সিটি আমাদের থেকে দূরে সরে পড়ছে। কাছে যদি আসতো তাহলে তার আলোকরশ্মি **ব্লু শিফ্‌ট** করতো। পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রায় সবক’টি দূরবর্তী **গ্যালাক্সি** থেকে আগত আলোকরশ্মি লাল-শিফ্‌ট করে। বিজ্ঞানীরা এই তথ্যাদি থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পুরো জগতটা প্রতিনিয়ত বর্ধিত হচ্ছে।

মহাবিস্ফোরণ **থিওরী** মুতাবিক জগৎ সৃষ্টির মাত্র ক্ষণকালের মধ্যেই এটা চতুর্দিকে খুব দ্রুত বর্ধিত হয়েছে। সে সময় জগতের চালিকাশক্তি হিসেবে একটি মাত্র মৌলিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল। বর্ধিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক বিরাট তাপমাত্রা কমে যায়। এতে উক্ত মৌলিক শক্তি ভেঙ্গে মোট চারটিতে রূপান্ততির হয়। এগুলো হলোঃ ১. মহাকর্ষ, ২. শক্তিশালী আনবিক শক্তি, ৩. দুর্বল আনবিক শক্তি ও ৪. **ইলেকট্রমেগনেটিক** শক্তি। এই চার শক্তি দ্বারাই সমগ্র মহাবিশ্ব আজো নিয়ন্ত্রিণ হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা এই চারটি মৌলিক শক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি।

প্রাথমিক পর্যায় শেষে মহাবিশ্বের আয়তন দিন দিন বাড়তেই থাকে যা আজো বিদ্যমান। **থিওরী** অনুযায়ী এই প্রসারণের কারণ হলো, সৃষ্টি ক্ষণে যে বিরাট এক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল, এটা তার প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ সেই ফোর্সের ফলে এখনও বিশ্বের সম্প্রসারণ স্তিমিত হয় নি। তবে **বিগ ব্যাং থিওরী** ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দু’টি পরিণতির

কথা বলেছে। হয় এই সম্প্রসারণ একদিন থেমে যাবে এবং মহাকর্ষের ফলে উল্টো দিকে সংকোচন হওয়া শুরু করবে এবং একদিন আবারও এক বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরূপ হলে বিশ্বটা হবে **‘ক্লোজড্ ইউনিভার্স’**। অপরদিকে যদি এই সম্প্রসারণ অনির্দিষ্টকালের জন্য হতে থাকে তাহলে বিশ্বটা হবে **‘অপেন ইউনিভার্স’**। **ক্লোজড্** হলে ধ্বংস আর **অপেন** হলে চিরন্তন।

এখন বিশ্বটা **ক্লোজড্** না **অপেন** তা কিভাবে নির্ণয় করা যায়? বিজ্ঞানীরা বলছেন, যদি এ মহাবিশ্বের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্তু বা **ম্যাস** থাকে- অর্থাৎ বিশ্বটা যদি ঘনত্বের দিক থেকে যথেষ্ট হয় তাহলে এটা হবে **ক্লোজড্।** আর যদি এই ঘনত্ব যথেষ্ট না হয় তাহলে তা হবে **অপেন।** ঘনত্ব যথেষ্ট হলে বিশ্বের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তিও যথেষ্ট হবে যা শেষ পর্যন্ত একে টেনে কেন্দ্রের দিকে নিয়ে যাবে ও একদিন বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেবে। আর **অপেন** থাকলে তো চিরকাল বিশ্বের আয়তন বাড়তেই থাকবে। বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে জগতে প্রচুর **‘ডার্ক মেটার’** বা কৃষ্ণ বস্তু বিদ্যমান। এ থেকে বিশ্বটা **ক্লোজড্** হওয়ার দিকেই পাল্লা ভারী মনে হয়। অর্থাৎ এর জন্ম ছিল এবং একদিন মৃত্যুও হবে। ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রেও এটা গ্রহণযোগ্য। সকল প্রাণীজগতেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। সুতরাং আমাদের মতে **ক্লোজড্** বিশ্ব হওয়াটাই হবে সঠিক। আর যে চারটি শক্তি দ্বারা পুরো মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে, এগুলোর মধ্যে হেরফের ঘটলে কালই যে বিশ্বটা **ক্লোজড্** হবে না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

আপনি জানেন কি: বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে পুরো বিজ্ঞান জগতে সত্যিকার বিপ্লব শুরু করেছিলেন। এ দুটো হলো: সময় ও স্থান (space-time) একত্রে দেখা এবং বস্তু ও এনার্জি (mass-energy) মূলত একই জিনিস হিসাবে সনাক্ত করা।

পরিচ্ছেদ ২৭

পানিচক্র

পানির অপর নাম জীবন- কথাটির তাৎপর্য কত গভীর তা পাঠকরা একটু পরই বুঝতে পারবেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা পানি থেকেই জীবীর উৎপত্তি। মানবদেহের তিন-চতুর্থাংশই পানি। পানি সম্পর্কে আমরা এ প্রসঙ্গে আরো অনেককিছু জানবো- তবে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো গত বিলিয়ন (হাজার মিলিয়ন) বছরে পৃথিবীর মোট পানির পরিমাণ খুব একটা বেশকম হয় নি। অর্থাৎ পানি বিভিন্ন অবস্থায় একই পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এর ক্ষয় বা উৎপাদন হয় নি। তবে পৃথিবীর পানি স্থির অবস্থায় নেই। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে পানির বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থান একান্তভাবে সংপৃক্ত। এসব অবস্থান ও অবস্থাকে বলে **'পানিচক্র'** বা **ওয়াটার সাইকোল**।

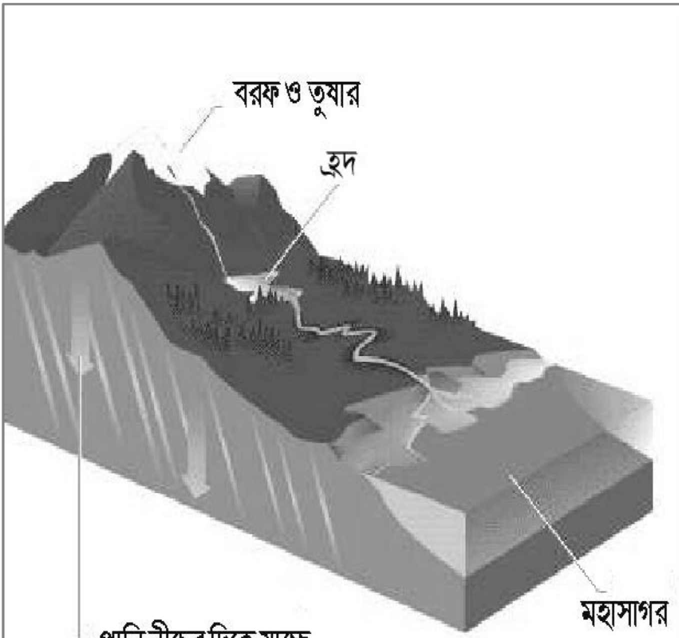
ওয়াটার সাইকোলের অপর নাম **'হাইড্রোলজিক সাইকোল'**। পনি সর্বদাই পৃথিবীর উপরিভাগ, বায়ুমণ্ডল ও অভ্যন্তরে চলাচল করে। কিভাবে কেনো এই চলাচল, সে সম্পর্কে গবেষণাকেই বলে পানিচক্র। পানিচক্রে বিরাট পরিমাণ পানি জড়িত। চারটি আলাদা পর্যায়ে পানিচক্র সংঘটিত হয়। এগুলো হলো **১. স্টোরেজ বা সঞ্চয়**, **২. ইভাপোরেশন বা বাষ্প হওয়া**, **৩. প্রিসিপিটেশন বা বৃষ্টি ও তুষারপাত** ও **৪. রানঅফ বা চলন**।

সঞ্চয়

পানি সাধারণত মাটি, লেক, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও উত্তর-দক্ষিণ মেরুতে বরফাকারে অস্থায়ীভাবে সঞ্চয়িত থাকে। পৃথিবীতে পানির মোট পরিমাণ ৩৪০ মিলিয়ন কিউবিক মাইল। এর মধ্যে ৯৭% পানিই সাগর-মহাসাগরে লবণাক্ত অবস্থায় আছে। তবে যেহেতু পানি যখন তাপের ফলে বাষ্পে পরিণত হয় তখন এতে লবণের পরিমাণ প্রায় শূন্যতে পৌঁছায়, তাই বৃষ্টি ও বরফ হিসাবে পতিত পানি আর লবণযুক্ত থাকে না। এটা তখন মিঠাপানিতে রূপান্তরিত হয়। পৃথিবীতে ফ্রেস বা মিঠাপানির পরিমাণ প্রায় ৮.৬ মিলিয়ন কিউবিক মাইল। যে কোন মুহূর্তে বায়ুমণ্ডলে পানির পরিমাণ থাকে প্রায় ২,৯০০ কিউবিক মাইল। এছাড়া পৃথিবীর নদী-নালা লেক ইত্যাদি প্রায় ২৯,০০০ কিউবিক মাইল পরিমাণ পানি সংরক্ষণ করে। তবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা

বৃহৎ দু'টি মিঠাপানির জলাধার (**রিজারভোইর**) হলো উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। এতে বরফ অবস্থায় ৬.৭ মিলিয়ন কিউবিক মাইল পানি বিদ্যমান আছে।

কি পরিমাণ পানি বরফ অবস্থায় থাকে তা অবশ্য নির্ভর করে পৃথিবীর সার্বিক আবহওয়ার উপর। আজ থেকে ২২,০০০ বছর পূর্বে সর্বশেষ **তুষারযুগ** (বা **আইস এইজ**) ছিল। সে সময় অতিরিক্ত ৮ মিলিয়ন স্কোয়ার মাইল স্থলভূমি বরফে ঢাকা ছিল। এই বরফের গভীরতা ছিল প্রায় ১ মাইল। এই অতিরিক্ত পানি মহাসাগর থেকেই এসেছিল তাই সে সময় সাগরের পানির লেবেল এখন থেকে অন্তত ১২০ মিটার নীচে ছিল।

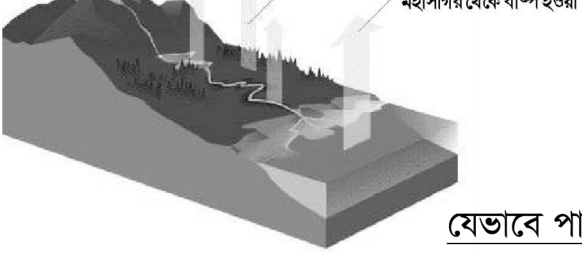


পানি স্টোরেজঃ বৃষ্টি ও তুষারপাত থেকে পানি পতিত হয়ে পৃথিবীতে তরল ও কঠিন পদার্থ হিসাবে জমা হয়। পৃথিবীতে মোট পানির মাত্রা ১.৪ বিলিয়ন কি.কি.মি. (৩৪০ মিলিয়ন কিউবিক মাইল)। এর মধ্যে ৯৭% লবণাক্ত যা থাকে মাহাসাগরে। মিঠাপানি অবশ্য নদী, নালা,হ্রদ, তুষার পর্বত ও বরফের মধ্যে বিদ্যমান। এছাড়া মাটির নীচে শিলাপাথর ও হ্রদে মিঠাপানি জমা থাকে।

বাষ্প হওয়া

পানি সূর্যের তাপে বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে **গ্যাস** হিসাবে আরোহণ করে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই বাষ্প হওয়ার ক্রিয়া সংঘটিত হয়। যেমন বরফ থেকে বাষ্প হওয়াকে বলে **সাবলিমেশন** (ঊর্ধ্বপাতন)। বৃক্ষের পাতা থেকে বাষ্প হওয়াকে বলে **ট্রান্সপাইরেশন** (বাষ্পত্যাগ)। প্রত্যহ বিপুল পরিমান পানি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বাষ্প হয়ে প্রবেশ করে। এক হিসাব মতে এই পানির মাত্রা ৩০০ কিউবিক মাইলেরও অধিক বলা হয়েছে। চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো, এই পরিমাণ পানি আবার বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি উপায়ে পৃথিবীতে নেমে আসে। সুতরাং উপরে ওঠা ও নামা প্রায় একই থাকায় একটি ব্যালান্স তৈরী হয়েছে। যদি বায়ুমণ্ডল থেকে পতিত পানি আবার বাষ্প হওয়ার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত না হতো তাহলে পুরো বায়ুমণ্ডল মাত্র ১০ দিনের ভেতর শুকিয়ে পড়তো।

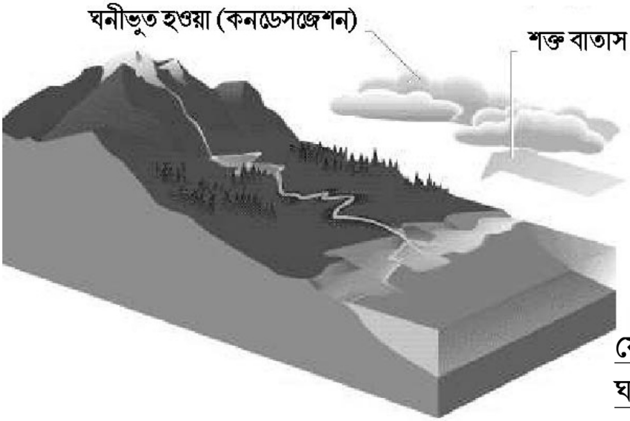
বাষ্প হওয়ার মাত্রা সূর্যালোক, তাপমাত্রা, বাতাসের গতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। আদ্রতা বেশী হলে বাষ্প হওয়া কমে যায়- কম হলে বেড়ে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় বাষ্প হওয়ার ক্রিয়া সংঘটিত হয়। যেমন উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে তাপমাত্রা ও সূর্যালোক অতি কম থাকায় বাষ্প হওয়ার মাত্রা প্রায় শূন্য। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সাগরের পানির স্তর বৎসরে ৪ মিটার পর্যন্ত কমে যায় বাষ্প হওয়ার কারণে। অবশ্য সাথে সাথে বৃষ্টির ফলে তা আবার স্বস্থানে ফিরে আসে। পৃথিবীর গড় বাষ্প হওয়ার বাৎসরিক পরিমাণ হলো ১ মিটার। এই রেইটে বছর-প্রতি সাগরের পানির স্তর ১ মিটার করে কমে যেতো, কিন্তু বৃষ্টি ও চলনের মাধ্যমে তা আবার পরিপূর্ণ হয়ে যায়।



যেভাবে পানি বাষ্প হয়।

বৃষ্টি ও তুষারপাত

পানি বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে যেয়ে কিন্তু বেশিদিন বসে থাকে না। বৃষ্টি, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি উপায়ে আবার পৃথিবীতে পতিত হয়। বাষ্পীয় পানি উপরে ওঠে **কনডেনজেশন** ক্রিয়ার মাধ্যমে মেঘে পরিণত হয়। এরপর তা পৃথিবীতে নেমে আসে। প্রত্যহ অন্তত ৭০ থেকে ৭৫ কিউবিক মাইল পরিমাণ পানি আকাশ থেকে পতিত হয়। স্থলভাবে পতিত পানির সিংহভাগ কিন্তু সাগরে যেয়ে পৌঁছার পূর্বেই আবার বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়।

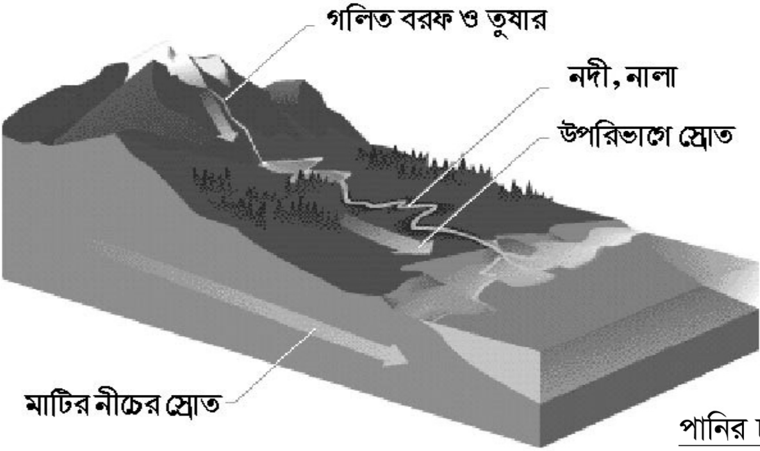


যেভাবে বাষ্পীয় পানি ঘনীভুত হয়।

চলন

পানি স্থলভাগ থেকে বিভিন্ন পথে ভূমির নীচে কিংবা সাগরে যেয়ে পৌঁছে। এই ক্রিয়াকে বলে **রান-অফ** বা চলন। পানি কোন সময়ই স্থির নেই। সবসময় গড়ায়, নীচের দিকে যায় না হয় বাষ্প হয়ে উপরের দিকে উঠে। নদী-নালার মাধ্যমে পানির চলনকে বলে **সারফেস রান-অফ**- অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়ে চলন। পৃথিবীর নদীসমূহের মাধ্যমে প্রত্যহ অন্তত ২৫ কিউবিক মাইল পানি সাগরে গিয়ে পৌঁছে। অবশ্য এই চলন সব সময় সমান নয়। বৃষ্টির মওসুমে তা বেশি হয় এবং শুষ্ক সিজনে কম হয়। নদীতে পানি ভূমির উপরিভাগ ও নীচ থেকে জমে তা সাগরের দিকে চলে। নাব্যতার অভাবে সময় সময় পানির স্তর বেশি হয়ে নদীর তীরবর্তী এলাকায় বন্যার

সৃষ্টি করতে পারে। ভূমির অভ্যন্তরে **'ওয়াটার টেবিল'** নামক একটি স্তর আছে। বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি থেকে যে পানি ভূমির উপর পতিত হয় তার উল্লেখযোগ্য অংশ নদী-নালায় না গিয়ে নীচের দিকে শিলা পেরিয়ে গড়ায়। **ওয়াটার টেবিল** যেখানে কম সেখানে গিয়ে স্থির হয়। এভাবে চলনের গড় গতি মাত্র **১** মিটার প্রতি সেকেণ্ড। মাটির নীচের নদী-নালা দিয়ে এই পানি আবার চলতে থাকে।



পানির চলন।

আপনি জানেন কি ঃ এই পৃথিবীতে একমাত্র পানিই বস্তুর প্রাকৃতিক তিনটি অবস্থার সবক'টিতে একই সঙ্গে বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ পানি কঠিন (বরফ), তরল ও বাষ্প এই তিনটি মৌলিক অবস্থায় আমাদের পৃথিবীতে বিরাজ করে। আপনি অবশ্য জানেন, পানির অপর নাম জীবন। এ কথাটি শুধুমাত্র পিপাসা নিবারণের বস্তু হিসাবে নয়- বরং পানি থাকার ফলে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ জীবিত আছে, সে-ই অর্থে বুঝতে হবে। আমাদের দেহের প্রায় ৮০ শতাংশ পানির তৈরী। জ্যান্ত প্রতিটি কোষের মৌলিক পদার্থের নাম **'প্রটোপ্লাজম'**। এ দ্রব্যে পানিতে ভাসমান আছে মেদ, **কার্বোহাইড্রেট, প্রটিন**, লবণ ও অন্যান্য দ্রব্য। পানি এ ক্ষেত্রে একটি **সলভেন্ট** বা দ্রাবক হিসাবে কাজ করে। উপরোক্ত দ্রব্যাদির বাহক হয়ে পানি এগুলোকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। এছাড়া আমাদের রক্তের মধ্যে প্রচুর পানি আছে।

পরিচ্ছেদ ২৮

কাল

পাঠকদেরকে **'সময়'** বা **'কাল'** কোন্ জিনিস তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। অনেকের হাতে ঘড়ি আছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এ তিনের ধারণা কারো অজানা নেই। অতীত থাকে স্মৃতিতে, ইতিহাসে; ভবিষ্যৎ নাগালের বাইরে; আর আমরা সবাই বন্দী বর্তমানের উপর। এক মুহূর্তের বর্তমান। কারণ সময় চিরচলন্ত। সময় সম্পর্কে এসব তথ্যাদি সবার জানা থাকলেও বিজ্ঞানীদের কাছে সময়কে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন ব্যাপার। এর কারণ কি- তা পরবর্তী প্যারাসমূহে বর্ণিত হবে।



ধারণা না বাস্তবতা

সময় কি আমাদের ধারণা মাত্র, না তার কোন বাস্তবতা আছে? এ ব্যাপারে দার্শনিকদের মধ্যে মাতনৈক্য দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বলেন শিশুরা সময়কে অনুভব করে, কেউ বলেন করে না বরং সময়কে আমাদের মস্তিষ্ক আবিষ্কার করে। অভিজ্ঞতা থেকেই সময়ের অনুভুতি জন্মে। সুতরাং সময় আসলে একটি **'সাবজেক্টিভ অভিজ্ঞতা'**। একটি শিশুকে অবশ্য এই অভিজ্ঞতা থেকে সময় জিনিসটি কি তা বুঝতে হয়। দার্শনিকদের এরূপ ধারণা বা **থিওরী** নিয়ে এখানে বেশি আর বলার দরকার

নেই। আমরা যেহেতু বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছি তাই দর্শনকে এর সঙ্গে জড়ানো হবে সঙ্গতিহীন। তবে কথাগুলো বলার কারণ এটাই, সময় জিনিসটি যে কী তা আদৌ কারো জানা নেই- ব্যাপারটি সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিফহাল করানো -এই যা।

সময় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

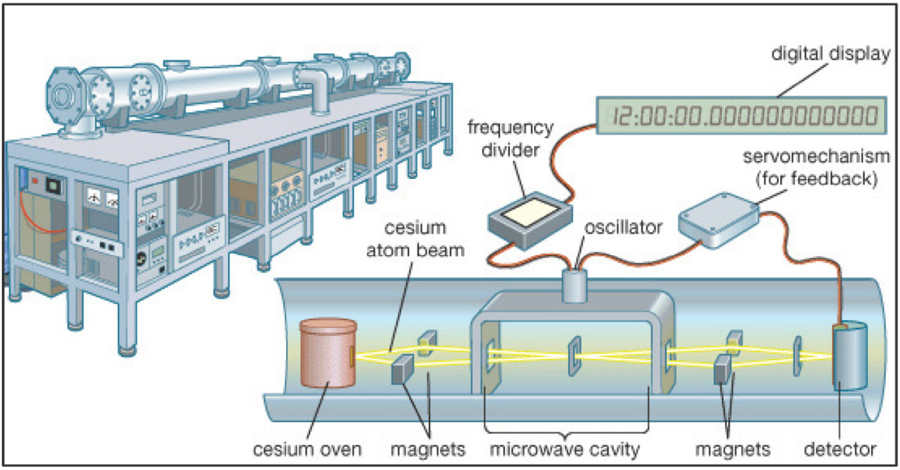
সময়কে বিজ্ঞান সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে, **'সময় হলো স্থিতিকালের অভিজ্ঞতা যা চেতনায় অনুভুত হয়, এই স্থিতিকাল অতিবাহিত হওয়ার সময় কোন ক্রিয়া সংগঠিত হয়'**। সময় একটি বিস্তৃতিও (বা **ডাইমেনশন**) বটে। সময় বস্তু জগতের একটি মৌলিক উপাদান। যেমন বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতা আছে, তেমনি সময়ও এর একটি বিস্তৃতি। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে সময়কে **'চতুর্থতম বিস্তৃতি'** হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। সময় বা কালকে মাপার দরকার। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা কিছু **স্ট্যান্ডার্ড** সৃষ্টি করেছেন। এই স্ট্যান্ডার্ডের মূলে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অণু ও বিশুদ্ধ গাণিতের সম্পৃক্ততা।

বিজ্ঞানীরা এব্যাপারে একমত যে, কাল হলো জগতের একটি জঠিল ও বুঝতে বেশ কঠিন জিনিস। অতীত, ভবিষ্যৎ, ক্ষণকাল, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি যদিও বিজ্ঞান দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে সময় জিনিসটি কী তা কেউ সঠিকভাবে জানে না। অস্পষ্ট সময়ের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব। যা হোক সময় সম্পর্কে আরো কিছু ব্যাপার আছে যা জানা থাকা দরকার।

সময় মাপার উপায়

একাধিক উপায়ে সময়কে মাপা হয়ে থাকে। **সোলার** বা সৌরসময় পৃথিবীর দৈনিক ঘুর্ণনের উপর নির্ভরশীল। এই ঘুর্ণন হেতু সূর্যটি পূর্বে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যায়। এই দৃশ্যমান গতি থেকে একটি **পিরিওড** বা নির্দিষ্ট কাল আমাদের নিকট স্পষ্ট। এই কালকে বলে **'এক দিন'**। অপর আরেকটি সময় আছে যাকে বলে **সাইডরিয়েল টাইম** বা **'নাক্ষত্রিক সময়'**। এটাও পৃথিবীর দৈনিক ঘুর্ণন গতির উপর নির্ভরশীল- তবে ব্যবধান হচ্ছে, মহাকাশে **'স্থির'** তারার দৃশ্যমান গতিকে **রেফারেন্স** হিসেবে নেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ একই স্থানে তারাটি ফিরে আসতে ঠিক যেটুকু সময় অতিবাহিত হয় তা-ই হবে **'এক দিন'**। **স্ট্যান্ডার্ড টাইম** বলতে পৃথিবীর গোলককে ২৪টি টাইম জোনে বিভক্ত করে ২৪ ঘণ্টাকে উপস্থাপন করা বুঝায়।

ডাইনামিক্যাল টাইম বা **'গতিশীল সময়'** নামক আরেকটি উপায় বিদ্যমান যা জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীরা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ, চন্দ্রের প্রদক্ষিণ এবং অন্যান্য গ্রহের প্রদক্ষিণ ইত্যাদি গতি গবেষণা করে এই সময় নির্ধারণ করেন। আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা সঠিক সময় নির্ধারণ করা হয় অণুর মাধ্যমে। একে **এটমিক** সময় বলা হয়। বিশেষ অবস্থায় কিছু কিছু পদার্থের অণু **ইলেকট্রমেগনেটিক** তরঙ্গ নির্গত করে। এরূপ পদার্থ দ্বারাই **এটমিক** ঘড়ি তৈরী হয়।



সৌরসময় ও নাক্ষত্রিক সময়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সৌরসময় মুতাবিক এক বৎসরে আছে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫.৫ সেকেণ্ড। অপরদিকে নাক্ষত্রিক সময় মুতাবিক এক বৎসরে আছে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৯.৫৪ সেকেণ্ড। সুতরাং পার্থক্য হলো ২০ মিনিট ২৪.০৪ সেকেণ্ড। সৌরবৎসর ও নাক্ষত্রিক বৎসরের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হিসাবে বলা হয়, পৃথিবীর দু'টি গতি। কারণ পৃথিবীর বার্ষিক ও দৈনিক এই দু'টি গতি আছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক মাপজোখের জন্য যে **স্ট্যান্ডার্ড টাইম** ব্যবহৃত হয় তা, **সিজিয়াম-১৩৩** অণুর কম্পনের উপর ভিত্তি করে। **১** সেকেণ্ডকে বলা হয়, উক্ত এটমের মধ্যে ৯,১৯২,৬৩১,৭৭০ পরিমাণ কম্পনের সমান। **ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিট্স (এসআই ইউনিট)** এক সেকেণ্ডকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছে। আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে **এসআই ইউনিট** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আপনি জানেন কি: আমাদের মস্তিষ্কে একটি **'মাস্টার বায়োলজিক্যাল ঘড়ি'** আছে। ব্রেনের **'হাইপোথালামাস'** নামক একটি এলাকায় এই ঘড়িটির অবস্থান। কোন্ সময় কি করতে হয় এই ঘড়ি তা নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঘড়িটি ক্ষুদা, পিপাসা, যৌন কামনা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়। এছাড়া প্রতিটি **সেল** বা কোষেও **বায়োলজিক্যাল** ঘড়ি আছে। অবশ্য এগুলো মস্তিষ্কের মাস্টার ঘড়ির প্রভাব থেকে মুক্ত নয় বরং আনুগত্যশীল। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা বুড়ো বয়সে এসব ঘড়ির মধ্যে তেমন যোগাযোগ অবশিষ্ট থাকে না বিধায় বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পরিচ্ছেদ ২৯

ওজন ও মাপজোখ

বিজ্ঞান মাপজোখের উপর নির্ভরশীল। আমরা দৈনন্দিন জীবনেও ওজন ও মাপজোখ করে থাকি। দোকানী সর্বদাই **কেজি, গ্রাম, মিটার, ফুট** ইত্যাদি মাপজোখ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং মাপজোখ শুধু বিজ্ঞানের ব্যাপার নয়- সবার। তাহলে আসুন আমরা এ ব্যাপারে আরো কিছু জেনে নিই।

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী একই ধরনের মাপজোখের **ইউনিট** ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সিস্টেমকে বলে **ইন্টারনেশন্যাল সিস্টেম অব ইউনিটস্ (সংক্ষেপে এসআই ইউনিট)**। এ প্রসঙ্গে আমরা পুরাতান **'ইম্পিরিয়াল সিস্টেম'** বা ইংলিশ সিস্টেমের উপর আলোচনা করবো না। তবে যারা এখনও মাইল, গজ, ইঞ্চি ইত্যাদি ভালো বুঝেন তাদের সুবিধার্থে একটি রূপান্তর টেবিল নীচে দেওয়া হলো।

এসআই ইউনিটস্ ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সবার সুবিধার জন্য এই **সিস্টেম** আবিস্কৃত হয়। সিস্টেমটি মূলত **মিটার, কিলোগ্রাম** ও **সেকেন্ড** এই তিনটি ইউনিটের উপর নির্ভরশীল। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদির জন্য **মিটার,** ওজনের জন্য **কিলোগ্রাম** ও সময়ের জন্য **সেকেন্ড**। এই **সিস্টেম 'মেট্রিক সিস্টেম'** এর অনুরূপ। আমরা একটু পরই **মেট্রিক সিস্টেম** এর উপর আলোচনায় যাচ্ছি।

মৌলিক **এসআই** ইউনিটসকে বলে **'বেইজ এসআই ইউনিট'** আর সেকেন্ডারী ইউনিটস্কে বলে **'সুপ্লিমেন্টারি এসআই ইউনিটস্'**। প্রথমে আমরা **এসআই বেইজ ইউনিটস্** টেবিলটি তুলে ধরলাম।

এসআই বেইজ ইউনিটস্

ইউনিট	**এসআই বেইজ ইউনিটের নাম**	**সংকেত**
দূরত্ব (লেন্থ)	মিটার	এম (m)
ওজন (ম্যাস)	কিলোগ্রাম	কেজি (kg)
সময় (টাইম)	সেকেন্ড	এস (s)

বৈদ্যুতিক কারেন্ট	আম্পেয়ার	এ (A)
থার্মোডাইনামিক তাপ	কেলভিন	কে (K)
বস্তুর পরিমাণ	মউল (Mole)	মোল (mol)
ঔজ্জ্বল্যতা	কেন্ডেলা	সিডি (cd)

এবার সুপ্লিমেন্টারি **এসআই** ইউনিটের একটি টেবিল তুলে ধরছি।

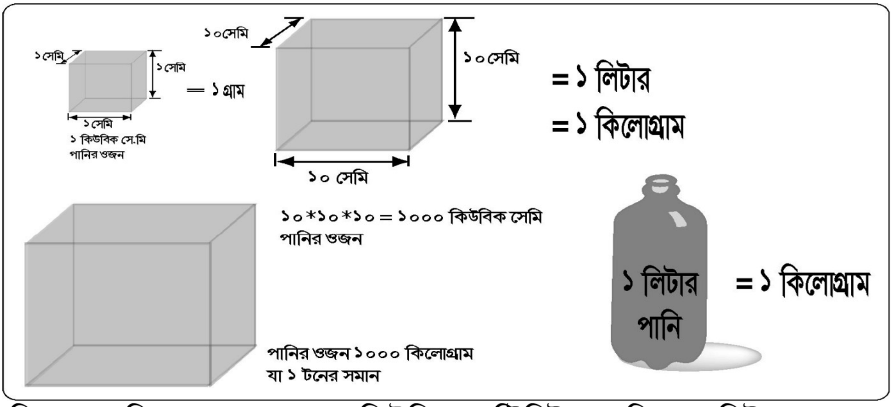
সুপ্লিমেন্টারি এসআই ইউনিটস

ইউনিট	**সুপ্লিমেন্টারি এসআই ইউনিটের নাম**	**সংকেত**
সমতল কোণ	রেডিয়ান	আরএডি (rad)
সলিড কোণ	স্টারেডিয়ান	এসআর (sr)
ইলেকট্রিক কেপাসিটেন্স	ফারাদ	এফ (F)
ইলেকট্রিক চার্জ	কুলুম্ব (coulomb)	সি (C)
ইলেকট্রিক কন্ডাকটেন্স	সিমেন্স (siemens)	এস (S)
এনার্জি বা ওয়ার্ক (কার্য)	জুল	জে (J)
ফোর্স	নিউটন	এন (N)
ফ্রিকুয়েন্সি	হার্টজ্ (hertz)	এইচজেড (Hz)
পটেনশিয়াল পার্থক্য	ভল্ট	ভি (V)
পাওয়ার	ওয়াট	ডব্লিউ (W)
প্রেসার	পাসকেল	পিএ (Pa)
রেজিসটেন্স	ওম (ohm)	ওমেগা (Ω)
শব্দের তীব্রতা	ডেসিবেল	ডিবি (dB)
তাপমাত্রা	°সেলসিয়াস	°সি (^0C)

মেট্রিক সিস্টেম

এসআই ও **মেট্রিক সিস্টেম** সহোদরা বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে উভয়ের জন্মকালে বিরাট তফাৎ বিদ্যমান। **মেট্রিক সিস্টেম** অনেক আগে প্রবর্তিত হয়েছিল (বাস্তবে ১৭৯০ খৃঃ ফ্রান্সে এর প্রচলন শুরু হয়।) এটা মূলত **ডেসিমেল সিস্টেম**। আজকাল পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই **সিস্টেম** ব্যবহার করে এবং বিজ্ঞানমহলে এটা সর্বত্রই চালু আছে। দূরত্ব মাপার **ইউনিট মিটার** এর সংজ্ঞা হলোঃ **১/২৯৯,৭৯২,৪৫৮ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে আলোকরশ্মি শূন্য স্থানের উপর দিয়ে যেটুকু দূরত্ব ভ্রমণ করে। মেট্রিক সিস্টেম** যেহেতু ১০ সংখ্যা ডেসিমেলের উপর নির্ভরশীল তাই এক **ইউনিট** থেকে অপর ইউনিটে রূপান্তর অতি সহজ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১২৫৩৬২১.০ মিলিমিটারকে আমরা শুধুমাত্র **ডেসিমেল পয়েন্ট** ডানে অথবা বাঁয়ে নিয়ে অন্য ইউনিটে রূপান্তর করতে পারি। এর কারণ হলো ১০ মি.মি. = ১ সেন্টিমিটার, সুতরাং **ডেসিমেল পয়েন্ট** বাঁয়ের দিকে এক সংখ্যা পরিমাণ নিলেই ১২,৫৩,৬২১ মিমি = ১২,৫,৩৬২.১ সে.মি. হবে। একইভাবে যেহেতু ১০০ সে.মি. = ১ মিটার, সুতরাং ১২৫৩৬২.১ সে.মি. = ১২৫৩.৬২১ মিটার এবং ১২৫৩.৬২১ মিটার (১০০০ মিটার = ১ কি.মি.) = ১.২৫৩৬২১ কিলোমিটার। তবে চিন্তা করুন কিভাবে ১২৫৩৬২১ ইঞ্চিকে গজ, মাইল ইত্যাদিতে রূপান্তর করবেন। পারা যাবে অবশ্যই তবে অনেকটা কঠিন হবে। দূরত্ব মাপতে মেট্রিক সিস্টেমে তাই **মিলি, সেন্টি** ও **কিলোমিটার** ব্যবহৃত হয়।

ওজন মাপার মৌলিক **ইউনিট** হচ্ছে গ্রাম। ১ গ্রাম = ১০০০ মিলিগ্রাম। আবার ১০০০ গ্রাম = ১ কিলোগ্রাম। ১ গ্রাম আসলে ১ কিউবিক সেন্টিমিটার পানির ওজনের সমান।



এ হিসবে ১ কিলোগ্রাম = ১০০০ কিউবিক সেন্টিমিটার পানি = ১ লিটার। সুতরাং ১

লিটার পানির **প্লাস্টিক** একটি বোতলে ১ কিলোগ্রাম ওজন হবে। ভারী ওজনবিশিষ্ট বস্তুর জন্য আছে টন যা ১০০০ কিলোগ্রামের সমান (দেখুন পূর্বের পৃষ্ঠার নক্সাটি)।

এসআই (মেট্রিক) ও পুরাতন ইউনিট (রূপান্তর) টেবিল

আমরা সবশেষে সকলের সুবিধার জন্য মেট্রিক ও পুরাতন সিস্টেমের একটি রূপান্তর টেবিল নিম্নে ছেপে দিলাম। যারা এখনও পুরাতন ইম্পেরিয়াল বা ইংলিশ **সিস্টেম** বেশি বুঝেন তাদের জন্য এটা সহায়ক হবে- এটাই আশা।

CONVERSION BETWEEN ENGLISH AND METRIC UNITS
Approximate Common Equivalents

UNITS OF LENGTH			UNITS OF LENGTH		
1 inch	=	25 millimeters	1 millimeter	=	0.04 inch
1 foot	=	0.3 meter	1 meter	=	3.3 feet
1 yard	=	0.9 meter	1 meter	=	1.1 yards
1 mile	=	1.6 kilometers	1 kilometer	=	0.6 mile
UNITS OF AREA			UNITS OF AREA		
1 square inch	=	6.5 square centimeters	1 square centimeter	=	0.16 square inch
1 square foot	=	0.09 square meter	1 square meter	=	11 square feet
1 square yard	=	0.8 square meter	1 square meter	=	1.2 square yards
1 acre	=	0.4 hectare	1 hectare	=	2.5 acres
UNITS OF VOLUME			UNITS OF VOLUME		
1 cubic inch	=	16 cubic centimeters	1 cubic centimeter	=	0.06 cubic inch
1 cubic foot	=	0.03 cubic meter	1 cubic meter	=	35 cubic feet
1 cubic yard	=	0.8 cubic meter	1 cubic meter	=	1.3 cubic yards
CAPACITY (LIQUID)			CAPACITY (LIQUID)		
1 quart	=	.946 liter	1 liter	=	1.057 quarts
1 gallon	=	0.004 cubic meter	1 cubic meter	=	250 gallons
UNITS OF MASS			UNITS OF MASS		
1 ounce (avoirdupois)	=	28 grams	1 gram	=	0.035 ounce
1 pound (avoirdupois)	=	0.45 kilogram	1 kilogram	=	2.2 pounds

আপনি জানেন কি ঃ অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বৃটেনে মাপজোখের জন্য ব্যবহৃত হতো ইঞ্চি, ফুট, ইয়ার্ড ও মাইল। এই মাপের সংজ্ঞা এসেছে ১৮৪৫ সালে নির্মিত একটি **'ইম্পিরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ইয়ার্ড'** থেকে, যা ছিল একটি ব্রোনজের তৈরী বারের দু'টি লাইনের দূরত্বের সমান। আমেরিকাও এই স্টেন্ডার্ড মুতাবিক ইঞ্চি ইত্যাদি গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু পরে দেখা গেছে এই বারটি বৎসরে ১ ইঞ্চির ১.৫ মিলিয়ন ভাগের একভাগ করে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এটা জানার পর আমেরিকায় বৃটিশ **সিস্টেম** ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ কমে যায়- এবং তারা শেষ পর্যন্ত **মেট্রিক সিস্টেম** এডোপ্ট করে নেয়। অবশ্য বৃটেনেও এখন **মেট্রিক সিস্টেম** চালু হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৩০

উদ্ভিদ ও তাদের জীবন

আমাদের এই সবুজে ঘেরা বসুন্ধরা ২,৬০,০০০ এরও অধিক ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। উদ্ভিদরাও প্রাণী। এটা অবশ্য কারো অজানা নেই। তবে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি আলাদা প্রধান শাখা। সুতরাং পুরো এ বিষয়ের উপর আলোকপাতই আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে শুধুমাত্র ওসব ব্যাপার-স্যাপার আলোচনা করবো, যা হয়তো অনেকের নিকট ইন্টারেস্টিং কিংবা নতুন তথ্য বলে মনে হতে পারে।

উদ্ভিদের আয়তন অতি ছোট্ট থেকে বিটার হতে পারে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় প্রাণী আসলে একটি গাছ। আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় **সিকোইয়া** নামক এরূপ একটি গাছ আছে। এটি উচ্চতায় ১০০ মিটার (৩৩০ ফুট) পর্যন্ত বেড়ে উঠতে পারে। এর ব্যস ৩০ ফুট পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তবে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হলো এগুলো ৪০০০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। সম্ভবত পৃথিবীর বুকে এতো দীর্ঘদিন আর কেন কিছুই বাঁচতে পারে না। নীচের চিত্রটি দেখুন।



পৃথিবীর মানুষ খুব অল্প পরিমাণ বৃক্ষরাজি সরাসরি কাজে লাগায়। যেমন ধান, গম, ভুট্টা, সূঁতা, সাকশব্জি, ফলের গাছ, ফুলগাছ, তামাক এবং বিভিন্ন ধরনের কাঠের গাছ ইত্যাদি। তবে সার্বিকভাবে কোটি কোটি বছর যাবৎ যে ক্রিয়ার সঙ্গে উদ্ভিদজগৎ জড়িত সেই **'ফটোসিনথেসিস'** থেকে মানবজাতি সর্বাপেক্ষা বেশি উপকৃত হয়ে আসছেন। এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই বায়ুমণ্ডলে **অক্সিজেন** সৃষ্টি হয় যা ছাড়া কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারবে না। আমরা একটু পরই **ফটোসিনথেসিস** কিভাবে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

উদ্ভিদ থেকেই খনিজ সম্পদের উৎপত্তি যার উপর নির্ভর করে পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশের অর্থনীতি। এখন দেখা যাক উদ্ভিদের জীবন বলতে কি বুঝায়।

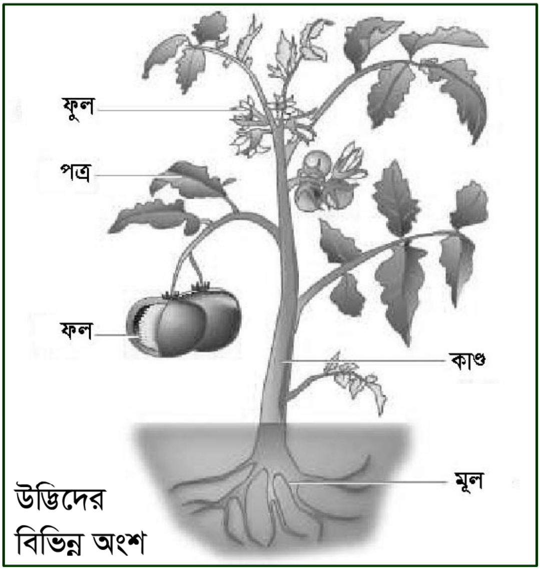
মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মতো উদ্ভিদ কোষ থেকে সৃষ্ট। উদ্ভিদের সবুজ রং আসে **'ক্লোরোফিল'** নামক একটি **রসায়ন** বস্তু থেকে। সুতরাং যেসব উদ্ভিদ সবুজ নয় যেমন মাশরুম, তাদের মধ্যে **ক্লোরোফিল** নেই। অধিকাংশ উদ্ভিদ যদিও বীজ-উদ্ভিদ- অর্থাৎ বীজ বা বিচি থেকে গজে ওঠে, কিন্তু কিছু আছে বীজ ছাড়াই জন্মে। এগুলোকে উদ্ভিতবিজ্ঞানীরা **ব্রাইওফাইটস্, ফার্নস্, লিকোফাইট্স ও হোর্সটেইল** বলে আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ উদ্ভিদে ফুলও ফুটে। যতো বীজ সৃষ্টিকারী উদ্ভিত আছে ওগুলো তাদের বিচিকে রক্ষার জন্য চতুর্দিকে কাভারিং করে যা আসলে ফল। অবশ্য কিছু উদ্ভিদ আছে যেগুলো বিচি দেয় সত্য কিন্তু তা উলঙ্গ- অর্থাৎ কোন কাভারিং নেই। এসব উদ্ভিদকে বলে **'কৌনিফার'** - বা চোঙ্গাকৃতি ফলবিশিষ্ট।

উদ্ভিদের মৌলিক অংশসমূহ

অধিকাংশ উদ্ভিদের মৌলিক অংশ মোট তিনটি। এগুলো হলো মূল, কাণ্ড ও পাতা। মাটির ভেতরের মূল পানি ও **মিনারেল** সংগ্রহ করে যা হলো উদ্ভিদের খাদ্য। আর কাণ্ডের মৌলিক কার্য হলো গাছকে খাড়া অবস্থায় রাখা। তবে এতে ডালপালা, পাতা, ফুল ও ফল থাকে। গাছের পাতার কাজ মূলত ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে খাদ্য সৃষ্টি। পাতার মাধ্যমে বৃক্ষ অতিরিক্ত পানিও ক্ষয় করে- একে বলে **ট্রান্সপাইরেশন**। এছাড়া পতিত বৃষ্টির পানিও সুস্থ পাতা গাছের ভেতর ঢুকতে দেয় না। পাতার মাধ্যমে উদ্ভিদ **'স্বাশক্রিয়া'** করে থাকে। বৃক্ষের পাতার আয়তন মাত্র কয়েক মিলিমিটার হতে **১৫** থেকে **১৮** মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। **ক্লোরোফিল** নামক একটি **কেমিক্যাল** পাতায় থাকায় তার রং সবুজ হয়। আর সবুজ পাতায়ই **'ফটোসিনথেসিস'** (সালোকসংশে- ষণ) নামক গুরুত্বপূর্ণ **কেমিক্যাল** রিয়েকশনটি ঘটে।

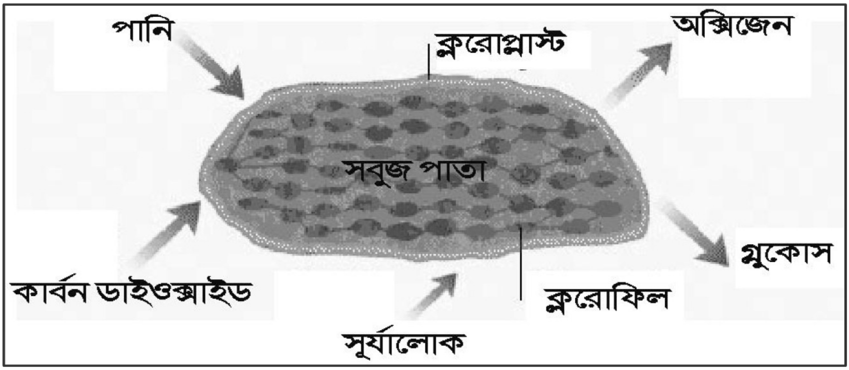
ফটোসিনথেসিস

এ পর্যন্ত একাধিকবার এ শব্দটির কথা উল্লেখ করেছি। গাছের সবুজ পাতার মাধ্যমে এই অতি জরুরী প্রতিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। এরই মাধ্যমে আমরা বাতাসে **অক্সিজেন** পাই- যার উপর নির্ভর করে সকল প্রাণীর বেঁচে থাকা। তাহলে **ফটোসিনথেসিস** নামক এই প্রতিক্রিয়াটি কিভাবে কাজ করে। একটু তলিয়ে দেখা যাক।



উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

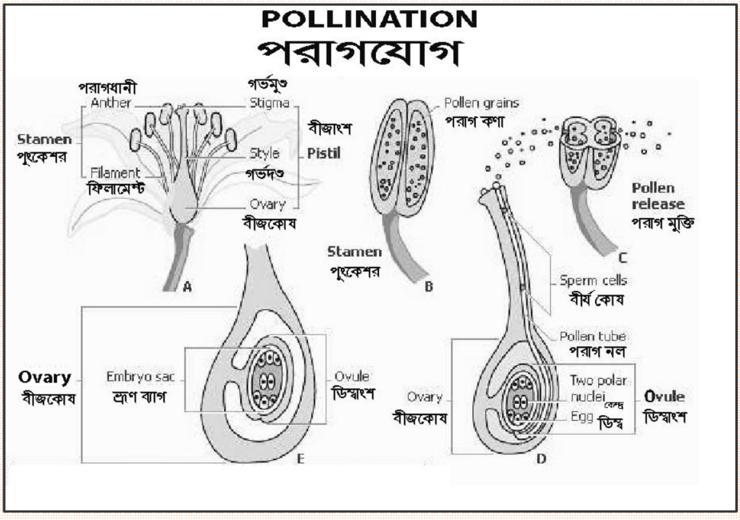
এই প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে গাছের সবুজ পাতা সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত **এনার্জি** দ্বারা **কার্বন ডাইঅক্সাইড** ও পানি থেকে সাধারণ **গে-াকোজ** (চিনি) তৈরী করে যা বৃক্ষের জন্য জরুরী। তবে এই কাজ করতে যেয়ে বর্জ্য বা বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ **গ্যাস** বায়ুমণ্ডলে নির্গত করে, এই গ্যাসটিই হচ্ছে প্রাণী জীবনের শ্বাসক্রিয়ার ভরসা- **অক্সিজেন**।



ফটোসিনথেসিসের প্রতিক্রিয়া এবং এর ফলাফল নিম্নের সহজবোধ্য **ফর্মুলা** থেকে বুঝা সবার জন্য সরল হবে। উপরের ছবিটির প্রতিও দৃষ্টিপাত করুন।

ফটোসিনথেসিস ঃ পানি + কার্বন ডাইঅক্সাইড + সূর্যালোক = অক্সিজেন + গ্লুকোস
(**অক্সিজেন** বায়ুমণ্ডলে চলে যায় এবং **গ্লুকোস** উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়)

আপনি জানেন কিঃ বহু উদ্ভিদ পুনর্জননের জন্য একটি সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করে যাকে বলে **'পলিনেশন'**। দু'টি উপায়ে পলিনেশন ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর প্রথমটি হলো পরাগ (**পলেন**) বাতাসে ছেড়ে দেয়া ও উপযুক্ত স্থানে পৌঁছানো- এ পদ্ধতি সফল হতে একই জাতের গাছ কাছাকাছি থাকা ও বিপুল পরিমাণ **পলেন** বাতাসে মুক্ত করা জরুরী। এ উপায়ে ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি **'ফলবান'** হয়। ফুল থাকে দু' ধরনের: পুরুষ ও নারী ফুল। আর ফুল থাকার মৌলিক কারণ হলো সৌন্দর্য প্রদর্শনের মাধ্যমে মধুমক্ষিকা, হামিংবার্ড ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মধুমক্ষিকার কথা বলা যেতে পারে। ফুলে আছে মিষ্টি মধু ও **পলেন** (পরাগ বা পুষ্পরেণু)। গাছ তার ফুল ফুটিয়ে মধুমক্ষিকাকে আকর্ষণ করে। মধু থাকে ফুলের ভেতরে। মধু আহরণ করতে যেয়ে সে অজান্তেই ফুলের **পলেন** গায়ে মাখে। এরপর অপর (নারী) ফুলে যেয়ে বসে মধু আহরণের সময় সেখানে ঘষিয়ে লাগিয়ে দেয়- ফলে ফুলটির ডিম্বকোষ **'ফারটিলাইজ'** হয়। এভাবে ঐ নারী ফুল গর্ভবতী হয়ে ফলের জন্ম দেয়।



পরিচ্ছেদ ৩১

বিস্ময়কর মানবদেহ

(জরুরী শতর্কীকরণ ঃ *আমি এ ব্যাপারে সকল পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নে বর্ণিত মানবদেহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ক্রিয়াকলাপ একমাত্র জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে রচিত। এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে কেউ যেনো শারীরিক কিংবা মানসিক বা অন্য কোন কারণে চিকিৎসা হিসাবে এই লেখা ও চিত্রগুলো ব্যবহার করেন না। যদি কেউ করেন ও ক্ষতিগ্রস্থ হোন তাহলে আমি লেখক* ***ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী অথবা প্রকাশক*** *কোনভাবেই দায়ী থাকবো না।*]

মেডিকেল বিজ্ঞানের ছাত্ররা মানবদেহের গঠনপ্রণালী ও কার্যকারিতা এবং এর উপর অভ্যন্তরীণ কিংবা বাইরের আক্রমণ তথা রোগব্যাধি কিভাবে সংঘটিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর পড়াশোনা করে ডাক্তার হন। এ বইটি বিজ্ঞানজগতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর আলোকপাত দ্বারা পাঠকদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রচিত। সুতরাং আমরা যে দেহের দ্বারা জীবিত আছি সে সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জন থেকে যদি গাফিল থেকে যাই তাহলে তা হবে আত্মবিস্তৃতির সমান। আমাদের দেহ-পিঞ্জরটি একটি অপূর্ব শিল্প। অত্যাশ্চর্য, চিত্তাকর্ষক ও জটিল মানবদেহ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান থাকা সবার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করি। তবে এখানে **মেডিকেল** বিজ্ঞানের কথা বলবো না- কারণ পাঠকদের কেউ এই বই পড়ে ডাক্তার কিংবা এমনকি বিজ্ঞানী হবেন, তা আশা করি নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিছুটা প্রজ্ঞার্জন ও এসাথে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জন্মানো ব্যতীত আর কিছু নয় এই বইটি রচনার উদ্দেশ্য। এবার তাহলে আসুন আমরা জেনে নিই আমাদের দেহটি কিভাবে গঠিত এবং কোন্ যন্ত্র কি কাজে ব্যস্ত আছে।

মানবদেহের **এনাটমি** খুব জটিল বিষয়। একাধিক **সিস্টেম** বা পদ্ধতির সমন্বয়ে পুরো দেহটি কাজ করে। একটি রাজ্য পরিচালনার জন্য যেমন একাধিক মন্ত্রণালয় বা পরিচালনা ডিপার্টমেন্ট থাকে ঠিক তদ্রূপ মানবদেহে কয়েকটি আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে যার দ্বারা বিভিন্ন কার্যাদি আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। সরকারী ডিপার্টমেন্টসমূহের মতো এদের একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র ও আদান-প্রদান, তথ্য ও প্রোডাক্ট রদরদল

ইত্যাদিও বিদ্যমান। সুতরাং প্রথমেই আমরা পুরো মানবদেহের বিভিন্ন সিস্টেমকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিই। এতে আলোচনা অনেকটা সহজ ও বোধগম্য হবে।

মোট ১২টি ভিন্ন **সিস্টেম** দ্বারা পুরো মানবদেহের এ্যানাটমিকে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো **১. মেইল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম (পুরুষ পুনর্জনন তন্ত্র), ২. ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম (নারী পুনর্জনন তন্ত্র), ৩. ফ্রন্ট মাসকুলার সিস্টেম (সামনের পেশি তন্ত্র), ৪. বেক মাসকুলার সিস্টেম (পেছনের পেশি তন্ত্র), ৫. নার্ভাস সিস্টেম (স্নায়বীয় তন্ত্র), ৬. ইমিউন সিস্টেম (রোগ প্রতিরোধ তন্ত্র), ৭. ডাইজেস্টিভ সিস্টেম (পরিপাক তন্ত্র), ৮. স্কেলেটেল সিস্টেম (কঙ্কাল তন্ত্র), ৯. রেসপিরেটরী সিস্টেম (শ্বাসক্রিয়া তন্ত্র), ১০. সার্কুলেটরী সিস্টেম (রক্তসঞ্চালন তন্ত্র), ১১. ইউরিনারি সিস্টেম (মূত্রক্রিয়া তন্ত্র) ও ১২. এন্ডোক্‌ট্রাইন সিস্টেম (হর্মোন সৃষ্টি তন্ত্র)**। এবার এগুলোর উপর কিছুটা অতিরিক্ত আলোচানার দরকার।

১. মেইল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম

মানুষের মধ্যে পুনর্জনন তন্ত্র আছে যার দ্বারা বংশবৃদ্ধি সম্ভব হয়। অর্থাৎ শিশুদের জন্ম হয়। একথা কারো অজানা নেই। নারী-পুরুষের মিলনের ফলেই যে নারীর গর্ভে শিশুর আবির্ভাব ঘটে তা-ও বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তবে ঠিক কোন্ উপায়ে একটি শিশু তার মায়ের পেটে আত্মপ্রকাশ করে সে কথাটি একটু বিশে-ষণ করাই এখানে জরুরী। পুরুষের পুনর্জনন সিস্টেমের মৌলিক ক্রিয়া হলো বীর্য সৃষ্টি ও তা নারীর সঠিক স্থানে পৌছানো। পুরুষের বীর্যকে দেহের বাইরে একটি তলের মধ্যে রাখা হয়েছে এই কারণে যে, দেহের তাপ থেকে এগুলো যেনো নিরাপদে থাকে। পুরুষের অণ্ডকোষে তাপমাত্রা অনেকটা কম।

বালিগ হওয়ার সময় থেকেই বীর্য সৃষ্টি শুরু হয়। এরপর তা **'ইপিডিডিমিস'** নামক একটি দীর্ঘ টিউবের মধ্যে গিয়ে তিন থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত অবস্থান করে উপযোগী হয়ে ওঠে। পুরুষের যৌন উত্তেজনার ফলে তার লিঙ্গে রক্ত এসে একে শক্ত করে তুলে। বীর্য একটি **'ভাস ডেফারেন্স'** নামক দীর্ঘ টিউবের মাধ্যমে ভ্রমণ শেষে নারীর লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে। একেক সময় ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন **স্পার্ম সেল** বা

বীর্য কোষ পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত হয়ে থাকে। অথচ শিশু গর্ভধারণের জন্য একটি মাত্র বীর্য কোষই যথেষ্ট।

নারীদের জরায়ু বা **'ইউটেরাস'** এর গলার নাম হলো **'সার্ভিক্স'**। বীর্য এখানে এসে **ইউটেরাসে** প্রবেশ করে। এরপর তারা সাতার কেটে **'ফেলোপিয়ান টিউব'** নামক ডিম্বনালীতে যেয়ে পৌঁছে। সেখানে নারীদের **'ওভাম'** বা ডিম্বকোষ থাকলে বীর্যকোষ ভেতরে ঢুকে একে **'ফারটিলাইজ'** বা ফলনশীল করার চেষ্টা চালায়। সফল হলেই মহিলা গর্ভধারণ করলেন।

২. ফিমেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম

নারীদের পুনর্জনন **সিস্টেম** পুরুষদেরটির তুলনায় অনেক জটিল। **ওভাম** বা ডিম্বকোষ সৃষ্টি ছাড়াও নারীদের মধ্যে এমন কিছু উপায়-উপকরণ আছে যার ফলে একটি শিশু দীর্ঘ নয় মাসের অধিক সময় গর্ভে থেকে বড় হয়ে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া জন্মের পরও সে মায়ের স্তন থেকে রেডি-মেইড খাদ্য পায়।

নারীদের পুনর্জনন সিস্টেমের মৌলিক বস্তু হলো দু'দিকের দু'টি **'ওভারি'** বা ডিম্বাশয়। বালিগা হওয়ার সময় উভয় ডিম্বাশয় অন্তত চার লক্ষ ডিম্বকোষ তৈরী করে। প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম ছাড়া হয়। এটা **ফেলোপিয়ান** টিউবে ভ্রমণ করে। নারী পুরুষের মিলনের সময় যদি ডিম্বটি টিউবে থেকে থাকে তাহলে তা একটি বীর্যকোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফলনশীল হয়ে ওঠে। এভাবে ডিম্বটি ফলনশীল হওয়ার পর টিউব দিয়ে ভ্রমণ করে নারীদের গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে সেটির দেয়ালে লটকে থাকে। যদি ডিম্বটি ফলনশীল হতে না পারে তাহলে তা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে পরবর্তী মাসিক পিরিওডের সময় দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

ফারটিলাইজ্ড ডিম্বটি গর্ভাশয়ের দেয়ালে থাকাকালে ভ্রূণে পরিবর্তিত হয়। গর্ভাশয়ে থাকার দু' মাস পূর্ণ হলেই এটি ভ্রূণ থেকে **'ফিটাস'**-এ রূপান্তরিত হয়। ৪০ সপ্তাহ পরে এই শিশুটি মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। এদিকে গর্ভাবস্থায় নারীদের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারণ হতে থাকে যাতেকরে জন্মের পরই শিশুটি পুষ্টিকর মায়ের দুগ্ধ পান করতে পারে। শিশু যখন স্তনের বোটা চোষে তখন **'ওক্সিটসিন'** নামক এক ধরনের **হর্মোন** রিলিজ হয় যার ফলাফল হলো স্তনের মধ্যে দুগ্ধ সৃষ্টি।

৩. ও ৪. ফ্রন্ট ও বেক মাসকুলার সিস্টেম

মানবদেহের সামনে ও পেছনে সর্বত্র পেশী বা **মাসুল** বিদ্যমান। এগুলো দ্বারাই দেহের বিভিন্ন চলনশক্তি সৃষ্টি হয়। আমরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় **মাসুল** ব্যবহার করে শরীরের বিভিন্ন অংশ চালনা করি- এ ক্রিয়াকে বলে **ভোলোন্টারী মুভমেন্ট** (স্বেচ্ছাকৃত চলন)। তবে বহুক্ষেত্রে **মাসুল** আমাদের অজান্তেই চলতে পারে- একে বলে **ইনভলোন্টারী** বা **অটোমেটিক মাসুল মুভমেন্ট** (ইচ্ছাস্বাধীন চলন)। প্রথম ধরনের **মাসুল** চালনার দৃষ্টান্ত হলো হাটু, কনুই, ঘাড় এবং অন্যান্য জোড়ায় জোড়ায় যেসব মুভমেন্ট আছে ওগুলো। দ্বিতীয় ধরনের **মাসুল** মুভমেন্টের উপমা হলো হৃদযন্ত্র ও অন্যান্য **রিফ্লেক্স** বা ইচ্ছানিরপেক্ষ ক্রিয়া।

মানবদেহে মূলত তিন ধরনের পেশী আছে। এগুলো হলোঃ **১. কঙ্কালের সঙ্গে সংপৃক্ত (স্কেলেটেল), ২. মসৃণ (স্মোদ) ও ৩. হৃদযন্ত্রের (কারডিয়াক) পেশী**। আমাদের ইচ্ছাকৃত চলনশক্তি আসে **স্কেলেটেল মাসুল** থেকে। এ পেশীগুলো বিভিন্ন হাড্ডিতে জড়িয়ে আছে। মসৃণ পেশী মূলতঃ অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন যন্ত্রাদির দেয়াল, শিরা-উপশিরার গঠন, পাকস্থলী, মূত্রথলি ইত্যাদিতে বিদ্যমান। এই মসৃণ পেশীগুলো দ্বারাই ইচ্ছানিরপেক্ষ ক্রিয়া সংঘটিত হয়- যেমন, রক্তে চাপ সৃষ্টি ও পরিপাক ক্রিয়া। হৃদযন্ত্রের পেশী শুধুমাত্র হৃদযন্ত্রেই বিদ্যমান। এই পেশীর কাজ হলো সমস্ত শরীরে শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রত্যেকটি কোষে রক্ত সঞ্চালন করা। মানবদেহে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পেশী আছে। কোনটা দুর্বল কোনটা সবল- তাতো অবশ্যই নির্ভর করে এই পেশীর ডিউটি কি। তবে আয়তন মানেই বেশী শক্তিশালী পেশী নয়। উরুর **মাসুল** বেশ বড় এবং শক্তির দিক থেকেও কম নয়, কিন্তু মানবদেহে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পেশী হলো চোয়ালের মাসুল। সুতরাং এবার জানলেন, কেনো আপনি সর্বাপেক্ষা শক্ত সুপারীও ভেঙ্গে গুড়ো করে দিতে সক্ষম।

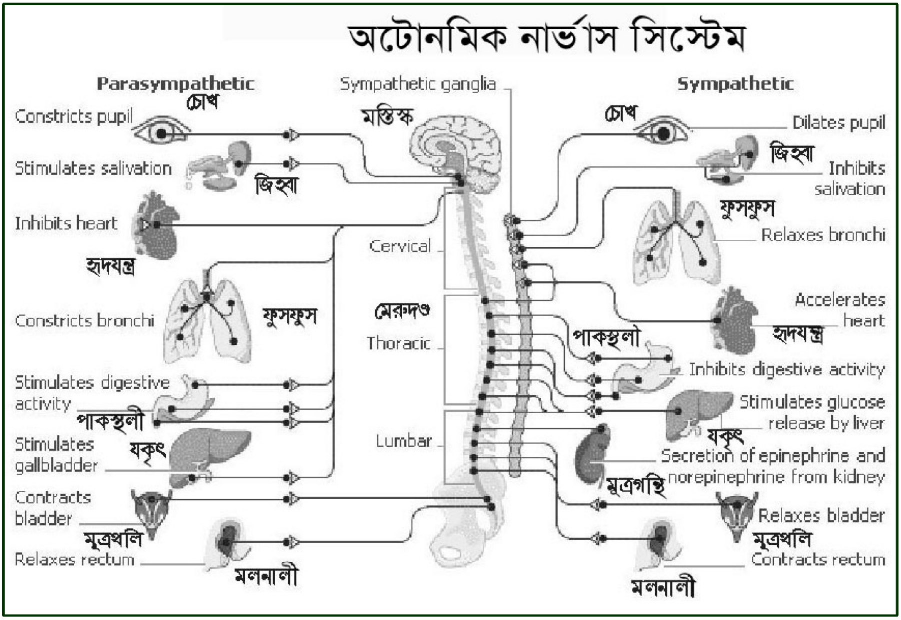
৫. নার্ভাস সিস্টেম

মানবিক স্নায়ুতন্ত্র একটি অত্যাশ্চর্য জটিল **নেটওয়ার্ক** যার পূর্ণ ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের স্কোপের বাইরে। তবে যেহেতু আমরা মানবদেহের মৌলিক ক্রিয়া যেটুকু সম্ভব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা চালাচ্ছি তাই, এক্ষেত্রেও অলসতা থেকে বিরত থেকে একটু প্রচেষ্টা করা

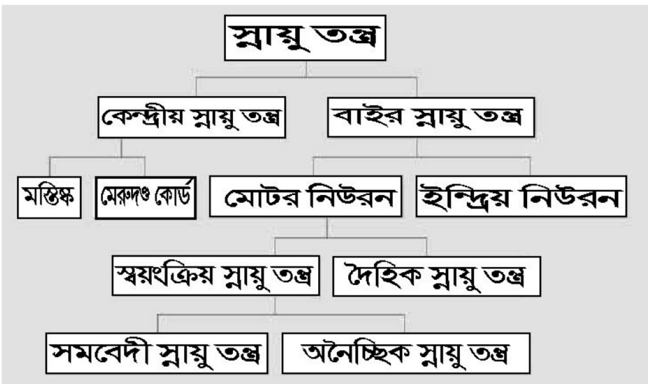
যাক। মানুষের মাথার খুলির ভেতর কি আছে তা-তো সবার জানা। বেশ মোটাসোটা ঐ মস্তিষ্ক বা ব্রেন আসলে একটি **সেস্ট্রাল প্রসেসিং সিস্টেম**। আমাদের দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের বিভিন্ন অংশ ও ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি এই ব্রেনে **নার্ভাস** সিস্টেমের মাধ্যমে আসে- এরপর **প্রসেসিং** শেষে রেজাল্ট যা তার বিকাশ ঘটে। যেমন মনে করুন, আপনি একটি ফুলপানে তাকালেন। ফুল থেকে আলোকরশ্মি আপনার চোখের ভেতর দিয়ে **নার্ভাস** তন্ত্রের মাধ্যমে ব্রেনে গিয়ে পৌঁছে। ব্রেন এই আলোকরশ্মিকে **প্রসেস** করে ফুলটি সম্পর্কে যেটুকু অভিজ্ঞতা আপনি অনুভব করবেন তার একগুচ্ছ অনুভূতি আপনার চেতনায় জন্ম দেয়। অর্থাৎ ফুলটি আপনি দেখেন ও এর সৌন্দর্য অনুভব করে আনন্দ পান। এভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয় যেমন কান, নাক, ত্বক ও স্বাদের অনুভুতি **নার্ভাস** সিস্টেমের মাধ্যমে ব্রেনের **প্রসেসিং** হেতু হয়ে থাকে।



নার্ভাস সিস্টেম মূলত দু'টি মৌলিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়: **সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম** (মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জু) ও **পেরিফ্যারল নার্ভাস সিস্টেম** (প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র)। **সেন্ট্রাল** সিস্টেমে মস্তিষ্ক ও মেরুরুজ্জ (**স্পাইন্যাল কোর্ড**) থেকে একটি **নার্ভাস নেটওয়ার্ক** পুরো দেহে বিস্তৃত আছে। ব্রেন ও মেরুরুজ্জের বাইরের সকল তথ্যাদি প্রান্তিক **নার্ভাস** সিস্টেমের মাধ্যমে আদান-প্রদান হয়। অর্থাৎ উক্ত **অরগ্যান** দু'টির মাধ্যমেই স্নায়বিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়- সুতরাং প্রান্তিক বা বাইরের **সিস্টেম** আসলে **সেন্ট্রাল** সিস্টেমের শাখা মাত্র। এই উভয় **সিস্টেম** মিলে আমাদের দেহের ইচ্ছাকৃত ও স্বয়ংক্রিয় সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।



নার্ভাস সিস্টেমের মূল দু'টি শাখার আরো কয়েকটি উপশাখা আছে (দেখুন নীচের নক্সাটি)। এই সবক'টি একত্রে মিলে মানুষের দেহের অনেক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর মধ্যে জড়িত আছে যাবতীয় আগত ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি ও বহির্গত **মটর** বা নির্দেশসমূহ। এছাড়া স্মরণশক্তি, চিন্তাক্ষমতা, বুদ্ধি, অনুভুতি ও শিক্ষা এই **নার্ভাস সিস্টেম** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।



নার্ভাস সিস্টেম কাজ করে বিশেষ ধরনের কোষ (বা **সেল**) এর মাধ্যমে। এগুলোকে **নিউরোন** (বা স্নায়ুকোষ) বলে। কোন কোন স্নায়ুকোষ দৈর্ঘ্যে ৩ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। দু'টি উপায়ে তথ্য এক স্থান

থেকে অন্য স্থানে স্নায়ুকোষের মাধ্যমে যাতায়াত করে থাকে। এগুলো হলো বৈদ্যুতিক ও **রসায়নিক সিগনাল**। প্রথমটি স্নায়ুকোষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত **সিগনাল** ক্যারী করে। দ্বিতীয়টি একটি স্নায়ুকোষ থেকে পরবর্তীতে সিগনালকে **ট্রান্সমিট** করে নিয়ে যায়। সুতরাং এতে একটি চেইন সৃষ্টি হয়। **সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম** পর্যন্ত এভাবে **সিগনাল** গিয়ে পৌঁছে। এরপর **প্রসেসিং** (অর্থাৎ উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নির্ণিত) করে **সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম** তথা মস্তিষ্ক থেকে **কমান্ড সিগনাল** (যাকে **মটর** বলে) আবার স্নায়ুকোষের মাধ্যমে গন্তব্য স্থানে যেয়ে ক্রিয়া সংঘটিত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া **ইলেকট্রিক্যাল সার্কেটের** মতো ব্যাপার- তবে আরও বহুগুণ জটিল।

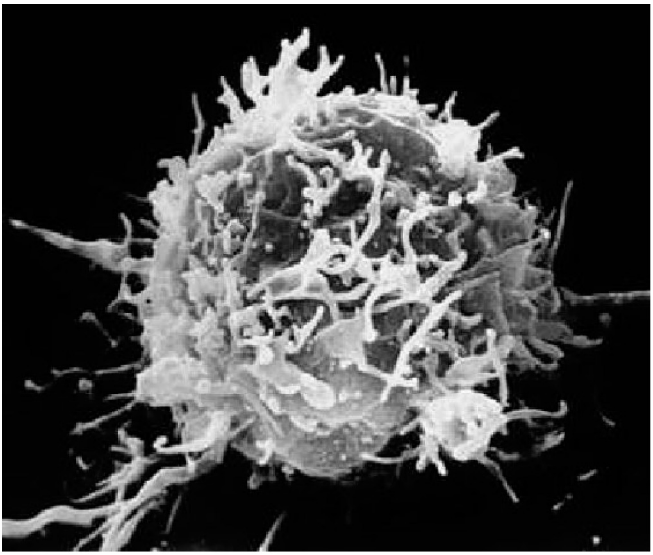
আপনি জানেন কি ঃ 'বেদনা' ছাড়া আপনার আমার বাঁচা কঠিন হবে। এই বেদনা নামক স্নায়বিক ক্রিয়া থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতামূলক সুফল পাওয়া যায় ঃ ১. দেহের কোনও অংশ আহত হয়েছে বা হতে পারে তা জানানো, ২. আরও ক্ষতি হওয়া থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মনের মধ্যে চিন্তার সৃষ্টি ও ৩. কিছুকাল কর্মশীল থাকা থেকে বিরত রেখে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এখন চিন্তা করুন, যদি বেদনা অনুভব করতে সম্পূর্ণ অপারগ হতাম তাহলে রাগের বশিভুত হয়ে আমরা একে অন্যকে ক্ষতবিক্ষত করার পরও থামতাম না!

৬. ইমিউন সিস্টেম

রোগ প্রতিরোধ তন্ত্র একটি অত্যাশ্চর্য রক্ষিবাহিনী যা সমগ্র দেহে অতন্দ্র প্রহরা ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধে রত আছে। ফরেন বা দেহের জন্য ক্ষতিকর বাইরের যাবতীয় জীবাণূ থেকে এই রক্ষিবাহিনী আমাদেরকে মুক্ত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সদা-সর্বদা। কোথাও কোন বিদেশীর সন্ধান পেলেই এই দুঃসাহসী নিবেদিতপ্রাণ সেনারা ছুটে যায় সেখানে। প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে বিদেশী হায়েনাদের মূলোৎপাটন ঘটায়- এতে অনেকে শহীদও হয়।

আপনার আমার স্বাস্থ্য নির্ভর করে দেহের এই রক্ষিবাহিনীর উপর। এই বাহিনীতে যারা জড়িত তারা হলো দেহের কিছু কোষ, **মলিকিউল** ও **অরগ্যান** (দেহযন্ত্র)। এরা সকলে মিলে শক্তিশালী ফৌজ তৈরী করে জীবাণূ, **ভাইরাস** ও **ফাঙ্গাস** ইত্যাদি দেহের জন্য ক্ষতিকর বিদেশী হামলাকারীদের প্রতিহত ও নির্মূল করে ছাড়ে। তবে সব ক্ষেত্রে পারে না- তাই তাদের সাহায্যে ডাক্তাররা আমাদের দেহে রক্তের মাধ্যমে **'এইড'** বা সহযোগী ফৌজ যোগান দেন। এই সহযোগী ফৌজই হলো ঔষধ। সুতরাং আমাদের দেহের **ইমিউন সিস্টেম** কী তার ধারণা এখন মোটামুটি জন্ম নিয়েছে- এবার ব্যাপারটি আরও একটু তলিয়ে দেখা যাক।

রোগ প্রতিরোধ তন্ত্র মূলত দু' ধরনের। এর একটি হলো প্রথমসারির ডিফেন্স **সিস্টেম** যাকে বলে **'সহজাত'** প্রতিরোধ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে খাপখাওয়ানো প্রতিরোধ- অর্থাৎ প্রয়োজনমাফিক প্রতিরোধ করা। সাধারণত সহজাত প্রতিরোধ থেকেই আক্রমণাত্মক বস্তুর শক্তি দুর্বল ও সময় সময় ধ্বংস হয়ে যায়- কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পুরোদমে প্রতিরোধ হয় না। সহজাত প্রতিরোধের সঙ্গে জড়িত আছে চামড়া, অশ্রু, শে- ষ্মা, থুথু ও ক্ষতস্থান তাড়াহুড়ো করে ফুলেওঠা ইত্যাদি। এই প্রথম **'লাইন অব ডিফেন্স'** ফেল করলে দ্বিতীয় তন্ত্র ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।



দেহের নিরাপত্তা প্রহরী একটি কোষ: টি লিমফোসাইট নামক সাদা রক্তকোষের **ইলেকট্রন মাইক্রগ্রাফ** (পাশের ছবি)। এটি দেহের ডিফেন্স সিস্টেমে প্রধান সেনাপতির কাজ করে থাকে। এই বিশেষ **সেল** ক্ষতিকর **ভাইরাস ও বেক্টেরিয়াকে** ধ্বংস করে দেয়।

এ্যাডাপ্টিভ প্রতিরোধ সিস্টেম একটি জটিল ক্রিয়া। দেহের কোষ, **মলিকিউল** ও দেহযন্ত্র একত্রে মিলে আক্রমণকারীদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে থাকে। সুতরাং আমাদের রোগ-প্রতিরোধ তন্ত্র আক্রমণাত্মক জীবাণূকে ধ্বংসের জন্য প্রয়োজনমাফিক একটি **ডিফেন্স সিস্টেম 'তৈরী'** করে এবং কাজে লাগায়। তবে এখানেই শেষ নয় নতুন সৃষ্ট এই ডিফেন্স **সিস্টেম** সংরক্ষণ করেও রাখে যাতে ভবিষ্যতে অনুরূপ হামলা থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। তন্ত্রের এই **'যুদ্ধ থেকে শিক্ষাগ্রহণ'** সত্যিই এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। এরই ফলে আমরা কোন বিশেষ রোগের প্রতিরোধ সিহেবে **'ইমিউনাইজেশন'** করতে সক্ষম হই। ছোটবেলা টীকা নেওয়ার বেদনাদায়ক স্মৃতি মনে আছে কি?

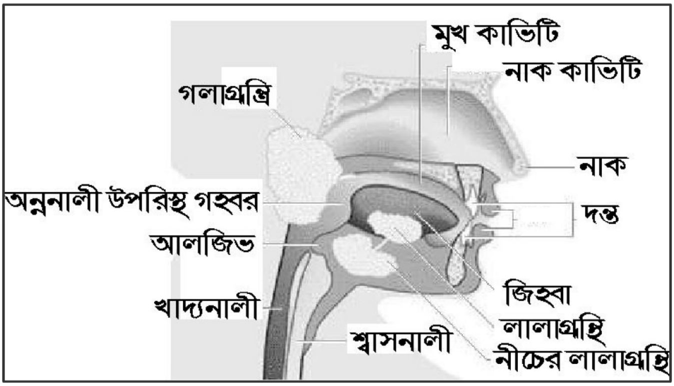
আপনি জানেন কি ঃ নিশ্চয়ই **এইড্‌স** নামক সংক্রামক মরণব্যাধির কথা আপনারা শোনেছেন। এবার জেনে নিন **এইড্‌স** রোগটি আসলে কি জিনিস। ইংরেজীতে AIDS- এর প্রতিটি অক্ষর কিন্তু এককেটি পূর্ণ শব্দের প্রথম অক্ষর মাত্র। Acquired Immunodeficiency Syndrome, হলো এর অর্থ। বাংলায় আমরা বলতে পারি **"অর্জিত রোগ-প্রতিরোধ-দুর্বলকরণ লক্ষণ (অরোদুল)" এইড্‌স** আসলে রোগের নাম তবে যে **ভাইরাস** থেকে এর উৎপত্তি তার নাম হলো Human Immunodeficiency Virus (HIV)। বাংলায় হবে, **"মানবিক রোগ-প্রতিরোধ-দুর্বলকরণ ভাইরাস (মারোদুভা)"**। এই **ভাইরাস** দেহের রোগ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় এবং তা ধ্বংস করে ফেলে। সুতরাং **এইচআইভি ভাইরাস** দেহরক্ষী সৈন্যদের তুলনায় অনেকগুণ শক্তিশালী হওয়ায় তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সফল হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এই মারাত্মক ব্যাধি কিভাবে সংক্রমিত হয় তা চিহ্নিত করেছেন। তারা বলেন, তিনটি উপায়ে তা হয়ে থাকে: **১. কোন আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলন, ২. এইচআইভি-তে আক্রান্ত কোন ব্যক্তির রক্ত কিংবা কোনভাবে আক্রান্ত রক্তের মাধ্যমে ও ৩. কোন আক্রান্ত মায়ের গর্ভে শিশু থাকাবস্থায় কিংবা জন্মের সময় অথবা শিশুকে বুকের দুগ্ধ পানের সময়। এইড্‌স** থেকে বাঁচতে হলে এই তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন একান্ত জরুরী। এ ব্যাপারে জনসচেতনতা ছাড়া উপায় নেই। ইতোমধ্যে পৃথিবীব্যাপী এই ব্যাধি **'মহামারীর'** আকার ধারণ করেছে। **ওয়ার্লড হেলথ অর্গেনাইজেশনের** হিসাব (২০০৭ সাল) মতে পৃথিবীব্যাপী **এইড্‌স** রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৪০-৫০ মিলিয়নের ঊর্ধ্বে। আরও জানা গেছে **১৯৮১** সাল (এ বছরই **এইড্‌স** রোগ প্রথম ধরা পড়ে) থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এই ২০ বৎসরে সারা বিশ্বে মোট ২০ মিলিয়ন মানুষ **এইড্‌স** রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

৭. ডাইজেস্টিভ সিস্টেম

আমাদের **ডাইজেস্টিভ সিস্টেম** বা পরিপাক তন্ত্রের সঙ্গে বেশ ক'টি **অরগ্যান** জড়িত। প্রথমতঃ মুখ দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। এরপর তা খাদ্যনালী দিয়ে পাকস্থলীতে যেয়ে পৌঁছে। সেখান থেকে ছোট আঁত তারপর বড় আঁত হয়ে **রেকটাম** পেরিয়ে (বর্জ্য হিসাবে) মলদ্বার হয়ে বেরিয়ে যায়। এই দীর্ঘ ভ্রমণের পূর্বে খাদ্য ছিলো সুস্বাধু কিছু বস্তু এবং সবশেষে তা দুর্গন্ধময় বস্তুতে পরিণত হয়। সুতরাং ব্যাপার কি? ব্যাপার হলো আমাদের পরিপাক তন্ত্র খাদ্য থেকে দেহের জন্য উপকারী সবকিছু রেখে বাকীটুকু ফেলে দেয়। খাদ্যের মধ্যে তাহলে অনেক বস্তু আছে যা আমাদের উপকারে আসে না। বাস্তবে অধিকাংশই অনুপযোগী বর্জ্য। এবার আসুন খাদ্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ভ্রমণটির উপর আরো কিছু জেনে নিই। কিভাবে কি হয় এবং কোন্ কোন্ যন্ত্র কিসব কাজ করে তা বুঝে নিতে পারলেই পুরো তন্ত্র সম্পর্কে আমাদের জানা হয়ে যাবে।

মুখগহ্বর

মুখবিবরে খাদ্য প্রবেশের পর এখানেই কিছু পরিপাক ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। দন্ত, জিহ্বা, লালা, কাশি এই চারটি মিলে প্রথমেই খাদ্যকে কেটে-কুটে, চিবিয়ে-চাবিয়ে গুড়ো করে দেয়। আস্ত গিলে ফেললে অবশ্য খুব বেশি অসুবিধে নেই- যদি না তা মাছের শক্ত কাটা কিংবা মাংশের হাড্ডি না হয়! পরিপাক তন্ত্রের যাত্রাপথে শক্ত খাবারও জেলিতে পরিণত হয়ে যায়।



মুখগহ্বরে খাদ্য যখন নরম হয়ে পড়ে তখনই তা গিলে ফেলার উপযুক্ত হয়। গিলে ফেরার উপযুক্ত খাদ্যের নরম বলকে কেনো যে ইংরেজীতে **'বোলাস'** বলে তার খবর আমার জানা নেই! বাংলায় আমরা এরূপ কোন

হাস্যকর শব্দ দ্বারা একে সম্বোধন করি না। যা হোক, এখন এই **বোলাস** গলদ্ধকরণের পর তার উপর আরো কিছু উত্তম-মধ্যম শুরু হয় খাদ্যনালীর মধ্যে। **খাদ্যনালী** একটি দীর্ঘ টিউব। এটি ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। গলা থেকে এর শুরু ও পাকস্থলীতে যেয়ে শেষ। খাদ্যনালী কিন্তু সাধারণ পাইপ নয়- এর শক্ত পেশী খাদ্যকে খুব জোরে আঁটিয়ে ধরে টিপিয়ে-টাপিয়ে পাকস্থলীর দিকে নিয়ে চলে। আমি যে বলেছিলাম, খাদ্যের উপর উত্তম-মধ্যম- এই যে! এই খাদ্যনালীকে কেনো যে **'ইসোফাগাস'** বলা হয়- তা-ও আমার জানা নেই। তবে শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে বলে মনে হয়। ইসোফাগাসের টিপুনি একশন কিন্তু অলস নয়- সে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খাদ্যের **বোলাস** টুকরোকে পাকস্থলীতে নিয়ে পৌঁছে দেয়।



খাদ্যনালীর শেষপ্রান্তে ও পাকস্থলীর মুখে আরেকটি পেশী আছে যার কাজ হলো খাদ্যকে পাকস্থলীতে প্রবেশ হতে সুযোগ দিয়ে সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটা আসলে খাদ্যের ফিরে আসাকে বাঁধা দেয়। কিন্তু বমিটিং হলে ভিন্ন কথা। তখন সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খোলে যায়। এই পেশীটির নাম **'ইসোফাগেল স্পিনটার'**। পাকস্থলীতে **বোলাস** পড়ে সত্যিকার অর্থে **মেকানিক্যাল** ও **কেমিক্যাল** হামলার শিকার হয়। কারণ পাকস্থলীর দেওয়ালে আছে খুব শক্তিশালী পেশী। আর এটির নাম

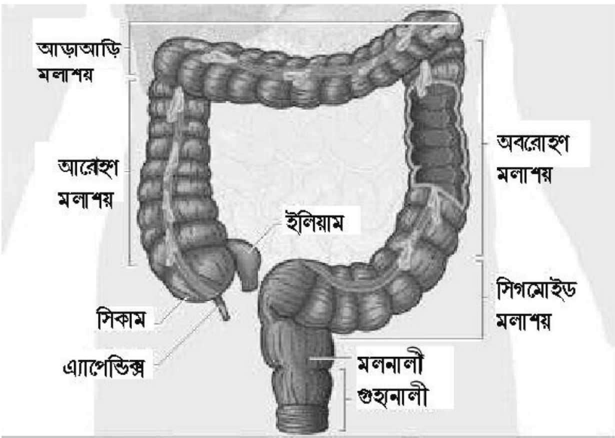
পাকস্থলী এমনিতে হয় নি- আসলে এটি একটি পাকযন্ত্র। খাদ্যকে পরিপাক করাই তার কাজ। পাকস্থলী বেশ বড়ও বটে। আপনি একবারে পেটপুরে খাওয়ার পর সব খাদ্য প্রথমে এই পাকস্থলীতে যেয়ে জমা হয়। এটি প্রয়োজনে বড় কিংবা ছোটও হতে পারে। পাকস্থলী তার কাজের অংশ হিসাবে প্রতি মিনিটে অন্তত ৩ বার ছোট্ট হয়ে খাদ্যে চাপ দেয়- এতে খাদ্য আরও নরম হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, পাকস্থলী একজাতীয় **এসিড** দ্বারাও খাদ্যের উপর হামলা চালায়। এই এসিডকে বলে **'গ্যাস্ট্রিক জ্যুস'**। **কেমিক্যাল** ও **মেকানিক্যাল** এই দ্বিবিধ হামলা হেতু খাদ্য বাধ্য হয়ে প্রায় জেলিতে পরিণত হয়। পাকস্থলীর মধ্যস্থ অভ্যন্তরীণ লাইনিংয়ে হাজার হাজার **গ্যাস্ট্রিক** গ্রন্থি **(গ্ল্যান্ডস্)** আছে। এগুলো উপরোক্ত **এসিড** তৈরী করে। এই এসিডের **কেমিক্যাল** নাম হলো **হাইড্রোক্লোরিক এসিড**। এটা খাদ্যকে ভেঙ্গে দেয়, অপরদিকে কোন ক্ষতিকর বস্তু যদি খাদ্যের সঙ্গে এসে থাকে তাহলে তা ধ্বংস করে ফেলে। চার ঘণ্টা পর্যন্ত পাকস্থলীতে থেকে পরিপাক হওয়ার পর খাদ্য এখন **'কাইম'** নাম ধারণ করে ছোট্ট আঁত বা ক্ষুদ্রান্তে যেয়ে পতিত হয়।



আসল **ডাইজেসশন** বা পাক হওয়ার কাজ শুরু হয় ছোট্ট আঁতে। ২০ ফুট লম্বা এই ছোট্ট (১ ইঞ্চি ব্যাস) পাইপ তলপেটের বেশ কিছু জায়গা দখল করে আছে। এখানে খাদ্য ঢোকার পর ৪ থেকে ৬ ঘণ্টাব্যাপী ধীর গতিতে টিউবের আঁকাবাঁকা পথে

অগ্রসর হতে থাকে। আঁতের পেশী খাদ্যকে টিপিয়ে টিপিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যায়। আঁতের মধ্যে তিনটি আলাদা অংশ আছে। এগুলোর নাম **‘ডুওডিনাম’**, **‘জেজুনাম’** ও **‘ইলিয়াম’**। এই ভ্রমণকালে যকৃৎ **(লিভার)** থেকে পিত্তরস **(বাইল)** ছোট্ট আঁতের ভেতর আসে। আঁতের মধ্যে **এনজাইম (জৈবরসায়নিক** পদার্থ) আছে। পিত্ত বড় বড় মেদী বস্তুকে ভেঙ্গে দেয় যাতেকরে **এনজাইম** এদের উপর ক্রিয়া করতে সক্ষম হয়। এছাড়া **প্যাংক্রিস** নামক যন্ত্র থেকে কিছু তরল পদার্থ আঁতে এসে পৌঁছে। এই জ্যুসেও **এনজাইম** আছে যাদের কাজ হলো খাদ্যের **‘স্টারচ্’** বা শ্বেতসারকে পরিবর্তন করে চিনিতে রূপান্তর করা; **ফ্যাট** বা মেদকে ভেঙ্গে মেদী **এসিড** ও **গি□সারল** (মিষ্টি দ্রব্য) **বানানো** এবং **প্রটিন** বা পলীয় ভেঙ্গে **আমিনো এসিডে** রূপান্তর।

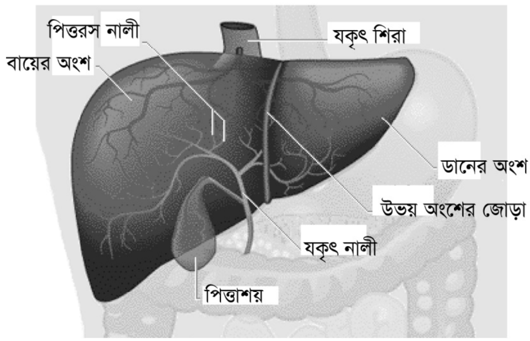
ছোট্ট আঁতের ভেতরের দেওয়ালে মিলিয়ন মিলিয়ন অতি ক্ষুদ্রকায় কিছু বস্তু আছে যাদের নাম হলো **‘ভিলি’**। ওগুলো অঙ্গুলির মাথার মতো। এসব ভিলির নীচে রক্ত ক্যারী করার **ক্যাপিলারি** বা উপশিরা আছে। ভিলির মধ্য দিয়ে খাদ্য থেকে চুষে নেওয়া জৈবিক উপাদানসমূহ (অর্থাৎ ইতোমধ্যে বর্ণিত চিনি, **গি-সারল, আমিনো এসিড** ইত্যাদি) ছোট্ট আঁত থেকে উপশিরার মাধ্যমে রক্তে গিয়ে পৌঁছে।



ছোট্ট আঁতের শেষাংশ তথা **ইলিয়াম** থেকে বাকী খাদ্যদ্রব্য বড় আঁতে প্রবেশ করে। এখানেও খাদ্যের অবস্থান দীর্ঘমেয়াদী হয়- **১২** থেকে **২৪** ঘণ্টা। ছোট্টটিকে বড় আঁত ইংরেজী অক্ষর উল্টো একটি 'U'- এর মতো হয়ে ঘিরে রেখেছে। এটা দৈর্ঘ্যে ৫ থেকে ৬ ফুট হয়ে থাকে। এর ব্যাস ২.৫ ইঞ্চি। বড় আঁত (বা **বৃহদান্ত**) কয়েকটি বিশিষ্ট কাজে নিয়োজিত আছে। এটা দৈনিক ৬ লিটার পরিমাণ পানি চুষে নেয়; ছোট্ট আঁত থেকে আসা পরিত্যক্ত খ্যাদ্য বস্তুর মধ্য থেকে লবণকে গলানো; নিজস্ব জীবাণূকে কাজে লাগিয়ে পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তু থেকে **ভিটামিন** তৈরী- বিশেষকরে **ভিটামিন-কে** যা দেহের **ব্লাড ক্লটিং** (রক্ত জমাট) ক্রিয়ার জন্য দরকারী। এই আঁত সকল উপকারী দ্রব্যাদি দেহের ভেতর নেওয়ার পর বাকী খাদ্যদ্রব্য বর্জ্য হিসাবে নীচের দিকে টিপিয়ে নিয়ে যায়। **রেকটাম** বা মলপাইপে যাওয়ার পর এই বর্জ্য গুহ্যদ্বার দিয়ে বাইর জগতে চলে আসে।

যকৃৎ বা লিভার

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, **ডাইজেস্টিভ** সিস্টেমে লিভারের ডিউটি আছে। তবে মানবদেহের এই সর্বাপেক্ষা বড় যন্ত্রটির উপর আলাদাভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া একান্ত জরুরী, কারণ এই **লিভার** অন্তত ৫০০টি ভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছে। তবে আমরা অবশ্যই সবগুলোর উপর আলোচনায় যাচ্ছি না।



মানব যকৃৎ

লিভার মূলত নরম টিস্যুর একটি গাঢ় বাদামী রংয়ের যন্ত্র। দেহের ডান দিকে পেটের কিছু উপরে এর অবস্থান। ডান দিকের **রিবকেইজে** বা পাঁজর-হাড্ডির নীচের অংশ

লিভারকে ঘিরে রেখেছে। এর ফলে এটা সরাসরি আহত হওয়া থেকে বেঁচে আছে। একজন সুস্থ মানুষের যকৃৎ **১.৫** কে.জি. ওজনসম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া এটা ৬ ইঞ্চি পরিমাণ গাঢ় (উপরের ছবিটি দেখুন)। **লিভার** আগেই বলেছি অসংখ্য কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে- কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এটা আসলে খুব সাধারণভাবে নির্মিত। উপরের ছবি থেকে এটা স্পষ্ট। **লিভার** দু'টি সূত্র থেকে রক্ত পেয়ে থাকে। প্রথমত, **হিপাটিক আরটারী** নামক শিরা অক্সিজেনে পরিপূর্ণ রক্ত হৃদযন্ত্র থেকে নিয়ে এসে লিভারে ডেলিভারী দেয়। এই সাপ্লাই থেকে কিন্তু মাত্র ১/৪ **পার্সেন্ট** পরিমাণ রক্তের সঞ্চালন হয়। বাকী ৩/৪ **পার্সেন্ট হিপাটিক পোর্টেল** নামক ধমনী থেকে আসে। এই রক্তের মধ্যে অল্প পরিমাণ **অক্সিজেন** থাকে। তবে লিভারের মধ্যদিয়ে প্রচুর রক্ত প্রতি মিনিটে ভ্রমণ করে। বাস্তবে **হিপাটিক** ও **আরটারী** এবং তাদের শিরা-উপশিরা মিলে প্রতি মিনিটে **১.৪** লিটার রক্ত লিভারের মধ্যে নিয়ে আসে। এই রক্ত আবার **হিপাটিক** ধমনী হয়ে হার্টে ফিরে যায়।

লিভারের প্রধান ক'টি কাজ

লিভারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি হলো **'গ-াইকোজেন'** নামক বস্তু স্টোর করে রাখা। এই বস্তুর মৌলিক উপাদান হলো, এক ধরনের চিনি (**গ-ুকোস**)। রক্তের মধ্যে যদি এই গ-ুকোসের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে পড়ে তাহলে **লিভার** তা ছেকে সরিয়ে দেয় এবং এটা দিয়েই সে **গ-াইকোজেন** যা মূলত **কার্বহাইড্রেট**- এক ধরনের **এনার্জি,** তৈরী করে রাখে। এরপর যখন রক্তে গ-ুকোসের মাত্রা কমে আসে তখন **লিভার** ঐ স্টোরকরা গ-াইকোজেনকে আবার গ-ুকোসে পরিণত করে রক্তে তা ছেড়ে দেয়। সুতরাং আমাদের **লিভার** এভাবে রক্তের মধ্যে গ-ুকোসের মাত্রার সঠিক একটি ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করে।

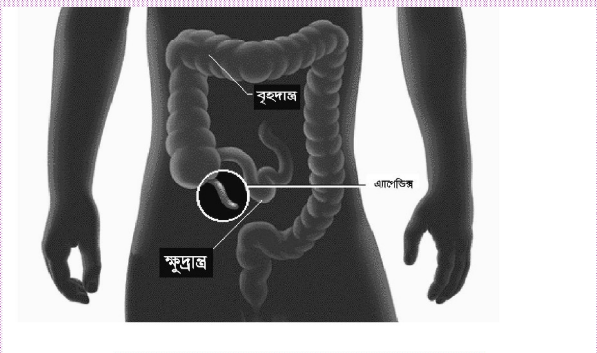
লিভারের অপর আরেকটি কাজ হলো **বাইল** বা পিত্তরস তৈরী। এই রস দ্বারা দেহের **ডাইজেস্টিভ সিস্টেম** ফেট বা মেদকে পরিপাক করে। পিত্তরসের মৌলিক উপাদান হলো লবণ। লিভারের নীচে পিত্তাশয় (বা **গলব্লাডার**) আছে। পিত্তরস সেখানে গিয়ে জমা হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনে তা ছোট্ট আঁতের ভেতর সাপ্লাই দেওয়া হয়।

লিভার ভিটামিন নামক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের স্টোররুমও। **ভিটামি এ, ডি, ই** এবং **কে** ছাড়াও **লিভার** তার স্টোর কক্ষে ২ থেকে ৪ বছরের **ভিটামিন বি-১২** এর সাপ্লাই জমা

করে রাখে। **লিভার** একটি **কেমিকেল** ফেক্টরীও বটে। এখানে বেশ ক'টি জরুরী **প্রটিন** তৈরী হয় যা রক্তের মধ্যে থাকে। এরূপ একটি **প্রটিন** হলো **'আলবিউমিন'**। এই প্রটিনই রক্তের মধ্যে **কেলসিয়াম** ও অন্যান্য বস্তু থাকতে সহায়তা করে। রক্ত থেকে দেহের টিস্যুতে পানি চলাচলেও **আলবিউমিন** সাহায্য করে। **লিভার** হিমোগে-াবিনের একটি বস্তু **'গে-াবিন'** তৈরী করে।

লিভার উপরোক্ত কাজগুলোই শুধু আঞ্জাম দেয় না। সে রক্ত থেকে বিষাক্ত জিনিষ যেমন **এ্যালকাহল,** মাদকদ্রব্য ইত্যাদি আলাদা করে দেয়। এরপর এসব বস্তু **কেমিকেল** প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বদলে দিয়ে পিত্তরস বানায়।

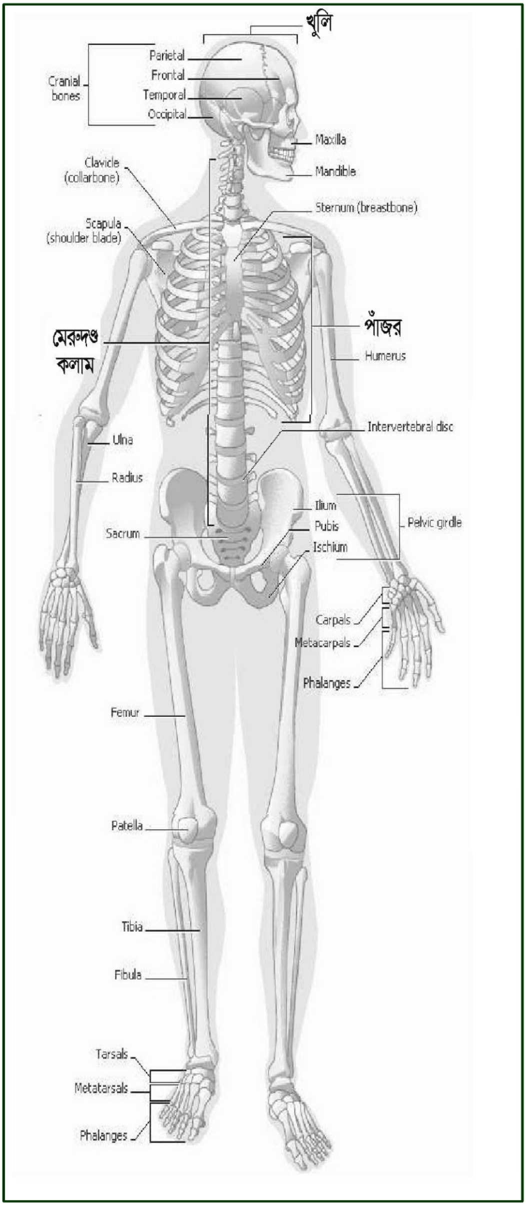
আপনি জানেন কি ঃ বড় আঁতের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ছোট্ট পাইপের মতো বস্তু মানবদেহে আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ জানে না এই যন্ত্রের কাজ কি! তবে এটার একটা নাম দেওয়া হয়েছে- **'এ্যাপেন্ডিক্স'** (দেখুন নীচের চিত্রটি)। তবে মজার ব্যাপার হলো এটি মাঝে মধ্যে ফুলে ওঠে কিংবা এতে পুঁজ জমে যায়। আর কেন এটা এরকম ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়ে তাও কেউ জানে না। এ্যাপেন্ডিক্সের মধ্যে রোগ হওয়াকে বলে- **'এ্যাপেন্ডিসাইটিস'**। বেশি ক্ষতিকর হলে **এ্যাপেন্ডিক্সকে** অপারেশনের মাধ্যমে কেটে ফেলা হয়।



৮. স্কেলেটেল সিস্টেম

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কঙ্কালে হাড্ডির সংখ্যা হলো ২০৬। কঙ্কাল মূলত মানবদেহের ফ্রেম। এর মোট ওজন পুরো দেহের ১৪%। কঙ্কালের উপর ভর করেই দেহের সবকিছু অস্তিত্বশীল। কঙ্কাল ছাড়া আমরা জেলিফিসের মতো হবো। নিম্নে কঙ্কালের

একটি নক্সা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন হাড্ডির নামের বঙ্গানুবাদ করার চেষ্টা করেছি- তবে অনেকক্ষেত্রে ইংরেজী নামই রেখে দিয়েছি।



হাড্ডির জোড়া

হাড্ডির জোড়া চার ধরনের হয়ে থাকে (দেখুন নীচের পরের পৃষ্ঠার ছবিটি)। জোড়া কিভাবে নড়াচড়া করে সে হিসাবে তা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন, মানুষের মাথার খুলির জোড়াকে বলে **‘সিউচার’**। এই জোড়াটি তেমন নড়াচড়া করে না- অনেকটা টাইট-ফিট তবে, শিশুর জন্মের পর বেড়ে ওঠার জন্য এতে যথেষ্ট ফাঁক আছে। **‘হিঞ্জ’** নামক জোড়া এমনভাবে **ডিজাইন** করা হয়েছে যে, একমাত্র একদিকে নড়াচড়া সম্ভব। আমাদের হাতের কনুই ও হাটুতে এরূপ জোড়া আছে। তৃতীয় ধরনের জোড়ার নাম **‘গ□াইডিং’**। একটা হাড্ডি আরেকটার উপর এভাবে জোড়া থাকলে নড়াচড়া করতে পারে, তবে খুব বেশিদূর নয়। আমাদের হাতের কব্জি ও পায়ের পাতায় এরূপ জোড়া আছে। সবশেষে **‘বল এন্ড সকেট’** নামক আরেক প্রকার জোড়া আছে। এরূপ জোড়ার বৈশিষ্ট্য হলো, সবদিক দিয়ে নড়াচড়া নিশ্চিত করা। আমাদের কটি (কোমর) ও স্কন্ধে এরূপ জোড়া বিদ্যমান।



হাড্ডির বিশেষ কার্য

কঙ্কালের প্রত্যেক হাড্ডিই বিশেষ কোন কাজে নিয়োজিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বুকের হাড্ডিগুলোর কথা বলতে পারি। এগুলোর কাজ হলো বুকের ভেতর স্থাপিত আমাদের হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে রক্ষা করতে সাহায্য করা। হঠাৎ বুকের উপর ভারী কিছু পতিত হলেও ছুরির মতো **ডিজাইন** করা এসব হাড্ডি একত্রে ঐ ওজনের ফোর্সকে প্রতিহত করে- এর দ্বারা হৃদযন্ত্র কিংবা ফুসফুস ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। একইভাবে আমাদের মাথার খুলি মস্তিষ্ককে রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে। হাতের কব্জি ও পাতায় ছোট্ট ছোট্ট হাড্ডিগুলো এমনভাবে সাজানো আছে যে, প্রয়োজনমাফিক আমরা যেভাবে ইচ্ছে এগুলো নড়াচড়া করতে পারি- আর এই হাতই প্রযুক্তির চাবিকাঠি। দীর্ঘ ও শক্ত পায়ের হাড্ডিগুলো দ্বারা আমরা খুব দ্রুত দৌড়াতে পারি ও একেবারে অনড় অবস্থায় দাঁড়াতেও সক্ষম। এসব ব্যাপার-স্যাপার আমরা সচরাচর অবলোকন করে থাকি। তবে হাড্ডি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত

আছে যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে- বা অনেকেরই অজানা। হাড্ডির মধ্যে **‘কেলসিয়াম’** নামক একটি **মিনারেল** জমা থাকে। আমাদের দেহের স্নায়ু ও পেশী কোষগুলোর জন্য পর্যাপ্ত **কেলসিয়াম** দরকার। হাড্ডির মধ্য থেকে এটার সাপ্লাই আসে। এছাড়া প্রত্যেক হাড্ডির ভেতর তরল পদার্থে পরিপূর্ণ একটি কেন্দ্র আছে। এই অংশের নাম **‘বোন মারো’**। এখানেই রক্তের লাল রক্তকোষ, কিছু সাদা রক্তকোষ ও রক্ত **প্লেইটলেট** তৈরী হয়। এসব কোষ দেহের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। লাল রক্তকোষ দেহের প্রতিটি কোষে **অক্সিজেন** নিয়ে যায়। সাদা রক্তকোষ রোগ জীবাণূ, **ভাইরাস** ইত্যাদির উপর আক্রমণ চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেয়। আর **প্লেইটলেট** হলো রক্তের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা ছোট্ট কোষ। এক কিউবিক মিলিমিটার রক্তের মধ্যে ২,৫০,০০০ এরূপ কোষ থাকে। এদের কাজ হলো ক্লট বা পিণ্ড তৈরী। অর্থাৎ কোন ক্ষতস্থান থেকে রক্তপড়া বন্ধ করার জন্য এরা ডিউটি দিচ্ছে। এরা জমাট বেঁধে রক্ত বের হওয়া বন্ধ করে।

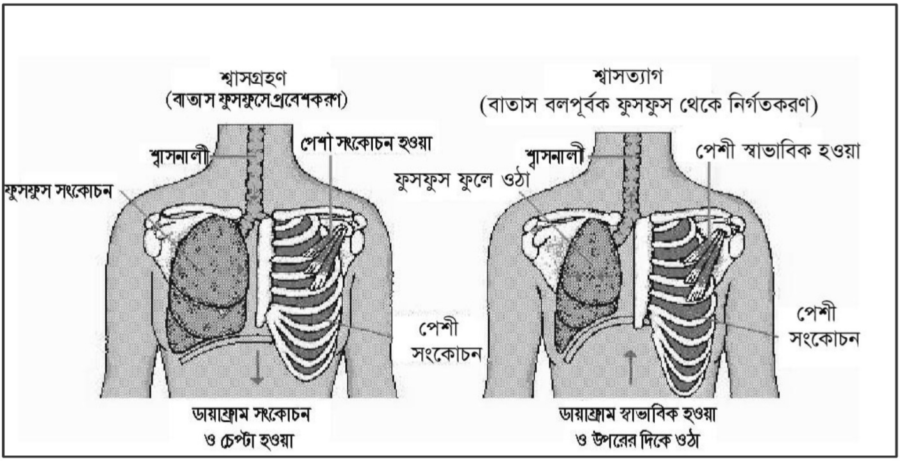
আপনি জানেন কি ঃ মনাবদেহে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও শক্ত হাড্ডি হলো উরুর হাড্ডি **(থাই বোন)**। সর্বাপেক্ষা ছোট্ট ও দুর্বল হাড্ডি আছে আমাদের কর্ণকূহরে- এর নাম **‘স্টিরাপ’** হাড্ডি। উরুর হাড্ডি ৫০ সে.মি. (২০ ই.) লম্বা ও ২.৫ সে.মি. (১ ই.) প্রস্থ হতে পারে। ক্ষুদ্র **স্টিরাপ** হাড্ডিটি মাত্র ০.১৮ সে.মি. (০.০৭ ই.) লম্বা।

৯. রেসপিরেটরী সিস্টেম

আমাদের দেহে বিভিন্ন **অরগ্যান** বা যন্ত্র আছে। এদের একেকটির কাজ একেক ধরনের। দেহের প্রতিটি কোষ জীবিত রাখার জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণ **অক্সিজেন** গ্যাস। এটা অবশ্য বায়ুমণ্ডল থেকে সহজে প্রাপ্য একটি উপাদান। তবে বাতাসে শুধু অক্সিজেনই নয়- অন্যান্য গ্যাসও আছে। সুতরাং আমরা যখন শ্বাস নিই তখন ভেতরে নেওয়া বাসাত থেকে **অক্সিজেন** রেখে বাকি সব **গ্যাস** নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আবার বের করে নিয়ে আসতে হবে। এ কাজের জন্য বুকের নীচে দু’টি বৃহৎ যন্ত্র নিয়োজিত আছে- এগুলোর নাম ফুসফুস। এখন এই কলুষমুক্ত অক্সিজেনকে কোন উপায়ে দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছাতে হবে- এ কাজে নিয়োজিত যন্ত্রের নামই হলো হৃদযন্ত্র বা হার্ট এবং তার সাথে জড়িত শিরা, উপশিরা ইত্যাদি। দেহের কোষে **অক্সিজেন** পৌছার পর রক্তের মধ্যে কিছু দেহের জন্য বর্জ্য **(কার্বন ডাইওক্সাইড)** কোষ থেকে

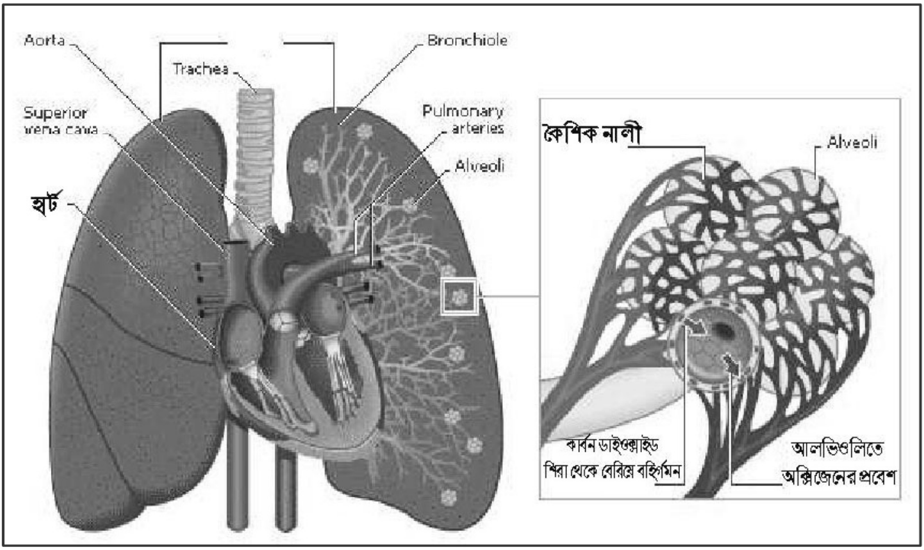
চলে আসে এবং তাতে অবশ্য অক্সিজেনও থাকে না। হার্ট পাম্প করে **অক্সিজেন** পাঠানোর পর ওসব অক্সিজেনশূন্য এবং **কার্বন** ডাইওক্সাইডসহ রক্ত আবার নিয়ে এসে ফুসফুসে পাঠিয়ে রক্তের মধ্যে পুনরায় **অক্সিজেন** মিশিয়ে ও **কার্বন ডাইওক্সাইড** (নিঃশ্বাসের মাধ্যমে) সরিয়ে- অর্থাৎ বিশুদ্ধ করে, কোষে পাঠিয়ে দেয়। প্রতি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে এই ক্রিয়াটি চলছে। আমরা যতোদিনই জীবিত থাকবো ততোদিন এই কার্য চলবে- আর এই ক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় তথা শ্বাস-নিঃশ্বাসকে বলে শ্বাসক্রিয়া তন্ত্র বা **রেসপিরেটরী সিস্টেম**। দ্বিতীয়টি তথা হার্টের মাধ্যমে রক্ত পাম্প করে কোষে **অক্সিজেন** নেওয়া এবং ডেলিভারী শেষে রক্ত ফিরিয়ে এনে নতুন **অক্সিজেন** সাপ্লাইসহ আবার একই কাজ করার নামই হলো **সার্কুলেটরী সিস্টেম** বা রক্তসঞ্চালন তন্ত্র। আমরা একটু পরই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলেচনা করবো। প্রথমে শ্বাসক্রিয়ার উপর কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি।

শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে **অক্সিজেন** ভেতরে নেওয়া ও দেহের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য **কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস** বের করা হয়ে থাকে। শ্বাসক্রিয়ার এটাই মৌলিক কাজ। তবে আরও আছে। দেহের টিস্যুগুলোতে এসিডের ব্যালান্স রক্ষায় শ্বাসক্রিয়া সাহায্য করে। এছাড়া **কার্বন ডাইওক্সাইড** ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু যাতে দেহের ভেতর না ঢুকে সে ব্যাপারেও শ্বাসক্রিয়া তন্ত্র সতর্ক আছে। আমরা অবশ্য গন্ধ অনুভব ও শব্দ উচ্চারণ করতে এই সিস্টেমের উপর নির্ভর করি- তা-তো সবারই জানা।



শ্বাসক্রিয়ার কাঠামো

যেসব যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস করে থাকি তা মূলত দু’ ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হলো উপরের অংশ যথা: নাক ও গলা। দ্বিতীয়টি হলো নীচের অংশ। এতে আছে বাগ্‌যন্ত্র, শ্বাসনালী ও তার শাখাসমূহ এবং এক জোড়া ফুসফুস। ফুসফুসের মধ্যে অন্যগুলো মিলে বাতাস যোগান দেয় ও সেখান থেকে নিয়ে আসে। ফুসফুসের কাজ হলো রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলে **অক্সিজেন** ডেলিভারী করা ও **কার্বন ডাইওক্সাইড** সরানো।



নার্ভাস সিস্টেম আমাদের সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতে ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকানো এবং বের করার কাজে নিয়োজিত আছে। সুতরাং শ্বাস-নিঃশ্বাস মূলত একটি **অটোমেটিক** ক্রিয়া- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তা অবিরত একটি বিশেষ নিয়মে চলতে থাকে। আমাদের মস্তিষ্কে একটি অংশ আছে যাকে বলে **‘রেসপিরেটরি সেন্টার’**। এখানকার কিছু কোষ একই সাথে দু’টি **নার্ভ-সিগনাল** প্রেরণ করে। এর একটি যায় **ডায়াফ্রাম** পেশী ও অপরটি পাঁজরের পেশীতে। এই উভয় পেশী মিলে শ্বাসক্রিয়া সংঘটিত করে। **নার্ভাস** সিগনালটি খুব স্বল্পমেয়াদী। তবে সেন্টার থেকে প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ২০টি পর্যন্ত এরূপ **সিগনাল** আসে। এটাই প্রাপ্তবয়স্কদের শ্বাস-নিঃশ্বাসের

রেইট। তবে নতুনভাবে জন্ম নেওয়ার পর শিশুদের কোষে অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় বিধায় সে ক্ষেত্রে শ্বাসক্রিয়া সেন্টার থেকে, প্রতি মিনিটে ৩০ থেকে ৫০ বার **সিগনাল** আসতে থাকে। সুতরাং বেবীরা দ্রুত শ্বাস-নিঃশ্বাস এ কারণেই করে থাকে।

আমি ইতোমধ্যে বলেছি শ্বাসক্রিয়া অটোমেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়- তবে আমাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণও আছে। অর্থাৎ চেতনশীল অবস্থায় আমরা ইচ্ছে করে শ্বাস-নিঃশ্বাসকে দ্রুততর কিংবা হ্রাস করতে সক্ষম। এমনকি কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে রাখতেও পারি। এটা বেঁচে থাকার জন্য সময় সময় জরুরীও। মনে করুন আপনি এমন এক অবস্থায় আছেন যেখানে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ থাকা জরুরী- যেমন পানির মধ্যে ডুবন্তাবস্থায়, তখন যদি সেন্টারের সিগনালকে অন্য কোন উপায়ে **'অভাররাইড'** করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে বাতাসের বদলে আপনার ফুসফুসে তরল পানি নিতে বাধ্য হতেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা মস্তিষ্কের **সেরেব্রাল করটেক্স** নামক অংশে চিন্তা ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এখান থেকেই উক্ত **অভাররাইডিং সিগনাল** এসে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ রাখার উপায় বের করে দেয়। তবে আপনি অবশ্য বেশিক্ষণ শ্বাসক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে বন্ধ রাখতে পারবেন না। এর কারণ হলো, **অক্সিজেন** ছাড়া দেহের সেলগুলোয় **কার্বন ডাইঅক্সাইড** দ্বারা ভরে যায়- এতে খুব শীঘ্র রক্তের মধ্যে **এসিড** জমা হতে থাকে। গলা ও **ব্রেনস্টেমে** আছে রক্তের **এসিড মনিটর** করার কৌশল। এগুলোকে বলে **কেমোরেসিপটর**। এরা যখন লক্ষ্য করে আপনার রক্তে এসিডের মাত্রা সীমাতিক্রম করে ফেলছে তখনই শ্বাসক্রিয়া সেন্টারে রেড **সিগনাল** পাঠিয়ে দেয়। এই **সিগনাল** পেয়ে সেন্টার একটি শক্তিশালী নির্দেশ-**সিগনাল ডায়াফ্রাম** ও **রিব-কেইজের** পেশীর প্রতি প্রেরণ করে- যা আপনার স্বেচ্ছাসৃষ্ট সিগনালকে **অভাররাইড** করে শ্বাসক্রিয়া শুরু করতে বাধ্য করে। একইভাবে কেউ ইচ্ছে করে খুব বেশী বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে তাকে অতিবেশী ফুলাতেও পারবে না। ফুসফুসের কিছু কোষ আছে, এরূপ যাতে হয় না এগুলো সে নিশ্চয়তা দান করে। তারা সেন্টারে **সিগনাল** প্রেরণ করে সাহায্যের জন্য। সেখান থেকে পেশীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত রাখা হয়।

আমাদের ফুসফুস একটি **গ্যাস-এক্সেঞ্জ চেম্বার**। এখানে **অক্সিজেন** ও **কার্বন ডাইওক্সাইড** গ্যাসের আদান প্রদান চলছে। আজকের বিশ্বের বাসাত কিন্তু মোটেই

কলুষমুক্ত নয়। মানুষই বাতাসকে দুষিত করেছে। আর বিশেষকরে শ্বাসক্রিয়ার সঙ্গে আমরা স্বেচ্ছায় কিছু বিষ আমাদের ফুসফুসে ঢুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করি না। আমি অবশ্য ধূমপানের কথা বলছি। ধূমপানের মাধ্যমে **নিকোটিন, টার** ইত্যাদি ফুসফুসে ঢুকিয়ে একে দ্রুত নষ্ট করা হয়। ক্রমে ফুসফুসের মধ্যে বিষ জমা হয়ে উজ্জ্বল গোলাপী রংয়ের ফুসফুস কালো বর্ণ ধারণ করে। এরপর আল্লাহ্ না করুন, ফুসফুসে **ক্যান্সারের** জন্ম হয়। সুতরাং ধূমপান থেকে সবাই সাবধান! যদি পান করে থাকেন তাহলে যাবতীয় **'উইল পাওয়ার'** কাজে লাগিয় এক্ষুণি ছেড়ে দিন। এ গ্রন্থের লেখক আমি নিজেই ত্রিশ বছর ধূমপান করে আজ প্রায় **১১** বৎসর পূর্বে তা ছেড়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। আপনিও পারবেন।

আপনি জানেন কি ঃ কোন শারীরিক কাজ, ব্যায়াম, কুস্তি, সাঁতার কাটা ইত্যাদি করার সময় ও পরে কেন আপনি বেশি বেশি শ্বাস-নিঃশ্বাসে ব্যস্ত হোন? এসব কাজের সময় আমাদের দেহের পেশীগুলোর কোষ অতিরিক্ত কর্মে লিপ্ত হয়- বিধায় বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন পড়ে। ফলে হার্ট অতিরিক্ত **অক্সিজেন** কোষে পৌঁছাতে দ্রুত পাম্প করা শুরু করে। এদিকে রক্তের চলাচল দ্রুত হওয়ায় ফুসফুসে রক্ত আসা-যাওয়ার রেট বেড়ে যায়। সুতরাং মগজের শ্বাসক্রিয়া তন্ত্র থেকে নির্দেশ আসে বাইর হতে **অক্সিজেন** ভেতরে নেওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে। এই সিগনালকে আপনি আমি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও সম্পূর্ণটা পারি না তাই, শ্বাস-নিঃশ্বাস উচ্চ মাত্রায় নিতেই হয়- অবশ্য এটা তো প্রয়োজনের খাতিরে।

১০. সার্কুলেটরী সিস্টেম

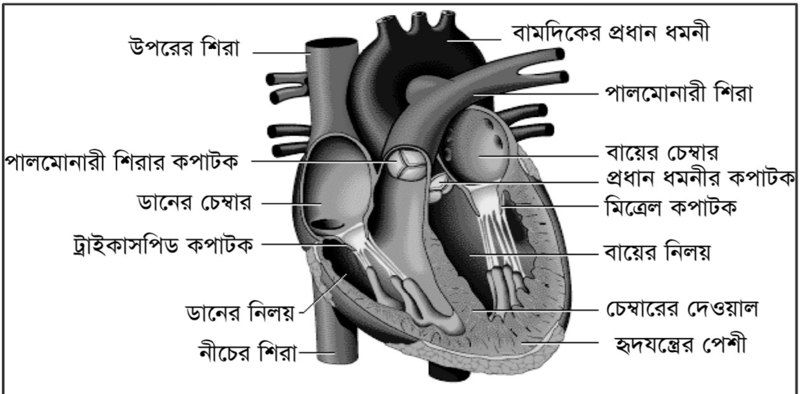
রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া একটি অত্যাশ্চর্য চিত্তাকর্ষক ব্যাপার যা ভালো করে অনুধাবন করলে বুঝা যায় মানবদেহকে জ্যান্ত রাখতে কী জটিল ও পরিপক্ক ডিজাইনই না করা হয়েছে। রক্তসঞ্চালন তন্ত্রের **সেন্ট্রাল অরগ্যান** অবশ্য আমাদের **হার্ট** বা হৃদযন্ত্র। এটি একটি উন্নতমানের পাম্প। বিভিন্ন ধরনের ধমনী, শিরা, উপশিরা, রগ ইত্যাদির মাধ্যমে বেশ কিছু রক্ত সমগ্র দেহের কোষগুলোতে সাপ্লাই দিয়ে থাকে আমাদের হার্ট। তার পাম্পিং একশন মায়ের গর্ভ থেকে শুরু হয়ে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বহাল থাকে।

রক্তের মাধ্যমে **অক্সিজেন** ছাড়াও খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন ধরনের **নিউট্রিয়েন্ট** (জৈবিক পদার্থ) আমাদের দেহের কোষগুলোতে ডেলিভারী হয়ে থাকে। এছাড়া কোষ থেকে অকেজো ও ক্ষতিকর বর্জ্য যেমন **কার্বন ডাইওক্সাইড** রক্ত সরিয়ে নিয়ে এসে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরে ফেলে দেওয়ার কাজে সহায়তা করে।

মানুষের হৃদযন্ত্র

আমাদের হার্ট বুকের ভেতর কিছুটা বায়ে অবস্থিত। আপনার হাতকে মুষ্ঠিবদ্ধ করলে যে আয়তন হয়, হার্টটির আয়তন প্রায় একই। হার্ট মূলত শক্তিশালী কিছু পেশী দ্বরা সৃষ্ট। একটি নির্দিষ্ট রেইটে এই পেশী সংকোচন হয়ে রক্ত চলাচল নিশ্চিত রাখে। মায়ের গর্ভে শিশু যখন মাত্র ৩ সপ্তাহ অতিবাহিত করে তখনই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়- আর তা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।

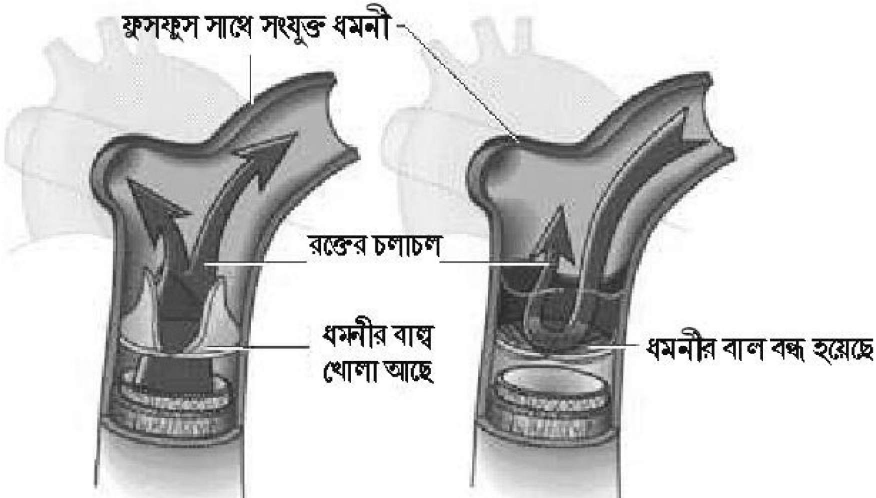
আমাদের হার্টের মধ্যে চারটি আলাদা **চেম্বার** বা কক্ষ আছে। উপরের দু'টি চেম্বারে রক্ত এসে জমা হয়। নীচের দু'টি চেম্বার থেকে রক্ত বেরিয়ে দেহের সর্বত্র চলে যায়। সুতরাং বুঝাই যচ্ছে- হর্টের কার্য মূলত দু'টি। প্রথমতঃ দেহের বিভিন্ন কোষ থেকে ব্যবহৃত রক্ত চুষে আনা ও তা বিশুদ্ধ করে (**অক্সিজেন** ও জৈবিক পদার্থ দিয়ে) আবার পাম্প করে কোষে পৌঁছানো। এই দ্বিমুখী **পাম্পিং একশন** আমাদের হার্টটি সারাজীবন চালিয়ে যাবে।



মানব হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

হার্টের ডান ও বায়ের সাইড একটি দেওয়াল দ্বারা আলাদা করা আছে। উভয় সাইড রক্ত সঞ্চালন করে আলাদাভাবে। যেমন, ডানের দিক থেকে ব্যবহৃত কম **অক্সিজেন** ও বেশি **কার্বন ডাইঅক্সাইড**-যুক্ত রক্ত আমাদের ফুসফুসের মধ্যে পাম্প করে দেয়। বায়ের দিক থেকে অক্সিজেনে পরিপূর্ণ রক্ত দেহের সর্বত্র সঞ্চালন করে।

হার্টের মধ্যে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে যাতে হয় তার জন্য মোট চারটি ভাল্ব বা কপাটক আছে। এগুলোর কাজ হলো রক্ত চলাচলকে একমুখী রাখা। অর্থাৎ যেদিকে রক্ত চলে সেদিকে এগুলো সহজেই খুলে যায় কিন্তু উল্টো দিকে রক্তের চাপ পড়লে বন্ধ থেকে চলাচল রহিত করে। হার্টের **মাসুল** বা পেশী শক্তিশালী। এর কারণ হলো সারা জীবন হার্টটি অনবরত কাজ করে যেতে হবে- বিধায় তার পেশী শক্ত হওয়া জরুরী। তবে ডানের সাইড থেকে বায়ের দিকের হার্ট পেশী বেশী শক্ত।



রক্ত

ইতোমধ্যে আমাদের ভালো ধারণা জন্মেছে যে, দেহের রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি কোষে অক্সিজেনসহ অন্যান্য জৈবিক পদার্থ সরবরাহ হয়। এখন তলিয়ে দেখার ব্যাপার হলো, রক্তের মধ্যে কি কি জিনিস আছে। এ থেকে আমরা জানতে সক্ষম হবো রক্তের গুরুত্ব ও উপকারিতা।

একজন সাধারণ সুস্থ মানুষের রক্তের ৪৫% কোষ এবং বাকীটা **প্লাজমা** নামক তরল পদার্থ। **সেল** বা কোষ বিভিন্ন ধরনের। তবে অধিকাংশই লাল কোষ। এছাড়া আছে সাদা কোষ ও **প্লেটলেট্স**। প্লাজমার মধ্যে আছে ৯৫% পানি। বাকী ৫%-এ আছে **গ-ুকোস**, মেদ **(ফ্যাট)**, **প্রটিন**, **ভিটামিন** ও **মিনারেল**। প্লাজমার পানির মধ্যে লবনও আছে- বাস্তবে এই পানি সমুদ্রের পানির মতো লবণাক্ত। রক্তের মধ্যে এসব বস্তু আমাদের দেহের প্রত্যেকটি কোষের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। সুতরাং অক্সিজেনের সঙ্গে রক্ত এসব অতিরিক্ত উপাদানসমূহ সেলে নিয়ে পৌঁছায়। আর রক্তে শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে **অক্সিজেন** সাপ্লাই ফ্রি অব **চার্জ** হলেও বাকীগুলো আমাদেরকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে যোগান দিতে হয়- অর্থাৎ পুষ্টিকর খাবার। আমরা যা খাই তা থেকে উপকারী দ্রব্যাদি **ডাইজেস্টিভ সিস্টেম** বের করে রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দেয়। বড় ও ছোট **ইন্টেসটিন** বা আঁতের দেওয়াল পেরিয়ে এগুলো বেরিয়ে এসে রক্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। তবে রক্ত এসব বস্তু এ পর্যায়ে সংগ্রহ করে খুশী নয়, সে এগুলোকে লিভারে নিয়ে যেয়ে আরেক দফা **রিফাইন** করে তারপর কোষে কোষে নিয়ে যায়। এ কাজ সারার সময় রক্ত নিজেও গোসল সেরে পরিষ্কার হয়- কারণ লিভারের এটাও একটা কাজ। **লিভার** ও এর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আমরা এতোমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ধমনী, শিরা ও উপশিরা

সার্কুলেটরী সিস্টেমে হার্ট, রক্ত, ফুসফুস ইত্যাদি তো নিয়োজিত আছেই, তবে রক্তকে জাগায় জাগায় পৌঁছে দিতে হলে পাইপওয়ার্কের প্রয়োজন। হার্টের সঙ্গে সংযুক্ত একটি উত্তম পাইপওয়ার্ক **সিস্টেম** সারা দেহব্যাপী বিস্তৃত আছে। এই পাইপগুলো বিভিন্ন আয়তন ও দৈর্ঘ্যসম্পন্ন। এগুলো মূলত তিন ধরনের: বেশ বড় ধমনী, এর পরের সাইজের শিরা ও এ থেকেও ছোট্ট উপশিরা। বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন দেহের এই পাইপ-নেটওয়ার্কের যাবতীয় ধমনী, শিরা ও উপশিরাকে যদি একটা আরেকটার

সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় তাহলে তা দৈর্ঘ্যে ১ লক্ষ **কিলোমিটার** বা ৬০ হাজার মাইল হবে! পৃথিবীর চতুর্দিকে এ পাইপ আড়াই বার চক্কর দিতে পারবে।

তিন ধরনের পাইপওয়ার্কের মধ্যে **আরটারী** বা ধমনীর মাধ্যমে রক্ত হার্ট থেকে দেহের কোষগুলোতে সঞ্চালন হয়। **ভেইন** বা শিরার মাধ্যমে রক্ত কোষগুলো থেকে হার্টে ফিরে আসে। **কাপিলারি** বা উপশিরার মাধ্যমে পুরো দেহব্যাপী রক্ত ডেলিভারী ও কালেকশনের কাজ চলে।

অন্যান্য ডিউটি

রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেনসহ জৈবিক পদার্থ কোষে কোষে সাপ্লাই দেওয়া ছাড়াও **সার্কুলেটরী** সিস্টেমের আরও একাধিক ডিউটি আছে। এগুলোর মধ্যে, সঠিক রক্তচাপ নিশ্চিতকরণ, দেহের তাপমাত্রা সঠিক রাখা, অন্যান্য সিস্টেমের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে বিভিন্ন **ফাংশন** কার্যকরী করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রক্তসঞ্চালন সিস্টেমকে দেহের একাধিক অরগ্যানও সাহায্য করে। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি হার্ট, ফুসফুস, ধমনী, শিরা ও উপশিরা কিভাবে এই সিস্টেমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। এছাড়া লিভারও কিভাবে সাহায্যে নিয়োজিত আছে তাও বুঝেছি। তবে এখানেই শেষ নয়, রক্তসঞ্চালন ক্রিয়াকে মস্তিষ্ক, প্লীহা, মূত্রগ্রন্থি (**কিডনী**), হাড্ডির মজ্জা ইত্যাদিও সচরাচর সাহায্য-সহযোগিতা করে। মস্তিষ্ক ও **নার্ভাস সিস্টেম** সর্বদাই রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে **মনিটর** করে ও প্রয়োজনীয় **সিগনাল** হার্ট ও রক্ত ধমনী, শিরা ও উপশিরায় পাঠিয়ে দেয় উপযুক্ত নির্দেশসহ। প্লীহা পুরাতন রক্তকোষকে ভেঙ্গে ব্যবহারযোগ্য উপাদানসমূহ বের করে- যেমন লৌহ, তা আবার রক্তের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়। সুতরাং এখানে **'রিসাইকেল'** প্রক্রিয়া চলে। মূত্রগ্রন্থিদ্বয় রক্ত থেকে বর্জ্য সরিয়ে পরিষ্কারকরণে নিয়োজিত আছে। এছাড়া রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত লবণ থাকলে তা সরিয়ে ফেলে। রক্তের **প্রেসার, মিনারেল** ও তরল পদার্থের ব্যালান্স রক্ষার্থেও কিডনীগুলো কাজ করে। হাড্ডির মজ্জা হলো রক্তকোষ তৈরীর ফেক্টরী। এখানে প্রতিনিয়ত নতুন রক্ষকোষ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রক্তচাপ

রক্তচাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণ অবশ্য হার্টের পাম্পক্রিয়া। সুতরাং রক্তের মধ্যে **'স্বাভাবিক'** একটি চাপ সর্বদাই থাকবে। তবে সময় সময় এ চাপের মধ্যে তারতম্য

অবশ্যই ঘটে। রক্তের চাপটি ঠিক কোথায় পড়ে? আসলে ধমনী, শিরা ও উপশিরার দেওয়ালে এই চাপের সৃষ্টি হয়। কারণ রক্তকে এসব পাইপ ক্যারী করে নিয়ে যায়। আপনার **সার্কুলেটরী সিস্টেম** কতটুকু সঠিক বা স্বাস্থ্যসম্মত তার একটি উত্তম নির্দেশিকা হলো রক্তচাপ। রক্তচাপ সঠিক না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ক'টি হলো ধমনীসমূহ ফুলে যাওয়া, **ইলাস্টিক** গুণাবলীর রদবদল কিংবা ছোট হওয়া; হার্টের কোন রোগহেতু তার পাম্প করার ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হওয়া ইত্যাদি। সাধারণত রক্তচাপের মধ্যে তেমন বেশি বেশকম হয় না। স্নায়ুতন্ত্র প্রয়োজনমাফিক হার্ট ও ব্লাড ভেসেলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে রক্ত চলাচলে বেশকম ঘটায় সত্য, কিন্তু এতে রক্তচাপে তেমন রদবদল ঘটে না। রক্তের চাপকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে রক্তের মধ্যে **হিমোগে-াবিন** নামক উপাদান আছে। এগুলো মূলত লৌহ-**প্রটিন** যুক্ত পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট এবং এগুলোই রক্তের রংকে লাল করে। **নাইট্রিক অক্সাইড** নামক **গ্যাস** হিমোগে-াবিনে থাকে যা রক্তপাইপের দেওয়ালকে সাহায্য করে। অর্থাৎ পাইপগুলোর সাইজ রক্ষার্থে **হিমোগে-াবিন নাইট্রিক অক্সাইড** উপযুক্ত পরিমাণ সাপ্লাই দেয়- সুতরাং এর ফলে রক্তের চাপও নিয়ন্ত্রণ হয়।

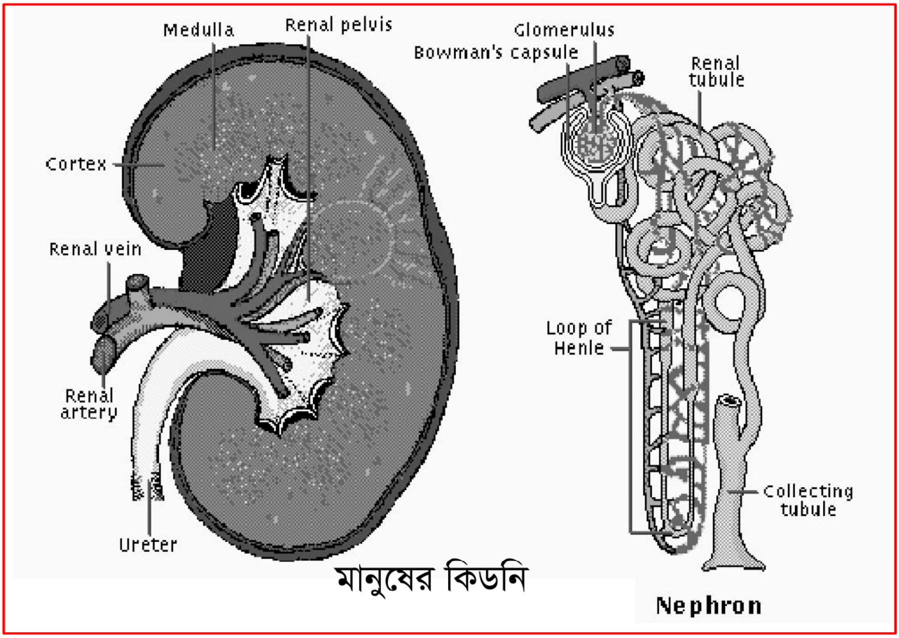
রক্তের চাপকে মাপতে দু'টি সংখ্যা নেওয়া হয়। এর একটিকে বলে '**সিসটোলিক প্রেসার**' আর অপরটি '**ডায়াসটোলিক প্রেসার**'। প্রথমটি রক্ত হার্টের চেম্বার থেকে বের হওয়ার পর আর দ্বিতীয়টি হার্টের চেম্বারে রক্ত থাকাবস্থায় মাপা হয়। সুতরাং প্রথমটি হলো উপরের মাপ ও দ্বিতীয়টি নীচের। আজকাল **ইলেকট্রনিক** যন্ত্র বের হয়েছে, এটা দ্বারা রক্তচাপ অতি সহজে মাপা যায়। তবে অধিকাংশ ডাক্তাররা এখনও '**ঘড়ি**' লাগিয়ে মাপতে পছন্দ করেন। আর এই ঘড়ি যন্ত্রটির আসল নাম তো অবশ্যই ঘড়ি নয়! আসলে এটিকে বলে, 'Sphygmomanometer' - শব্দটি উচ্চারণ সহজ নয় বিধায় '**ঘড়ি**' দিয়েই সবাই চালিয়ে যাচ্ছেন। মাপটি মিলিমিটার পারদ (mm Hg) দ্বারা নির্ণিত হয়। রক্তের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির স্বাভাবিক / অস্বাভাবিক রক্তচাপের একটি চার্ট নীচে দেওয়া হলো। অস্বাভাবিক (অর্থাৎ উচ্চ বা বেশি কম রক্তচাপ হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শও দেওয়া হলো। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।)

শ্রেণী	সিসটোলিক প্রেসার (উপরের) (mm Hg)	ডায়াসটোলিকপ্রেসার (নীচের) (mm Hg)	পরামর্শ
স্বাভাবিক	< ১২০	< ৮০	কোন পরাপর্শ নেই- আপনি ভালো!
পূর্ব-হাইপারটেনশ	১২০ - ১৩৯	৮০ - ৮৯	আপনার লাইফ-স্টাইল বদলানোর চেষ্টা করুন। ধূমপান করবেন না, নিয়মিত ব্যায়াম করুন, পুষ্টিকর কম লবণযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করুন।
১ম স্তরের হাইপারটেনশন	১৪০ - ১৫৯	৯০ - ৯৯	উপরোক্ত পরামর্শ গ্রহণ ছাড়াও ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
২য় স্তরের হাইপারটেনশন	১৬০ কিংবা এর উপরে	১০০ কিংবা এর উপরে	উপরোক্ত উভয় পরামর্শ তো নেবেনই ডাক্তারের নিকট নিয়মিত যাবেন ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন করবেন।

আপনি জানেন কি ঃ কেউ যদি ৭৬ বৎসর জীবিত থাকে তাহলে তার হার্ট কি পরিমাণ রক্ত সমগ্র দেহে পাম্প করবে? এছাড়া কতবার স্পন্দন করতে হবে? এক হিসাব মতে ১৭ কোটি লিটার রক্ত পাম্প করবে ও তা করতে যেয়ে হার্টকে অন্তত ২৮০ কোটি বার স্পন্দন (**হার্ট বিট**) করতে হবে।

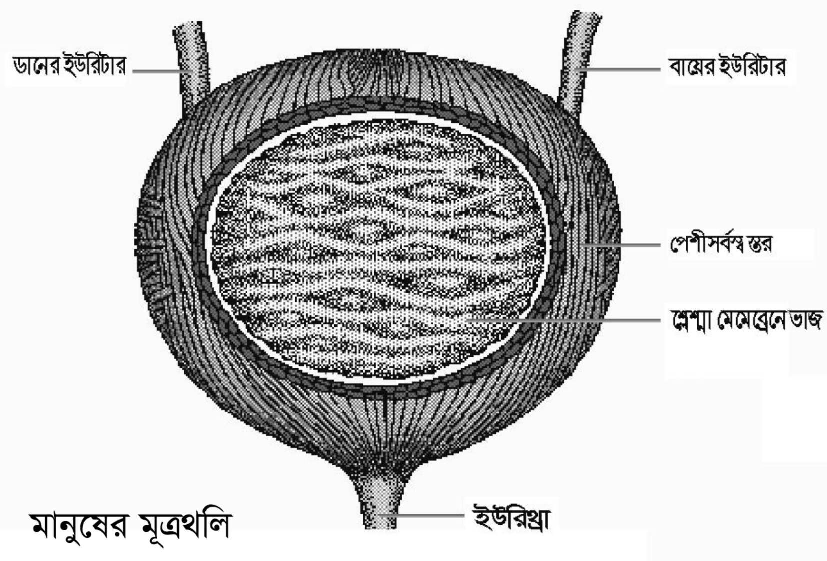
১১. ইউরিনারি সিস্টেম

এই তন্ত্রের মাধ্যমে মূত্র সৃষ্টি ও তা দেহ থেকে বের করার ব্যবস্থা হয়ে থাকে। মূত্র বা **ইউরিন** মূলত অতিরিক্ত পানি। তবে এই পানির সাথে আরও কিছু বর্জ্য পাদর্থ আছে যেমন লবণ ও **নাইট্রোজেন** মিশ্রিত পদার্থ। আমাদের দেহের দু'টি **কিডনী** হলো এই সিস্টেমের প্রধান সদস্য। কিডনীগুলো অবিরাম মূত্র সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আছে। কিডনীদ্বয় রক্ত থেকে মূত্র বানিয়ে তা **'ইউরিটার'** নামক দু'টি পাইপের মাধ্যমে দেহ থেকে বের করার ব্যবস্থা করে।



মানুষের কিডনি

তবে ইউরিটারের মাধ্যমে মূত্র সরাসরি বের হয়ে আসে না- প্রথমে তা মহাকর্ষের সাহায্যে মূত্রথলিতে **(ব্লাডার)** যেয়ে জমা হয়। এই থলের ভেতর অর্ধ লিটার পর্যন্ত মূত্র জমা রাখা যায়। এখান থেকে মূত্র নীচের দিকে নেমে **ইউরিথ্রা** নামক অপর আরেকটি টিউব হয়ে বাইরে চলে আসে। আপনি আমি প্রত্যহ অন্তত দেড় লিটার মূত্র উৎপন্ন করি। এর মধ্যে অর্ধ লিটার দৈনিক রেব করতেই হবে। এবার দেখা যাক ঠিক কিভাবে মূত্রসৃষ্টি ও বেরকরণ প্রক্রিয়াটি ঘটিত হয়।



মানুষের মূত্রথলি

কিডনীদ্বয় কোমরের লেবেলে মেরুদণ্ডের উভয় দিকে কিছু শক্ত মেদী টিস্যুর মধ্যে অবস্থান করে। লালচে-বাদামী কিডনীর ওজন ১৪০ থেকে ১৬০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিডনীর ভেতরে কিছু নীচু জায়গা আছে যাকে **'হাইলাম'** বলে। এখানে কিডনীর **ইউরিটার,** ধমনী ও শিরা একত্রিত হয়েছে। কিডনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত এই ধমনীকে **'রিনেল আরটারী'** বলে এবং এটির কাজ হলো প্রতিদিন কিডনীর ভেতর ১৭০০ লিটার পর্যন্ত রক্ত পৌঁছে দেওয়া। এরপর কিডনীদ্বয় এই রক্তকে **ফিল্টার** পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে শিরার মাধ্যমে পুনরায় হার্টে পাঠিয়ে দেয়। কিডনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত শিরার নাম **'রিনেল ভেইন'**। একটা বিষয় এখানে জানিয়ে রাখা দরকার মনে করছি। এ পর্যন্ত আমরা অনেকবার ইংরেজী শব্দদ্বয় **'আরটারী'** ও **'ভেইন'** উল্লেখ করেছি। বাংলায় প্রথমটিকে বলেছি ধমনী ও দ্বিতীয়টিকে শিরা। আসলে উভয়টিই একই জিনিস- তবে ব্যবদান হলো ধমনী বা **আরটারী** রক্ত কোন অরগ্যান- বিশেষকরে হার্টে ঢুকায় এবং শিরা বা **ভেইন** তা বের করে নেয়। এই পার্থক্য চিহ্নিত করতে যেয়েই এদের নামকরণ আলাদা করা হয়েছে- অবশ্য এদের অভ্যন্তরীণ গঠনেও কিছুটা ব্যবদান আছে।

যা হোক, **কিডনী** দু'টি উপরোক্ত **ফিল্টারিং প্রসেস** করতে যেয়ে মূত্র (বৈর্জ্য হিসাবে) তৈরী করে। প্রতিটি কিডনীর ভেরত আছে ১০ লক্ষাধিক অতি ক্ষুদ্রকায় ছিদ্র যাকে **'নেফরোন'** বলে। এই **নেফরোন** দিয়েই **কিডনী ফিল্টারিং** কাজটি আঞ্জাম দেয়। রক্ত থেকে যেসব বস্তু বের করে নিয়ে আসা হয় তার মধ্যে পানি; **ইউরিয়া** (নাইট্রোজেনের তৈরী প্রটিনকে ভেঙ্গে ফেলার বস্তু); লবণ; **গ-ুকোস; অ্যামিনো এসিড** (প্রটিনের বিল্ডিং ব্লক্স); লিভারে সৃষ্ট হলুদ রংয়ের তরল পদার্থ- **বাইল** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলো যখন **রিনেল টিউব** দিয়ে চলতে থাকে তখন অধিকাংশই আবার রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের কাজে পুনরায় ব্যবহৃত হয়। বৈর্জ্য হিসাবে পরিত্যক্ত বস্তুর মাত্র ১% মূত্র হিসাবে দেহ থেকে বের হয় বাকীগুলো **'রিসাইকেল'** প্রডাক্ট হিসাবে দেহে থেকে যায় ও উপকারে আসে।

নেফরোন থেকে উপরে উল্লেখিত বাকী বস্তু বেসিনের মতো একটি পাইপে চলে যায়- এটির নাম **'রিনেল পেলভিস'**। এখান থেকে বৈর্জ্যদ্রব্য **ইউরিটা** নামক দীর্ঘ টিউবে প্রবেশ করে। এটা দৈর্ঘ্যে ১ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখান থেকে বৈর্জ্য **ইউরিনারী ব্লাডার** বা মূত্রথলে গিয়ে পৌঁছে। ব্লাডারের প্রবেশপথে একটি ভাল্ব (কপাটক) আছে যার কাজ হলো ইউরিটায় যাতে মূত্র ফিরে না যেতে পারে তা নিশ্চিত করা। এরপর ব্লাডারে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূত্র জমা হলেই এর দেওয়াল থেকে **সিগনাল** আসে যে, এখনই মূত্রত্যাগের প্রয়োজন। প্রস্রাবের সময় **ব্লাডার** থেকে **ইউরিথ্রা** নামক একটি মূত্রনালী দিয়ে শেষপর্যন্ত পেশাব বেরিয়ে আসে। নারীদের ও পুরুষদের ইউরিথ্রায় পার্থক্য আছে। নারীদের ক্ষেত্রে এটা সত্যিকার অর্থেই একটি আলাদা মূত্রনালী, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এটা দু'টি কাজ আঞ্জাম দেয়। প্রস্রাব বের হওয়া ও বীর্যপাত হওয়া- এই উভয় কাজ পুরুষদের মূত্রনালী বা **ইউরিথ্রা** করে থাকে।

আমাদের কিডনীদ্বয়ের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ডিউটি আছে। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে মূত্র বহিষ্করণ ও রক্ত পরিষ্কার করা ছাড়াও এগুলো দেহের মধ্যে পানির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। আজকে বেশি আর কালকে যদি আপনি কম পানি পান করেন তাহলে **কিডনী** এই ব্যবধানকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে যাতে এর ফলে কোন ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ পানির মাত্রা যাতে একই লেবেলে থাকে সে নিশ্চয়তা রক্ষার্থে **কিডনী** কাজ করে যায়। হাড়গুলো যাতে স্বাস্থ্যবান থাকে তার জন্য কেলসিয়ামের প্রয়োজন। রক্তের মধ্যে এই উপাদানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে **কিডনী** ক্রিয়াশীল আছে। এছাড়া রক্তে **এসিড** ও দেহের

তরল পদার্থের মাত্রার একটি ব্যালান্স সৃষ্টিতে **কিডনী** সহায়তা করে। রক্তের মধ্যকার লাল কোষ সৃষ্টিতেও কিডনীদ্বয়ের অবদান আছে। মোটকথা, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অন্তত একটি কার্যকরী **কিডনী** একান্ত জরুরী। আর উভয়টি তো আরো ভালো।

আপনি জানেন কি ঃ হিমোডায়ালিসিস বা **কিডনী ডায়ালিসিস** একটি আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি, যার মাধ্যমে অকেজো কিডনীর কাজ দেহের বাইরে রক্ত এনে সাধিত হয়। দেহের **আরটারী** (ধমনী) থেকে রক্ত পাম্পের মাধ্যমে বের করে কৃত্রিম একটি কিডনীতে নিয়ে আসা হয়- একে **ডায়ালাইজার** বলে। এরপর **ফিল্টারিং** কাজ সেরে আবার একটি ভেইনের (শিরার) মাধ্যমে দেহে পরিষ্কার রক্ত ফেরৎ পাঠানো হয়। যাদের কিডনীর **ফাংশন** সঠিক নয় কিংবা সম্পূর্ণ অকেজো তাদেরকে এই ডায়ালিসিসের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে আজকাল **কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট** সম্ভব- কিন্তু সঠিক **'ডোনার' কিডনী** না পাওয়া পর্যন্ত **ডায়ালিসিস** দ্বারা জীবনরক্ষা জরুরী।

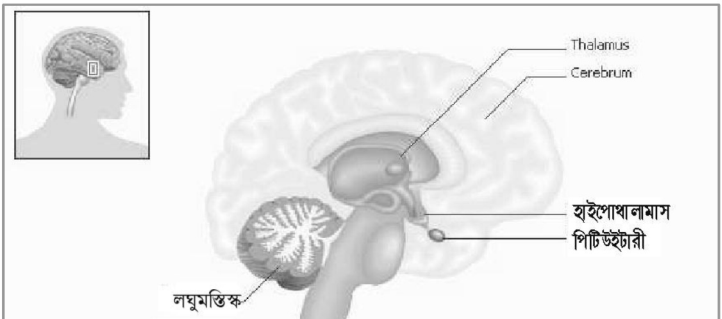
১২. এন্ডোক্‌ট্রাইন সিস্টেম

মানবদেহের কোষ থেকে কোষে যে **কেমিক্যাল** বস্তু **মেসেঞ্জার** বা বার্তাবাহক হিসেবে কাজ করে থাকে, তাকে **হর্মোন** বলে। এটা মূলত একটি ভেসজদ্রব্য। মানবদেহে কয়েকটি বিশেষ যন্ত্র আছে যাদের কাজ হলো প্রয়োজনমাফিক এই বার্তাবাহক দ্রব্য তৈরী করা। এই **হর্মোন** তৈরীর ক্রিয়াকেই সার্বিকভাবে **এন্ডোকট্রাইন সিস্টেম** বলে। মানবদেহের উপর আমাদের এই অপূর্ব তথ্যানুসন্ধানের শেষ অংশ হিসেবে আমরা দ্বাদশতম এই তন্ত্রের উপর কিছু আলোচনা শেষে এই পরিচ্ছেদের ইতি টানবো। আমি প্রথমেই বলেছি, এ বইটি মূলতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের উপর তথ্যভিত্তিক একটি সাধারণ উপস্থাপনা মাত্র। সুতরাং মানবদেহের কার্যকলাপ ও তন্ত্রমন্ত্রের মতো একটি অতি-জটিল সাইন্সকে একটিমাত্র পরিচ্ছেদে বুঝিয়ে বলা আদৌ সম্ভবপর ব্যাপার নয়। এরপরও আমরা এই প্রাথমিক সার্ভে থেকে হয়তো অনেক অজানা জিনিষ জানতে পেরেছি- আর এটাই হবে এই রচনার ক্ষেত্রে স্বার্থকতা। যা হোক সর্বশেষ এই তন্ত্র বা সিস্টেমের উপর এবার কিছুটা আলোচনায় মনোনিবেশ দেওয়া যাক।

হর্মোনের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কার্যাদি সাধিত হয়। এই **সিস্টেম হর্মোন** তৈরী করে রক্তের মধ্যে রিলিজ করে। **হর্মোন** বিভিন্ন তথ্যাদি ও নির্দেশ নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে।

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে এই তন্ত্র দেহের অনেককিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলোর মধ্যে এখানে দেহের বেড়েওঠা ও গঠন, বিভিন্ন টিস্যুর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, গর্ভবতী মাকে সাহায্য করা এবং দেহের '**মেটাবলিজ্‌ম**' (জীবনরক্ষার বিভিন্ন উপাদান) নিয়ন্ত্রণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। **হর্মোন** সৃষ্টিতে একাধিক বিশেষভাবে তৈরী দেহযন্ত্রাদি জড়িত। এবার এগুলো নিয়ে আলোচনার দরকার।

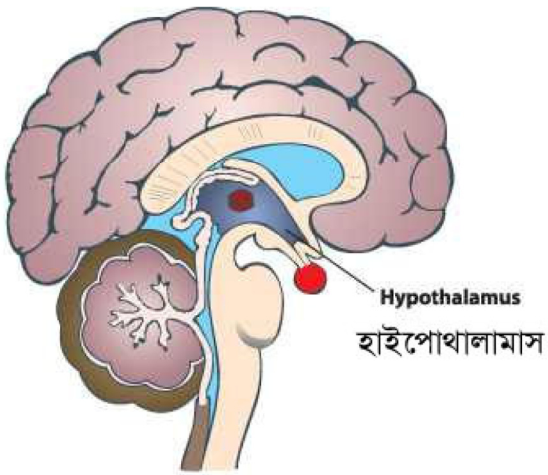
এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের সঙ্গে আটটি গ্রন্থি (**গ□ান্ড**) ও একটি **অরগ্যান** (দেহযন্ত্র) জড়িত। প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে **গ□ান্ড** বা গ্রন্থির কাজ কি। **গ□ান্ড** হচ্ছে ঐসব যন্ত্র যারা দেহের রক্ত থেকে কিছু বস্তু সরিয়ে নেয়, না হয় রক্তের মধ্যে কিছু বস্তু সংযোগ করে। দেহে দুই ধরনের **গ□ান্ড** আছে : প্রথমটি হলো **ডাক্টসহ** (ভেতর থেকে বের হওয়ার রাস্তাসহ) **গ□ান্ড** আর দ্বিতীয়টি **ডাক্টলেস** (বের হওয়ার রাস্তা ছাড়া) **গ□ান্ড**। যেসব **গ□ান্ড** ও যন্ত্রের ডাক্ট আছে এদের মধ্যে '**সালিভারী গ□ান্ড**' (লালা তৈরীর গ্রন্থি), '**পানক্রিয়াস**' (অগ্ন্যাশয় ?) ও **লিভার** (যকৃৎ) ইত্যাদি এখানে উল্লেখযোগ্য। **হর্মোন** তৈরীর সঙ্গে জড়িত গ-ান্ডগুলো কিন্তু **ডাক্টলেস** (অর্থাৎ এরা তাদের সৃষ্ট বস্তু সরাসরি রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দেয়- কোন আলাদা রাস্তার দরকার নেই)। এবার এসব বস্তুর ব্যাখ্যা আলাদাভাবে করা জরুরী।



১. হাইপোথালামাস গ-ান্ড ঃ এটি মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে **হর্মোন** সৃষ্টিসহ বেশ কিছু নিয়ন্ত্রক কাজে নিয়োজিত আছে। এটা চোখের পেছনে মগজের '**থালামাস**' এর নীচে ও '**পিটিউইটারী গ□ান্ড**' এর উপরে অবস্থিত। এই গ্রন্থির ওজন মাত্র ৪ গ্রাম। ছোট্ট

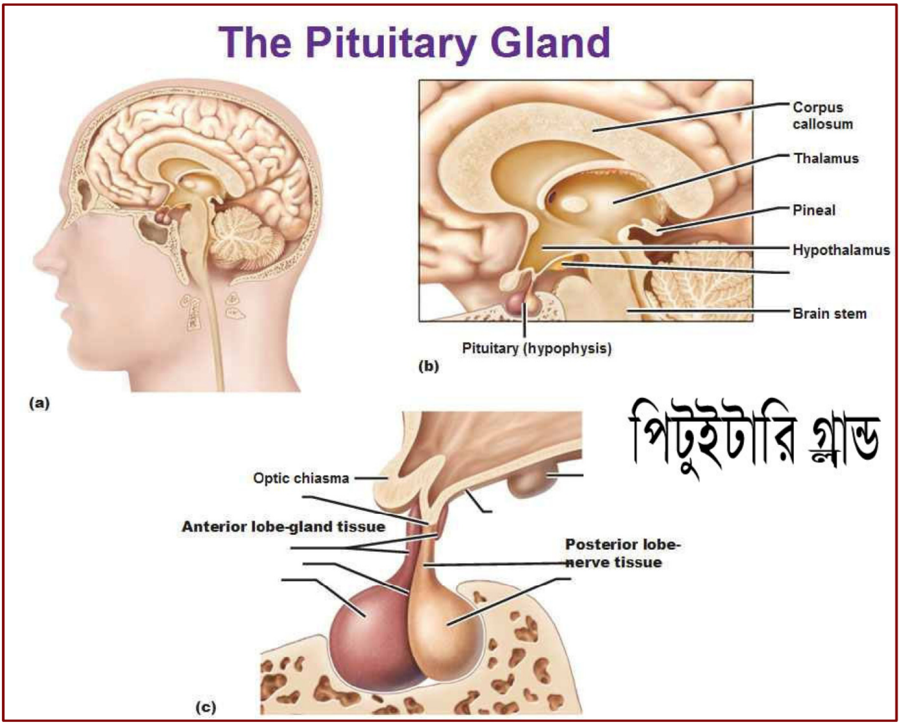
হলেও তার নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু মৌলিক কার্যাদি আছে- যেমন আমাদের যৌন সংক্রান্ত বিষয়, আবেগ, **হর্মোন** উৎপাদন ও স্বয়ংক্রিয় **নার্ভাস** সিস্টেমকে সাহায্য।

আমরা যখন ভয় পাই কিংবা কোন ব্যাপারে উত্তেজিত হই তখন **অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেম** থেকে **সিগনাল** এই হাইপোথালামাসে এসে পৌঁছে। এটা পাল্টা **সিগনাল** পাঠিয়ে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধি, চোখের তারাকে বড়করণ এবং রক্তসঞ্চালন রেট বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দেয়। এটা রক্তের **গ-ুকোস** ও পানির মাত্রা **মনিটর** করে এবং প্রয়োজনমতো খাদ্যের রুচি ও পিপাসা নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া নিদ্রা ও যৌনক্ষুদা এই গ-ান্ডের আওতাধীন। তবে **এন্ডোক্রাইন** সিস্টেমে এই গ্রন্থির ডিউটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হলো, এটি পুরো সিস্টেমের **'কো-অরডিনেটর'**। মগজে যখন দেহের কোথাও থেকে কোন তথ্য আসে, যাতে পরিবর্তন সাধনের ইশারা বিদ্যমান থাকে, তখন এই গ্রন্থির **নার্ভ** কোষগুলো জ্যান্ত হয়ে ওঠে সঠিক একশনে ব্রত হয়। সুতরাং সকল গ্রন্থির মধ্যমণি হলো এটি- যেনো একটি অফিসের লিয়াইজন অফিসার।

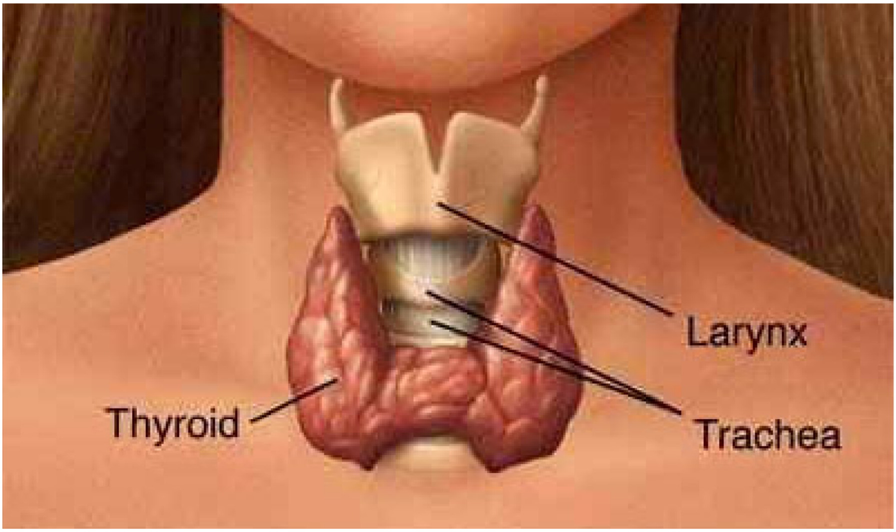


২. **পিটিউটারী গ□ান্ড** ঃ কো-অরডিনেটরের দায়িত্ব বেশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিচালকের সমপর্যায়ের হয় না। **এন্ডোক্রাইন** সিস্টেমের পরিচালক- বরং বলা যায় মাহাপচিলক হলো **'পিটিউটারী গ□ান্ড'**। এটি থেকে সৃষ্ট **হর্মোন** দ্বারা পুরো সিস্টেমের সকল **গ□ান্ড** নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কের সেন্টারে স্থাপিত এই গ-ান্ডটির অবস্থান **হাইপোথালামাস**

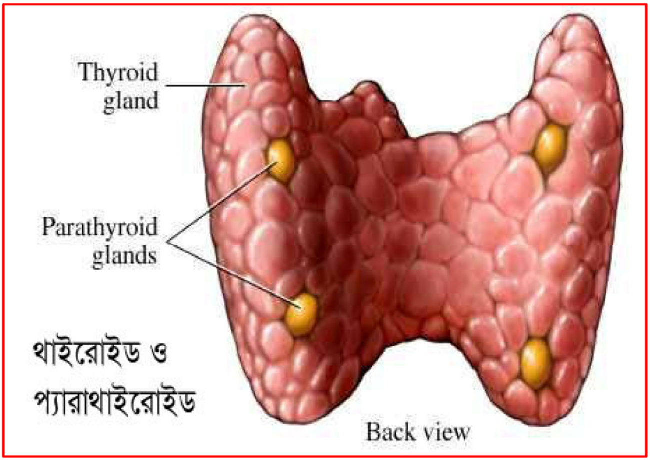
থেকে বেশ দূরে নয়। এটির দু'টি আলাদা অংশ আছে- বাইর ও পেছনের অংশ। বাইরের অংশ **'থাইরোইড'** ও পুনর্জনন গ-ান্ডগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এই অংশ বেড়ে ওঠা ও মহিলাদের বুকে দুগ্ধ হওয়া (যখন তারা বুকের দুধ শিশুদেরকে পান করায়) ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রণ করে। পেছনের অংশ দেহের মধ্যে পানির ব্যালান্স ও মহিলাদের গর্ভাশয়ের পেশী নিয়ন্ত্রণ করে।



৩. থাইরোইড গ-ান্ড ঃ আমাদের গলার মধ্যে এই গ-ান্ডের অবস্থান। এই গ্রন্থি বড় হওয়া, শিশুবেলা মগজ বৃদ্ধির কাজ ও বিপাক ক্রিয়া **(মেটাবলিজম)** নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।



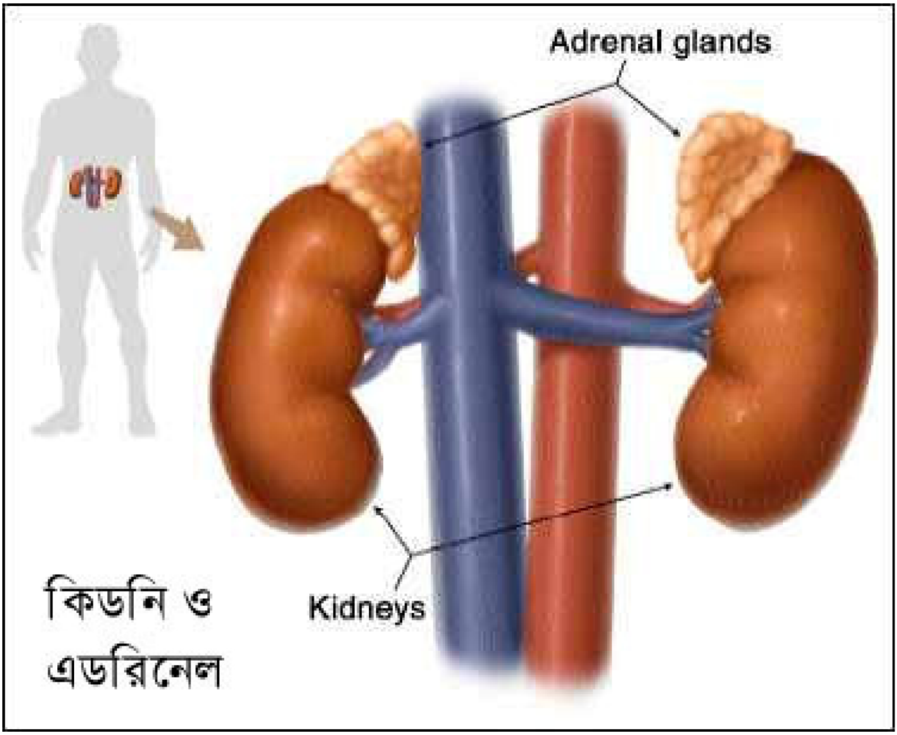
৪. **পারাথাইরোইড গ-ান্ড** (৪টি) ঃ গলার মধ্যে স্থাপিত **থাইরোইড** গ-ান্ডের নিকটে এগুলোর অবস্থান। আমাদের দেহে এরূপ চারটি **গ□ান্ড** আছে। সবগুলোই গলায় অবস্থিত। রক্তের মধ্যে কি পরিমাণ **কেলসিয়াম** থাকবে সেটা নিয়ন্ত্রণে এই গ্রন্থিগুলো **হর্মোন** সৃষ্টি করে।



থাইরোইড ও প্যারাথাইরোইড

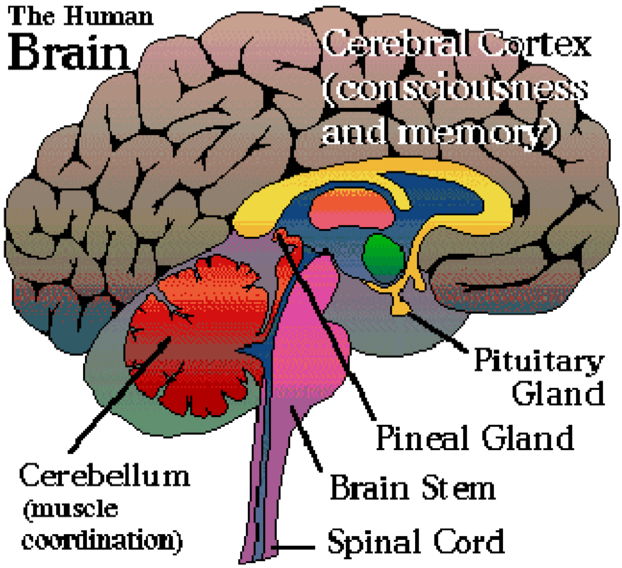
৫. **এড্রিনেল গ□ান্ড** (২টি) ঃ উভয় কিডনীর উপরে এই গ-ান্ডদ্বয়ের অবস্থান। গ্রন্থিগুলোর মধ্যে ভেতরের ও বাইরের দু'টি আলাদা অংশ আছে। উভয় অংশ আলাদা ধরনের **টিস্যু** দ্বারা ঘটিত এবং তাদের কাজও ভিন্ন। ভেতরের অংশ **'এপিনেফরিন'** নামক একটি **হর্মোন** তৈরী করে। আমরা যখন শারীরিকভাবে চাপের মুখে পড়ি তখন এই হর্মোনের প্রয়োজন

হয়। এটা আমাদের কষ্টকর পরিস্থিতিতে বন্ধু হিসাবে কাজে লাগে- অর্থাৎ শান্ত করতে সহায়তা করে। বাইরের অংশ ৩০টি **'স্টেরোইড' হর্মোন** বানায়। এগুলোর মধ্যে গোটা ক'টি মাত্র ব্যবহৃত হয়। এইসব **হর্মোন** দেহের পানি ও লবণের মাত্রার ব্যালান্স নিয়ন্ত্রণ করে।

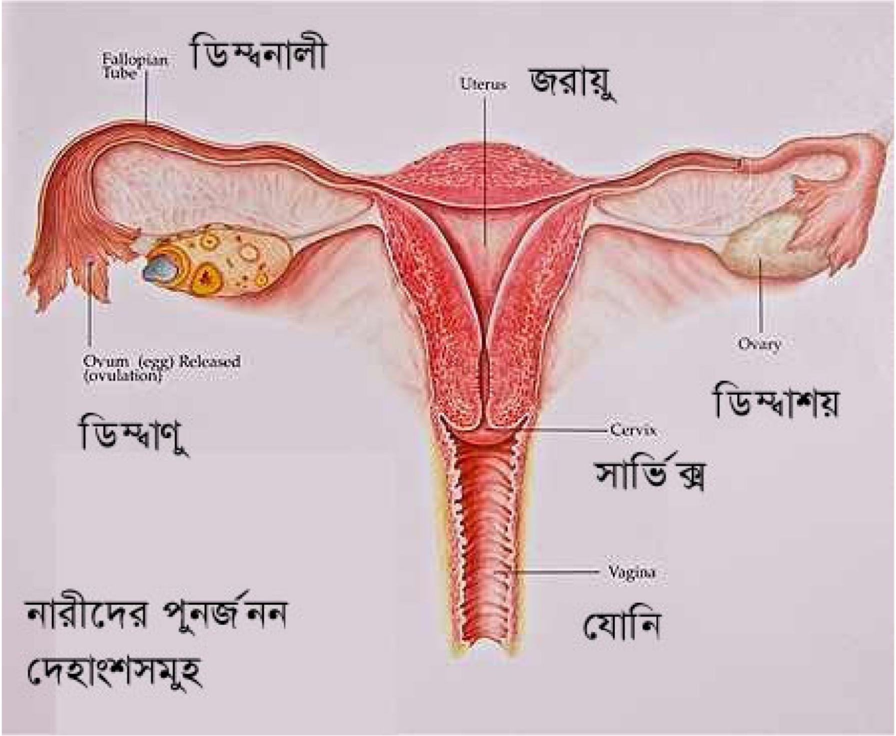


৬. পিনিয়েল গ-ান্ড ঃ এই গ-ান্ডের অপর নাম **পিনিয়েল বডি**। এটা মগজের মাঝখানে অবস্থিত। এই **গ□ান্ড 'মেলোটোনিন'** নামক একটি **হর্মোন** তৈরী করে। এই হর্মোনের একশন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এখনও হয় নি। তবে ধারণা করা হয় এটাই আমাদের দৈনন্দিন নিদ্রা যাওয়া ও সজাগ থাকার যে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে তা নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা আরও মনে করেন, কোন্ সময় অন্ধকার আর কোন্ সময় আলোকময় এ খবর দেহকে রসায়নিকভাবে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে এই হর্মোনটি। কেউ কেউ এটাও বলেন যে, আমাদের দেহের অভ্যন্তরীণ **বায়োলজিক্যাল** ঘড়িকেও এই **মেলোটোনিন হর্মোন** নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঘড়ির টেকনিক্যাল নাম হলো

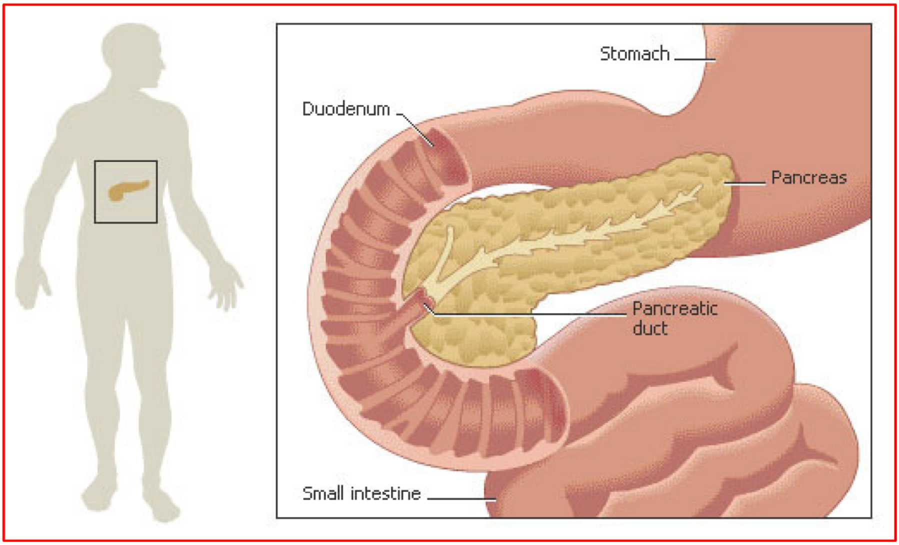
'সারকেডিয়ান রিদ্‌মস্' (Circadian Rhythms)। এটা মূলত দেহের বিভিন্ন কোষের দৈনন্দিন সময় নির্ধারণ পদ্ধতি। এর ফলেই দিনের বিভিন্ন সময় আমাদের দেহের কিছু কার্যাদির পরিবর্তন ঘটে।



৭. **অভারী গ□ান্ড** ঃ এটা মূলত নারীদের ডিম্বকোষ সৃষ্টির কেন্দ্র। **অভারী** থেকেই **অভিউম** বা নারীদের ডিম্বকোষ এসে পুরুষের বীর্য কোষ বা স্পার্ম সেলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নতুন জীবনের উদ্ভাবন ঘটায়। তবে **অভারী** একটি গ-ান্ডও বটে। এটা ডিম্বকোষ ছাড়াও **হর্মোন** তৈরী করে। সাধারণত এসব **হর্মোন** যৌনসংক্রান্ত ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। **'এসট্রোজিন'** ও **'প্রজেশটেরোন'** নামক দু'টি **হর্মোন** এই গ্রন্থিতেই তৈরী হয়। প্রথমটি বালিগা হওয়ার সময় মেয়েদের দেহে যৌবনের বিভিন্ন দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়টি মহিলাদের মাসিক পিরিওডকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তার মূল কাজ হলো গর্ভাশয়ে লালাজাতীয় দ্রব্যের আয়োজন করা। এছাড়া শিশুর খাদ্য হিসাবে দুগ্ধ সৃষ্টির কাজেও এর অবদান আছে।



৮. **টেস্‌টিস গ-ান্ড** ঃ পুরুষের অণ্ডকোষ। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি অণ্ডকোষ মূলত পুরুষের বীর্যকোষ সৃষ্টির কারখানা। কিন্তু এটাও একটি গ্রন্থি। সুতরাং প্রয়োজনে এটা থেকেও **হর্মোন** বেরিয়ে আসে। **'আনড্রোজেন'** নামক পুরুষের যৌন সংক্রান্ত **হর্মোন টেস্‌টিস** গ্রন্থিতেই তৈরী হয়। এই হর্মোনই পুরুষাঙ্গের বেড়েওঠাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপর আরেকটি সচরাচর জানা **হর্মোন 'টেসটোসটেরন'** (Testosterone) এখানেই জন্মলাভ করে- যা মূলত আনড্রোজেনই। এটা পুরুষত্ব বিকাশে সাহায্য করে যেমন, দাড়ি গজে ওঠা, সুঠাম দেহ, নাভির নীচের লোম, কথার মধ্যে গাম্ভির্যতা সৃষ্টি ইত্যাদি। এটা অবশ্য পুরুষের যৌন সংক্রান্ত চরিত্রের উপরও সরাসরি প্রভাব ফেলে।



৯. **প্যানক্রিস** ঃ এটি গ্রন্থি নয়- একটি **অরগ্যান**। তবে **এন্ডোকট্রাইন** সিস্টেমে এর অবদান আছে। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, এই যন্ত্রটি আমাদের **ডাইজেসটিভ** সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এটি আসলে আরেক কাজের সঙ্গেও সম্পৃক্ত- অর্থাৎ এটাও গ্রন্থিদের মতো **হর্মোন** তৈরী করতে জানে। **এন্ডোকট্রাইন** তন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত উপরে বর্ণিত ৮টি গ্রন্থিকে বলে **'ডাক্টলেস'** গ্রন্থি- অর্থাৎ এগুলোর কোন আলাদা রাস্তা নেই যেদিকে **হর্মোন** তৈরী করে বের করে দেওয়া যায়- বরং তারা ক্যাপিলারির (শিরার) মাধ্যমে হর্মোনগুলো রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দেয়। কিন্তু **প্যানক্রিস** একটি ডাক্টসহ যন্ত্র। এই যন্ত্রই আমাদের রক্তে কি পরিমাণ চিনি আছে তা নিয়ন্ত্রণ করে। **ডায়াবেটিস** নামক রোগের কারণও এটি- অর্থাৎ এই যন্ত্র সঠিক পরিমাণ **গ্লুকাগন** ও **ইনস্যুলিন** (দু'টি **হর্মোন**) তৈরী করে না, কিংবা একেবারেই অকেজো হওয়ায় রক্তের মধ্যকার চিনি অনিয়ন্ত্রিত থাকে। অবশ্য আজকাল কৃত্রিম উপায়ে **ইনস্যুলিন** ও **গ্লুকাগন** তৈরীসহ **ডায়াবেটিস** সমস্যার চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

এন্ডোকট্রাইন সিস্টেমের উপর আমাদের এই শিক্ষামূলক প্রাথমিক সার্ভের এখানেই শেষ। মানবদেহের মধ্যে যেসব অভ্যন্তরীণ **অরগ্যান** ও গ্রন্থি আছে ওগুলোর পরিচিতিমূলক এই বর্ণনায় আমি ইচ্ছে করেই **'ডাক্তারী'** দিকটি উপেক্ষা করে গেছি।

এর একমাত্র কারণ হলো, আমি ডাক্তার নই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অংশ হিসাবে মানবদেহ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান যেটুকু আছে এবং এই গ্রন্থ রচনার সময় বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব তথ্যাদি পেয়েছি তা-ই এখানে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরেছি। আমি আবারও বলছি দৈহিক কোন সমস্যা হলে তার জন্য অবশ্যই ডাক্তারের সাহায্য নেবেন- এই গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কোন চিকিৎসা জাতীয় কিছু করবেন না। আমি তো অবশ্যই এটাকে কোন চিকিৎসাশাস্ত্রের কিতাব হিসাবে রচনা করি নি। এই কিতাব ব্যবহার করে, এ থেকে তথ্যাদি নিয়ে যদি কেউ স্বাস্থ্যগত বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হোন তাহলে আমি এবং অত্র গ্রন্থের প্রকাশক ও গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত কেউই এর জন্য দায়ী থাকবো না। সুতরাং আপনার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপার এখানে ইচ্ছে করেই অত্যল্প বর্ণনা করেছি। বিষয়টি আশারাখি পরিষ্কার হয়েছে।

আপনি জানেন কি ঃ ‘জাইগান্টিজিম’ এবং **‘জায়ান্টিজিম’** দুটি ইংরেজী শব্দ কিন্তু অর্থ একই। বাংলায় তরজমা করতে যেয়ে আমরা বলতে পারি **‘বিরাটত্ব’**। হ্যাঁ, বিরাট উচ্চতা ও আয়তনবিশিষ্ট কিছু মানুষ আছে। লম্বা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রায় সবারই। তবে অতিরিক্ত লম্বা হওয়া কিন্তু অস্বাভাবিক- বরং এক ধরনের রোগ। এই রোগের নামই হলো **‘জাইগান্টিজিম’** কিংবা **‘জায়ান্টিজিম’**। আমরা জেনেছি মস্তিষ্কে স্থাপিত **‘পিটিউটারী গ্লান্ড’** বেড়ে ওঠার **হর্মোন** তৈরী করে। এটা আমাদের জন্ম থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত জরুরী উপাদান হলেও যদি বেশি উৎপাদন হয় তাহলে উপরোক্ত সমস্যা দাঁড়ায়। বাড়তে বাড়তে আর বাড়ার শেষ হয় না। সাধারণত উপযুক্ত চিকিৎসা ছাড়া মানুষ বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে না। সুতরাং বেশ লম্বা হওয়া ভালো কিন্তু অতিরিক্ত ভালো নয়।

পরিচ্ছেদ ৩২

ইন্দ্রিয়

আগের পরিচ্ছেদে মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্রের উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইচ্ছে ছিল এটুকু বর্ণনাই এ কিতাবের জন্য হয়তো যথেষ্ট। কিন্তু মানবদেহের কিছু মৌলিক **ফাংশন** আছে যা সবার জ্ঞাতে হয়ে থাকে- এগুলো সার্বিকভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া বলা চলে। সুতরাং এ সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু তথ্যাদি বর্ণনা হয়তো এখানে প্রযোজ্য, বিধায় এসব ব্যাপার নিয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনা এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

পাঠকরা অবশ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা জানেন। এই পাঁচটি **সেন্‌স** বা ইন্দ্রিয় ছাড়াও আরও কিছু **'জ্ঞানার্জনের'** ব্যাপার আছে যা মূলত পঞ্চেন্দ্রিয়ের নির্যাস বলা যায়। এগুলোর মধ্যে **'ইন্টেলিজেন্স'** বা বুদ্ধিক্ষমতা এবং **'মেমরী'** বা স্মরণশক্তি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রথম পর্বে পঞ্চেন্দ্রিয় ও তৎসঙ্গে জড়িত বিভিন্ন **অরগ্যান** বা দেহযন্ত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এরপর অদেখা ঐসব ইন্দ্রিয় যেমন বুদ্ধিক্ষমতা, মেমরী, ভাব, অনুভুতি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদির উপর তথ্যমূলক বর্ণনায় যাবো। আগেই বলে রাখি, ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান থাকলেও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেসব তথ্যাটি আমরা পেয়ে থাকি ও যেভাবে এগুলোকে বুঝি তা কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা সহজ ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের গবেষণাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। ধর্ম ও দর্শন এ ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছে। বিশেষকরে অদেখা ইন্দ্রিয়দ্বয় বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির উপর অনেক দার্শনিক ও ধর্মভিত্তিক গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। সুতরাং বিজ্ঞান দ্বারা এগুলো পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, এসব ব্যাপার হলো অজড় মানবিক গুণাবলী- যাকে আমরা **এবস্ট্রাক্ট** বা বিমূর্ত পার্যায়ভুক্ত বিষয় হিসাবে ধরে নিতে পারি। তবে বিজ্ঞান এগুলো সম্পর্কে যেটকু জানতে সক্ষম হয়েছে তা জানা অবশ্য বিষয় বুঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

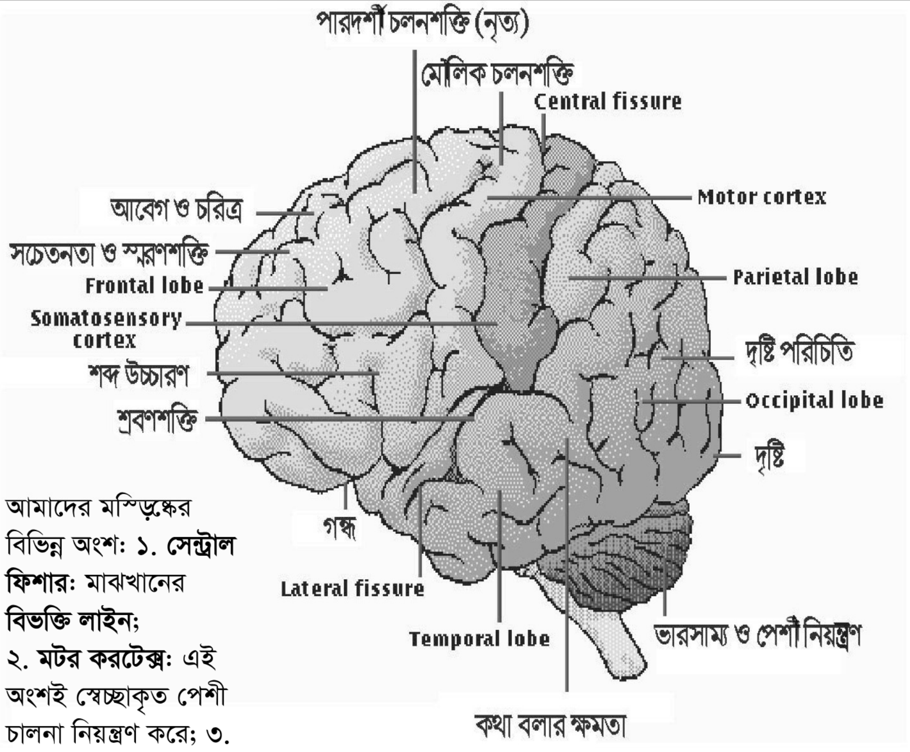
ইতোমধ্যে বলেছি ইন্দ্রিয় মূলত পাঁচটি। তবে এই হিসাবটি অনেক পুরাতন- গ্রীক দার্শনিক **এ্যারিস্টটল** (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃপূঃ) সম্ভবত সর্বপ্রথম পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা বলেছিলেন। এগুলো হলোঃ দেখা (চোখ), শোনা (কান), স্বাদ (জিহ্বা), গন্ধ (নাক)

ও ছোঁয়া (ত্বক)। বন্ধনীতে লিখিত যন্ত্রগুলো প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক যুগে এসে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, শেষোক্ত ইন্দ্রিয় তথা ত্বকের একাধিক শাখা-ইন্দ্রিয় আছে। যেমনঃ চাপ, তাপ ও বেদনা। বিজ্ঞানীরা আরও ১৫টি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের কথাও বলেন- যেমন, ক্ষুদা, পিপাসা, ওজন, ওজনশূন্যতা ইত্যাদি। তবে আমরা এগুলোর সবক'টির উপর আলোচনা এখানে করছি না। এসব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়, এমন কিছু দেহযন্ত্রের কথা সময়মতো হয়তো উল্লেখ করবো মাত্র। প্রথমে ঐসব ট্রাডিশন্যাল ইন্দ্রিয়ের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি। তবে সবার আগে যে যন্ত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সত্যিকার অর্থে **'জানা-চেনা-শোনা'** যায় সেটির উপর কিছু বলা জরুরী। সুতরাং **সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম** নামে খ্যাত আমাদের মগজ সম্পর্কে আরো জানতে হবে।

মানব ব্রেন

আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় যন্ত্রটি হলো মাথার খুলির ভেতরে অবস্থিত ব্রেন বা মস্তিষ্ক। যাবতীয় ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যাদি প্রসেসসহ অসংখ্য কার্যে নিয়োজিত থেকে এই মস্তিষ্কই আমাদেরকে **'ইন্টেলিজেন্ট'** বা বুদ্ধিসম্পন্ন জীবী হিসাবে অস্তিত্বশীল ও জ্যান্ত রেখেছে। এটাই হলো চলাচল, নিদ্রা, ক্ষুদা, পিপাসা ও অন্যান্য প্রায় সবগুলো ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক যার ফলে আমরা বেঁচে আছি। ব্রেনে দেহের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্যা স্নায়বিক **সিগনাল** আসে এবং এগুলোর সঠিক জবাব হিসাবে তা ব্রেন থেকেই আবার উপযুক্ত স্থানে নির্দেশ হিসাবে ফিরে যায় ও প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই মগজই কী আমাদেরকে চেতনা প্রদান করে? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব বিজ্ঞান থেকে আমরা এখনো পাই নি- যদিও অনেকের মতে তা-ই, অর্থাৎ ব্রেন চেতনা দান করে। অপরদিকে মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মে **'চেতনা'** শব্দটির অর্থ ব্যাপক। অধিকাংশ মতে চেতনা মূলত আমাদের **'আত্মা'** নামক অজৈবিক বা অ-বস্তুর অবদান। আত্মা থাকায়ই আমরা জ্যান্ত। কারণ দেহের যাবতীয় ফাংশন- এবং এতে মগজও বাদ নেই, মূলত ঐ আত্মাকে **'পিঞ্জরে বন্ধী'** রাখার নিমিত্তেই ক্রিয়াশীল আছে। এক কথায়, দেহ ও তার যাবতীয় কার্যাদি আত্মার গোলামী ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, আত্মা ছাড়া আমরা নির্জীব, মৃত- সুতরাং মানুষ চেতনাশীল আত্মার ফলে- দেহের কোন যন্ত্রের কারণে নয়। আত্মা চলে গেলে আমরা মৃত কিংবা দেহের জরুরী কোন **ফাংশন** যেমন, হৃদযন্দ্রের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে আত্মার উপস্থিতির অবসান ঘটে। কারণ, দেহে তখন আত্মা থাকার মতো উপযোগিতা অবশিষ্ট থাকে না-

সুতরাং এক্ষেত্রেও আমরা মৃত। যা হোক এসব ব্যাপার- আগেই বলেছি ধর্ম-দর্শন-সাইকোলজির কথা, তাই এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত বলা হবে অপ্রাসঙ্গিক। এখন প্রশ্ন জাগে, জৈবিক পদার্থের তৈরী এরূপ একটি **অরগ্যান** কিভাবে এতো জটিল-কঠিন অসংখ্য কার্যাদি আঞ্জাম দিতে পারে? আসুন একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি- আমাদের, হ্যাঁ সেই মস্তিষ্ককেই ব্যবহারের মাধ্যমে।



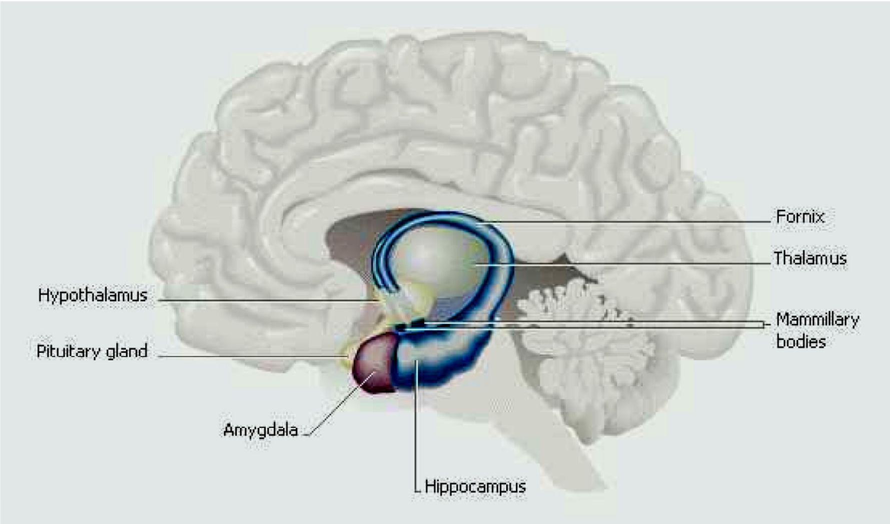
আমাদের মস্ড়িষ্কের বিভিন্ন অংশ: ১. **সেন্ট্রাল ফিশার:** মাঝখানের **বিভক্তি লাইন;** ২. **মটর করটেক্স:** এই অংশই স্বেচ্ছাকৃত পেশী চালনা নিয়ন্ত্রণ করে; ৩. **লেটারেল ফিশার:** নীচের

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ

মস্তিষ্কের গঠন ও কাঠামো

প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের মস্তিষ্ক জেলির মতো টিস্যুর তৈরী বস্তু থেকে সৃষ্ট- যার ওজন ১.৩ কে.জি। মস্তিষ্কের মৌলিক কোষগুলো মূলত স্নায়ুকোষ এবং এর সংখ্যা প্রায় ১০০ বিলিয়নের মতো। এই সেলগুলোর অপর নাম **নিউরন**। এছাড়া এতে আছে অনেক

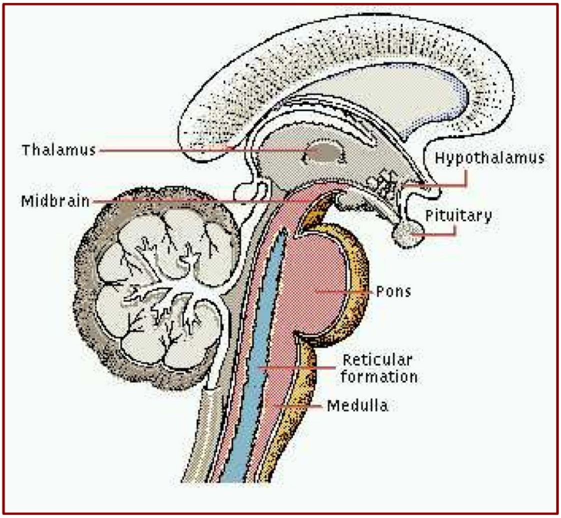
নিউরোগলিয়া (বা সাহায্যকারী টিস্যু) নামক কোষ ও রক্ত চলাচলের **(ভাসকিউলার)** টিস্যুসহ অন্যান্য কোষ।



আমাদের মগজের অন্যান্য অংশ: আমিগডালা: এই অংশ ভয় ও রাগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এছাড়া দেখে দেখে শেখা ও স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে এই অংশ বিশেষ অবদান রাখে। **মামিলারী বডিজ** (স্তনের বোটার মতো অংশ): এগুলোও আমাদের রাগ-গোস্বা, ইমোশন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এই সবগুলো অংশ মিলে **'লিমবিক সিস্টেম হয়েছে'**। এই সিস্টেমই আমাদের মধ্যে সৃষ্ট আবেগ, ক্ষুদা, পিপাসা, বেদনা, আনন্দ, যৌন ক্ষুদা, স্বার্থকতার অনুভুতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

পুরো মস্তিষ্ক রংহীন পরিষ্কার কিছু তরল পদার্থের মধ্যে ডুবন্ত আছে। এই বস্তুটির নাম হলো **'সেরেব্রস্পাইনাল ফ্লুইড'**। এর কাজ হলো মস্তিষ্ককে অভ্যন্তরীণ চাপ থেকে মুক্ত রাখা ও বিভিন্ন অংশে **রসায়নিক** বস্তু আদান-প্রদান করা। বাইর থেকে মস্তিষ্কের মধ্যে তিনটি বিশেষ অংশ পরিলক্ষিত হয় : **সেরেব্রাম** (এ শব্দটি লাতিন ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ হলো ব্রেন), দু' দিকের দু'টি বড় অর্ধ-গোলক দ্বারা এই অংশ সৃষ্ট; **সেরেবেলাম** (এর অর্থ ছোট্ট ব্রেন), সেরেব্রামের পেছনের দু'টি ছোট্ট অর্ধ-গোলক হলো এই অংশ; এবং **ব্রেন স্টেম** (মস্তিষ্কের কাণ্ড), এটার অবস্থান বা শুরু মগজের

অভ্যন্তর থেকে এবং তা নীচের দিকে যেয়ে মেরুদণ্ডের কোর্ডে রূপন্তরিত হয়েছে। মস্তিষ্কের আরোও দু'টো বিশেষ অংশ আছে। এদের অবস্থান ভেতরে উভয় সেরেবেলামের নীচে ও স্টেমের উপরে। এদের একটি হলো **থালামাস** আর অপরটি **হাইপোথালামাস**। আমাদের মগজ ও মেরুদণ্ডের কোর্ড মিলেই **সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম** ক্রিয়াশীল আছে। এই তন্ত্র ও প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্র মিলে পুরো দেহের সঙ্গে যোগাযোগ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের এই মূল ক'টি অংশকে আবার বেশ কিছু সাব-অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে জেনে নিতে ছবিগুলো দেখুন ও ক্যাপশন পাঠ করুন।



ব্রেন-স্টেমঃ এতে আছে তিনটি মূল অংশঃ **মেডোলা, পনস্ ও মিডব্রেন**। **মেডোলা** হলো নিম্নতম অংশ যার যোগসূত্র মেরুদণ্ডের কোর্ডের সাথে এবং এরই মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় বিভিন্ন কার্যাদি যেমন হার্ট ও ফুসফুসের **ফাংশন** নিয়ন্ত্রণ হয়। **পনস্** হলো শ্বেতবর্ণের বেশ কিছু **নার্ভে ফাইবার**। এগুলো রিলে স্টেশনের মতো কাজ করে- **সেরেব্রেল করটেক্স** ও মোডোলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা এদের প্রধান ডিউটি।

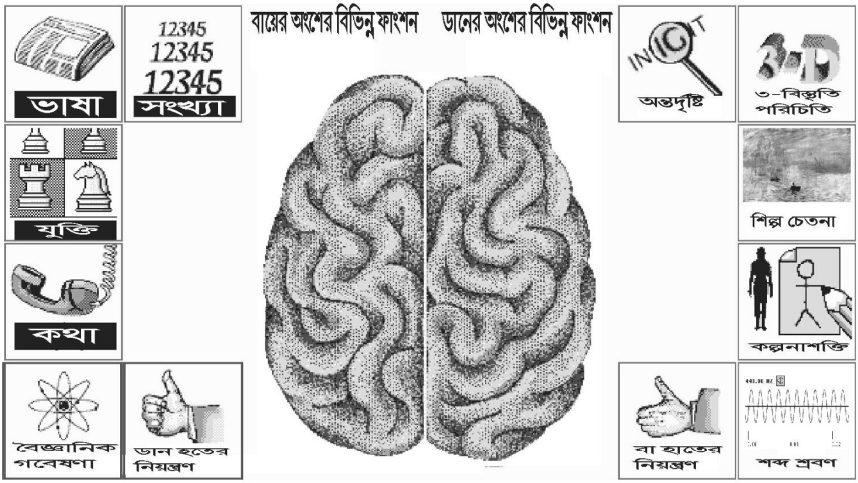
মস্তিষ্কের কোষ

কোষের সৃষ্ট পুরো দেহটি। ব্রেনও মূলত কোষের তৈরী। মস্তিষ্কে দু' ধরনের মৌলিক কোষ আছেঃ **নিউরন** কোষ ও **নিউরোগলিয়া** কোষ। পুরো **নার্ভাস সিস্টেম** ও ব্রেনের মধ্যে **ইলেকট্রিক** ও **কেমিকেল সিগনাল** আদান-প্রদান হয় নিউরনের মাধ্যমে। ব্রেনে প্রচুর **নিউরন** আছে সত্য কিন্তু তুলনামূলকভাবে দ্বিগুণ বেশী যে কোষ মগজে অবস্থান করে তার নাম হলো **নিউরোলগিয়া**। মস্তিষ্কের ওজনের অর্ধেক এই কোষগুলোর

মধ্যেই নিহিত। **নিউরোলগিয়া** অর্থ গাম বা গ□। এটা সকল **নার্ভ সেল** তথা নিউরনকে কাঠামোগত সাপোর্ট প্রদান করে।

মস্তিষ্কের কাজ

আমাদের জীবনচলার পথে মস্তিষ্ক প্রতি মুহূর্তে সীমাহীন কাজকর্ম করে যাচ্ছে। এই গ্রন্থে ওসব ব্যাপার বুঝিয়ে বলার সুযোগ আদৌ নেই। এছাড়া মগজের অনেক কাজ এখনও বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন নি। সুতরাং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়ার একটি দৃশ্যতঃ ছবি নীচে দেওয়া হলো। এ থেকেই পাঠকরা মগজের **ফাংশন** সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়ে যাবেন- এটাই আশা।



আমাদের মগজ ও এর বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম

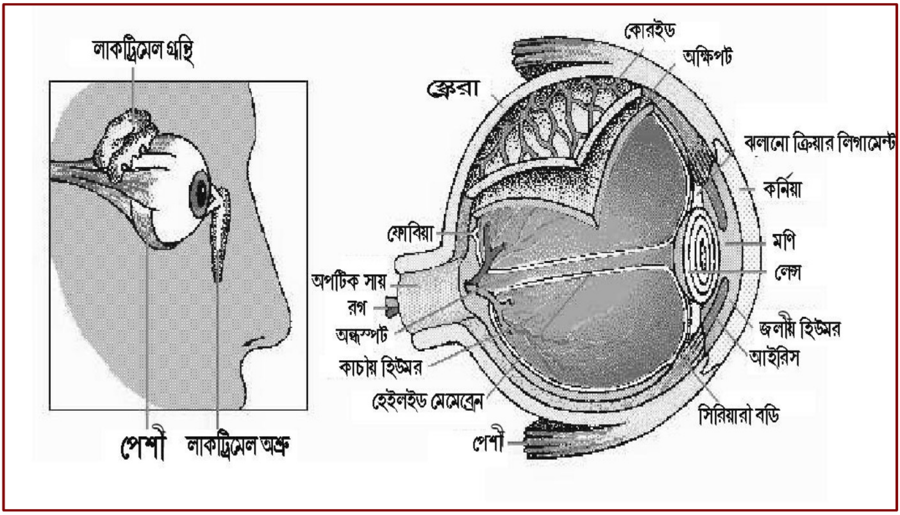
আমাদের মগজের দু'টি অর্ধ-গোলকের কাজ আলাদা। তবে সাধারণত **'বুদ্ধিসম্পন্ন'** কার্যাদি সকল ডানহাতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে (এবং আংশিক বাহাতিদেরও) প্রভাবশীল অংশ হলো মগজের বায়ের অর্ধ-গোলক। উল্লেখ্য অনেকের মতে **'ভাষা'** ও **'লজিক'** হচ্ছে আমাদের সবার মস্তিষ্কের প্রভাবশীল ক্রিয়া। এসব ব্যাপারে যে যতো বেশী সচেতন বা মেধাশীল সে-ই অপেক্ষাকৃত বেশী **'বুদ্ধিসম্পন্ন'** বলে বিবেচিত।

ইংরেজী শব্দ '**ভিশন**' এর একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ আছে। যেমন: দৃষ্টিশক্তি, দৃষ্টি, দর্শনশক্তি, কল্পনাশক্তি, দূরদৃষ্টি ও অন্তদৃষ্টি ইত্যাদি। আমাদের মগজের মধ্যে এই **ভিশন** ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া। এরই মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা বেশী তথ্যাদি আদান-প্রদান হয়। চোখ ছাড়াও মগজের ভেতর কিছু অংশ আছে যাদের একমাত্র কাজ হলো দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ- এই অংশকে সার্বিকভাবে '**ভিজ্যুয়াল করটেক্স**' বলে। ইন্দ্রিয়ের অংশ হিসাবে আমরা অবশ্য একটু পরই দৃষ্টিশক্তির প্রধান মাধ্যম আমাদের চোখ সম্পর্কে আলোচনায় যাচ্ছি।

স্মরণশক্তি হলো আমাদের মস্তিষ্কের আরেক অত্যাশ্চর্য তন্ত্র। এখনও এই তন্ত্র সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্যাদি জানা যায় নি। তবে মস্তিষ্কের কিছু অংশ খুঁজে পাওয়া গেছে যেগুলোর কাজ স্মরণশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হয়। যা হোক মস্তিষ্ক সম্পর্কে আপাতত এটুকু জেনে নেওয়াই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য মানবদেহের সার্বিক কার্যকারিতা ও বিভিন্ন **ফাংশন** নিয়ে আলোচনায় এমনিতেই মস্তিষ্ক ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের **রেফারেন্স** এসেছে। আর ইন্দ্রিয়ের উপর আলোচনায় তো অবশ্যই তা আসবে। এবার আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর কিছু অতিরিক্ত তথ্যাদি তুলে ধরবো।

চোখ

চোখ হলো দেখার ইন্দ্রিয়। এটা আসলে একটি **ক্যামেরা**। আলোকরশ্মির প্রতি এটা



সেনসিটিভ। চোখকে আমরা যদিও ইন্দ্রিয়ের একটি প্রধান **অরগ্যান** বা হেদযন্ত্র হিসাবেই দেখি- বাস্তবে **'দেখা'** জিনিষটা চোখের কাজ নয়। আমরা আসলে দেখি আমাদের মগজ দিয়ে। শুধু চোখের ক্ষেত্রেই কথাটি সত্য নয়- সব ইন্দ্রিয়ের ফাইন্যাল রেজাল্ট অনুভুত হয় আমাদের মস্তিষ্কে। এটুকু বলার পরও আমরা ইন্দ্রিয়ের প্রাইমারী যন্ত্র হিসাবে চোখ, কান, নাক ইত্যাদিকেই চিহ্নিত করবো।

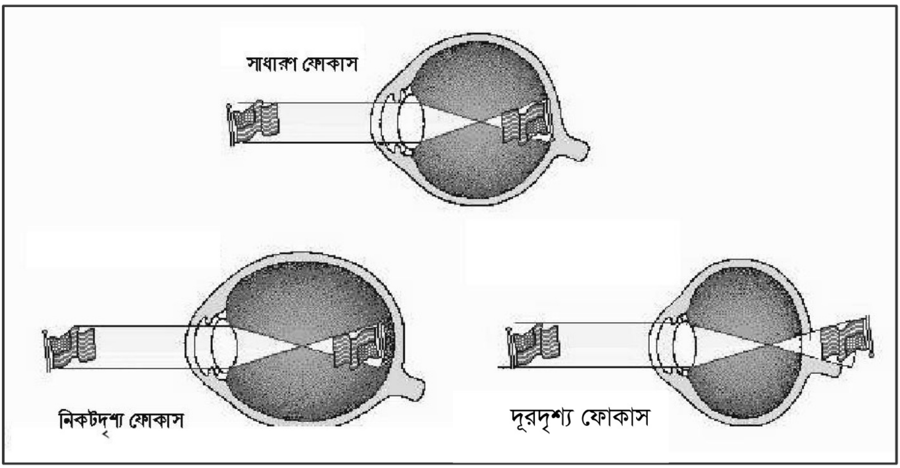
উপেরর (পূর্বের পৃষ্ঠার) ছবিতে আমরা চোখের গঠনপ্রণালী দেখতে পাচ্ছি। **পিউপল** বা মণি চোখের মধ্যে কতটুকু আলো প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা প্রয়োজনমাফিক ছোট-বড় হতেও সক্ষম। **কর্নিয়া ও লেন্স** মিলে আলোকরশ্মিকে পেছনের **রেটিনা** বা অক্ষিপটে পতিত করে। এই ক্রিয়াকে বলে **'ফোকাস'** বা **'মিলনবিন্দুতে পতিত'** করা। এটা জরুরী। আলোকরশ্মি যদি সঠিকভাবে **ফোকাস** না হয় তাহলে দৃশ্যটি পরিষ্কার হবে না। **ফোকাস** করা রশ্মি এবার রেটিনায় স্থাপিত **রিসেপটরসমূহ** (কোষ) **নার্ভ সিগনালে** পরিণত করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে দেয়। **কোরইড** নামক কিছু রক্তকোষ রেটিনায় থেকে **অক্সিজেন** ও চিনির যোগান দেয়। কাঁদার সময় অশ্রুতে চোখ ভিজে যায় এমনকি সময় সময় ফোটা ধরে কপোল বেয়ে পড়ে। দুঃখ ও অতিখুশী এই উভয়বিধ মানবিক অনুভুতি হেতু অশ্রু নির্গত হয়ে



থাকে। তবে অশ্রু থাকা চোখের জন্য এমনিতেই জরুরী। আর দুঃখ-খুশী সর্বাবস্থায় একটি গ্রন্থি এই অশ্রু তৈরীর কাজে নিয়োজিত আছে। এই গ্রন্থির নাম **'লাকরিমোল গ্লান্ড'**। **কর্নিয়া** যাতে শুকিয়ে না যায় এবং চোখটিতে সার্বক্ষণিক পানি রাখতে যেয়ে এই গ্রন্থিটি সর্বদা অশ্রু উৎপাদন করে। আমরা যেই মুহূর্তে চোখের পাতা বন্ধ করি ঠিক তখনই এই গ্রন্থি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এসময় পানি তৈরী হয়।

আমাদের চোখ দু'টো খুব কম সময়ই স্থির থাকে। এমনকি ঘুমান্তবস্থায়ও চোখ নড়াচড়া করে- স্বপ্নের মধ্যে এই নড়াচড়া খুব বেশী হয়। চোখের এই **ফ্লেক্সিবিলিটি** একান্ত জরুরীও। চোখ নড়াচড়া করতে বেশী অসুবিধা হলে সমস্যা হতো। আমাদের দেখার স্বাধীনতা অনেকটা সীমিত হয়ে পড়তো। সুতরাং চোখের নড়াচড়া স্বাধীনভাবে অল্প পরিশ্রমে যাতে সম্ভব হয় সেজন্য এক-দুটো নয়, ৬টি পেশী একত্রে কাজে নিয়োজিত আছে। উপরের ছবিতে ব্যাপারটি দেখানো হয়েছে। এই ছ'টি **মাসুল** চোখের বলের সঙ্গে লাগানো। চারটি সোজাসুজিভাবে এবং দু'টি বাঁকাবস্থায় থাকায়, সবগুলো পেশী মিলে চোখের নড়াচড়ায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছে। উভয় চোখ যাতে একই বস্তুর উপর সঠিকভাবে **ফোকাস** হয় সেক্ষেত্রেও এই পেশীগুলো কাজ করে থাকে।

আমরা ইতোমধ্যে কয়েকবার **ফোকাস** শব্দটির কথা বলেছি। সঠিক **ফোকাস** ছাড়া বস্তু পরিষ্কারভাবে দেখায় না। সুতরাং **ফোকাস** একটি অতি জরুরী কার্য এবং তা নিয়ন্ত্রণ



করে চোখের **লেন্‌স**। হ্যাঁ, চশমার কাচের তৈরী লেন্‌স ও চোখের লেনসের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। বরং চশমারটি চোখেরটিকে সঠিক করার জন্য ব্যবহৃত হয়। চোখের লেনস যদি আলোককে সঠিকভাবে **ফোকাস** না করে তখনই সঠিককরণের জন্য চশমার লেনস দরকার পড়ে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন চোখে রেটিনার মধ্যে সঠিক স্থানে আলোকরশ্মি **ফোকাস** হবে। কিন্তু চোখের বলটি যদি অতিরিক্ত লম্বা হয়- যার ফলে লেনসের আয়তনে তারতম্য ঘটে, তাহলে রেটিনার পেছনে না যেয়ে **ফোকাস** আগে হবে। এর ফল দাঁড়াবে **'শর্ট-সাইটেড'** বা **'নিকটদৃষ্টি-স্বচ্ছল'**। এরূপ চোখবিশিষ্ট কেউ কাছের জিনিষ পরিষ্কার দেখবে কিন্তু দূরেরটা অপরিষ্কার লাগবে। একইভাবে চোখের বলটি অতিরিক্ত চাপা হলেও ঐ ব্যক্তি হবে **'লং-সাইটেড'** বা **'দূরদৃষ্টি-স্বচ্ছল'**। সে দেখবে কাছের জিনিষ অস্পষ্ট কিন্তু দূরেরটা স্পষ্ট। শুধু চোখের অবস্থা বা আয়তন নয়, একই ধরনের সমস্যা দাঁড়াতে পারে যদি চোখের **মাসুল** লেনসের সাইজ পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়। কৃত্রিম উপায়ে এরূপ সমস্যার সমাধান হয়- যা ইতোমধ্যে বলেছি।

রাতেরবেলা সঠিকভাবে দেখার জন্য শরীরে **ভিটামিন-এ** যথেষ্ট থাকা জরুরী। এর অভাবে **'রাতকানা রোগ'** হতে পারে। চোখের **সেনসিটিভিটি** আলোকের তীব্রতার সাথে রদবদল হয়। কেউ যখন সূর্যালোক থেকে হঠাৎ অন্ধকার কোন কক্ষে ঢুকবে তখন প্রথমে কিছুই দেখতে পাবে না- তবে কিছুক্ষণ পরে সবকিছু আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে ওঠবে। এক ধরনের রং যাকে **'ভিজ্যুয়েল পারপুল'** বলে এই ক্রিয়ার জন্য দায়ী। আর ভিজ্যুয়েল পারপুলের জন্য দরকার **ভিটামিন-এ**।

আমাদের চোখ ও মগজ একই সাথে কাজ করে বাইরের জগতের ছবি অবলোকন সম্ভব করেছে। এই অবলোকনকে আমরা দৃষ্টি বা **ভিশন** বলি। সুতরাং দৃষ্টি হলো চোখ-মগজের দ্বৈত কারসাজি। এবার আমরা এই দৃষ্টি কিভাবে মগজে **'দেখা'** যায় সে ব্যাপারে কিছু চিত্তাকর্ষক তথ্য তুলে ধরছি।

মনে করুন আপনি একটি ফুলের দিকে তাকাচ্ছেন। প্রথমতঃ চোখগুলোর ফুলের প্রতি নিবদ্ধকরণ ক্রিয়া বা তাকানো মগজে সৃষ্ট **সিগনাল** থেকে এসেছে। কারণ আপনি এটা ইচ্ছে করেছেন। অপূর্ব সুন্দর এই ফুলটি দেখে আপনি সত্যিই অভিভুত- কী চিত্তাকর্ষক স্বভাবের কারসাজি! তবে এই সুন্দরকে অবলোকন করতে যেয়ে আপনার

চোখ ও মস্তিষ্ক কি করছে তা শ্রবণ করুন। ফুলটির উপর সূর্যালোক পতিত হওয়ায় উচ্চগতিতে তা প্রতিবিম্বিত হয়ে আপনার চোখে এসে পৌঁছেছে। আলোকরশ্মিকে ধরে রেখে সঠিকভাবে ফোকাসে আনতে চোখের **কর্নিয়া, আইরিস, পিউপিল** ও **লেন্স** একত্রে কাজ সেরে রেটিনার উপর নিয়ে পতিত করে। রেটিনার কেন্দ্রে একটি জায়গা আছে যাকে **'মাকুলা'** বলে। এই এরিয়াটি মাত্র ০.০৬ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। ফুলের আলোকরশ্মিটি ঠিক এই মাকুলার ভেতরে পতিত হলে আপনি এটিকে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবেন।

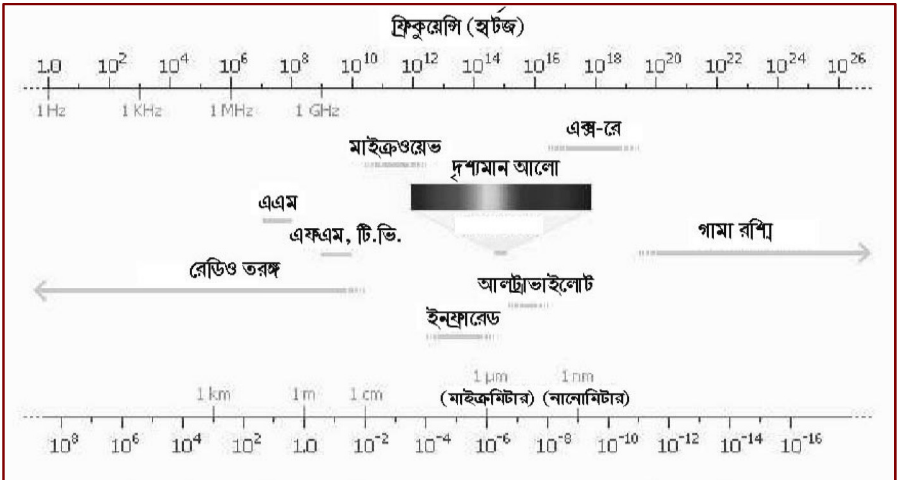
রেটিনা দুই ধরনের কোষ বা **সেল** দ্বারা সৃষ্ট। এর একটি দেখতে কৌণের মতো এবং অপরটি রড সদৃশ। কৌণগুলো আলোকরশ্মি (উজ্জ্বলতা) ও রং (লাল, নীল ও সবুজ) **সেনসিটিভ**। আর রডগুলো আলোকরশ্মির অনুজ্জ্বলতার প্রতি **সেনসিটিভ**। মেকুলায় কৌণ কোষের সংখ্যা অধিক- তাই আমরা অতি ক্ষুদ্রকায় বস্তুও ভালোভাবে দেখতে সক্ষম। আর এগুলো যে রং দেখার জন্যও দায়ী তা-তো আগেই বলেছি। রড কোষগুলোর ফলে আমরা রাতের বেলায়ও দেখতে পাই। এছাড়া এগুলোর কারণেই বস্তুর মধ্যে গতি পরিলক্ষিত হয়। রড কোষে রংয়ের কোন অর্থ নেই- সে এটা কি বুঝে না। তার নিকট জগতটা সাদাকালো। এ কারণেই অল্প আলোতে আমরা বেশি রং দেখিনা- এসময় রড কোষগুলো চোখের রেটিনায় বেশি এক্টিভ থাকে।

এবার ফুলের কথায় ফিরে আসি। চোখের লেনস ফুলের ছবিটি উল্টিয়ে নিয়ে রেটিনায় পতিত করবে। কিন্তু পরে এটা আমাদের মগজ **'দেখার'** সময় পুনরায় উল্টিয়ে সঠিক করে দেয়। রেটিনায় **ফোকাস** হওয়ার পর রড আর কৌণ কোষগুলো মগজে **নার্ভ সিগনাল** প্রেরণ করে। অবশেষে এই সিগনালগুলোকে মগজের **ভিজ্যুয়েল করটেক্স** গবেষণা করে ফুলটিকে তার পূর্ণ কান্তি ও শ্রীসহ আমাদের অনুভুতিতে **'দেখিয়ে'** দেয়- অর্থাৎ আমরা এটা দেখি। তবে মজার ব্যাপার হলো ঠিক যেভাবে দেখি তা কেন দেখি, এ প্রশ্নের জবাব কেউ জানে না। মগজ আগত আলোকরশ্মি থেকে সৃষ্ট **নার্ভাস** সিগনালকে যেভাবে **'এ্যানালাইজ'** করবে আমরা ঠিক সেভাবেই দেখবো- বেশিও নয় কমও নয়, অবার অন্যরকমও নয়। ওহ, আরেক কথা- আমাদের চোখ দু'টো যে কোন বস্তুর প্রতি একই সঙ্গে তাকায়। এ কারণে আমরা বস্তুকে শুধু দেখি না- এর দূরত্ব ও গভীরতাও দেখি। একে **৩-ডি ভিশন** বলে, অর্থাৎ **'তিন-বিস্তৃতি'** দৃশ্য। এরূপ দেখার কারণ হলো চোখের মধ্যে দূরত্ব। আমরা বস্তুটি কিছুটা ভিন্ন কোণ থেকে দেখি। এতে

দূরত্ব ও গভীরতার অনুভুতি জন্মে। সকল জন্তুর চোখ এরূপ **‘স্টেরিওস্কোপিক’** নয়। পাখি, মৎস এবং সর্পের ভিশনকে বলে **‘মনোকিউলার’** বা একচোখা। কারণ ওরা দেখার সময় বস্তুর প্রতি এক চোখে তাকায়- অপরটি তখন অন্য বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করে। তাদের চোখ দু'টোও মাথার দু'প্রান্তে অবস্থিত।

দেখার ব্যাপ্তি

আলেকরশ্মির মাধ্যমে আমরা দেখে থাকি- একথা অনেকবার বলেছি ঠিকই। তবে আলোকরশ্মি মূলত **‘ইলেকট্রমেগনেটিক’** তরঙ্গের একটি অংশ মাত্র। এই তরঙ্গের মানব চোখে দৃশ্যমান অংশটুকু দ্বারাই ৭টি রং বিশিষ্ট **‘দৃশ্যমান আলোক’** সৃষ্ট। পুরো **‘ব্যাপ্তি’** কিন্তু বিরাট। এর একপ্রান্তে **রেডিও** তরঙ্গ আর অপরপ্রান্তে **গামা-রে** বিদ্যমান (দেখুন নীচের চিত্রটি)। আমরা এই পুরো **‘স্পেকট্রামের’** অতি অল্প একটি অংশ দেখতে পাই মাত্র। কোন কোন জীব-জন্তু আছে যাদের চোখে রড কোষের মাত্রা বেশী হওয়ায় অন্ধকারেও দেখতে পারে। এরূপ একটি জলদ জন্তু হলো **ডলফিন**। তার চোখে ৭ হাজার গুণ বেশি রড কোষ আছে। সুতরাং গভীর জলেও সে দেখতে সক্ষম।



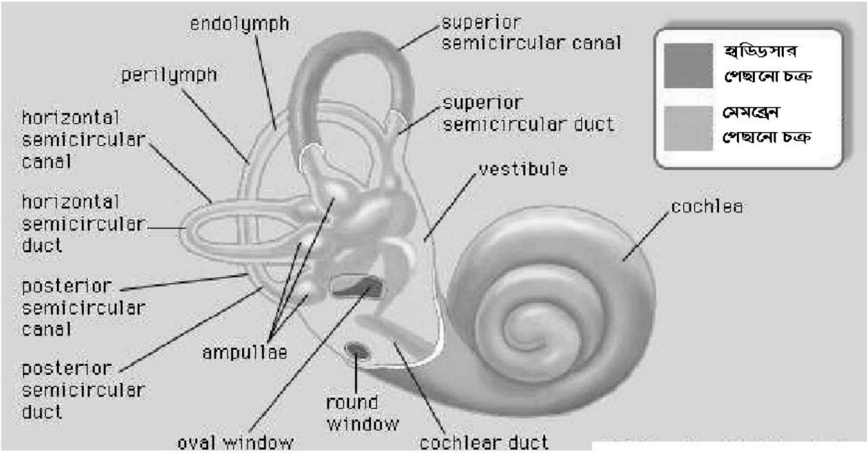
ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রামে দৃশ্যমান আলো ও অন্যান্য রশ্মির ব্যাপ্তি

আপনি জানেন কি ঃ চোখের ভেতর রেটিনার মধ্যে একটি ছোট্ট অংশ আছে যেখানে **আলোক-সেনসিটিভ** কোন কোষ নেই। সুতরাং এখানে আলো পতিত হলে কিছুই দেখা যাবে না। এই স্পটকেই বলে **'ব্লাইন্ড স্পট'** বা 'অন্ধ-বিন্দু'। সুতরাং আমরা যখন দেখার কোন বস্তু দেখি না, তখন বুঝতে হবে বস্তুটি থেকে আগত আলোকরশ্মি চোখের অন্ধ-বিন্দুতে পতিত হয়েছে।

কর্ণ

শ্রবণশক্তির **অরগ্যান** হলো কান- এটা তো আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তবে ঠিক কিভাবে এই ইন্দ্রিয়টি কাজ করে তা তলিয়ে দেখার বিষয় বৈকি। আবারও বলতে হবে- আসল শোনার কাজটি কর্ণ দ্বারা হয় না বরং তা আমাদের মগজ আঞ্জাম দেয়। তবে কর্ণ হলো শোনার প্রাথমিক যন্ত্র। বাইর জগত থেকে আগত শব্দ-তরঙ্গ কর্ণে প্রবেশের পর তা বিভিন্ন কারসাজির মাধ্যমে **'ইলেকট্রকেমিক্যাল'** সিগনালে রূপান্তর করে মগজে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কানের ডিউটি।

কানের গঠনপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য করলে আমরা তিনটি আলাদা অংশ দেখতে পাই- বাইরের, মাঝের ও ভেতরের অংশ। বাইর অংশের কাজ হলো শব্দ-তরঙ্গকে সংগ্রহ করে **'ইয়ারড্রাম'** পর্যন্ত পৌঁছানো। মঝের অংশে তিনটি বিশেষভাবে তৈরী হাড্ডি আছে। এগুলো নাম হলো **'হামার'** (হাতুড়ি), **'এ্যানভিল'** (কামারের নেহাই) ও **'স্টিরাপ'** (বাংলা প্রতিশব্দ নেই!)। এসব কাল্পনিক ও কিছুটা হাস্যকর নামের সঙ্গে হাড্ডিগুলোর ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে কিন্তু। এদের কাজ, সবে মিলে শব্দতরঙ্গকে **'মিড্‌লম্যান'** সেজে বাইর কর্ণ থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় ঘষামাজা সেরে ভেতরের অংশে পৌঁছে দেওয়া। ভেতরের অংশকে আদি যুগ থেকেই **'লাবিরিন্থ'** (শব্দটি কোন সর্পিল পথের ভয়ঙ্কর মিলনপথ- এই সংজ্ঞা দিয়ে বাংলা একাডেমী বুঝাতে চেয়েছেন! প্রতিশব্দ বাংলায় নেই।) বলা হয়ে থাকে।



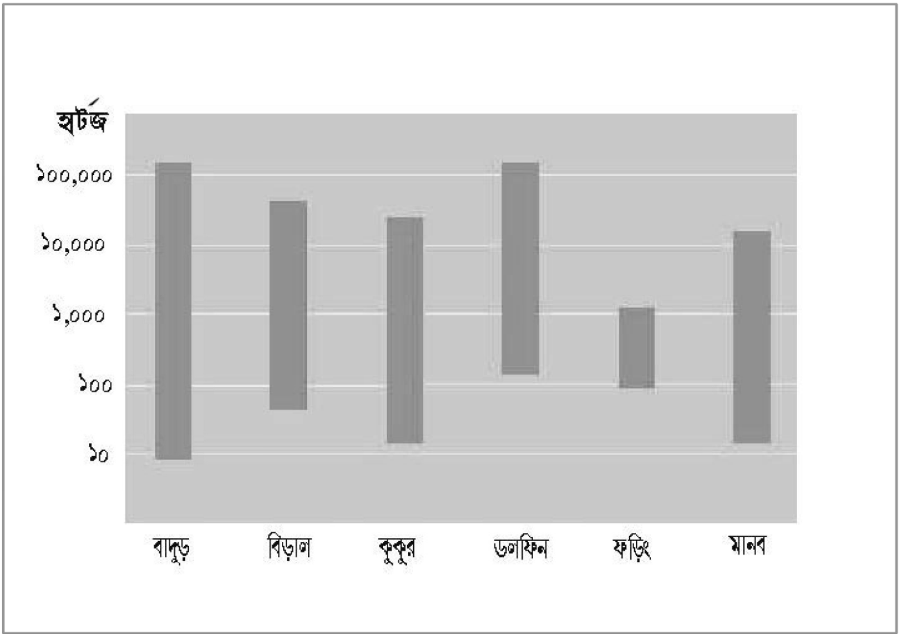
বাস্তবে ভেতরের অংশে দু'টি **লাবিরিন্থ** আছে। এর একটি অপটির ভেতরে অবস্থান করে। ভেতরের কর্ণে তিনটি মৌলিক বস্তু আছে: **ককলিয়া, ভেস্টেবিউল** ও তিনটি দেখতে অর্ধ্ববৃত্তের মতো **কানাল** বা নল। ককলিয়া দেখতে অনেকটা শামুকের খোসার মতো পাকানো- এ কারণেই এটিকে **ককলিয়া** বলে- এর অর্থই এটা। এই শেলের ভেতর তিনটি অংশে কিছু তরল পদার্থ আছে। এর একটি অংশ আলাদাকরণের স্থানে বাঁকানো আকারের গুরুত্বপূর্ণ এক **অরগ্যান** আছে- এর নাম **করটি**। এই **করটি** নামক যন্ত্রটিই শব্দতঙ্গ সংগ্রহ করে **অডিটোরী নার্ভের** মাধ্যমে মগজে **সিগনাল** প্রেরণ করে। এরপর আমরা শব্দটি শোনতে পাই। এতো **গেল** ককলিয়ার কাজ। তবে এখানেই শেষ নয়, কান শুধু শব্দ শোনে না- এটির আরো দু'টি **ফাংশন** আছে যা আমাদের জন্য একান্ত জরুরী।

কর্ণকুহরের ভেতর অংশের দ্বিতীয় বস্ত তথা **ভেস্টেবিউল** আমাদের ব্যালান্স-ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ আমরা হাঁটছি, বসছি না ঘুমোচ্ছি কিংবা অন্য কোন অবস্থায় আছি তা নির্ণয় করে কিছু বিশেষ **সিগনাল** মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, ব্যালান্স রক্ষা হলো এই বস্তুর ডিউটি। মনে করুন আপনি মাথাটিকে সোজা করে রেখেছেন। এই অবস্থা বজায় রাখতে যেয়ে মগজ থেকে কিছু নির্দেশ ঘাড়ের পেশীতে আসতে হবে। তবে এভাবে অবস্থান যে আপনি করেছেন তা প্রথমে **ভেস্টেবিউল** মগজকে জানিয়ে দেয়। মগজ এই তথ্য জেনে সাথে সাথে উপযুক্ত নির্দেশ ঘাড়ের পেশীর প্রতি পাঠিয়ে দেয়। ব্যাপারটি এরকম।

তৃতীয় বস্তুত্রয় নলগুলোর কার্যও একই ধরনের। এরা দেহের ব্যালান্স **মনিটর** করে। আপনি লাফ দিচ্ছেন না মহাকর্ষের প্রভাবে মাটিতে পতিত হচ্ছেন, সোজা না বাঁকা রাস্তায় হাঁটছেন, দৌড়াচ্ছেন না দাঁড়িয়ে আছেন ইত্যাদি নলের ভেতরের তরল পদার্থের অবস্থান পরিবর্তন দ্বারা চিহ্নিত হয়। আপনি নিশ্চয় **স্পিরিট লেবেল** দেখেছেন। বিল্ডিং মিস্ত্রিরা এটা দ্বারা ইট-পটকেল ও পিলার ইত্যাদি সোজা না বাঁকা আছে তা নির্ণয় করেন। বর্ণিত কর্ণের নলগুলোও ঠিক এভাবে সোজা-বাঁকা নির্ণয় করতে যেয়ে ভেতরের তরল পদার্থের পরিবর্তন **মনিটর** করে। এর ফলে প্রয়োজনীয় **সিগনাল** মগজে পাঠানোও সম্ভব হয়। সুতরাং চলাফেরার **সেন্স** মগজে সৃষ্টি হওয়ার পর কোন অপ্রীতিকর অথবা অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাকে সঠিককরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেহপেশীতে মজগ নির্দেশ পাঠায়। ব্যাপারটা এরকম।

শোনার ব্যাপ্তি

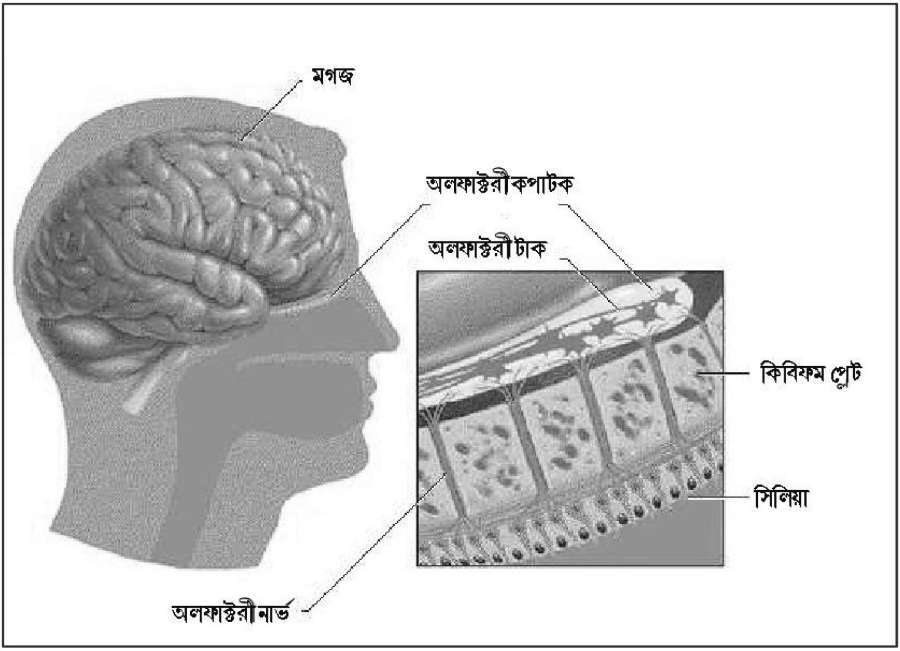
মানুষের কর্ণ দ্বারা শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। অর্থাৎ শব্দতরঙ্গ একটি বিশেষ রেঞ্জের ভেতর থাকতে হবে। এই রেঞ্জ বা ব্যাপ্তি যা **হার্টজ্ ইউনিট** দিয়ে মাপা হয়, এর ভেতর আমাদের কর্ণ **সেনসিটিভ**- বাইরে হলে কান দ্বারা শব্দতরঙ্গ শোনা যায় না। নীচের নক্সায় মানুষ ও অন্যান্য কিছু জীব-জন্তুর শোনার রেঞ্জ দেওয়া হলো।



আপনি জানেন কি ঃ সর্পের কোন কান নেই। সুতরাং বাতাসে ভাসমান কোন শব্দই তারা শোনতে পায় না। তবে মাটির মধ্যে সৃষ্ট শব্দ বা কম্পন তারা শোনতে পায়- অর্থাৎ মগজে অনুভুত হয়। সুতরাং সর্পের নিটক দিয়ে চিল্লাচিল্লি করে যেতে পারেন কোন অসুবিধা নেই- কিন্তু মাটিতে কোন শব্দ সৃষ্টি করতে পারবেন না!

নাসিকা

আমাদের নসিকা একাধিক কর্মে নিয়োজিত আছে। এটা দ্বারা আমরা শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করি, কথাবলার ক্ষেত্রে মুখের সাথে নাকও সাহায্য করে এবং এটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি- অর্থাৎ গন্ধ পাওয়া-নেওয়ার যন্ত্র। এ ক'টি কথায় কোন নতুন তথ্য নেই। এসব ব্যাপার সবাই জ্ঞাত। নাকের শ্বাসক্রিয়া সম্পর্কে আর অতিরিক্ত কিছু এখানে বলবো না। তবে গন্ধ পাওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে নাক সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি যেগুলো হয়তো সবার জানা নয়।

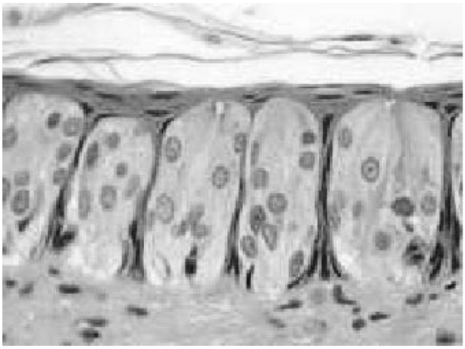


নাকের মধ্যে কিছু বিশেষ **নার্ভ** বা স্নায়ু কোষ আছে যাদের নাম হলো **'অলফাক্টরী নার্ভস্'** (উপরের ছবিটি দেখুন)। এই নার্ভগুলো বস্তুর মধ্যকার গন্ধকে বিভিন্নভাবে **সিগনাল** হিসাবে মগজে পাঠিয়ে দেয়। এরপর আমরা গন্ধ পাই। বিজ্ঞানীরা এখনও গন্ধকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করেন নি। তবে গবেষণা থেকে জানা গেছে ৭টি ভিন্ন মৌলিক গন্ধ আছে। এ গন্ধগুলোর সূত্র হলোঃ **১. কর্পুর, ২. মৃগনাভী, ৩. ফুল, ৪. পুদিনা (মিন্ট), ৫. ইথার (কেমিক্যাল জাতীয় বস্তু), ৬. শিরকা ও ৭. পচা**। এই ৭টির মধ্যে একাধিক গন্ধ মিলে অন্যান্য গন্ধ সৃষ্টি হয়। **অলফাক্টরী নার্ভ** কোষ নাকের মাধ্যমে বাসাতের সঙ্গে টেনে নেওয়া গন্ধের মলিকিউলের সাথে **রিয়েকশন** করে, এরপর **নার্ভ সিগনাল** মগজে পাঠিয়ে দেয়। এভাবেই আমরা গন্ধ উপলব্ধি করি। কোন বস্তুর স্বাদও গন্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জিহ্বার স্বাদ **পাওয়ার** সময়ও অলফাক্টুরীতে যেয়ে ঐ বস্তুর গন্ধ পৌঁছে। এর ফলে আমরা বস্তুটি স্বাদে-গন্ধে উপলব্ধি করি।

আপনি জানেন কি ঃ বিশেষ ধরনের কিছু কুকুর আছে যাদের গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা মানুষ থেকে আলাদা ও শক্তিশালী। এরূপ কুকুরের মধ্যে **জার্মান শেপার্ড** নামক একটি কুকুর আছে। এই কুকুরটি **'ডগ স্কোয়ার্ড'** এর সদস্য হিসাবে পুরো বিশ্বব্যাপী পুলিশবাহিনী ব্যবহার করে থাকে। এরূপ কুকুরকে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। এরা গভীর জলে পচেগলা লাশ, লুকানো মাদকদ্রব্য, বোমা ইত্যাদি গন্ধের সাহায্যে সনাক্ত করতে সক্ষম।

স্বাদ

একই মাটিতে পাশাপাশি আমগাছ ও আমড়াগাছ গজে উঠে, অথচ আমের ফল মিষ্টি ও আমড়া টক। ভাতের মধ্যে থাকে আলু, মূলা, লাউ ও আরো কতকিছু। খাবার মুখে দেওয়ার পর সহজেই বুঝা যায় কোনটি আলু আর কোনটি মুলা, আর কোনটি অন্যকিছু। হ্যাঁ, আমি অবশ্য স্বাদ নামক ইন্দ্রিয়ের কথা বলছি। স্বাদে-গন্ধে খাবারের



মধ্যে মজা। তবে এই মজা কিভাবে আপনি আমি অনুভব বা উপলব্ধি করি? নিশ্চয়ই এটা জিহ্বার কাজ- তাতো সবাই জানি। বিজ্ঞান কিন্তু এটুকুতে সন্তুষ্ট নয়- গভীরে যেয়ে এই ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি ঠিক কিভাবে মগজের মধ্যে পয়দা হয়, সেটাও বুঝতে চায়। আসুন তাহলে বিজ্ঞানের ভাষায় স্বাদের আসল স্বরূপ জেনে নিই।

স্বাদের মূলে চারটি মাত্র উপাদান বিদ্যমান: **মিষ্ট, তিক্ত, লবণাক্ত ও টকযুক্ত**। এ চারটির একাধিক মিলে শত ধরনের স্বাদ আমাদের ইন্দ্রিয়ে অনুভব করি। একটু মিষ্টি ও একটু লবণ এসাথে সামান্য টক- হয়ে **গেল** স্বাদের চাটনি। আমাদের জিহ্বায় কিছু **'রিসেপটর'** বা স্বাদ পাওয়ার ছোট্ট ছোট্ট অঙ্কুর আছে। এদেরকে ইংরেজীতে **টেইস্ট বাড্স** বলে। কার জিহ্বায় কতটি কোন্ আয়তনের **বাডস** আছে তার উপর নির্ভর করে কোনো দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা। হ্যাঁ, সবার জিহ্বায় বাডের সংখ্যা সমান নয়। দেখাগেছে, মহিলাদের জিহ্বায় সাধারণত বেশি বাড থাকে। সুতরাং কোন মহিলা যদি

খাবার খেয়ে সুস্বাধু বলে, তাহলে সেটা মানা যায়। হয়তো এ কারণেই বিশ্বব্যাপী রন্ধনের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারাই আঞ্জাম দিচ্ছেন।

জিহ্বার উপরে ও উভয় সাইডে স্বাদ-বাড আছে। এছাড়া মুখের তালু ও অন্ননালীর পূর্ব পর্যন্ত মুখগহ্বরেও স্বাদ-বাড বিদ্যমান। তবে সব স্থান থেকে সব ধরনের স্বাদের **সিগনাল** মগজে যায় না। যেমন জিহ্বার সামনের মাথা থেকে যায় মিষ্টি স্বাদের সিগনাল, সাইড থেকে যায় লবণাক্ততা ও টক স্বাদের সিগনাল। এছাড়া ভেতর (পেছন) থেকে যায় চতুর্থ স্বাদের **সিগনাল** তিক্ততা। প্রতিটি বাডের নীচে ছোট্ট ছিদ্র আছে যেখান দিয়ে স্নায়ু কোষ প্রবেশ করেছে। সুতরাং বাড থেকে স্নায়ুকোষের মাধ্যমে **সিগনাল** মস্তিষ্কে যেয়ে পৌঁছে। স্বাদ পেতে হলে কিন্তু লালার প্রয়োজন। প্রতিটি বস্তু লালা দ্বারা সিক্ত হতে হবে। সুতরাং জিহ্বার বাড, লালা এবং গন্ধ নেওয়া এই তিনটি উপাদান সঠিকভাবে থাকলে মুখে স্বাদ মিলবে।

ত্বক

পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে ছোঁয়ার অনুভুতি মূলত ত্বক বা চামড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের শরীরের চামড়ায় অসংখ্য **নার্ভ** কোষ আছে। ওগুলো মগজের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। সুতরাং কোন বস্তু শরীরে লাগলেই তার অনুভুতি আমাদের মগজে জাগ্রত হয়। তবে ছোঁয়াসহ যাবতীয় ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভুতি কিন্তু বুঝা যায় যে স্থান থেকে **নার্ভ সিগনাল** এসেছে সে স্থানে। অর্থাৎ ব্রেনই জানিয়ে দেয় অনুভুতিটা কোথায় হতে হবে। সুতরাং কেউ যদি আপনার সঙ্গে মুসাহাফা করে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার হাতে অপরের হাত রাখা হয়েছে। অনুভুতিটা হাতেই বুঝবেন- ব্রেনে নয়। আশারাখি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে।



আমাদের দেহের চামড়ার বাইরদিকে **'এপিডারমিজ'** নামক একটি নিরাপত্তামূলক স্তর আছে। ভেতরের স্তরকে বলে **'ডারমিজ'**। **এপিডারমিজ** স্তরের ভেতর বা শেষে স্নায়ুগুলোর শেষ। সুতরাং চামড়ায় ছোঁয়া লাগলেই ওসব স্নায়ু জ্যান্ত হয়ে ওঠে ও ছোঁয়ার **সিগনাল** ব্রেনে পাঠিয়ে দেয়। আপনি যদি সম্পূর্ণ অন্ধকারে কোন বস্তুতে হাত দেন আর তার সঠিক আকার বুঝতে সক্ষম না হোন তাহলে সেটা কোন্ জিনিস তা কিছুতেই ধরতে পারবেন না। কিন্তু বস্তুটি কতটুকু ঠাণ্ডা কিংবা উষ্ণ তা অবশ্যই জানবেন। ছোঁয়ার মাধ্যমে তাই আমরা বস্তুর তাপ জানতে পারি মাত্র। অবশ্য আকারও জানা যায়- যদি জানার মতো পরিমাণ এরিয়া আমাদের হাতের ছোঁয়ার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ একটি বলকে চোখ বুজে ধরলেও আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন- এটা একটি বল। বস্তুর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এরিয়া যে ছোঁয়ায় না আসলে বস্তুটি কি হতে পারে তা সঠিকভাবে বলা যায় না, তার জন্য আপনি একটি পরীক্ষা করে নিতে পারেন। আপনি চোখ বন্ধ করে হাতের তালুতে একটি লাঠি রাখুন। লাঠির একপ্রান্তের সামান্য অংশ আপনার হাতের তালুতে শুধু লেগেছে- ফলে আপনি জানেন না এটা লাঠি কি না। এবার মুষ্টিবদ্ধ করে লাঠিটিকে ধরুন- এখনও চোখদুটো বন্ধ। এবার আপনি অনায়াসে বুঝতে পারবেন- এটি একটি লাঠি কিংবা এই জাতীয় কিছু হবে। সুতরাং ছোঁয়া যখন যথেষ্ট হয় তখন সবগুলো স্নায়ু শিরা মিলে যে **সিগনাল** ব্রেনে প্রেরণ করে সে থেকেই আমরা বস্তুটির আকার জানতে পারি- আর একই ধরনের

বস্তুর আকারের একটি চিত্র আমাদের মগজে আগে থেকে সংরক্ষিত থাকায় আমরা সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বস্তুটি **'চিনতে'** সক্ষম হই।

ইতোমধ্যে আমরা মনুষের মৌলিক পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর কিছু অতিরিক্ত আলোচনা করেছি। আশাকরি এ থেকে পাঠকরা বেশ কিছু অতিরিক্ত বিষয় জানতেও পেরেছেন। তবে প্রথমেই বলেছি ইন্দ্রিয় এই পাঁচটি মাত্রই নয়- বিজ্ঞনীরা ১৫টির অধিক ইন্দ্রিয় সনাক্ত করেছেন। আমরা কিছু সচরাচর শোনা এরূপ কিছু ইন্দ্রিয়ের উপর এখন তথ্যাদি তুলে ধরবো।

বুদ্ধি

আমরা অবশ্য বুদ্ধি ও জ্ঞান শব্দদ্বয় সম্পর্কে সর্বদাই শোনি ও পড়ে থাকি। তবে জ্ঞান ও বুদ্ধি কিন্তু একই জিনিষ নয়। অনেকের মতে বুদ্ধি বা **ইন্টেলিজেন্স** মানুষের স্বভাবজাত গুণ- অর্থাৎ জন্মগত ব্যাপার। আর জ্ঞান অর্জনের বস্তু। বুদ্ধি দিয়েই কিন্তু এই অর্জন সম্ভব। বুদ্ধি না থাকলে জ্ঞানবান হওয়া যায় না- বা বুদ্ধি না খাটালে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তাহলে বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া যায়? আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, **'মন দিয়ে যুক্তিকে অনুধাবনের সামর্থ, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, বিমূর্ত চিন্তাক্ষমতা, নতুনকে জানা ও চেনার সামর্থ এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সুফল গ্রহণের ক্ষমতার নাম বুদ্ধি'**। এই সংজ্ঞাটি কিন্তু সম্পূর্ণ নয়- বাস্তবে সঠিক ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা এখনও কেউ দিতে পারে নি। আসলে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে বুদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। একবার এক সাময়িকীতে বুদ্ধি সম্পর্কে ২৫ জন বিজ্ঞানীর মতামত প্রকাশ হয়েছিল। তাদের মতামতের লিস্ট ছিল এরূপ: ১. চিন্তার মধ্যে নতুনত্ব, স্বাধীনতা ও প্রগতিশীলতা থাকা; ২. জ্ঞানার্জনের ধারণক্ষমা; ৩. অর্জনের জন্য অর্জনক্ষমতা থাকা; ৪. সম্পর্ক বুঝার ক্ষমতা; ৫. ভাল-মন্দ বিচারক্ষমতা; ৬. জ্ঞানার্জনের জন্মগত ক্ষমতা থাকা; ৭. পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা; ৮. জীবনচলার পথে নতুন সমস্যামাফিক নিজের চিন্তা-চেতনাকে বদলানোর ক্ষমতা; ৯. বিমূর্তভাবে চিন্তার ক্ষমতা এবং ১০. যে কোন ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা।

উপরোক্ত ১০টি ভিন্ন মতামত থেকেই এটা প্রমাণ হয়েছে যে, বুদ্ধি নামক মানবিক গুণাবলী একটি ব্যাপক ব্যাপারকে বলে। এটাই মানুষকে অপর সকল জন্তুর তুলনায়

শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। সাধারণ পাবলিকের নিকট বুদ্ধির ধারণা বা বুঝ কিন্তু আরো ব্যাপাক ও চওড়া। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মনোবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, শিক্ষক প্রমুখ **'এক্সপার্ট'** গুণিজন যেভাবে বুদ্ধিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তা সাধরণ্যের তুলনায় ভিন্ন। জনসাধারণ প্রায়ই ওদেরকেই বুদ্ধিমান বলে যারা **'চালাক'** (আর এই চালাকি চুরি করা থেকে কথার মারপ্যাঁচে কাউকে আটকিয়ে দেওয়াও হতে পারে)। বাহাসে যারা জিতে তারাও বুদ্ধিমান, কূটচরিত্রের অধিকারীরাও বুদ্ধিমান, যেমনটি শিক্ষাণুরাগী ও কৌশলী। আবার অনেকের ধারণা সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত- অর্থাৎ সামাজিকভাবে হাই-স্ট্যান্ডিং ব্যক্তিও বুদ্ধিমান।

বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সম্পর্ক অনঃস্বীকার্য। কারোর স্মরণশক্তি, মেধা, বুঝার ক্ষমতা, উপস্থিত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও চিন্তাক্ষমতা ইত্যাদি তাকে **'বুদ্ধিমান'** হিসাবে পরিচিত করে- একথা সবার জানা। আর বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের এসব ক্ষমতাকে পরীক্ষার উপায় খুঁজে থাকেন। এরূপ একটি পদ্ধতি কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অনেকের কাছে বুদ্ধির টেস্ট হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। এখন এই টেস্টকে আরো উন্নত করা হয়েছে- তবে এখনও অনেকে এটাকে সেই একই নামে সম্বোধন করেন। এই টেস্টকে বলে **'আইকিউ (IQ) টেস্ট'**। ইংরেজী অক্ষরদ্বয় 'IQ' এর অর্থ intelligence quotient। বাংলায় আমরা বলতে পারি **'বুদ্ধির ভাগসংখ্যা'**- কারণ **কৌশিয়েন্ট** শব্দের অর্থ হলো দু'টি সংখ্যার ভাগফল। **আইকিউ = (কারো 'মানসিক' বয়স / আসল বয়স) * ১০০**। **মেন্টাল এইজ** বা মানসিক বয়স আসলটির তুলনায় যতো বেশী হবে **আইকিউ** সংখ্যাও ততো উর্ধ্বে হবে। সুতরাং ৫ বছরের শিশু যদি এমন কিছু জিনিষ করতে সক্ষম যার দ্বারা তার মানসিক বয়ক ১০ বছর বুঝায় তাহলে তার **আইকিউ** = (১০/৫) *১০০ = ২০০ (খুব বেশি)। অপরদিকে ৪ বছরের শিশু যদি ৩ বছর মেন্টাল এইজের মতো হয় তাহলে তার **আইকিউ** হবে মাত্র ৭৫। এখন প্রশ্ন জাগে কারো মেন্টাল বা মানসিক বয়স কতো তা কিভাবে নির্ণিত হবে?

এটা নির্ণয়ের জন্যে একটি টেস্ট আছে। বিভিন্ন বিষয় ও চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে এই টেস্ট করা যায়। যেসব বিষয় টেস্টে থাকে তাদের মধ্যে তথ্য, প্রায়োগিক বিচার, সাধারণ পাটিগণিত, স্বামর্থবোধক শব্দ, বাক্যে ওলট-পালট শব্দ, সংখ্যা সিরিজ বের করা ও সম্পর্ক আবিষ্কার।

আমরা সাধারণত বুদ্ধিকে স্বজ্ঞাবলেই চিনতে পারি। সকল ভাষায়ই একাধিক শব্দ আছে যা বুদ্ধির মাত্রা সংবোধক। যেমনঃ বাংলায়- মেধা, বোকা, চালাক, চতুর, পেচুক, সুধী, কৌশলী, ধীরস্থির ইত্যাদি সবই মানুষের বুদ্ধিক্ষমতার সঙ্গে সামর্থবোধক। ইংরেজীতেও অনুরূপ শব্দ আছেঃ ব্রাইট, ডাল, স্মার্ট, ক্লেবার, স্টুপিড, কালচার্ড ইত্যাদি। তবে সত্যিকার অর্থে কে কতটুকু বুদ্ধিমান বা নয়- তা ইতোমধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন টেস্ট বিশেষ করে **আইকিউ** দ্বারা ১০০% নির্ণয় হয় না। আসলে বুদ্ধিবৃত্তির মূল সেন্টার তো হলো আমাদের ব্রেন বা মগজ। বলতে পারেন, মগজ সবারই আছে- সুতরাং মগজ পরীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে কারো বুদ্ধিক্ষমতা মাপা যায়? প্রশ্নটি অমূলক নয়। কারণ সকলেরই মগজে বুদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত অংশ বিদ্যমান- তাহলে? ব্যাপারটি এজন্যেই এতো কঠিন। বুদ্ধি নিয়ে কতো মাথাব্যথা! আদি কাল থেকে দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধিকে জানার জন্য কতোই না গবেষণা করলেন! যা হোক এখানে আমিও কিছুটা করলাম, তবে বেশির ভাগই অপরের কথা- আমার অতি অল্প। পাঠকরা নিজেই একটু চিন্তা করে দেখবেন- কোন কোন মানুষ এতো চালাক আর অপররা কোনো এতো বোকা!

আপনি জানেন কি ঃ আমেরিকার ‘**সিআইএ**’, বৃটেনের ‘**এমআই-৬**’, রাশিয়ার ‘**কেজিবি**’, ভারতের ‘**র**’, ইসরাইলের ‘**মশাদ**’ ও পৃথিবীর আরো বহু দেশের সিক্রেট সার্ভিসকে সার্বিকভাবে ‘**ইন্টেলিজেন্ট এজেন্সি**’ বলা হয়। যে উপায়ে এই ‘**অপরের গোপন তথ্যাদি**’ সংগ্রহ হয় তাকে বলে ‘**এসপিওনাজ**’। আসলে এসপিওনাজ কোন ‘**বুদ্ধিসম্পন্ন**’ কাজের নাম নয় বরং চুরিদারী বিদ্যা!

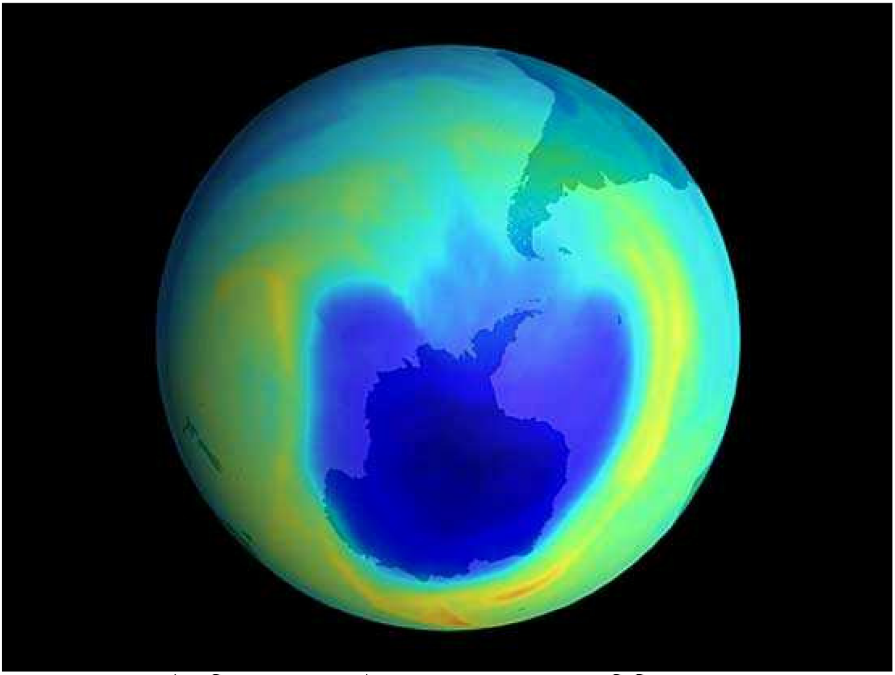
পরিচ্ছেদ ৩৩

পরিবেশ

আমাদের এ পৃথিবী একটি প্রাণচঞ্চল মাহাকাশে ভাসমান নীল গ্রহ। নিশ্চিতভাবে জানা একমাত্র সৌরজগৎ আমাদেরটাই। এতে আরোও ৮টি গ্রহ বিদ্যমান কিন্তু কোথাও কোন প্রাণী নেই- অন্তত মানুষের মতো কেউ নেই। সুতরাং এই পৃথিবী সৌরজগতে এবং সম্ভবত পুরো বিশ্বজগতে এক একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর তা হলো, এর উপরই **'সৃষ্টির সেরা'** নামে খ্যাত মানবজাতির বসবাস। আমাদের গ্রহটির বিরল বৈশিষ্ট্য তার বিশেষ গঠন এবং সৌরমণ্ডলে বিশিষ্ট জায়গায় অবস্থানের কারণে হয়েছে। পৃথিবীর ওজন, বায়ুমণ্ডল, পানি, মাটি, উর্বরতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সঠিক **'পরিবেশ'** থাকায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের বসবাস এখানে সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে সৌরমণ্ডলে সূর্য থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থান, দৈনিক ও বার্ষিক গতি, **মেগনেটিক ফিল্ড** ইত্যাদি পৃথিবীকে প্রাণীদের জন্য উপযোগী করে তুলেছে। আমাদের দু'পাশে দু'টি গ্রহ আছে। সূর্যের দিকের গ্রহটি হলো শুক্র আর বাইরেরটি হলো মঙ্গল গ্রহ। কিন্তু এই উভয় গ্রহের অবস্থান যেখানে আছে সেখানে থাকার কারণে প্রাণীদের বেঁচে থাকা সম্ভব হয় নি। তাহলে বুঝা **গেল** পৃথিবীটা বর্তমান স্থানে না হয়ে অন্যত্র অপেক্ষাকৃত দূরে, সূর্যের বেশি নিকটবর্তী কিংবা অতিবেশী দূরবর্তী স্থানে থাকলে আমরা এখানে বেঁচে থাকতে পারতাম না। এসব ব্যাপার চিন্তা করলেই বুঝায় যায়- আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এই পৃথিবীটি সৃষ্টি করা হয়েছে।



পরিবেশ প্রাণীজীবনকে প্রভাবিত করে- তা ভালো হোক কিংবা মন্দ। আমাদের পৃথিবীর পরিবেশ মূলত ভালো থাকায়ই আমরা এখানে হাজার হাজার বছর যাবৎ জ্যান্ত আছি বংশপরাম্পরায়। কিন্তু ভবিষ্যৎ তেমন পুষ্পিত হবে বলে মনে হয় না। ইতোমধ্যে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে মডার্ণ শিল্পভিত্তিক মানবসমাজ তার নিজস্ব পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বেঁচে থাকাকে হুমকিতে ফেলে দিচ্ছে। কথাগুলো আমার নয়- পরিবেশ বিজ্ঞানীদের।



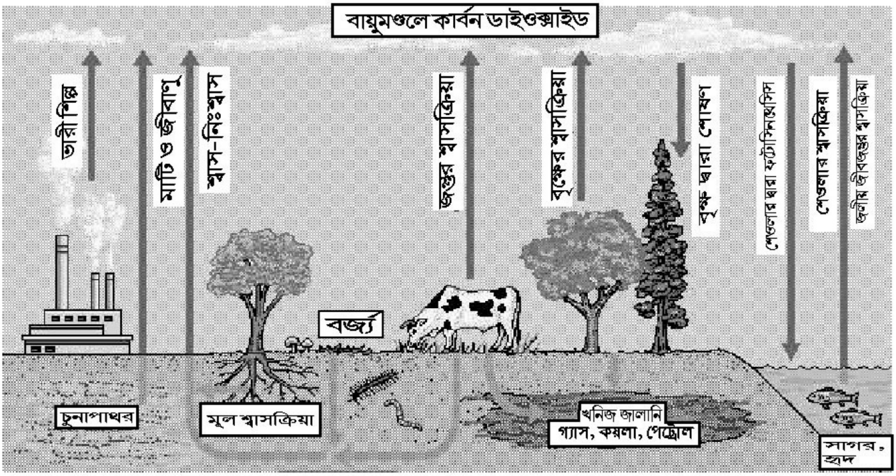
অজোনহোল : এই মিথ্যা-রংয়ের উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবিটি **১৯৯৯** সালে নেওয়া। ছবিতে দক্ষিণ মেরুর উপর যে **অজোন** ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। **অজোন** হলো একটি **গ্যাস** স্তর যা সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর **আলট্রা-ভাইলোট** রশ্মিকে আটকে রাখে। আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত **কেমিকেল** এই **অজোন** স্তরকে মারাত্মকভাবে পাতলা করে দিয়েছে- সুতরাং সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীতে অনায়াসে পৌঁছার সুযোগ পাচ্ছে।

ইতোমধ্যে পরিবেশকে আমরা নিজেরা কৃত্রিম উপায়ে কতটুকু ধ্বংস করেছি তা জানলে শরীরে শিহরণ জেগে ওঠবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ **ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট** ধ্বংসের কথা বলা যায়। ফার্ম ও পশুচারণের উদ্দেশ্যে শত শত বছর যাবৎ বনাঞ্চল কেটেছেটে ধ্বংস করা হয়েছে ও হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এর ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ায় পবির্তন ঘটেছে- **গে-াবাল ওয়ার্মিং** সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য বিশ্বব্যাপী তাপবৃদ্ধির আরোও অনেক কারণ আছে। একটু পরই আমরা এসব ব্যাপারে আলোচনায় যাচ্ছি। বিজ্ঞানীরা পরিবেশের উপর কৃত্রিম কিংবা অকৃত্রিম প্রভাব থেকে যে দীর্ঘমেয়াদী রদবদল ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেসব ব্যাপারে গবেষণা করেন। অপরদিকে পরিবেশবিদরা কৃত্রিম উপায়ে পরিবেশকে আমরা যাতে নষ্ট না করি সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে এক্টিভ ভূমিকা রাখেন।

ইকোলজি

এটা বিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা। প্রাণীজীবন ও তাদের পরিবেশ নিয়ে গবেষণা হলো এ শাখার মূল বিষয়বস্তু। আমাদের চতুর্দিকে একটি **ফিজিক্যাল** (বাস্তব ও অপ্রাণী) পরিবেশ আছে। আরো আছে **বায়োলজিক্যাল** (আমরা নিজেরা ও অন্যান্য প্রাণীরা) পরিবেশ। এই উভয়বিদ পরিবেশের মধ্যে আমাদের জীবন। সুতরাং এগুলোর স্বরূপ জানা ও এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ আমাদের জন্য উপকারী বৈকি।

ফিজিক্যাল পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত আছে আলো, বাতাস, তাপ, সূর্যের তেজস্ক্রিয়া, মাটির উর্বরতা, পানি এবং বায়ুমণ্ডল। **বায়োলজিক্যাল** পরিবেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সকল প্রাণী ও আমরা নিজে। পরিবেশভুক্ত প্রাণীজীবন নিয়ে গবেষণা বিরাট একটি বিষয়- বিধায় পরিবেশবিজ্ঞানের সহায়ক অনেক বিজ্ঞান আছে যা থেকে শিক্ষার্জন একান্ত জরুরী। এসব অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মধ্যে পদার্থ, আবহাওয়া, পানিচক্র, মহাসাগরবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং মাটি নিয়ে গবেষণা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, একজন **ইকোলজিস্টকে** উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর প্রাথমিক থেকে মধ্যম পর্যায়ের জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী। এগুলো মূলত ইকোলজির সঙ্গে সম্পর্কিত ও সহায়ক বিজ্ঞান বিষয়। এতো **গেল** ইকোলজির সঙ্গে **ফিজিক্যাল** সাইন্স-এর সম্পর্ক।



অন্যান্য প্রাণী ও আমরা- ইকোলজির এই **বায়োলজিক্যাল** দিকটি যেসব বিজ্ঞানের সাহায্যে গবেষণা করা জরুরী, তার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্র, প্রাণীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শরীরবৃত্ত, শ্রেণীকরণের সূত্রাবলী (প্রাণীদের শ্রেণী) ইত্যাদি এখানে উল্লেখযোগ্য।

পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রাণীদের বসবাস। এটাকে বলে **'বায়োস্পেয়ার'** (জীবমণ্ডল বা প্রাণীমণ্ডল)। জীবমণ্ডলের সংজ্ঞা আরো একটু বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন জরুরী। পৃথিবীর চতুর্দিকে একটি পাতলা পরিবেষ্টনী আছে যেখানে মানুষসহ প্রাণীজীবনের বেঁচে থাকার যাবতীয় উপাদান বিদ্যমান। বাতাস, মাটি ও পানি নিয়ে এ পরিবেষ্টনী যার উচ্চতা পৃথিবীর সাগরতল থেকে বায়ুমণ্ডলের ৬ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত। এই জোনে জীবনরক্ষা নীর্ভর করে সূর্য থেকে প্রাপ্ত **এনার্জি** ও জীবনরক্ষার অন্যান্য উপদান যেমন, পানি ও খাদ্য। আমাদের পৃথিবীর এই গুরুত্বপূর্ণ **বায়োস্ফেয়ারটি** কোটি কোটি বছর যাবৎ মূলত অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। প্রাণীমণ্ডলটি একাধিক শাখা-প্রখাশা দ্বারা গঠিত যাকে **'বায়োমেস'** বলে।

বায়োমেস বলতে পরিবেশের মধ্যে ভিন্নতা বুঝায়। যেমন, বনাঞ্চল, ঘাসভূমি, উদ্যানভূমি, ঝোপভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি। এসব অঞ্চল মূলত কিছু মিঠাপানির সমাজভুক্ত এলাকা: নদী, হ্রদ, পুকুর, জলাশয়, হাওর, বিল, নিম্ন সিক্তভূমি ইত্যাদি।



ঝোপভূমি বা শ্রাবল্যান্ড: পৃথিবীর সর্বত্র এরূপ ঝোপভূমি বিদ্যমান। এই ভূমির অবস্থান উভয় মেরু থেকে ৩২ ও ৪০ ডিগ্রীর মধ্যে।

ইকোসিস্টেম

ইকোসিস্টেমকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে বলতে পারি, প্রাণী ও জড়ের মধ্যে বিভিন্ন স্বাধীন অংশের সমন্বয়ে যে সার্বিক একটি তন্ত্র বা **সিস্টেম** ক্রিয়াশীল আছে তা-ই **ইকোসিস্টেম**। এতে অবশ্য একদিকে আছে **ইনপুট** (সম্ভরণ) আর ফল হিসাবে অপরদিকে বেরিয়ে আসে **আউটপুট** (উৎপাদন)। যেমন: ইকোসিস্টেমের মৌলিক অংশগুলো হলো- **১. উৎপাদক (সবুজ উদ্ভিদ), ২. ভোক্তা (তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণী) ও ৩. পচনকর্মী (জীবাণূ ও ছত্রাক বা ফাঙ্গি)**। ইকোসিস্টেমের **ইনপুট** বা সম্ভরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই সূর্যের আলো, পানি, **অক্সিজেন, কার্বন ডাইওক্সাইড, নাইট্রেজেন** ও অন্যান্য মৌলিক ও যুক্ত পদার্থ। অপরদিকে উৎপাদন বা আউটপুটও পানি, **অক্সিজেন,** তাপ ইত্যাদি দেখতে পাই। তবে মনে রাখার বিষয় যে পুরো ইকোসিস্টেমের মৌলিক চালিকাশক্তি হচ্ছে সূর্যের **এনার্জি** - অর্থাৎ আলো ও তাপ।

আপনি জানেন কি ঃ পরিবেশ বিনষ্টকারী **'এসিড বৃষ্টি'** আমাদেরই সৃষ্টি। পৃথিবীর বিরাট বিরাট মহানগরীতে অনবরত চলন্ত গাড়ি ও অন্যান্য মোটরচালিত যানের **ইঞ্জিন** থেকে বেরিয়ে আসে **কার্বন ডাইঅক্সাইড** ও **সালফার অক্সাইড**। এসব **কেমিকেল** বাসাতের সাথে মিশে সৃষ্টি করে **এসিড রেইন, গে-াবাল ওয়ার্মিং** ও **স্মগ** (কুয়াশা ও ধুঁয়ার মিশ্রণ)। বাতাসে মিশ্রিত **অক্সাইড** বাষ্পের সঙ্গে জড়িত হয়ে **এসিড** বৃষ্টির জন্ম দেয়। আর **কার্বন ডাইওক্সাইড** থেকেই **'গ্রীনহাউজ এফেক্ট'** নামক ক্রিয়াটি সংঘটিত হয় যার ফলে **গে-াবাল ওয়ার্মিং** বা পৃথিবীব্যাপী উষ্ণকরণ সমস্যার জন্ম নিয়েছে।

উপসংহার

আলহামদুলিল্লাহ! মৌলিক বিজ্ঞানের উপর আমরা অনেক আলোচনা করলাম। অঙ্কশাস্ত্র থেকে পরিবেশবিজ্ঞান পর্যন্ত আমরা বেশকিছু **ফিল্ড** এতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। সাধারণ পাঠকদের নিকট বিভিন্ন বিষয়ের জটিলতা ও কাঠিন্যতা হয়তো কিছুটা কষ্টের হয়েছে। কি আর করা যায়, বিজ্ঞান তো আর তেমন সহজ-সরল বিষয় নয়। এরপরও আমি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে যেটুকু সম্ভব সরলভাবে উপস্থাপন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। আমার মতে, যাদের নিকট প্রথম পাঠের পর কোন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ বোধ সৃষ্টিতে অভাব অনুভুত হবে তারা বিষয়টি আবার পাঠ করার চেষ্টা করবেন। আর লিখিত বর্ণনা থেকেও শক্তিশালী মাধ্যম হলো **ভিজিউয়্যাল** (দৃশ্যমান) উপস্থাপন। এ কারণেই আমি বেশ কিছু ছবি, ড্রইং, নক্সা ইত্যাদি সংযুক্ত করেছি। ওসব চিত্রও ভালো করে স্ট্যাডি করলে বিষয় অনুধাবন অনেকটা সহজ হবে নিঃসন্দেহে।

মৌলিক বিজ্ঞানের উপর শুধু **'ইনট্রোডাকশন'** বা একটি ভূমিকা মনে করেও যদি এ অধ্যায়ের বর্ণনা ও উপস্থাপনকে মূল্যায়ন হিসাবে ধরে নেওয়া যায়, তবে তা-ই হবে স্বার্থক। আর স্বার্থকতার মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধি পাবে যদি সুহৃদ পাঠকবর্গ এ থেকে উপকৃত হয়েছেন বলে বিশ্বাস রাখেন। মৌলিক বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের **থিওরিটিক্যাল** দিকটি আগে বর্ণনা উপযোগী ও সহায়ক মনে করেই উপস্থাপন করলাম। পরবর্তী অধ্যায়টি এখন পাঠ করা ও তা থেকে জ্ঞানার্জন অনেকটা সহজ হবে এটাই আশা- কারণ, প্রথম অধ্যায়ের নির্যাস বা প্রাকটিক্যাল ফলই হলো প্রযুক্তি যা দ্বিতীয় অ্যধায়ে বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে প্রযুক্তির উপর রচিত পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো পাঠের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই অত্র অধ্যায়ের ইতি টানছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক প্রযুক্তি

পরিচ্ছেদ ১

টেকনোলজি বা প্রযুক্তি

আমরা যে বিশ্বে বাস করি তাতে কিছু কৃত্রিম স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সর্বদাই ক্রিয়াশীল আছে। এর মধ্যে একটি হলো প্রযুক্তি। শব্দটি ছোট্ট কিন্তু তার **স্কোপ** অনেক বড়। প্রযুক্তি ছাড়া কেউ কোথাও বেঁচে নেই। অর্থাৎ কোন না কোনভাবে আমাদের সবাই প্রযুক্তির ব্যবহার করে যাচ্ছি। সুতরাং এরূপ একটি বিরাট বিষয়কে বুঝিয়ে বলার ক্ষেত্রে কিভাবে উপস্থাপন সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, আমাদেরকে বাধ্য হয়ে সীমাবদ্ধতার ভেতর স্বেচ্ছায় বন্দী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে গবেষণার স্কোপকে সীমিতকরণ ছাড়া উপায় নেই। প্রযুক্তির কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হবে তা ব্যক্ত করার পূর্বে বিষয়টি সম্পর্কে আরো কিছুটা ওয়াকিফহাল হওয়া হয়তো আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

আমি প্রযুক্তি বা ইংরেজী **'টেকনোলজি'** শব্দের সংজ্ঞা একাধিক সূত্র খোঁজ করে দেখেছি। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা **ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকায়** দেখতে পেলাম। এতে বলা হয়েছেঃ The application of scientific knowledge to the practical aims of human life or, as it is sometimes phrased, to the change and manipulation of the human environment. (অর্থাৎ ঃ মানবজীবনের প্রায়োগিক উদ্দেশ্য হাসিলে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো, অথবা কোনো কোনো সময় এটাও বলা হয় যে, মানব পারিপার্শ্বিকতাকে পরিবর্তন ও রদবদল করা।)

উপরোক্ত সংজ্ঞাটি সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ যথার্থ। তবে এ থেকেই কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার একটি

অপরিহার্য অংশ। আমাদের মৌলিক চাহিদা থেকে সর্বাপেক্ষা বড় স্বপ্ন পূরণে প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই। আর আজকের বিজ্ঞানপাগল, **স্পেইস-এইজ** টেকনোলজির যুগে যে দিকেই তাকাবো সেদিকেই আমরা প্রযুক্তির ব্যবহার দেখতে পাবো। মূলত এখন অবস্থা এই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, পৃথিবীর একটি লোকও **মডার্ন** টেকনোলজির ছোঁয়া থেকে মুক্ত নয়। আমরা সবাই প্রত্যক্ষ না হয় অন্তত পরোক্ষভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছি। এই ব্যাপারটি যে ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও প্রকট হবে তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

আমাদেরকে অবশ্য এ ব্যাপারে আগেই জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, প্রযুক্তি শুধুমাত্র মানবকল্যাণের জন্য নয়, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তা মানব-অকল্যাণের জন্যেও। মানুষ তার আক্বলের অনালোকিত দিকটিকে আরোও অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে যেয়ে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। কেউ কেউ এখন প্রযুক্তিকে ভবিষ্যতে মানবতা ধ্বংসের কারণ হবে বলে চিহ্নিত করেছেন। কথাটি উড়িয়ে দেওয়ার নয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বড় বড় ধনাঢ্য দেশ নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন। মানবতৈরী রাজনীতিক বাউন্ডারীর অপর পার্শ্বের মানুষের স্বার্থ ও নিরাপত্তার প্রতি তোয়াক্কা করছেন না। বরং তাদেরকে কিভাবে যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়া যায় সেটাই চিন্তা। সুতরাং প্রযুক্তির একটি অন্ধকার দিক আছে- যা সত্যিই আধুনিক যুগে মানবতার জন্য **ট্রাজেডি** বলা চলে। আনবিক শক্তিকে আজ কিভাবে মানব বিধ্বংসী মারণাস্ত্র হিসাবে কাজে লাগানো যায় সে প্রতিযোগিতা চলছে সারা বিশ্বময়। যা হোক, প্রযুক্তির আলোকিত দিকটির উপরই আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে।

আগেই বলেছি কিছু কিছু বিশেষ প্রযুক্তির স্বরূপ উন্মোচন করা ছাড়া বেশী কিছু এ প্রসঙ্গে আলোচনা আদৌ সম্ভব নয়। তবে পাঠকদের মনের বহু প্রশ্নের জবাব এ থেকে বেরিয়ে আসবে- এটা অবশ্য আশারাখি। এবার প্রযুক্তির উপর আমাদের আলোচ্য বিষয়ের একটি তালিকা তুলে ধরলে ভালো হয়।

১. **এনার্জি** রূপান্তর প্রযুক্তি
২. **কন্সট্রাকশন** প্রযুক্তি
৩. যাতায়াত প্রযুক্তি
৪. যোগাযোগ প্রযুক্তি

৫. উৎপাদন প্রযুক্তি
৬. **মেডিকেল** প্রযুক্তি
৭. **অটোমেশন** প্রযুক্তি

বিমূর্তভাবে উল্লেখিত উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির একাধিক শাখা-প্রশাখা আছে [নীচের নক্সাটি দেখুন]। আমরা বিষয়ের প্রধান প্রধান শাখাগুলো নিয়েই আলোচনা-বিশ্লেষণ করবো।



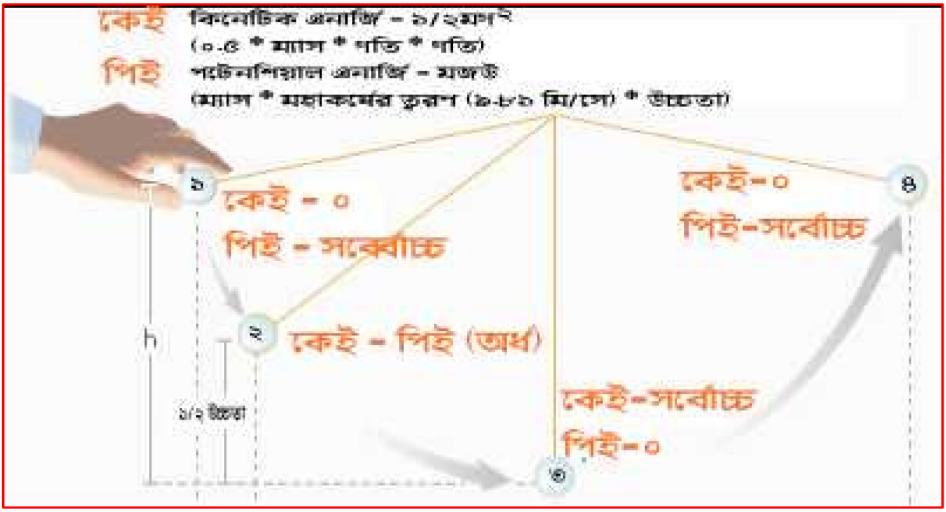
উপরের ছবিতে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রধান প্রধান শাখা-প্রশাখার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই পাঠকরা অবশ্য অনুধাবন করে নেবেন, প্রযুক্তি কথাটি ছোট্ট হলেও তার ব্যাপকতা কতো বিরাট। আসলে উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের উপর একেকটি আলাদা বড় গ্রন্থ রচনা করলেও টেকনোলজির ব্যাপকতা বা স্কোপকে পুরোদমে কাভার করা সম্ভব হবে না। বর্তমান এই গ্রন্থে আমরা শুধুমাত্র ঐসব মূল বিষয়গুলোর উপরই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাবো, যেগুলো সম্পর্কে সকলেই অল্প-

বিস্তর জেনে নেওয়া এ যুগে বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচ্য। আমি ইতোমধ্যে প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ করেছি যে, এ কিতাব স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্য বইয়ের মতো কিছু না। আসলে এটা পাঠের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বরূপ অনুধাবন ও এ থেকে কিভাবে মানবকল্যাণ সাধিত হচ্ছে সে ব্যাপারে মনের অনুসন্ধিৎসার কিছুটা হলেও জবাব পাওয়া যাবে। এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কে অনুধাবন করে মহান স্রষ্টা আল্লাহর সৃষ্টিকৌশলের নৈপুণ্য উপলব্ধির মাধ্যমে ঈমানী শক্তিতে আরো বেশি বলীয়ান হয়ে আনুগত্যশীল হওয়া। এ উভয় দিক থেকে পাঠকরা উপকৃত হবেন- এটাই আশা। যা হোক, এবার আসুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেভাবে নিজেকে ব্যাখ্যা করে সেই 'প্রণালীবদ্ধভাবে' আমরা আধুনিক প্রযুক্তির উপর আমাদের আলোচনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করি।

পরিচ্ছেদ ২

এনার্জি রূপান্তর প্রযুক্তি

এনার্জি শব্দটি ইংরেজী থেকে ধার-করা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষা মূলত ইংরেজী বেইজ্‌ড হয়ে পড়েছে। অবশ্য বাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিশব্দ অন্তত অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে ব্যাপার হচ্ছে, বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন ইংরেজী কিংবা কোন প্রসিদ্ধ পশ্চিমা ভাষা ছাড়া আজকাল আদৌ সম্ভব নয়। যেমনটি এক যুগে আরবী ভাষা ছিল। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি জ্ঞানার্জনের প্রধান প্রধান শাখাগুলোর উপর উচ্চতর অধ্যয়নের পূর্বশর্ত ছিল আরবী ভাষার উপর ব্যুৎপত্তি। আজ এই কথা বলা চলে ইংরেজী ভাষার ক্ষেত্রে। যা হোক এনার্জিকে বাংলায় বল, ক্ষমতা, শক্তি, উদ্যম ইত্যাদি দ্বারা বোঝানো হয়। আমি ইচ্ছে করেই মূল ইংরেজী শব্দটা ব্যবহার করবো। কারণ, বিজ্ঞানের ভাষায় **এনার্জি** বলতে যা বুঝায় তা আসলে উক্ত কোনটি দ্বারা বুঝানো যথেষ্ট নয়। বল রূপান্তর, ক্ষমতা রদবদল, উদ্যম রূপান্তর, শক্তি বদল ইত্যাদি কোন একটি কথাও '**এনার্জি** রূপান্তর' কথাটির মতো শ্রুতিমধুর কিংবা অর্থপূর্ণও নয়। এবার আসুন এনার্জির সংজ্ঞা বিজ্ঞানের ভাষায় জেনে নিই।



এনার্জির সংজ্ঞা সঠিকভাবে লিখতে গেলে বেশ বড় কয়েকটি প্যারার প্রয়োজন পড়বে। প্রথমতঃ **এনার্জি** হলো কোন বস্তুর গতির ফলাফল। অর্থাৎ গতির ফলে বস্তুর মধ্যে **এনার্জি** বা শক্তির জন্ম হয় যা দ্বারা প্রযুক্তির মাধ্যমে 'কাজ' সম্পাদিত হতে পারে। এখানে কাজ বলতে কোন কাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি। এরূপ এনার্জিকে বিজ্ঞানের ভাষায় **'কিনেটিক এনার্জি'** বলে। এই **এনার্জি** হচ্ছে, **'গতির ফলে সৃষ্ট এনার্জি'**। দ্বিতীয়তঃ কোন বস্তুর মধ্যে **এনার্জি** জমা থাকতে পারে। যেমন কোন নদীতে বাধ থাকার ফলে একদিকের পানির উচ্চতা বেশী হয়ে যায়। এতে ঐ পানির মধ্যে জমা হয় সম্ভাব্য শক্তি বা এনার্জি। পানি যতক্ষণ স্থির থাকবে ততক্ষণ এই এনার্জিও 'জমা' থাকবে। কিন্তু বাধের মধ্যে ছিদ্র করে দিলে খুব দ্রুত পানি বেরিয়ে আসবে। এখন এই গতিশীল পানির মধ্যে বিরাজ করবে, **কিনেটিক** এনার্জি। স্থির অবস্থায় জমা থাকা এনার্জিকে বলে **'পটেনশিয়াল এনার্জি'**। উভয়বিধ এনার্জিকে বুঝতে যেয়ে আমরা একটি দোলক বা পেন্ডোলাম এর গতিবিধির উপর গবেষণা করে দেখাতে পারি [উপরের ড্রইংটি দেখুন]।

লক্ষ্য করুন, **পেন্ডোলামের** চার অবস্থানে কিভাবে **এনার্জি** রূপান্তর হয়। অবস্থান ১-এ তার মধ্যে জমা আছে **পটেনশিয়াল এনার্জি** কিন্তু কোন **কিনেটিক এনার্জি** নাই। ছেড়ে দেওয়ার পর জমাকৃত **এনার্জি** বদলে **কিনেটিক** এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে অবস্থান ২-এ এসে উভয় এনার্জির মান সমান হবে। অবস্থান ৩-এ যেহেতু **পেন্ডোলামের** মধ্যে উচ্চতা নেই বা তা সর্বনিম্নে তাই তার মধ্যে কোন **পটেনশিয়াল** এনার্জিও নেই। কিন্তু গতির **এনার্জি** সর্বোচ্চে। তাহলে বুঝা গেল একটি **পেন্ডোলামের** মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি শক্তি তখনই সৃষ্টি হয় যখন সে মাটির লেভেলের সর্বাপেক্ষা কাছে থাকবে। এরপর অবস্থান ৪-এ পৌঁছে সে ক্ষণকালের জন্য অবস্থান ১-এর অনুরূপ হয়ে যায়।

উপরে বর্ণিত এনার্জির দু'টি মৌলিক স্বরূপ সর্বাবস্থায়ই বিদ্যমান। তবে **এনার্জি** বিভিন্ন সূত্র থেকে রূপান্তরের মাধ্যমে উপকারযোগ্য কাজে লাগানো যেতে পারে। এসব সূত্রের মধ্যে **মেকানিক্যাল**, তাপ, রসায়নিক, বৈদ্যুতিক, তেজস্ক্রিয়াজণিত এবং আনবিক **এনার্জি** হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এনার্জির সকল অবস্থা কিন্তু একে অন্যের মধ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তর সম্ভব। অর্থাৎ **মেকানিক্যাল** এনার্জিকে বৈদ্যুতিক কিংবা বৈদ্যুতিক এনার্জিকে **মেকানিক্যাল** এনার্জিতে রূপান্তর সম্ভব।

অনুরূপভাবে তাপশক্তিকে বদলে রসায়নিক এনার্জিতে এবং এর উল্টো কাজ সমাধান সম্ভব। এভাবে, যে কোন একটি **এনার্জি** সূত্রকে অন্য যে কোন এনার্জিতে রূপান্তর সম্ভব। রূপান্তরকালে অবশ্য- হয় **কিনেটিক** কিংবা **পটেনশিয়াল এনার্জি** ক্ষয় অথবা আয় হবে- কিন্তু উভয়ের মোট এনার্জির মাত্রা সর্বদাই সমান থাকবে।

এনার্জি রূপান্তরের সময় সাধারণত কিছু ক্ষয় হয়- আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা তাপ **এনার্জি** হিসেবে ক্ষয় হয়ে থাকে। যেমন **ইলেকট্রিক্যাল সার্কেট** থেকে তাপ এনার্জিই বেশি ক্ষয় হয়। একইভাবে যে কোন **মেকানিক্যাল** সিস্টেমেও ক্ষয়ের মাত্রা ঘর্ষণ থেকে হয়ে থাকে যা শেষ পর্যন্ত তাপ হিসেবে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। আমরা প্রথম অধ্যায়ে **'প্রিন্সিপাল অব কনজারভেশন অব এনার্জি'** এর উপর সামান্য আলোচনা করেছি। এছাড়া **'প্রিন্সিপাল অব কনজারভেশন অব মেটার'** -এর উপরও কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এখন আমরা এই উভয়টির উপর পুরো ব্যাখ্যা দিচ্ছি। এ দু'টো আইন হচ্ছে সম্ভাবের মৌলিক আইনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো খুব ভালোভাবে জেনে নেওয়া একান্ত জরুরী।

কনজারভেশন অব **এনার্জি** আইনে বলা হয়েছে ঃ **এনার্জি যদিও এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর সম্ভব কিন্তু এটাকে সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস কখনো সম্ভব নয়। এনার্জি** যে আসলে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না বা ধ্বংস করতেও অক্ষম এ ব্যাপারটি আগের দিনের বিজ্ঞানী ও **ইঞ্জিনিয়ারদের** নিকট ধরা পড়েছিল বলে জানা গেলেও কেউ তা **'আইন'** হিসেবে ব্যক্ত করেন নি। উনিশ শতকের শুরুতে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞানীরা **এনার্জি** সম্পর্কে আরোও অনেক ব্যাপার বুঝতে সক্ষম হলেন। অবশেষে জার্মান বিজ্ঞানী হারম্যান ভন হেমহল্জ, জুলিয়াস রবার্ট ভন মেয়ার ও বৃটিশ পদার্থবিদ জেম্স প্রেসকট জুল্স **কনজারবেশন** আইন লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেন। আইনটিকে আমরা অন্যভাবে ব্যক্ত করতে যেয়ে বলতে পারি ঃ **কোন ক্লোজ সিস্টেমে পটেনশিয়াল, কিনেটিক ও তাপ এনার্জির মোট পরিমাণ সর্বদাই সমান থাকবে।** এই আইনকে **'ফাস্ট ল অব থারমোডাইনামিক্স'** বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। মোটকথা, এই আইন আমাদেরকে বলে দিচ্ছে, **এনার্জি** কোন মানুষ কৃত্রিম উপয়ে সৃষ্টি অথবা ধ্বংস করতে পারবে না- শুধুমাত্র এর রূপান্তর সম্ভব এবং মোট **এনার্জি** সর্বদাই সমান থাকবে (যদিও বাস্তবে অনেক **এনার্জি** রূপান্তরের সময় বিভিন্নভাবে ক্ষয় হয়ে যায়)।

উনিশ শতকে লিপিবদ্ধকরণের পর বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত উপরোক্ত **কনজারভেশন** আইন বিনাপ্রশ্নে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু **রিলেটিভিটি** ও **ক্যুয়ান্টাম মেকানিক্স** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ আইনের উপর চাপ পড়ে যায়। কারণ দেখা গেছে, আলোকের গতির সঙ্গে তুলনামূলক ক্ষেত্রে বস্তুর মধ্যে যে **এনার্জি** সৃষ্টি হয় এবং স্থান-কালের উপর যেসব রদবদল পরিলক্ষিত হয়- তা **কনজারভেশন** আইন দ্বারা সম্পূর্ণটা বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং এই আইনকে স্বস্থানে রেখে বলা হলো, প্রাত্যহিক জগতে প্রযোজ্য ও ব্যবহারযোগ্য হলেও আনবিক স্কেলে এই আইনের মূল্য নেই। তাই নতুন আরেকটি আইন লিখতে হলো যাকে বলা হয়, **'ম্যাস এন্ড এনার্জি ইক্যুইভেলেন্স ল'**। এটাকে **'প্রিন্সিপাল অব কনজারভেশন অব মেটার'** বলেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই আইনের আসল কথাটি হলো বাস্তবে **এনার্জি** ও বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থৎ **এনার্জি** মানেই বস্তু। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বিরাট অঙ্কের **এনার্জি** লুকিয়ে আছে। আনবিক পর্যায়ে লুকানো এই শক্তিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসা সম্ভব। বর্তমানে দু'টি উপায়ে এই শক্তিকে বের করার পথ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এর একটি মানুষ কাজে লাগাচ্ছে। এটাকে বলে **'নিউক্লিয়ার ফিশন'**। অপরটি হলো **'নিউক্লিয়ার ফিউশন'**। আমরা আশা করছি এ দু'টি টেকনোলজির উপর পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এ মুহূর্তে আমাদেরকে এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, আনবিক স্কেলে এনার্জির **কনজারভেশন** আইন কিছুটা ভিন্ন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এনার্জির স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। আসলে এনার্জিই বস্তুর সবকিছু। **এনার্জি** দ্বারাই এ মহাবিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। আর এই এনার্জিকে কাজে লাগানোর নামই হলো প্রযুক্তি। এনার্জির উপর এই দীর্ঘ সংজ্ঞা শেষে এবার আমরা **এনার্জি** রূপান্তরের **প্রাকটিক্যাল** দিক নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি।

ফসিল জ্বালানি

ফসিল বা জীবাশ্ম থেকেই আমাদের গ্রহের অধিকাংশ এনার্জির আমদানী হয়। দূর অতীতে মৃত উদ্ভিদ ও জীবাণূ থেকে এই জ্বালানি মাটির নীচে মওজুদ হয়েছে। এই **ফসিল** জ্বালানির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো **পেট্রোল**, কয়লা ও প্রাকৃতিক **গ্যাস**। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজ এই তিনটি খনিজ সম্পদের উপর বহুমাত্রায় নির্ভরশীল। পৃথিবীর যে দেশ বা অঞ্চলে এ তিনটি খনিজ সম্পদের মওজুদ বেশী রয়েছে, সে দেশ

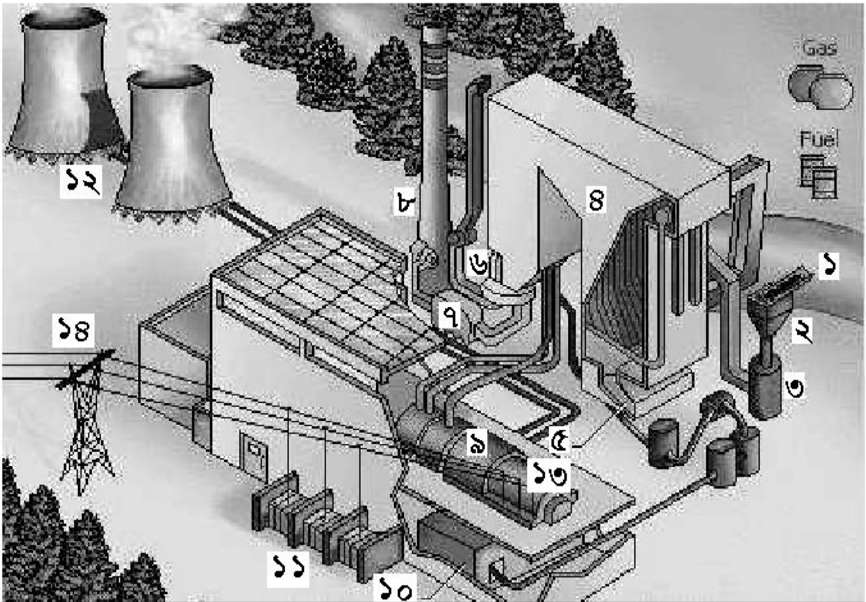
বা জাতি সম্পদশালী বলে গণ্য। **ফসিল** জ্বালানির উপর আমাদের এই বাংলাদেশের মতো গরীব দেশও এখন অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শহরায়ণ প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে শুরু হওয়ায় গ্রামীণ থেকে **মেট্রোপলিটান** এলাকায় বাসিন্দাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে ওঠছে। এসাথে আবাসন প্রকল্প গজিয়ে উঠছে সর্বত্র বেঙ্গের ছাতার মতো। বাড়ছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চাহিদা। তবে এদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রাকৃতিক **গ্যাস** ও তেলের প্রচুর খনিজ সম্পদ মওজুদ আছে। এগুলো সত্যিই দেশের জন্য **'ফরচুন'**। কিন্তু দুর্নীতি ও অপব্যবহারের হাত থেকে মুক্ত রেখে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ফরচুনকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই হচ্ছে আমাদের আসল সমস্যা। যা হোক, কয়লা, **গ্যাস** ও প্রেট্রোল থেকে কিভাবে **এনার্জি** রূপান্তর হয় সে ব্যাপারে এখন আমরা কিছুটা আলোকপাত করবো।

ফসিল জ্বালানি থেকে এনার্জি

রসায়নিক দিক থেকে **ফসিল** জ্বালানি **হাইড্রোকার্বন** থেকে সৃষ্ট। এর অর্থ হলো, জ্বালানিটি একটি **কম্পাউন্ড** বা যুক্ত পদার্থ ও এর মধ্যে আছে মৌলিক পদার্থদ্বয়- **হাইড্রোজেন** ও **কার্বন**। আদি যুগে মৃত প্রাণীদের দেহাবশেষ থেকে **হাইড্রোকার্বন** সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত মাটির নীচে অনেক গভীরে **পেট্রোল**, কয়লা ও **গ্যাস** মওজুদ থাকে। বিশেষ টেকনোলজির মাধ্যমে এগুলো বাইরে নিয়ে আসতে হয়- এরপর প্রয়োজনে বিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য উপাদানে রূপান্তরিত করতে হবে। **রিফাইন** শেষে উপযুক্ত জ্বালানি যথা **পেট্রোল**, **ডিজেল**, **কেরোসিন**, তাপ-তৈল ইত্যাদিতে পরিণত করা যায়। শুধু জ্বালানি নয়, কোন কোন **ফসিল** থেকে অন্যান্য বস্তুও সৃষ্টি সম্ভব যেমন, **প্লাস্টিক**, **কেমিকেল** ও পিচ্ছিলকরণ তৈল ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ **ফসিল** জ্বালানি যাতায়াতব্যবস্থা, উৎপাদন শিল্প, আবাসিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

অশোধিত তৈল খনি থেকে বের করে নিয়ে এসে **রিফাইনারীর** মাধ্যমে শোধিতকরণের পর তা **পেট্রোল, ডিজেল ও জেট** (বা বিমানে ব্যবহৃত) জ্বালানিতে রূপান্তর করা হয়। এসব বস্তু হচ্ছে পৃথিবীর যাতায়াত ব্যবস্থার জ্বালানি উপাদান। কয়লা এক সময় শিল্পোন্নত দেশে ঘরে ঘরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লার ব্যবহার দেখা যায়। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার এখন ডমেস্টিক খাতে প্রায় সীমাবদ্ধ। অবশ্য শিল্পোন্নত দেশে **কমার্শিয়াল ও প্রাইভেট**

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ইমারতে **সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের** জ্বালানি হিসেবে এখনও গ্যাসের উপর অগ্রাধিকার বিদ্যমান আছে। খনি থেকে উত্তোলনের পর অশোধিক তৈল পাইপলাইন কিংবা অন্য উপায়ে **রিফাইনারীতে** নিয়ে এর **গ্যাস** ও তরল অংশকে আলাদা করা হয়। এরপর গ্যাসকে জাতীয় পাইপলাইনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছানো হয়। তরল বস্তু থেকে অন্যান্য উপাদান যেমন **পেট্রোল, ইঞ্জিন অয়েল** ইত্যাদিও তৈরী হয়।



তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র: ১. কয়লা পরিবহণ, ২. কয়লা চুল্লিতে দেওয়ার যন্ত্র, ৩. কয়লা গুড়া করার যন্ত্র, ৪. বয়েলার (চুল্লি), ৫. কয়লার ছাই, ৬. বাতাস তাপযন্ত্র, ৭. ইলেকট্রস্টেটিক প্রেসিপিটেটর, ৮. ধোঁয়া বহির্গমন পাইপ, ৯. টারবাইন, ১০. কনডেনসার, ১১. ট্রান্সফরমার, ১২. ঠাণ্ডকরণ টাওয়ার, ১৩. জেনারেটর ও ১৪. উচ্চ ভলটেজ সম্পন্ন পাওয়ার লাইন।

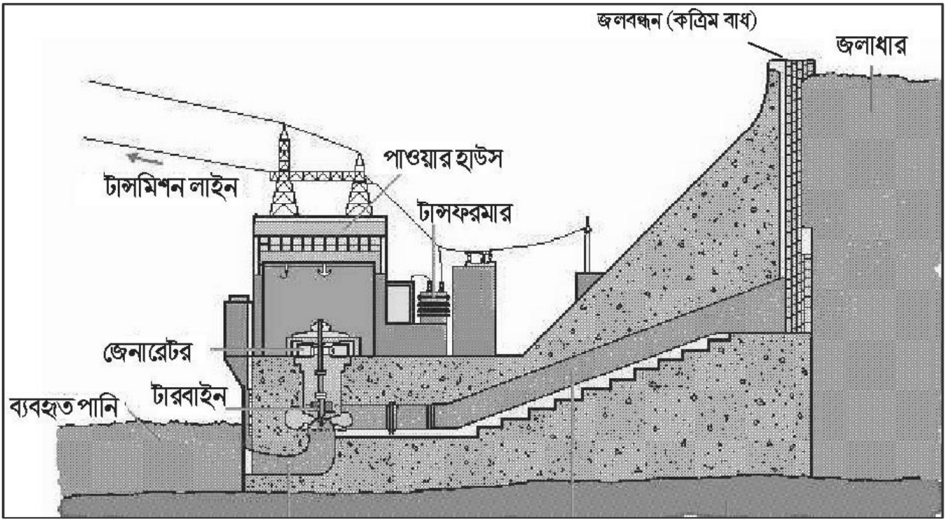
সাধারণত দু'টি উপায়ে **ফসিল** জ্বালানি থেকে **এনার্জি** রূপান্তর হয়ে থাকে। এর প্রথমটি হলো সরাসরি পুড়িয়ে **এনার্জি** তৈরী আর দ্বিতীয়টি হলো এর দ্বারা **পাওয়ার স্টেশনের** বিরাট বিরাট **ইলেকট্রিক জেনারেটর** ঘুরানো। **ফসিল** জ্বালানি দ্বারা পানির মধ্যে উচ্চ তাপ সৃষ্টি করে বাষ্পে পরিণত করা হয়। উচ্চ চাপযুক্ত বাষ্প দ্বারা বিরাট বিরাট **'টারবাইন'** [ফ্যান জাতীয় ইঞ্জিন] ঘুরানো হয়। সুতরাং **ফসিল** জ্বালানিতে জমা

থাকা **কেমিকেল** এনার্জিকে গতিশীল **কিনেটিক** এনার্জিতে রূপান্তর করা হলো। টারবাইনের সাথে জাড়িত থাকে **ইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেটর।** টারবাইনের **মেকানিক্যাল এনার্জি** দ্বারা **জেনারেটর** ঘুরানোর ফলে কয়েলের মধ্যে সৃষ্টি হয় **ইলেকট্রিসিটি** যা ব্রাশ দ্বারা সংগ্রহ করে জাতীয় গ্রীডে ফিড করা হয়। সুতরাং টারবাইনের **কিনেটিক** এনার্জিকে **ইলেকট্রিক্যাল** এনার্জিতে রূপন্তর করা হলো। [উপরের নক্সাটি দেখুন] ইতোমধ্যে জ্বালানি দ্বারা বাস্পে পরিণতকরণ, বাস্প দ্বারা **টারবাইন** ঘুরানো আর **টারবাইন** দ্বারা **জেনারেটর** চালাতে যেয়ে **ফ্রিকশন ও লিকেজের** মাধ্যমে বেশ কিছু **এনার্জি** ক্ষয় হবে। সুতরাং আমাদের জ্বালানিতে মওজুদ এনার্জির ১০০% রূপান্তর বিদ্যুতের মধ্যে পাবো না। এটাকে বলে **সিস্টেম লস**। অবশ্য ইঞ্জিনিয়াররা সিস্টেম লসকে সর্বনিম্নে নামিয়ে আনতে সদা সচেষ্ট আছেন। ভালো ও উন্নত **ডিজাইন** সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করছে।

ফসিল ছড়াও **'পরিষ্কার'** একাধিক পদ্ধতিতে **ইলেকট্রিসিটি** প্রস্তুত সম্ভব। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো **'**হাইড্রো**ইলেকট্রিক পাওয়ার'** বা পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন। আমাদের বাংলাদেশে কাপ্তাই হাইড্রো**ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন** হচ্ছে একটি প্রসিদ্ধ পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আমরা এখন হাইড্রো**ইলেকট্রিক** বিদ্যুৎ উৎপানের উপর আরো কিছু আলোচনা করবো।

পানি থেকে বিদ্যুৎ

পানিবিদ্যুৎ একটি প্রাকৃতিক **এনার্জি** সূত্র। যেখানেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পানির স্রোত বহমান থাকে সেখানেই এই সূত্র বিদ্যমান। যেমন ঃ নদী, হ্রদ, জলপ্রপাত ইত্যাদি। আজকাল পানিশক্তি উৎপাদনে প্রয়োজন হয় বেশ বড় প্রজেক্টের। কারণ, এতে জড়িত আছে **স্টোরেজ লেক**, বাধ নির্মাণ, **বাইপাস** নালা, বড় বড় **টারবাইন** ও **জেনারেটর।** সুতরাং যেসব অঞ্চলে কয়লা বা জ্বালানি তৈলের আমদানী বেশি সেসব এলাকায় হাইড্রো**ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট** তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যয়বহুল হবে। অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেশ লাভবান হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এছাড়া তৈল ও **গ্যাস পাওয়ার স্টেশনের** তুলনায় পানিবিদ্যুৎ ঢের বেশী পরিষ্কার ও সবুজও বটে।



অধিকাংশ পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বাধের একদিকে লেক থাকে। অপরদিকে নদী বা নালার পানির স্তর খুব অল্প হওয়ায় লেকের পানির মধ্যে সৃষ্টি হয় বিরাট অঙ্কের **পটেনশিয়াল এনার্জি**। বিষেশভাবে সৃষ্ট নালা দিয়ে পানি ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে পানির মধ্যে সৃষ্টি হয় শক্তিশালী স্রোত। **টারবাইন** গেইট দিয়ে এই স্রোতের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতেকরে চাহিদা মাফিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়। পানিতে সৃষ্ট গতি দ্বারা **টারবাইন** পরিচালনা করে এর সঙ্গে সংযুক্ত **ইলেকট্রিক জেনারেটর** ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন হয়। উপরের ছবিটির প্রতি দৃষ্টি দিন। পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের মৌলিক ব্যাপার-স্যাপার এতে পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে।

আমাদের দেশের মতো নদীপ্রধান অঞ্চলে হাইড্রো**ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট** অত্যন্ত উপযোগী বলে প্রায় সকলেই বলে থাকেন। কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো একাধিক **প্লান্ট** কিছু কিছু নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করলে তিনটি ফায়দা হবে। এগুলো হলো দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকদের


কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াটস্।

সুবিধার্থে পানি বন্টন। অবশ্য **ফিজেবিলিটি স্ট্যাডির** মাধ্যমে লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা সঠিকভাবে বেরিয়ে আসতে পারে। পানিবিদ্যুৎ যে পারিপার্শ্বিকতার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ এবং বাংলাদেশের মতো নদী-মাতৃক দেশে বিরাট সম্ভাবনার সূত্র হতে পারে তা কেউ অস্বীকার করবেন না। ইউরোপের কোন কোন দেশে বিদ্যুৎ এতোই বেশী উৎপাদন হচ্ছে যে জনগণ খুব অল্প দামে তা ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছেন। অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ী এলাকায় তৈরী হয়েছে সিরিজ পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র। পাহাড় থেকে গিড়য়ে পড়া একই পানির স্রোত বার বার ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। অস্ট্রিয়া তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে প্রচুর বিদ্যুৎ বিদেশে রপ্তানী করে থাকে।

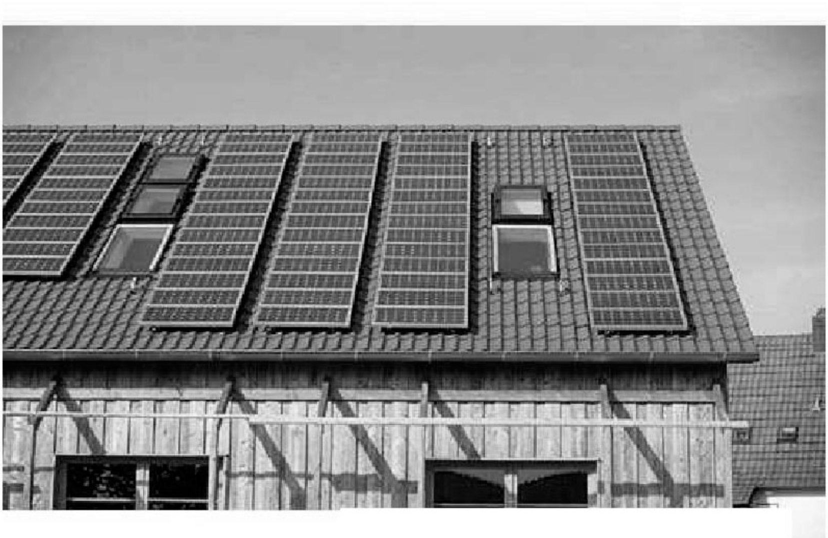
সৌরশক্তি ঃ সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ এনার্জি

সূর্য হচ্ছে আমাদের গ্রহের মূল **এনার্জি** সূত্র। সূর্য থেকে আমরা সর্বদাই তাপ ও আলো পেয়ে থাকি। পৃথিবীর দিবাভাগে বায়ুমণ্ডলের এক বর্গ কিলোমিটারের উপর সূর্য থেকে ১,৪০০ **মেগাওয়াট্স** সৌরশক্তি পতিত হয়। এই **পাওয়ার** পৃথিবীতে স্থাপিত অধিকাংশ **পাওয়ার স্টেশনে** উৎপাদিত বিদ্যুৎ থেকেও বেশী। কিন্তু এই মোটা অঙ্কের এনার্জির পুরোটা ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছে না- বাস্তবে অর্ধেকটার মতো আসে। এরপরও তা বিরাট। আধুনিক যুগে গে-াবেল জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও এসাথে এনার্জির প্রয়োজনীয়তা বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীতে খনিজ সম্পদ সীমিত। সর্বত্র এই সম্পদকে মানুষ খরচ করে চলছে। এতে একদিন অবশ্যই যাবতীয় খনিজ সম্পদের মাত্রা কমে শূন্যে এসে পৌঁছাবে। বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ণ ও জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে খনিজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত **এনার্জি** আর যথেষ্ট নয়। এছাড়া **হাইড্রোইলোকট্রিক পাওয়ার স্টেশন** শুধুমাত্র- সবদিক থেকে উপযোগী লকেশন ছাড়া প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাছাড়া পানিবিদ্যুৎ প্রজেক্টে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়। সুতরাং বিজ্ঞানী, **ইঞ্জিনিয়ার** ও প্রকৌশলীরা বিকল্প **এনার্জি** সূত্রের সন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন। তারা উপলব্ধি করেছেন, ভবিষ্যৎ **এনার্জির** প্রয়োজনীয়তায় বিকল্প সূত্রে প্রাপ্ত **এনার্জি** একান্ত জরুরী হয়ে দাঁড়াবে।

বিকল্প **এনার্জি** সূত্রের মধ্যে বাতাস-শক্তি ও সৌরশক্তি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উভয় শক্তি কাজে লাগানো হচ্ছে। আমরা উভয়টির উপরই বিস্তারিত আলোচনা করবো।

সৌরশক্তি ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে জেনে নিতে হবে সৌরশক্তি আসলে কোন জিনিস। সূর্যের অভ্যন্তরে **নিউক্লিয়ার ফিউশন** নামক আনবিক **রিয়েকশন** থেকে সৃষ্টি হয় বিরাট অঙ্কের **এনার্জি**। এই এনার্জির কিছুটা আলো ও তাপ হিসেবে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। **ফটোন** নামক একেকটি প্যাকেট হিসেবে এই **এনার্জি** আমাদের গ্রহে পতিত হয়। সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত এনার্জির যেটুকু আমাদের বায়ুমণ্ডলে পতিত হয় তার অর্ধেকটা ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছে, বাকী অর্ধেক বায়ুমণ্ডল চতুর্দিকে ছিটকে ছড়িয়ে দেয়। মৌসুম, দিনের সময় ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কোন বিশেষ এলাকায় কতটুকু আলো বা তাপ পতিত হবে।

মানুষ আদি কাল থেকেই সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আসছে। বিল্ডিংয়ের জন্য সূর্য-শুষ্ক ইট, জ্বালানি হিসেবে গোবরকে শুকানো ইত্যাদি অসংখ্য উপায়ে সৌরশক্তি মানুষ ব্যবহার করে আসছে। তবে আধুনিক যুগে এটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পানির মধ্যে তাপ প্রদান পুরো বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে। অনেকেই এ দু'টো মোটামুটি অল্প ব্যয়বহুল ও সাধারণ টেকনোলজিকে কাজে লাগাচ্ছেন। আমরা প্রথমে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।



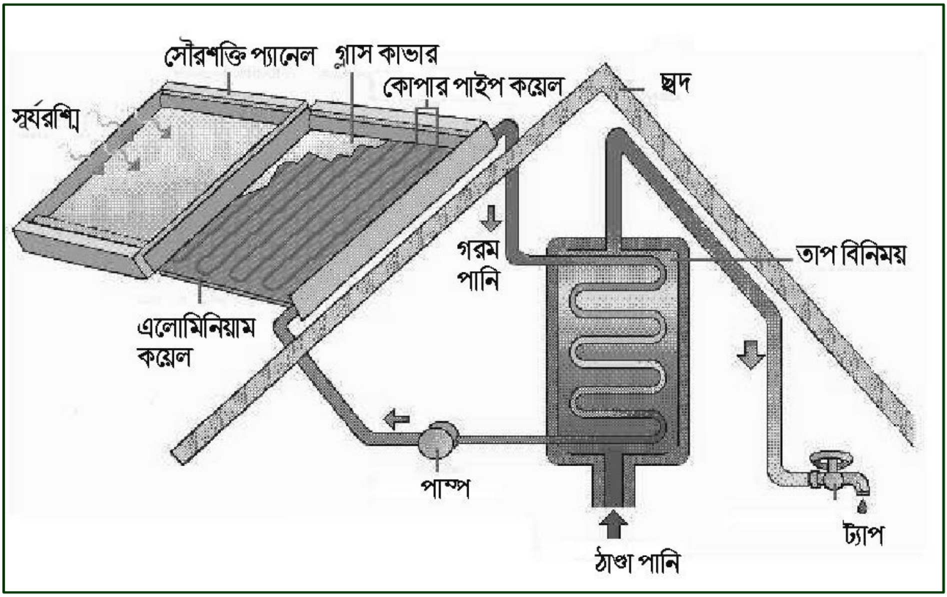
সূর্যালোক থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় **ক্রিস্টেলাইন সিলিকন, জেলিয়াম আর্সেনাইড** বা অনুরূপ **'সেমিকন্ডাক্টিং'** বস্তু থেকে তৈরী **'ফটোভলটেক সেল'**। উল্লিখিত সেমিকন্ডাকটারে যদি সূর্য থেকে আগত তেজস্ক্রিয়া পতিত হয় তাহলে তাতে **কারেন্ট** চলতে থাকে। বিশেষভাবে ডিজাইনের ফলে এই কারেন্টকে **ইলেকট্রিক্যাল** সার্কেটের মাধ্যমে বাড়িতে বা ব্যবসায়িক বিল্ডিংয়ে বাতি, ফ্যান ইত্যাদি পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হয়। **সিলিকন সেল** তৈরী বেশ ব্যবহুল- কিন্তু যেহেতু সূর্যের **এনার্জি** ফ্রি তাই একবার লাগিয়ে দিলে পরবর্তীতে বিদ্যুৎ খরচের আয় থেকে তা পরিশোধিত হয়ে অনেক লাভজনক হতে পারে। আজকাল রিজার্ভ হিসেবে **'রিচার্জেবল ব্যাটারী' ইলেকট্রিক** সার্কেটে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। দিনের বেলা **ব্যাটারী চার্জ** আর রাতে তা দ্বারা বাতি জ্বালিয়ে ঘর আলোকিত হলো- ব্যস। তবে দুর্ভাগ্যবশত বৈদ্যুতিক পাখা, **ফ্রিজ, টিভি, কম্পিউটার** ইত্যাদি পরিচালনায় যে পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন তা সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা কাভার বেশ ব্যয়বহুল। এ কারণে এখনো সেরূপ মাত্রায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে না। হয়তো টেকনোলজির উন্নয়নের ফলে ভবিষ্যতে অধিকাংশ বাড়িতে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার হবে। সৌরবিদ্যুৎ আর যাই হোক, এটা পারিপর্শ্বিকতার জন্য ক্ষতিকর নয়- বরং তা সবুজ, বন্ধুত্বপূর্ণ। সৌরবিদ্যুৎ গবেষণায় যদি সরকারী ফান্ড ও উদ্যোগ আন্তরিক হয় তাহলে অবশ্যই তা এনার্জির প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনেকটা পূরণ করে দিতে পারে। পাঠকরা পশ্চিমা একটি দেশে কিভাবে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার চলছে তা উপরের ছবিটি দেখে কিছুটা অনুধাবন করতে পারবেন। অবশ্য বাংলাদেশেও সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সৌরবিদ্যুতের উপর গবেষণাও চলছে।



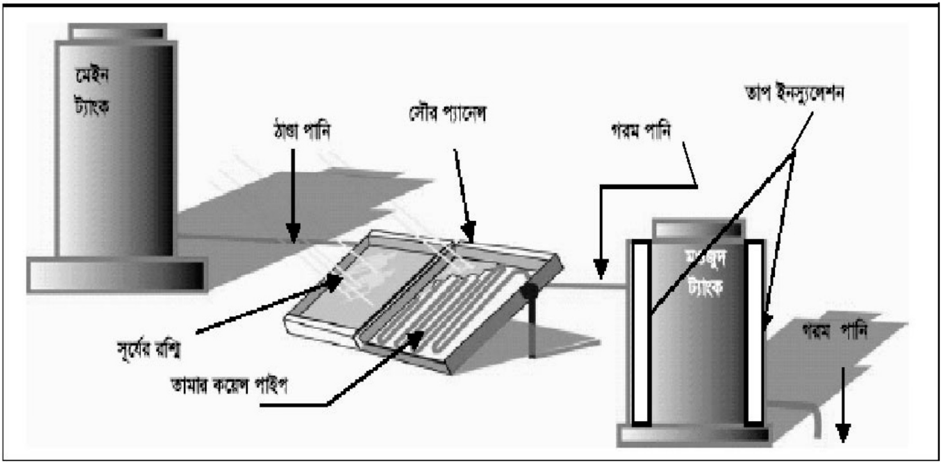
সৌরতাপ দ্বারা বাড়ির পানি উষ্ণকরণ

সূর্য থেকে প্রাপ্ত **এনার্জি** দ্বারা **ফটোভলটেক সেলের** মাধ্যমে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও আমরা এ থেকে বিশেষ প্যানেলের মাধ্যমে বাড়ির রান্নাঘর ও বাথরুমে, কিংবা অফিসের টয়লেটে গরম পানি সরবরাহ করতে পারি বিনা খরচে।

অবশ্য প্যানেল বানানো ও তা স্থাপনে কিছু খরচ তো হবেই। যে টেকনিকের মাধ্যমে গরম পানি সরবরাহ হতে পারে তার দু'টি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো। এ থেকে পাঠকরা বুঝতে পারবেন সৌরতাপ কাজে লাগানো কতো সহজ। **'ডু ইট ইয়রসেলফ' বা ডিআইওয়াই** উৎসাহীরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।



উপরের প্রথম **ডিজাইন** থেকে গরম পানি প্রাপ্তির মাত্রা সর্বোচ্চ হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। এ ডিজাইনে একটি **হিট এক্সচেঞ্জ** ট্যাংক আছে। তামার পাইপের ভেতর দিয়ে পানি বইতে থাকে এবং তা সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে বের হয়ে আসে। **হিট এক্সচেঞ্জ** ট্যাংকের ভেরত দিয়ে তা টিউবের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে এবং ট্যাংকের পানি গরম করে দেয়। এ ডিজাইনে ক্যারিয়ার তরল পদার্থ (এক্ষেত্রে পানিও ব্যবহার করা যাবে) একটি ছোট্ট **পাম্প** দ্বারা চালাতে হয়। এছাড়া দ্রুত পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার মূল সূত্র থেকে তা ভরে দিতে হবে।



এবার দ্বিতীয় প্যানেলটির প্রতি লক্ষ করুন। আমাদের বাংলাদেশে এরূপ সিস্টেমই সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য হবে। এতে অতিরিক্ত কোন পাম্পের প্রয়োজন নেই। প্রথমত মেইন পানির ট্যাংক থেকে পাইপের মাধ্যমে প্যানেলের ভেতর তামার কয়েলে পানি ঢুকাতে হবে। এই পানি অপরদিকে গরম হয়ে বেরিয়ে আসবে। এরপর তা একটি স্টোরেজ ট্যাংকে জমা করা হয়। বিশেষ ডিজাইনের এ ট্যাংক **থার্মোফ্লাস্কের** মতো কাজ করে। অর্থাৎ গরম পানি সহজে ঠাণ্ডা হবে না। মওজুদ গরম পানি পাইপের মাধ্যমে বাথরুমের শাওয়ার বা ট্যাপে এবং রান্নাঘরে গরম পানির ট্যাপে সরবরাহ করা যাবে। উল্লেখ্য, এই সিস্টেম ভোরে অন করে রাখলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে **স্টোরেজ ট্যাংক** গরম পানিতে ভরে যাবে যদি সেদিন সূর্যালোক বেশী হয়। প্যানেলের উভয় দিকে বিশেষ বাল্ব দ্বারা পানির ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতেকরে তামার টিউবটি পূর্ণ হওয়ার পর তা ঘণ্টা দু'এক সূর্যের আলো থেকে গরম হয়ে ওঠে। অবশ্য তামার টিউব যতো বেশী দীর্ঘ হবে এ সিস্টেম থেকে ততো বেশী সুফল পাওয়া যাবে। মনে করুন স্টোরেজ ট্যাংটি ভরে ফেলতে যদি দৈনিক তিন বা চারবার ফ্লো নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাহলে এক ট্যাংক গরম পানি দৈনিক পাওয়া যাবে।

বাতাস-শক্তি থেকে এনার্জি

বাসাতের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। আমরা তিক্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা বাতাসের শক্তিকে উপলব্ধি করে থাকি। ঝড়-ঘুর্নিঝড়ের দেশ আমাদের এই মাতৃভূমি। সুতরাং বাসাতের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল সকলেই। এই ক্ষতিকর বাতাসকে অবশ্য

লাভজনক **এনার্জি** সূত্র হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব- যদি আমরা চাই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বাতাস-শক্তি (বায়ুবিদ্যুৎ) বা **উইন্ড পাওয়ার** আহরণের ব্যবস্থা ইতোমধ্যে গজে উঠেছে এবং দিন দিন তা বাড়ছে। পৃথিবীর মানুষ অনেক আগে থেকেই কিন্তু বাতাসকে বিভিন্ন মিল পরিচালনার জন্য কাজে লাগিয়ে আসছে। পশ্চিমা দেশে প্রায়শই বিরাট চক্রযুক্ত **উইন্ডমিল** চোখে পড়তো। এগুলো অবশ্য বাসাতের মধ্যে সৃষ্ট **কিনেটিক** এনার্জিকে সরাসরি **মেকানিক্যাল** এনার্জিতে রূপান্তর করতো।

আজকাল সে যুগের উইন্ডমিলের ব্যবহার আর অবশিষ্ট নেই। তবে নতুন ডিজাইনের **উইন্ড টারবাইন** থেকে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আমরা এখন এরূপ **উইন্ড টারবাইন** কিভাবে কাজ করে তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

আধুনিক বাতাসচালিত টারবাইন

দু'টি পদ্ধতিতে আধুনিক **টারবাইন** কাজ করে। প্রথমতঃ **রোটার ব্লেড** এভাবে **ডিজাইন** করা হয়েছে যাতেকের বাতাস একে ধাক্কা দিতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ ব্লেডটি যাতে বিমানের পাখার মতো বাতাসের চাপে উপরের দিকেও কিছুটা উঠে যায় সে ব্যবস্থাও আছে।



বাতাস থেকে এরূপ **উইন্ড টারবাইন** দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন মূলত খুব সহজ ব্যাপার। ব্লেডগুলো যখন বাতাসের গতিতে ঘুরতে থাকে তখন একটি গিয়ারবক্সের মাধ্যমে গতি বৃদ্ধি করে **টারবাইন** ঘুরানো হয়। আর টারবাইনের সাথে সংযুক্ত থাকে **জেনারেটর**। আমাদের দেশের মতো ঝড়-তুফানের অঞ্চলে

এরূপ মেশিন পরিচালনা সময় সময় কঠিনও হতে পারে। সুতরাং বাতাসের গতি অতিরিক্ত হলে মেশিনকে বন্ধ রাখা ও প্রয়োজনে ব্লেডের গতি নিয়ন্ত্রণ **টেকনোলজি** থাকা জরুরী। বর্তমানে ব্যবহৃত **উইন্ড টারবাইনে** ঠিক এ ধরনের ব্যবস্থা আছে।

বাতাসের গতি মাত্র **১২** মাইল (**১৯** কি.মি.) প্রতি ঘণ্টায় হলেই আধুনিক বাতাসচালিত **টারবাইন** বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম। অপরদিকে বাতাসের গতি যখন ৬০ মাইল (১০০ কি.মি.) প্রতি ঘণ্টা কিংবা বেশী হবে তখন **টারবাইন** স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ উচ্চ গতিসম্পন্ন বাতাস আর বাতাস থাকে না-তখন এটা ঝড় বা তুফান, বিধায় **টারবাইন অপারেশন** এ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। আমাদের দেশে **উইন্ড টারবাইন নেটওয়ার্ক** গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে কারণ, বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যেসব অঞ্চলে বাৎসরিক গড় বাতাসের গতি **১৩** মাইল (২১ কি.মি.) কিংবা বেশী হবে সেসব এলাকায় এরূপ **উইন্ড টারবাইন** লাভজনক হতে পারে। তাদের ধারণা এ শতকের মাঝামাঝি সময়ের দিকে পৃথিবীব্যাপী প্রচুর **উইন্ড টারবাইন** গড়ে ওঠবে। তখন আমাদের গ্রহের পুরো **এনার্জি** প্রয়োজনীয়তার **১০-১২%** হয়তো এসব **টারবাইন** থেকে আসবে।

বর্তমানে আমেরিকার কালিফোর্নিয়ায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ **'উইন্ড ফার্ম'** বিদ্যমান। এই বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে **১১২০** মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে থাকে যা একটি আধুনিক আনবিক **পাওয়ার স্টেশনের** সমান। ইউরোপের ডেনমার্কেও **উইন্ড টারবাইন** গজে উঠছে। এ পর্যন্ত দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২ থেকে ৩% বিদ্যুৎ **উইন্ড টারবাইন** থেকে উৎপাদন হচ্ছে। সুদূর পাড়াগাঁয়ে কিংবা ছোট-বড় দ্বীপে **উইন্ড টারবাইন** দ্বারা বিদ্যুৎ সৃষ্টি অনেকটা লাভজনক হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আর এভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন যে পারিপার্শ্বিকতার জন্য অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

এক সূত্র থেকে জানা গেছে বাংলাদেশে একটি **'বায়ুবিদ্যুৎ'** প্রকল্প ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী এটা বন্ধ আছে। হয়তো এ বই প্রকাশের সময় তা চালু হয়ে যেতে পারে। ফেনী জেলার দক্ষিণাংশে সোনাগাজী উপজেলায় এই বায়ুবিদ্যুতের প্রকল্পটি কার্যকরী করা হয়। এখানে **১৪০** ফুট উঁচু চারটি **টাওয়ার** নির্মিত হয়েছে। একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব ৩০০ মিটার। প্রতিটি

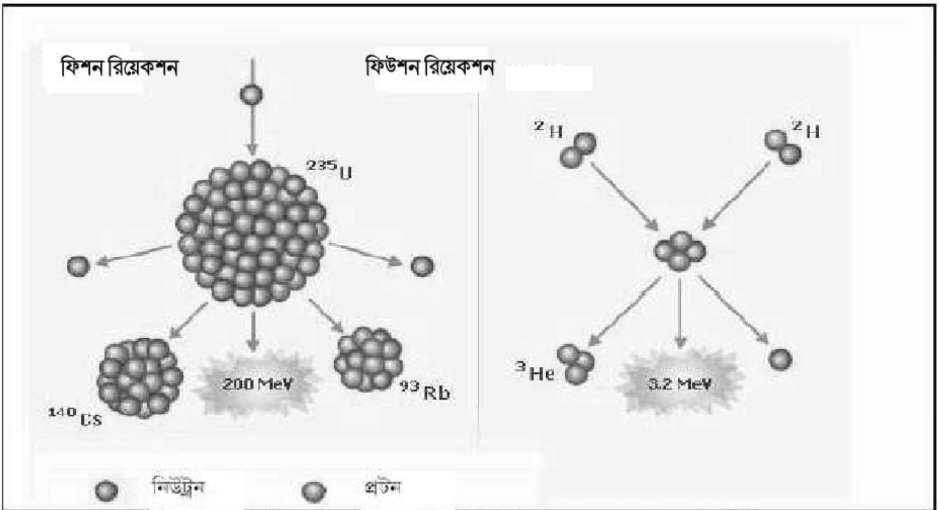
টাওয়ারে দেড় টন ওজনের পাখা আছে। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্রীডে প্রেরণের জন্য **জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার** আছে। চারটি ট্রান্সফরমারের এককেটির ক্ষমতা **১১** হাজার **কিলোভল্ট**। সবকিছু রেডি হওয়ার পরও তা বর্তমানে অজানা কারণবশত বন্ধ আছে বলে জানা গেছে। দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা কিছুটা অন্তত পূরণ করার ক্ষমতা রাখে এসব বাতাসচালিত **টারবাইন** ও **জেনারেটর**। এভাবে একটি প্রকল্প যে হাতে নেওয়া হয়েছে তা আমাদের জন্য বেশ আশাব্যঞ্জক ব্যাপার হলেও কার্যকরী না হওয়ায় হতাশ হতেই হয়। যা হোক হয়তো সব ঠিক হবে- আমরা তো আর আশা ছেড়ে দিতে পারি না?

অণুর কেন্দ্র থেকে এনার্জি

আমরা এ পর্যন্ত মানুষের **এনার্জি** চাহিদা মেটানোর বেশ ক'টি উপায়-অবলম্বন নিয়ে আলোচনা করেছি। বড় অঙ্কের **এনার্জি** হিসেবে আমরা বর্তমানে বিদ্যুৎ, **গ্যাস, পেট্রোল** এই তিনটি মূল সূত্র ব্যবহার করছি। এর মধ্যে বিদ্যুৎ কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করতে হবে। বাকী দু'টো সূত্র ভূগর্বে প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে পাওয়া যায়। এছাড়া আমরা নতুন কিছু টেকনোলজির উপর আলোচনা করেছি, যেমন সৌরশক্তি ও বাসাত শক্তি। আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিজ্ঞানীরা অপর একটি শক্তিশালী সূত্রের উদ্ভাবন করেছেন- তাহলো **নিউক্লিয়ার এনার্জি**। পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে এই **টেকনোলজি** আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিকভাবে **নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার** বা আনবিক চুল্লি মূলত এটম বোমা তৈরীর জন্য নির্মাণ করা হতো। ১৯৪৪ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকার হ্যানফোর্ড, ওয়াশিংটনে বোমা তৈরীর জন্য আনবিক চুল্লি নির্মিত হয়। এতে জ্বালানি ছিল **ইউরেনিয়াম** নামক পাদার্থ। আনবিক বোমা তৈরীর কৃত্রিম পদার্থ **প্লুটোনিয়াম** এই চুল্লি দ্বারা সৃষ্টি করা হতো। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আনবিক চুল্লিতে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তা থেকে বড় অঙ্কের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা অনুভব করে **নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন** নির্মাণ করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র আনবিক শক্তি এভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। **নিউক্লিয়ার সাইন্স** বা আনবিক বিজ্ঞান নিয়ে গভীর আলোচনা এ প্রসঙ্গে আদৌ সম্ভব নয়। তবে এই টেকনোলজির উপর একটা মোটামুটি ধারণা থাকা আমাদের দরকার। তাই পরবর্তী প্যারাসমূহে আমি অতি সংক্ষেপে আনবিক চুল্লির মৌলিক প্রযুক্তির উপর কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

আনবিক রিয়েকশন

দু'টি মূল প্রতিক্রিয়া বা **রিয়েকশন** থেকে আনবিক শক্তির উদ্ভব ঘটে। এর একটি হলো **'ফিশন'** ও অপরটি **'ফিউশন' রিয়েকশন**। **ফিশন** অর্থ অণুর বড় কোন কেন্দ্রকে বিভক্ত করা। আর **ফিউশন** অর্থ দু'টি অণুর ছোট্ট কেন্দ্রগুলো একত্রিত করা। উভয় রিয়েকশনে বিরাট অঙ্কের **এনার্জি** নির্গত হয়। এই এনার্জিকে **এমইভি** (মিলিয়ন্স অব **ইলেকট্রন** ভল্ট) হিসাবে মাপা হয়। নীচের ছবিটির প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। এতে উভয় ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে।



দু' ধরনের আনবিক রিয়েকশন ঃ ফিশন ও ফিউশন। উভয় রিয়েকশন থেকে প্রচুর এনার্জি নির্গত হয়।

আমরা জানি এটমের ভেতরে আছে খুব শক্তিশালী **পজিটিভ** চার্জসম্পন্ন একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রকে **নেগেটিভ** চার্জসম্পন্ন **ইলেকট্রন** প্রদক্ষিণ করে। কেন্দ্রে দু'টি সাব-এটমিক **পার্টিকেল** বা পরমাণু আছে যাদের একটি হলো চার্জহীন **নিউট্রন** ও অপরটি চার্জযুক্ত **প্রটন**। এ উভয় **পার্টিকেল** শক্তিশালী ফোর্সের দ্বারা কেন্দ্রে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কেন্দ্রের এই **বাইন্ডিং ফোর্স** খুব শক্ত- এটা **ইলেকট্রন** ও কেন্দ্রের মধ্যে সৃষ্ট শক্তি থেকে বহু বহু গুণ বেশী।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে এটমের উপর আলোচনা থেকে জেনেছি যে, কেন্দ্রের **‘ম্যাস নাম্বার’** [আমরা এ নাম্বারকে ‘A’ সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করবো] হলো- এতে ক’টি **নিউক্লিয়াস** [বা **প্রটন** ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা] আছে সেটা বুঝায়। **এটমিক নাম্বার** [যাকে আমরা ‘Z’ সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করবো] হলো- কেন্দ্রের মধ্যে ক’টি **পজিটিভ** চার্জসম্পন্ন **প্রটন** আছে তার একটি হিসাব। এখন আমরা এই হিসেব মতে কোন পদার্থকে এভাবে লিখতে পারি যথাঃ AU -সুতরাং 235U- এর অর্থ হলো **ইউরেনিয়াম-২৩৫**। এভাবে আমরা যে কোন পদার্থকে তার ম্যাস ও এটমিক নাম্বারসহ লিখতে পারি। বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, একটি অণুর কেন্দ্রের **বাইন্ডিং এনার্জি** [যুক্ত থাকার শক্তি] হলো তার **ম্যাস নাম্বার** (A) এর একটি **ফাংশন**। অর্থাৎ দু’টি পাতলা কেন্দ্রকে যদি আমরা নিউক্লিয়ার ফিউশনের মাধ্যমে একত্রিত করি তাহলে এ থেকে যেটুকু **এনার্জি** রিলিজ হবে তা নিম্নলিখিত সমীকরণ মতো হবে:-

$$2H + 2H \text{ ---> } 3He + 1n + 3.2MeV$$

উক্ত রিয়েকশনে 2H হলো **হাইড্রোজেন আইসোটপ ডিউটেরিয়াম**। এতে সৃষ্টি হবে একটি **হিলিয়াম-৩** [3He] এটম, একটি মুক্ত **নিউট্রন** ও 3.2MeV অব **এনার্জি** [দেখুন উপরের নক্সাটি]। এই রিয়েকশনকে বলে **‘ফিউশন রিয়েকশন’**। একইভাবে কেন্দ্র থেকে বিরাট অঙ্কের **এনার্জি** বের হয়ে আসে **‘নিউক্লিয়ার ফিশন’** রিয়েকশনেও। এটার ফর্মুলা হলো:-

$$1n + 235U \text{ ---> } 140Cs + 33Rb + 3\ 1n + 200MeV \text{ ------ক}$$

উক্ত রিয়েকশনে 235U হলো **ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটপ**। এতে একটি **সিজিয়াম-১৪০, রুবিডিয়াম-৩৩,** তিনটি ফ্রি **নিউট্রন** ও ২০০MeV **এনার্জি** সৃষ্টি হয়। উভয় রিয়েকশনই কৃত্রিম উপায়ে শুরু করতে হবে। প্রথমটি শুরু করতে বিরাট তাপ ও প্রেসারের প্রয়োজন- যা এই পৃথিবীতে আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের নিকটতম তারকা সূর্যের ভেতর এই অবস্থা বিরাজ করছে তাই সেখানে **নিউক্লিয়ার ফিউশন** সংঘটিত হচ্ছে- যার ফলে সূর্য জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করছে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বুকে এরূপ **রিয়েকশন** সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু এখনও নিয়ন্ত্রিত **ফিউশন রিয়েকশন** সম্ভব হয় নি। তবে নিউক্লিয়ার **ফিশন রিয়েকশন** নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা যদি সমীকরণ **ক** এর দিকে ভালো করে তাকাই তাহলে এতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লক্ষ্য করতে পারি- এ উভয়ই আনবিক চুল্লির মাধ্যমে **এনার্জি** নির্গতকরণের ক্ষেত্রে জরুরী। প্রথমতঃ বুঝাই যাচ্ছে প্রত্যেক **ফিশন** রিয়েকশনে বিরাট অঙ্কের **এনার্জি** রিলিজ হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাত্র **১ কিলোগ্রাম** ওজনের **ইউরেনিয়াম-২৩৫** থেকে ১৮.৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা তাপ শক্তি বের হয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ **ফিশন রিয়েকশন** শুরু করতে একটি মাত্র **নিউট্রন** ব্যবহারের ফলে গড়ে ২.৫টি **নিউট্রন** কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসে- যা অন্য কেন্দ্রের উপর পতিত হয়ে আরোও রিয়েকশনের জন্ম দেয়। এভাবে একটি **চেইন রিয়েকশন** শুরু হয়। সুতরাং এই চেইন রিয়েকশনকে যদি আমরা কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তাহলে বিরাট অঙ্কের **এনার্জি** আহরণ সম্ভব। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ না করলে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে [যা ইচ্ছে করে ঘটানো হয় আনবিক বোমায়]।

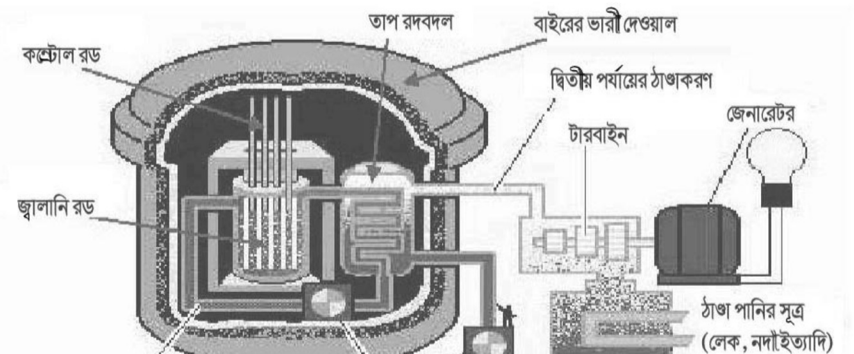
ফিশন রিয়েকশনকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে বিজ্ঞানীরা অন্য কোন পাতলা এটমের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘর্ষ ঘটিয়ে থাকেন। সাধারণত **হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম** বা কার্বনের **নিউক্লিয়াস** দ্বারা এ কাজ করা হয়ে থাকে।

নিউক্লিয়ার রিয়েকটার [আনবিক চুল্লি]

নিউক্লিয়ার এনার্জি সংগ্রহ ও ব্যবহারে বিভিন্ন ধরনের **রিয়েকটার** বা চুল্লি ব্যবহৃত হয়। এগুলোর ভিন্নতা নির্ভর করে কোন্ ধরনের জ্বালানি, **মডারেটর** (নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি) ও **কুলেন্ট** (ঠাণ্ডাকরণ) ব্যবহৃত হবে- তার উপর। **মডারেটর** ও **কুলেন্ট** হিসেবে যখন উচ্চমানের '**পিউরিফাইড**' [বিশুদ্ধ করা] পানি ব্যবহার করা হয় তখন এই সিস্টেমকে '**লাইট ওয়াটার রিয়েকটার**' [LWR] বলা হয়। অপর আরেকটি সিস্টেম আছে যেখানে পানিকে উচ্চ চাপযুক্ত করা হয়। এরূপ **রিয়েকটারকে** বলে '**প্রেসারাইজ্‌ড ওয়াটার রিয়েকটার**' [PWR]। এ সিস্টেমে **কুলেন্ট** হিসেবে ব্যবহৃত পানিকে বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় ১৫০ গুণ বেশি চাপযুক্ত করা হয়। এরপর তা রিয়েকটারের '**কোর**' [কেন্দ্র] এর ভেতর দিয়ে **পাম্প** করে নিয়ে আসা হয় যার ফলে এর তাপমাত্রা ৩২৫ ডিগ্রী **সেন্টিগ্রেড** পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। এই সুপার-তাপযুক্ত পানিকে একটি **হিট-এক্সচেঞ্জ** দ্বারা আরেকটি দ্বিতীয় পর্যায়ের পানিচক্রের মাধ্যমে

এটাকে বাস্পে পরিণত করে এর দ্বারা বৈদ্যুতিক **জেনারেটর** ঘুরানো হয়। নিম্নের ছবিটি দেখুন।

আমরা জানি আনবিক চুল্লির সঙ্গে তেজস্ক্রিয়া জড়িত। এর কারণ হলো **নিউক্লিয়ার** রিয়েকশনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয়া নির্গত হয় যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নিউক্লিয়ার চুল্লির ভেতর অবশ্য বিরাট তেজস্ক্রিয়তা বিদ্যমান। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের পানিচক্রে কোন তেজস্ক্রিয়া থকে না। সুতরাং সেখানে কর্মরত ব্যক্তিরা অনেকটা নিরাপত্তার মধ্যেই কাজ করতে পারেন। এরপরও আনবিক চুল্লির ব্যবহার অনেক ঝুকিপূর্ণ ব্যাপার। উচ্চ পর্যায়ের কর্মদক্ষ আনবিক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের একটি টীম না হলে এরূপ চুল্লি নির্মাণ, পরিচালনা ও এ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন আদৌ সম্ভব নয়।



এবার আমরা উপরোক্ত ছবি মুতাবিক **রিয়েকটার** কিভাবে কাজ করে তার উপর আরো একটু বর্ণনা তুলে ধরবো। রিয়েকটারের কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করুন। সেখানে সাদা ও অপর আরেকটি রড দেখাচ্ছে। সাদাটা হলো তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন জ্বালানি ও অপরটি

হলো নিয়ন্ত্রণ করার রড। কতটুকু রিয়েকশনের প্রয়োজন তা ঐসব **কন্ট্রোল রড** দিয়ে করা হয়- এগুলো উপরে কিংবা নীচের নিকে ওঠানামা করিয়ে। আসলে এই **কন্ট্রোল রড** হলো **মডারেটর**- অর্থাৎ এর দ্বারা চেইন রিয়েকশনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। **কুলেন্ট** বা ঠাণ্ডাকরণ প্রক্রিয়ায় দু'টি পানিচক্র ব্যবহৃত হয়। প্রথমটিতে পানি কোর (কেন্দ্র), তাপ **এক্সেঞ্জার** হয়ে আবার কোরে **পাম্প** করে নেওয়া হয়। তাপ **এক্সেঞ্জারে** কয়েলের ভেতর দিয়ে চলন্ত গরম পানি দ্বারা কিছু পানি বাস্পে পরিণত হয়ে বেরিয়ে এসে **ইলেকট্রিক** উৎপাদনের জন্য টাবরাইনকে ঘুরিয়ে দ্বিয়ীয় পানি চক্রের মাধ্যমে তাপ এক্সেঞ্জার এর মধ্যে ফিরে যায়। ইতোমধ্যে অবশ্য বাইরের ঠাণ্ডা পানি দ্বারা বাস্পকে ঠাণ্ডা করে আবার তরল পানিতে রূপান্তর করা হয়। পানির উভয় চক্রকে **পাম্প** দ্বারা পরিচালনা করতে হবে। এরূপ রিয়েক্টারই আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

অপর একটি **রিয়েক্টার** হচ্ছে **'বয়েলিং ওয়াটার রিয়েক্টার'** [BWR]। এটাও উপরে বর্ণিত রিয়েক্টারের মতোই। তবে পানিকে কোরের মধ্যেই উচ্চ তাপসম্পন্ন করে পাইপের মাধ্যমে বের করে নিয়ে আসা হয়। অর্থাৎ মাঝখানে অতিরিক্ত কোন তাপ পরিবর্তন সিস্টেম নেই। বাস্পে পরিণত পানি দ্বারা **জেনারেটর** ঘুরিয়ে তা ঠাণ্ডা করে তরল পানিতে রূপান্তর শেষে আবার কোরে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে রিয়েক্টারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা পানি তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন থাকে। তবে এরূপ রিয়েক্টারের কর্মদক্ষতা [**এফিসিয়েন্সি**] অনেক বেশী। অন্যান্য পানি নিয়ন্ত্রিত রিয়েক্টারের মতো এরূপ সিস্টেমেও **কনডেন্সার** [ঠাণ্ডাকরণ ব্যবস্থা] এর সাথে যুক্ত থাকে কোন একটি লেক বা নদীর পানি।

আধুনিক যুগে গবেষণা ও শিক্ষার জন্য কিছু ছোট্ট সাইজের **নিউক্লিয়ার রিয়েক্টার** উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলো বানিয়ে অপারেশনাল করা অনেকটা সস্তা। এসব রিসার্চ **রিয়েক্টার** দ্বারা তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন **আইসোটপ** উৎপাদন করা হয়। এদের ক্ষমতা **১** মেগাওয়াট এর মধ্যে সীমিত থাকে। ছোট্ট হওয়ার ফলে এগুলো পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সহজ। এসব রিয়েক্টারের মধ্যে **'পুকুর রিয়েক্টার'** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এটা প্রায় দেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

অপর এক ধরনের **রিয়েক্টার** আছে যাকে **'ব্রিডার রিয়েক্টার'** বলে। **নিউক্লিয়ার** রিয়েক্টারের জ্বালানি হলো **ইউরেনিয়াম**। প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ হিসাবে এর মাত্রা খুব

সীমিত। সুতরাং বিজ্ঞানীরা রিয়েক্টারের জ্বালানি তৈরীর চুল্লি আবিষ্কার করেছেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ে **'বিটা ডিকে'** নামক তেজস্ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছি। **ইউরেনিয়াম-২৩৮** হলো প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ। এটা **'ফিশনেবোল'** পদার্থ তাই এর দ্বারা আনবিক চুল্লির জ্বালানি সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম উপায়েও **'ফিশনেবোল'** পদার্থ তৈরী সম্ভব- যা পরবর্তীতে **নিউক্লিয়ার** রিয়েক্টারে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এরূপ একটি হলো **প্লুটোনিয়াম**। যে রিয়েকশনের মাধ্যমে তা ঘটে সেটা হলো ঃ

235U + 1n ---> 239U ---> 239Np ---> 239Pu ------খ

উপরের রিয়েকশনে প্রথমে **ইউরেনিয়াম-২৩৮** এর কেন্দ্রে ফ্রি **প্রটন** সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে **ইউরেনিয়াম আইসোটপ ইউরেনিয়াম-২৩৯** এর সৃষ্টি হয়, একই সাথে এই **রিয়েকশন বিটা পার্টিকেল** রিলিজ করে। এই **বিটা পার্টিকেল 'নেপটোনিয়াম-২৩৯'** তৈরী করে যা আবার **বিটা পার্টিকেল** রিলিজ করে সৃষ্টি করে **প্লুটোনিয়াম-২৩৯**। এই প্লুটোনিয়ামকে পরবর্তীতে আনবিক চুল্লির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আনবিক চুল্লির উপর আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রায় শেষ। আরো এক দু'টু ব্যাপার আমাদের জানা থাকা দরকার। **নিউক্লিয়ার এনার্জি** যদিও শোনতে ও দেখতে বেশ র‍্যোমান্টিক মনে হয়- আর অবশ্যই এটা উচ্চ পর্যায়ের একটি **টেকনোলজি**। তথাপি এটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের **এনার্জি** চাহিদা মেটাবে বলে অনেকেই মনে করেন না। দু'টি কারণে বিজ্ঞানীরা আনবিক শক্তির প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন। প্রথমতঃ এই **টেকনোলজি** মারাত্মক তেজস্ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেফটি বা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সহজ নয়। পৃথিবীর মানুষ আনবিক চুল্লিতে কোন ধরনের দুর্ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি ইতোমধ্যে দেখেছে। আমেরিকার পেনিসিলভানিয়ার **'থ্রি মাইল আইল্যান্ড' নিউক্লিয়ার** দুর্ঘটনা [১৯৭৯] এবং রাশিয়ার **চেরনোবিল** দুর্ঘটনার [১৯৮৬] কথা কে না জানে। প্রথম দুর্ঘটনায় কেউ সরাসরি ক্ষতির সম্মুখীন বা হতাহত হয় নি কিন্তু এ থেকে বুঝা গেছে যে, অনুরূপ কোন অনিয়ন্ত্রিত আনবিক দুর্ঘটনা অত্যন্ত মারাত্মক হবে। এছাড়া প্রথম দুর্ঘটনায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার। মারাত্মক দুর্ঘটনার জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের [বর্তমান ইউক্রেনে] চেরনোবিলে স্থাপিত চারটি আনবিক চুল্লির মধ্যে একটি, এক বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়। এতে পুরো দক্ষিণ ইউরোপ ও স্কেন্ডানাভিয়াব্যাপী তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন বস্তু ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ইউরোপে মহা আতঙ্ক

সৃষ্টি হয় ও চেরনোবিল এবং আশপাশের এলাকা থেকে দেড় লক্ষাধিক মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়েছে। দুর্ঘটনায় মোট ৩০ জন প্রাণ হারান।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো চুল্লি থেকে নির্গত **'নিউক্লিয়ার বর্জ্য'**। ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়াসম্পন্ন এসব বর্জ্য কোথায় কিভাবে **'ডাম্প'** করা হবে এ নিয়ে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কর্তৃপক্ষ। **'ইন্টারনেশন্যাল এটমিক এনার্জি এজেন্সি'** নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এসব ব্যাপারে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ছাড়াও আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এখন **'আনবিক বোমা'** তৈরীর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল এবং দক্ষিণ কোরিয়া **'নিউক্লিয়ার ক্লাবের'** সদস্য হয়ে গেছে। এই ক্লাবের মেম্বার হতে ইরানও আগ্রহী। হয়তো এই লেখা প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তারা সফল হয়ে যাবে। সুতরাং **নিউক্লিয়ার এনার্জি** এখন আনবিক বোমা বানানোর পদ্ধতি হিসেবেই বেশি কাজে লাগানো হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়তো আর বেশিদিন স্থায়ী থাকবে না।

জেনারেটর ও মোটর

আমরা ইতোমধ্যে **এনার্জি** সৃষ্টির বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের উপর বেশ কিছু বর্ণনা তুলে ধরেছি। আমরা দেখেছি মৌলিকভাবে এনার্জির প্রয়োজনীয়তা মূলত বিদ্যুৎ থেকেই মেটানো হয়। তাই আমরা তাপবিদ্যুৎ থেকে বাতাসচালিত **টারবাইন** (বা বায়ুদ্যিুৎ) পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেছি। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আসলে **পটেনশিয়াল** (সম্ভাব্য) কিংবা **কিনেটিক** (গতির সঙ্গে সম্পর্কিত) এনার্জিকে রূপান্তর করে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। এ কাজ করতে যেয়ে পানি, খনিজ জ্বালানি, বাতাস, সৌরশক্তি ইত্যাদি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে **টারবাইন** ঘুরিয়ে **ইলেকট্রিক** উৎপাদনের জন্য **'জেনারেটর'** চালনা একান্ত জরুরী। এরপর এই **ইলেকট্রিসিটি** থেকে পুনরায় **মেকানিক্যাল** কাজের জন্য **'মোটর'** দরকার। সুতারং বুঝাই যাচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে **জেনারেটর** ও মোটরের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা বেশি- তাই আমরা এখন এই দু'টি যন্ত্রের মৌলিক প্রিন্সিপালের উপর আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

বিদ্যুৎ জেনারেটর

বিদ্যুৎ জেনারেটরের কাজ হলো **মেকানিক্যাল** (গতির সাথে সম্পর্কিত) এনার্জিকে বিদ্যুতে রূপান্তর। যে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশেষ **ইঞ্জিন** হলো এটি। অর্থাৎ **পাওয়ার** লাইনে বিদ্যুৎ পৌঁছার পূর্বে এই মেশিনই তা উৎপাদন করে। পূর্বের যতো আয়োজন এই মেশিনকে ঘুরানোর জন্য- আর কিছু নয়।

অলটারনেটর ও ডাইনামো বিদ্যুৎ উৎপাদন করে বলে এগুলোকেও **জেনারেটর** পর্যায়ভুক্ত করা যায়। দু'টি আলাদা প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে **জেনারেটর** ও **মোটর** কাজ করে। এর প্রথমটি হলো: **ইলেকট্রমেগনেটিক ইন্ডাকশন**। ইংরেজী এই শব্দদ্বয় শোনতে বেশ কঠিন মনে হয়। আসলে তা মোটেই নয়। এই প্রিন্সিপালের অর্থ যা, তা এই: কোন চুম্বকীয় ফিল্ডের মধ্যে বিদ্যুৎ চলে এমন কোন কন্ডাকটারকে যদি চলন্তাবস্থায় রাখা হয়, তখন ঐ কন্ডাকটারের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। দ্বিতীয় প্রিন্সিপালটি হলো: **ইলেকট্রমেগনেটিক রিয়েকশন**- এটাও তেমন কঠিন কোন কথা হয়। এর অর্থ উপরে উল্লেখিত প্রথমটির উল্টো ইফেক্ট : **মেগনেটিক ফিল্ডে** স্থাপিত কোন কন্ডাকটারের মাধ্যমে **কারেন্ট** চালনা করলে ফিল্ড থেকে একটি **মেকানিক্যাল** শক্তি ঐ কন্ডাকটারের উপর ক্রিয়া করবে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে প্রথম **প্রিন্সিপালটি** **'জেনারেটর'** এর ক্ষেত্রে ও দ্বিতীয়টি **'মোটর'** এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন আমরা **জেনারেটর** সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যাদি তুলে ধরবো।



উপরের চিত্রটির প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখাই যাচ্ছে **এসি (অলটারনেটিং কারেন্ট)** জেনারেটরের মৌলিক ক'টি অংশ আছে : স্থায়ী চুম্বক, কয়েলসর্বস্ব **আরমেচার** ও **ব্রাশ**। স্থায়ী চুম্বক থেকে সৃষ্ট মেগনেটিক ফিল্ড আরমেচারের কয়েলে (বা তারে) **কারেন্ট** পরিচালনা করে। ব্রাশ দ্বারা এই **কারেন্ট** সংগ্রহ করে **ইলেকট্রিক** সার্কেটে নিয়ে যাওয়া হয়। **কারেন্ট** বের হয়ে **ইলেকট্রিক** মেশিন বা যন্ত্রপাতি পরিচালনা শেষে আবার ফিরে আসে। এটা আশাকরি বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, **আরমেচার** কয়েল যখন পূর্ণ একটি চক্কর দেবে তখন এক অর্ধেকে **কারেন্ট** একদিকে চলবে আর অপর অর্ধেকে চলবে বিপরিত দিকে। এভাবে চলাকে বলে **অলটারনেটিং কারেন্ট**। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে **ডিসি (ডাইরেক্ট কারেন্ট)** তথা একদিকে **কারেন্ট** চালাতে হলে আরমেচারকে বিশেষভাবে **ডিজাইন** করতে হবে। আরমেচারে **কমিউটেটর** নামক ব্যবস্থা থাকলে এসি **জেনারেটর** ডিসিতে রূপান্তর হবে।

বৈদ্যুতিক মোটর

মোটর আসলে বিদ্যুৎ জেনারেটরের বিপরিতভাবে কাজ করে। যেখানে **জেনারেটর** **মেকানিক্যাল** এনার্জিকে (অর্থাৎ **আরমেচার** ঘুরিয়ে) **ইলেকট্রিসিটি** বা **কারেন্ট** তৈরী করে সেখানে, **মোটর** বিদ্যুৎ দ্বারা আরমেচারকে ঘুরিয়ে **মেকানিক্যাল এনার্জি** তৈরী করে।



উপরের ছবিটির প্রতি লক্ষ্য করুন। আসলে **মোটরকে** আমরা **জেনারেটর** বলতে পারি- তবে উল্টো দিকে পরিচালিত। উভয় যন্ত্র থেকে **এনার্জি** বেরিয়ে আসে। প্রথমটি থেকে আসে **ইলেকট্রিক** ও দ্বিতীয়টি থেকে **মেকানিক্যাল** এনার্জি। ডিসি (বা ডাইরেক্ট কারেন্ট) মোটরের **আরমেচার** একদিকে ঘুরে- আর এসি মোটরও একদিকে ঘুরে। **আরমেচার ডিজাইন** থেকেই এটা সম্ভব। আরমেচারে থাকে একদিকে চলন্ত **কারেন্ট**। ফলে মেগনেটিক ফিল্ড এতে একটি ফোর্স সৃষ্টি করে ও পুরো আরমেচারকে ঘুরাতে থাকে। ডিসি **মোটর** ও জোনারেটর স্ট্রার্ট দিতে আরো কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়।

বড় বড় **পাওয়ার স্টেশনে** সাধারণত এসি **জেনারেটর** দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। এসি **জেনারেটর** ব্যবহার অনেকটা নিরাপদ, কারণ ডিসি **জেনারেটর** উচ্চ গতি ও **কারেন্ট** ব্যবহারের জন্য তেমন নিরাপদ নয়। এছাড়া আরেকটি ব্যাপার হলো জেনারেটরে আরমেচারকে না ঘুরিয়ে একাধিক চুম্বকের তৈরী **'রোটার'** ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মেগনেটিক ফিল্ডই ঘুরে, আর স্থির আরমেচারে চলন্ত **কারেন্ট** সরাসরি সংগ্রহ করা হয়।

পরিচ্ছেদ ৩

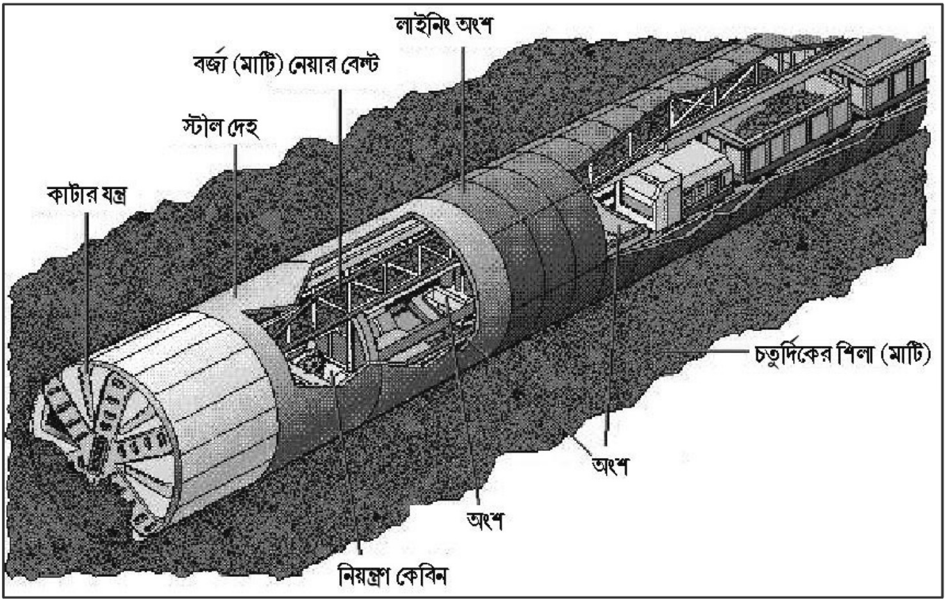
কন্সট্রাকশন প্রযুক্তি

বিল্ডিং **ডিজাইন** ও ইঞ্জিনিয়ারিংকে মূলত **'আরকিটেকচার'** বা স্থাপত্যশিল্প বলে। স্থাপত্যশিল্প সফল হয় টেকনোলজির মাধ্যমে- অন্য কথায় আধুনিক যুগে কোন স্থপতি যখন বিল্ডিং, সেতু ইত্যাদি ইমারত জাতীয় **ডিজাইন** করবেন তখন তাকে অবশ্যই নির্মাণ প্রযুক্তি ও প্রাপ্য যন্ত্রপাতি এবং **মেটেরিয়েল** সম্পর্কে পুরোদমে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।

কন্সট্রাকশন প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত আছে: খনিজ সম্পদ উদ্ধারের জন্য কিংবা **ট্যানেল** তৈরীতে মাটির নীচে খননকাজ; সেতু, বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি **সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং;** ছোট থেকে বড় আয়তনের **রেসিডেনশিয়াল ও কমার্শিয়াল** বিল্ডিং বা ইমারত নির্মাণ কাজ ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কাজ। আমরা এ পরিচ্ছেদে এসব কাজের মৌলিক বিষয়বস্তু তুলে ধরবো।

ট্যানেল কন্সট্রাকশন

যেসব ক্ষেত্রে **ট্যানেল** ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো : রাস্তার **ট্রাফিক, রেলরোড, সাবওয়ে,** পানি **ট্রান্সপোর্ট,** গ্যাস, তৈল, নর্দমা, বাধ থেকে পানি অন্যদিকে নেওয়া ইত্যাদি। **ট্যানেল** তৈরী কোন একসময় অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ ছিল। আগের দিনে পাহাড়ের নীচ দিয়ে রেল **ট্যানেল** তৈরী করতে যেয়ে অনেক শ্রমিক প্রাণও হারিয়েছেন। আধুনিক যুগে **অটোমেটিক** মেশিনের মাধ্যমে **ট্যানেল** করা হয়- এতে ব্যক্তিগত ঝুকির মাত্রা অনেকটা কমে গেছে।



উপরের ছবিতে আমরা একটি **ট্যানেল** করার মেশিন দেখতে পাচ্ছি। এটাকে **'মৌল্'** বলেও সম্বোধন করা হয়। এই মেশিনটির সামনে শক্তিশালী **'কাটারহেড'** ব্লেইড আছে। এগুলো ঘুরে ঘুরে সামনের শিলাপাথর কেটে অগ্রসর হয়। সাথে সাথে মাটি ও গুড়ো বর্জ্য একটি **'কনভেয়ার বেল্ট'** এর মাধ্যমে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। ট্যানেলকে অবশ্য সাথে সাথে পাকার কাজের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। মৌল্ সামনের দিকে **ট্যানেল** কেটে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ইঞ্জিনিয়াররা শক্তিশালী **কংক্রিট** কাঠামো নির্মাণ করেন। বড় ও দীর্ঘ **ট্যানেল** নির্মাণকালে সাধারণত দুই দিক থেকে দু'টি মৌল্ একসঙ্গে কাজ করে থাকে। আধুনিক যুগে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী **ইংলিশ চ্যানেলের** নীচ দিয়ে ৩২ মাইল (৫০.৪ কি.মি.) একটি দীর্ঘ **ট্যানেল** তৈরীর বিরাট **ইঞ্জিনিয়ারিং** কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। এই ট্যানেলটির ভেতর দিয়ে প্রত্যহ ৬০০টি উচ্চ গতিসম্পন্ন ট্রেন চলাচল করে। ট্যানেলের মাঝখানে গভীরতা ২৬২৫ ফুট (৮০০ মিটার)। **'ইউরোট্যানেল'** নামক এই বিরাট **কন্সট্রাকশ** কাজ ১৯৮৭ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৪ সালে শেষ হয়। এতে মোট খরচ হয়েছে ১৫ বিলিয়ন পাউন্ড।

পৃথিবীর দীর্ঘতম কয়েকটি ট্যানেল

নাম	দৈর্ঘ্য (কি.মি. / মাইল)	দেশ / অঞ্চল	নির্মাণ সমাপ্তির বৎসর
সিকান	৫৪ / ৩৪	জাপান	১৯৮৫
চ্যানেল টানেল	৫১ / ৩২	ইউকে-ফ্রান্স	১৯৯৪
ডাই-শিমুজু	২৩ / ১৪	জাপান	১৯৭৯
সিমপ্লোন (১ ও ২)	১৯ / ১২	সুইজারল্যান্ড-ইতালি	১৯০৬ / ১৯১২
কানমন	১৯ / ১২	জাপান	১৯৭৫
আপেনাইন	১৮ / ১১	ইতালি	১৯৩৪
রক্কো	১৬ / ১০	জাপান	১৯৭২
ম্যাকডলান্ড পাহাড়	১৫ / ৯	কানাডা	১৯৮৯
হকুরিকু	১৪ / ৯	জাপান	১৯৬২
কাসকেইড	১৩ / ৮	আমেরিকা	১৯২৯

রাস্তা ও মহাসড়ক

রোড এর বাংলা রাস্তা ঠিকই কিন্তু **‘মোটরওয়ে’** বা **‘হাইওয়ে’** এর বাংলা মহাসড়ক দিয়ে হয় না। বাংলাদেশে আজো সত্যিকার অর্থে কোন **মোটরওয়ে** তৈরী হয় নি। **মোটরওয়ে** মূলত **ইন্টারসিটি** রাস্তা। এতে খুব উচ্চগতিতে গাড়ি চলতে পারে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে গড়ে ওঠেছে দীর্ঘ ও বড় বড় **মোটরওয়ে**। এগুলো কন্সট্রাকশনে প্রয়োজন হয় সুপরিকল্পিত **ইঞ্জিনিয়ারিং** প্রকল্প।

নির্মাণ যন্ত্রপাতি

রাস্তা তৈরীতে আধুনিক যুগে **কন্সট্রাকশন** ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। এরমধ্যে সবার জানা **'বুলডোজার'** এবং অনেকের অজানা **'আসফাল্ট পেইভার'** (গালা দেওয়ার মেশিন) উল্লেখযোগ্য। সড়ক নির্মাণে আরো কিছু যন্ত্র ব্যবহৃত হয়- এর মধ্যে রাস্তাকে খোঁড়ার জন্য ভারী ড্রিল, মাটি সরানোর মেশিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



রাস্তা নির্মাণ

রাস্তা নির্মাণ পদ্ধতি হতে হবে সঠিক- অন্যথায় খুব অল্পদিনের মধ্যে তা আবার ভেঙ্গে পড়তে পারে- গর্ত সৃষ্টি হতে পারে। নিম্নে রাস্তা নির্মাণের একটি নক্সা দেওয়া হলো। এটা দেখে পাঠকরা বুঝতে পারবেন নির্মাণের প্রযুক্তিটি।



সেতু নির্মাণ প্রযুক্তি

সিভিল **ইঞ্জিনিয়ারিং** এর আওতাভুক্ত সেতু নির্মাণ প্রযুক্তিও আজকাল অত্যাধুনিক উপায়ে কাজে লাগানো হচ্ছে। সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট **ডিজাইন** ব্যবহৃত হয়, এগুলো হলো: **বীম, কেন্টিলিভার** (বহির্বাহু), **আর্চ** (ধনুকাকৃতি), **ট্রাস** (ছাদ), **সাসপেনশন** (ঝুলন্ত), **কেবুল-স্টেইড** (রজ্জু-আটকানো), **মোবেবুল** (চালনীয়) ও **ফ্লোটিং** (ভাসমান)।



কেবল-স্টেইড সেতু (সাসপেনশনের অনুরূপ)

বীম

এটা হলো সেতু ডিজাইনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সাধামাটা। এ সেতুতে শক্তিশালী **হরাইজোন্টেল** বা অনুভূমিক বীম থাকে। বীমের সাপোর্টের জন্য থাকে উভয় দিকে সোজা খাড়া ভারবাহী স্তম্ভ (যাকে বলে পিয়ার্স) অথবা নদী কিংবা খালের পারকেও স্বাভাবিক সাপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করা হতে পারে। রাস্তা নির্মাণে এই বীম সেতুর ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায়। বীম সেতু ১০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে- তবে শক্তিশালী বীমের মাধ্যমে আরও দীর্ঘ সেতু নির্মাণ সম্ভব।

কেন্টিলিভার

এটা মূলত বীম সেতুভিত্তিক জটিলতর **ডিজাইন**। এরূপ ডিজাইনে দু'ধারে দু'টি (বা ততোধিক) **টাওয়ার** তৈরী করা হয়। সেতুটি এসব টাওয়ারের উপর ভিত্তিকরে বাইরের দিকে **কেন্টিলিভার** দ্বারা নির্মিত হবে। প্রতিটি **কেন্টিলিভার** হস্তের যাবতীয় ওজন **টাওয়ার** সমর্থন করে। এরূপ সেতু তৈরীর সময় অতিরিক্ত সাপোর্ট দিতে হয় না- অর্থাৎ এগুলো নিজেই নিজেকে সাপোর্ট করে। সুতরাং নির্মাণকালে যদি অস্থায়ী সাপোর্ট দেওয়া কঠিন হয়- তাহলে ওসব ক্ষেত্রে **কেন্টিলিভার** সেতু তৈরী করা যেতে পারে।

আর্চ

এটা পুরাতন স্টাইল। একাধিক আর্চ বা ধনুকাকৃতির খিলান দ্বারা সেতুকে রক্ষা করা হয়। এ ধরনের সেতু কিন্তু অনেক দিন স্থায়ী থাকে। এখনও পর্যন্ত হাজার হাজার বছর পুরাতন আর্চ সেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান আছে। এই সেতুর যাবতীয় ওজন আর্চের উপর থেকে দু'দিকে যেয়ে সাপোর্টের উপর পতিত হয়। আর্চ সেতু নির্মাণে পাথর, ইট, কাষ্ঠ, লৌহ, স্টীল ও কংক্রিট ব্যবহার করা যায়।



ট্রাস

এই সেতুর **ডিজাইন** মূলত ছাদের মতো। ছাদের মাধ্যমে পুরো সেতুকে লটকানো হয়। কোণসর্বস্ব বীম দ্বারা ট্রাস **ডিজাইন** করে সেতুর ওজন বীমগুলোর উপর সমভাবে

বিতরণ করা হয়। ট্রাস দ্বারা বীম, **কেন্টিলিভার** ও আর্চ সেতুও নির্মাণ করা যায়। এ ধরনের সেতু ভারী ওজন বহন করতে সক্ষম, অপরদিকে এগুলো নির্মাণে তুলনামূলক কম খরচ হয় এবং তা পাতলাও হবে।


একটি ট্রাস সেতু

সাসপেনশন

এই সেতুটি হলা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। একাধিক টাওয়ারের উরপ পুরো সেতুটি ঝুলন্ত থাকে। খুব বড় দু'টি ধাতুর তৈরী কেব্‌ল বা রজ্জু টাওয়ারের সঙ্গে বেঁধে এগুলো থেকে সেতুর দু'ধারে অসংখ্য ছোট্ট রজ্জু দ্বারা সেতুটি লটকানো হয়।



লম্বা লম্বা সেতু নির্মাণে ঝুলন্ত **ডিজাইন** ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপ সেতু কিন্তু একই সঙ্গে ভারী ওজন বহন করতে পারে না। সেতুর মধ্যে কম্পন শুরু হতে পারে- এমনকি তা ভেঙ্গেও পড়া অস্বাভাবিক নয়। এরূপ একটি প্রখ্যাত ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকায়। ওয়াশিংটনের নিকটস্থ টাকোমা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ ২ বছর নির্মাণকাজ শেষে **১**ম জুলাই **১৯৪০** সালে **"টাকোমা নারো ব্রিজ"** নামক ঝুলন্ত সেতুটি সবার জন্য খোলে দেওয়া হয়। মাত্র ৪ মাস পরে ৫৯৪০ ফুট দীর্ঘ এই সেতুটি ঝড়ের কবলে পড়ে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়, অথচ বাতাসের গতি ছিলো মাত্র ৪২ মাইল প্রতি ঘণ্টা। **ইঞ্জিনিয়ারিং** ডিজাইনে ভুল থাকার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

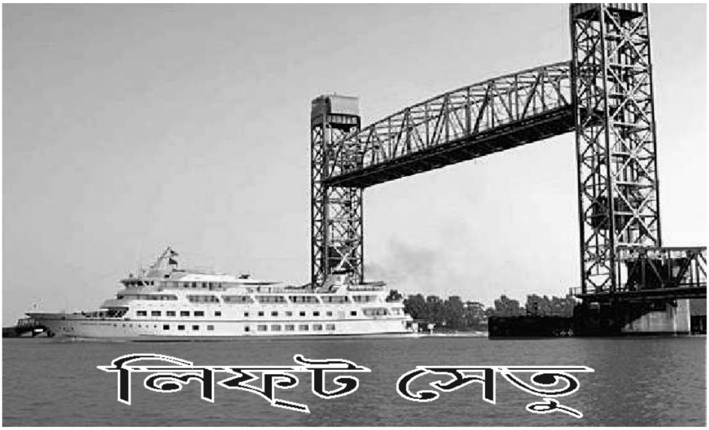
কেব্‌ল-স্টেইড

এটা দেখতে অনেকটা **সাসপেনশন** সেতুর মতোই। আসলে এটা **সাসপেনশন** সেতুর একটি শাখা **ডিজাইন** বলাও চলে। বিরাট উঁচু টাওয়ারের উপরই পুরো সেতুর ওজন পড়ে- আর তা করতে যেয়ে টাওয়ারের সাথে রাস্তার অংশ সরাসরি কেব্‌ল দ্বারা সংযুক্ত রাখতে হয়।

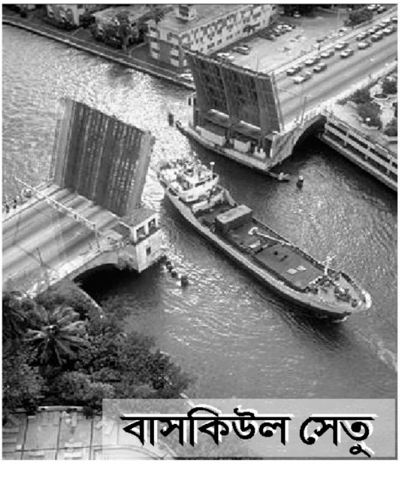
মোবেবুল

আপনারা সবাই লন্ডনের প্রখ্যাত **টাওয়ার** ব্রিজের কথা শোনেছেন এবং এর ছবিও দেখেছেন নিশ্চয়। এ সেতুটি অনেক আগের তৈরী। টেম্‌স নদীর উপর নির্মিত এই সেতুটির বৈশিষ্ট্য হলো মূল রাস্তার অংশ খুলে ছোট ছোট জাহাজ বা বড় নৌকা চলার সুবিধা করে দেওয়া। এরূপ সেতুকেই বলে মোবেবুল বা চালনীয় সেতু।

তিন ধরনের চালনীয় সেতু আছেঃ **বাসকিউল, ভারটিক্যাল-লিফ্‌ট ও সুইং**। প্রথমটি মাঝখানে খুলে যেয়ে নৌকা, ছোট্ট জাহাজ ইত্যাদি চলাচলের সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয়টিতে মূল অংশ সোজা উপরের দিকে উঠানোর ব্যবস্থা আছে। এরূপ সেতুর দু'ধারে **টাওয়ার** থাকে। বিদ্যুতচালিত লিফটের মাধ্যমে উভয় **টাওয়ার** একসঙ্গে পুরো সেতু অংশটি বেশ উপরে ওঠিয়ে নেয়। সুইং সেতু মাঝখানে ঘুরে উভয় দিকের স্রোতস্বিনী সম্পূর্ণ খুলে দেয়। এরূপ সেতু অবশ্য খুব একটা দীর্ঘ করা যায় না- তবে যে কোন উচ্চতার জাহাজ চলাচলে এরূপ সেতুর বিকল্প নেই।







তিন ধরনের সেতুঃ
১. লিফ্‌টঃ এটা জাহাজ চলাচলের জন্য প্রয়োজনে উপরে ওঠে যায়। ২. এটা ঘুরে নৌ চলাচল নিশ্চিত করে। ৩. এটা প্রয়োজনে খুলে যায়।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং

আমরা এ পর্যন্ত যেটুকু ইমারত, সেতু, রাস্তা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি তা সবই যে ক্যাটাগরিতে পড়ে, তা হলো **সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং**। সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তুলনায় এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ব্যাপ্ত- কারণ, এর অর্থ হলো পুরো সমাজের জন্য **সার্ভে** ও **কন্সট্রাকশন** কাজ। সিভিল ইঞ্জিনিয়াররাই দেশের জনগণের স্বার্থে যোগাযোগ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সহাবস্থানের জন্য সুযোগ গড়ে তুলেন। সুতরাং একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে একাধিক ফিল্ডে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এগুলোর মধ্যে বড় বড় বিল্ডিং, রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন ও **ড্রেজিং**, সেতু নির্মাণ, রেল লাইন তৈরী, বিমানবন্দর বানানো, পানি সাপ্লাই সিস্টেম, নদীতে বাধ নির্মাণ, **ট্যানেল** তৈরী, সমূদ্রতীরবর্তী নগরে জাহাজ নির্মাণ ও ডকের কাজ, শহরের ড্রেনেজ সিস্টেম এবং অন্যান্য **ইঞ্জিনিয়ারিং** কার্যাদি উল্লেখযোগ্য। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে সকল ধরনের সার্ভে কাজেও পূর্ণ দক্ষতা থাকতে হবে।

পরিচ্ছেদ ৪

মেডিকেল প্রযুক্তি

এটা একটি বিরাট ফিল্ড। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ **মেডিকেল কেয়ার** সেক্টরে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করেছে। এর কারণ হলো, মানুষ আদি কাল থেকেই রোগ-ব্যাধি দ্বারা সর্বদাই আক্রান্ত হয়। রোগ ব্যাধি থেকে বাঁচা ও রোগ থেকে নিরাময় লাভের চেষ্টা সর্বদাই হয়েছে এবং হবেও। আধুনিক যুগে **মেডিকেল সাইন্স** বিজ্ঞানের একটি প্রধান শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানবদেহ সম্পর্কে আরও বেশি জানা এবং একে রোগমুক্ত রাখার জন্য গড়ে উঠেছে সংবিধিবদ্ধ **মেডিকেল ডিসিপ্লিন**। এতে আছে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের **ফাংশন** নির্ণয়, রোগের কারণ ও প্রতিরোধ **টেকনিক, মেডিকেল** যন্ত্রপাতি নির্মাণ, **কেমিকেল** প্রযুক্তির মাধ্যমে ঔষধ তৈরী, সঠিক **মেডিকেল কেয়ার** ইত্যাদি। আমরা প্রযুক্তির অংশ হিসাবে **মেডিকেল** সাইন্সে ব্যবহৃত এক দু'টো অত্যাধুনিক যন্ত্রের উপর কিছুটা তথ্যমূলক বর্ণনা তুলে ধরবো। প্রথমেই যে কোন রোগ সনাক্তকরণে প্রয়োজন হয় **ডায়াগনসিস** টেকনিকের।

ডায়াগনসিস যন্ত্রপাতি

ডায়াগনসিস বা রোগ সনাক্তকরণ ছাড়া ডাক্তাররা কোন রোগীকে সঠিক ঔষধ প্রদান করতে অপারগ। সাধারণ কোন রোগব্যাধি হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা তার চেম্বারে রোগীর বুকে-পেটে **স্টেথোস্কোপ** লাগিয়ে কিংবা চোখ পরীক্ষা বা **থার্মোমিটার** দ্বারা তাপ নির্ণয় করে রোগ ধরতে সক্ষম হোন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগ সম্পর্কে অতিরিক্ত জানার দরকার- তাই আজকাল ডাক্তাররা রোগিকে **ডায়াগনস্টিক সেন্টারে** পাঠিয়ে রক্ত পরীক্ষা থেকে **এমআরআই স্কান** করা পর্যন্ত ব্যবস্থা করেন। অবশ্য আজকাল **মেডিকেল ডায়াগনসিস** একটি বড় টাকার প্রাইভেট ব্যবসায় রূপান্তর হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়াই অধিকাংশ রোগীকে এসব প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয় টেস্ট করানোর জন্য। সে আরেক কাহিনী।

আধুনিক **ডায়াগনসিস** টেকনিকে আছে রোগীর অতীত **মেডিকেল** ইতিহাস জানা, তাকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করা ও প্রয়োজনে **লেবোরেটরী** এবং **রেডিওলোজিক্যাল টেস্ট** সম্পাদন করা। কিছু কিছু রোগ আছে যা কোন দক্ষ ডাক্তার অতি সহজেই

সনাক্ত করতে পারেন। যেমন সচরাচর রোগ- সর্দি, কাশি, ফেরা, জ্বর, বাত ইত্যাদি। তবে কারো হাড্ডি যদি ভেঙ্গে যায়, অথবা কোমরের ব্যথা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে তাহলে হয়তো **এক্স-রে** করে অবস্থা সনাক্ত করার দরকার পড়বে। **গ্যাস্ট্রিক আলচার** হয়েছে কি না তা দেখার জন্য **এন্ডোস্কোপির** প্রয়োজন, **করোনারী হার্ট** রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির **ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি)** থেকে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। তবে হয়তো সঠিক তথ্যের জন্য দরকার পড়বে **অ্যাঞ্জিওগ্রাম** করানো। দুরারোগ্য ক্যান্সারে কেউ আক্রান্ত হয়েছেন কিনা তা নিশ্চিতকরণে হয়তো **বায়োস্পির** দরকার পড়তে পারে। অপরদিকে মায়ের গর্ভে শিশুর বেড়েওঠা সঠিকভাবে হচ্ছে কি না বা এমনকি শিশুর মধ্যে কোন ধরনের **মেডিকেল** সমস্যা আছে কি না তাও জানার ব্যবস্থা আছে। **আলট্রাসাউন্ড ইমেজিং টেকনিক**- শিশুর বেড়েওঠা থেকে মানবদেহের অভ্যন্তরের যে কোন দেহযন্ত্রকে দেখা ও পরীক্ষা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

এক্স-রে

আমরা অনেকেই এক্স-রের কথা শুধু শোনি নি- এর দ্বারা নিজের দেহের কোন অংশের সাদাকালো অদ্ভুত ভুতুড়ে ছবিও তুলেছি। অবশ্য একমাত্র ডাক্তার সাহেবের নির্দেশে তা সম্ভব। **এক্স-রে** আসলে কি জিনিস? আমরা প্রথম অধ্যায়ে **ইলেকট্রমেগনেটিক স্পেকট্রাম** সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। **এক্স-রে** মূলত **ইলেকট্রমেগনেটিক** তেজস্ক্রিয়া যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত অল্প হয়ে থাকে। এর রেঞ্জ হলো ১০০ থেকে ০.০১ **আংস্ট্রম** (১ **আংস্ট্রম** = $১০^{-৮}$ সে.মি. -অত্যল্প দৈর্ঘ্য)। **ওয়েভলেন্থ** বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো কম হবে **এক্স-রে** এর শক্তি ততো বেশী হবে। অণুর ক্ষুদ্র অংশ **ইলেকট্রন**। এক্স-রের মাধ্যমে **ইলেকট্রন** দ্বারা আমাদের দেহকে **'বম্বার্ড'** করা হয়। দেহের অপরদিকে থাকে **এক্স-রে** প্লেট। এতে দেহের ভেতরের একটি সাদাকালো ছবি অঙ্কিত হয়।

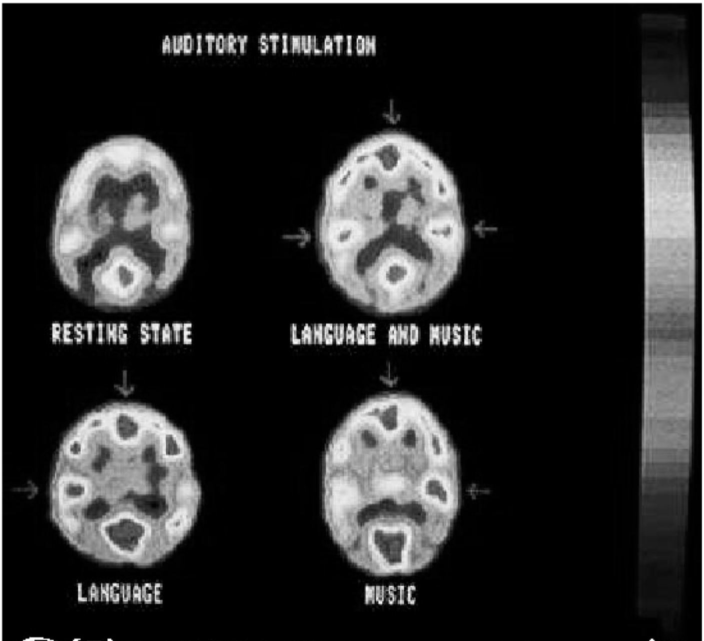
এক্স-রে শুধুমাত্র **মেডিকেল সাইন্সে** ব্যবহৃত হয় না। শিল্প ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এর ব্যবহার হয়ে থকে। তবে আমরা এখানে **মেডিকেল** ব্যবহারের উপরই গুরুত্ব দেব। **এক্স-রে** দ্বারা শুধু ভেতরের ছবি ওঠানো হয় না- **রেডিওথেরাপী** নামক **টেকনিক** দ্বারা ক্যান্সার রোগিকে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে, এটাও মূলত এক্স-রের ব্যবহার। তবে **রেডিওগ্রাফী টেকনিক** তথা এক্স-রের মাধ্যমে ভেতরের ছবি ওঠানোই **মেডিকেল** ডায়াগনসিসে বেশি ব্যবহৃত হয়।



রেডিওলজি

ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশনের **'আয়োনাইজিং'** (বৈদ্যুতিকভাবে এটম কিংবা **মলিকিউল চার্জ** হওয়া) তেজস্ক্রিয়াকে আধুনিক যুগে **ডায়াগনস্টিক রেডিওলজিতে** ব্যবহার করছেন। এই তেজস্ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো: **এক্স-রে, আলফা, বিটা ও গামা রে। ডায়াগনস্টিক** কার্যে **রেডিয়েশন** থেকে একাধিক ধরনের ইমেজ বা ছবি তোলা হয় যা দ্বারা দেহের কোন বিশেষ অংশকে পরীক্ষা করা যায়। আমরা ইতোমধ্যে সাধারণ **এক্স-রে** সম্পর্কে বলেছি। এটাকে বলে **রেডিওগ্রাফ**। এছাড়া **রেডিয়েশন** শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিচালনা করে আরও একাধিক ছবি তোলা সম্ভব। যেমন, **মামোগ্রাম**- মহিলাদের স্তনের **এক্স-রে** ছবি যা দ্বারা স্তন ক্যান্সার আছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়। অপর আরেকটি হলো **টমোগ্রাফ**- এটা দ্বারা কোন বিশেষ দেহযন্ত্রের সম্পূর্ণ **এক্স-রে** ছবি বিভিন্ন দিক থেকে তোলা হয়। এছাড়া **'কম্পিউটারাইজড্ এক্সিয়েল টমোগ্রাফি' (সিটি** বা **সিএটি)** স্ক্যানও করা যায়। শেষোক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা দেহ-অংশের **কম্পিউটার** গবেষণা করাতে পারি। একই ধরনের

আরেকটি **টেকনিক** আছে যাকে **'পজিশন এমিশন টমোগ্রাফি'** **(পিইটি) স্কান** বলে। এখানে উল্লেখিত প্রতিটি টেকনিকের জন্য তৈরী হয়েছে বিশেষ যন্ত্রপাতি।



পিইট (PET) স্কানের রেজাল্ট

আমাদের দেহের বেশ কিছু যন্ত্রাদি, হাড্ডি, পেশী ইত্যাদি সচরাচর **রেডিওলজি** টেকনিকের মাধ্যমে ওঠানো ছবিতে স্পষ্ট দেখায় না। এই সমস্যা দূর করতে **রেডিওলজিস্টরা 'কনট্রাস্ট মিডিয়া'** (প্রতিতুলনা মাধ্যম) ব্যবহার করে থাকেন। এসব বস্তু মূলত অতিরিক্ত জিনিস যা রোগীর পরীক্ষার স্থানে ইনজেকশন, ইনজেসশন কিংবা গলদ্দকরণের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়। এসব মিডিয়ার মধ্যে উপরস্থ **গেসস্ট্রো-ইনটেস্টিনেল (জিআই), বেরিয়াম এনেমা, আনতোগ্রাম** (হাড্ডির জোড়া পরীক্ষার জন্য), **মাইয়েলোগ্রাম** (মেরুদণ্ড পরীক্ষার জন্য), **এ্যাঞ্জিওগ্রাম** (হৃদযন্ত্র পরীক্ষার জন্য) উল্লেখযোগ্য।



কম্পিউটারের **ডিসপ্লে স্ক্রীনে** আজকাল দেহের অভ্যন্তরের ক্রিয়া চলচিত্রের মতো সরাসরি প্রদর্শনও সম্ভব। ডাক্তার ও সার্জনরা যথাক্রমে **ডায়াগনস্টিক** ও সার্জারীর জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকেন। একে বলে **'ডাইনামিক ইমেজিং'** (গতি চলচিত্রকরণ)। একাধিক পদ্ধতিতে **ডাইনামিক ইমেজিং** করা সম্ভব। বর্তমানে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রযুক্তির মধ্যে **'এন্ডোস্কপি', 'আলট্রাসাউন্ড', 'ফ্লোরোস্কপি'** এবং **'সিনারেডিওগ্রাফি'** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

আলট্রাসাউন্ড

এই **টেকনিককে আলট্রাসোনোগ্রাফি** বলে। এক্স-রের বদলে উচ্চ-তরঙ্গের শব্দ **(আলট্রাসাউন্ড)** দেহের ভেতর প্রেরণ করা হয়। দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও পেশী এই শব্দতরঙ্গকে প্রতিবিম্ব করে, যা ফিরে এসে একটি **কম্পিউপার ডিসপ্লে ইউনিটে (সিডিইউ)** পতিত হয়। অবশ্য ইতোমধ্যে **কম্পিউটার** প্রতিবিম্বিত ছবিকে গবেষণা করে, ফলে এটা স্ক্রীনে চলন্ত ছবি হিসেবে দেখা যায়। ছবিটি রেকর্ড করাও সম্ভব।

আলট্রাসাউন্ড অবশ্য দেহেরে বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার জন্য উপযোগী তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়ের গর্ভে শিশুর বেড়ে ওঠা পরীক্ষার জন্যই এর ব্যবহার দেখা যায়। অনেকে আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে গর্ভের শিশুর ছবি তুলে সংরক্ষণ করে রাখেন।



আলট্রাসোনোগ্রাফিতে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি ও প্রতিবিম্ব সংগ্রহের জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে যাকে **'ট্রান্সডিউসার'** বলে। এটি চামড়ার সাথে মিলিয়ে রাখা জরুরী। শব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ যাতে সঠিক হয় তার জন্য এক ধরনের তরল পিচ্ছিল পদার্থ চামড়ায় লাগানো হয়ে থাকে।

এন্ডোস্কপি

এন্ডোস্কোপ নামক যন্ত্রের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে **ডাইজেস্টিব ট্রাক** (পরিপাকতন্ত্রের রাস্তা) পরীক্ষা করা যায়। যন্ত্রটি মূলত ক্ষুদ্র একটি ক্যামেরা। তবে এটার মাধ্যমে ছবি তোলা হয় না বরং লেনসে পতিত সামনের দৃশ্যটি আঁকাবাঁকা রাস্তায় (অর্থাৎ বক্র হয় এমন পাইপ দ্বারা) বের করে নিয়ে এসে একটি **টিভি** স্ক্রীনে ডিসপ্লে করা হয়।



ফ্লোরোস্কপি

ফ্লোরোস্কপ নামক যন্ত্রের মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন যন্ত্র, পেশীর চলাচল পরীক্ষা করার নামই হচ্ছে **ফ্লোরোস্কপি**। যন্ত্রটির মৌলিক দু'টি অংশ আছে: **এক্স-রে** টিউব ও **ডিসপ্লে স্ক্রীন** (বা **ফ্লোরেসেন্ট ডিসপ্লে**)। **এক্স-রে** ইউনিট ও স্ক্রীনের মাঝখানে রোগিকে দাঁড় করানো হয়। **এক্স-রে** থেকে ছবি যেয়ে স্ক্রীনে পতিত হতে থাকে। এতে স্ক্রীনের মধ্যে রোগির যে দেহযন্ত্রটি পরীক্ষা করা হবে তার সরাসরি চলচিত্র ভেসে ওঠে। ফ্লোরোস্কপির মাধ্যমে পরিপাক তন্ত্র ও হাড্ডির ভেতরে ক্যান্সার রোগ আছে কি না জানা যায়। এছাড়া পরিপাক তন্ত্রের কোথাও **আলসার** কিংবা হাড্ডির ওজন কমেছে কিনা তাও ফ্লোরোস্কপির মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব।

সিনারেডিওগ্রাফি

এটাও ফ্লোরোস্কপির মতো। তবে এক্ষেত্রে অর্জিত ছবিগুলোকে সংরক্ষণ করা যায়। অর্থাৎ পরবর্তীতে ডাক্তাররা পুরো চলচিত্রটি দেখতে পারবেন। এভাবে স্থায়ী সংরক্ষণ সময় সময় জরুরীও বটে।

তেজস্ক্রিয়ার অন্যান্য ব্যবহার

রোগ সনাক্তকরণে আমরা ইতোমধ্যে বেশ ক'টি উপায়-উপকরণের ওপর আলোচনা করেছি। বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে ক্যান্সার সেল ধ্বংস করা সম্ভব। এতে দেহের ভালো কোষগুলো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। এর কারণ হলো ক্যান্সার সেলকে (আর বিশেষকরে টিউমারের কোষকে) **রেডিয়েশন** দ্বারা আক্রমণের সময় আশপাশের কিছু ভালো সেলও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ক্যান্সার রোগিকে এভাবে চিকিৎসা করাকে বলে **'রেডিয়েশন অনকোলজি'** বা **'থেরাপিউটিক রেডিওলজি'**। যদি পরীক্ষা করে দেখা যায়, কোন রোগির সাধারণ সুস্থ কোষগুলো **রেডিয়েশন** দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর আবার সুস্থ হতে অপারগ কিংবা সুস্থ হতে টিউমারের কোষের তুলনায় প্রায় একই, তাহলে ঐ রোগিকে এরূপ **থেরাপী** দেওয়া আর সম্ভব হয় না- বা তাতে কোন সুফল আসে না।

রেডিওলজিক ইমেজিং ব্যবহারের মাধ্যমে আজকাল সার্জনরা অনেক ধরনের অপারেশন করে যাচ্ছেন। এসব অপারেশনে **'ক্যাথেটার'** (ক্ষুদ্র বাঁকা হয় এমন নল) টিউবকে যথাস্থানে নিয়ে বিভিন্ন **মেডিকেল** কার্যাদি সারা হয়। টিউব ছাড়াও ক্ষুদ্র বেলুন, ফিল্টার ও অন্যান্য ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি এ উপায়ে রোগির শিরার মধ্যদিয়ে ভেতরে নেওয়া যায়। এসব কৌশলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো: বেলুন **এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি** (ব্লক করা বা বেশি ছোট্ট হয়ে যাওয়া শিরায় বেলুন ঢুকিয়ে দেওয়া যাতে তা রক্ত চলাচলে সাহায্য করে); **ফেলোপিয়ান টিউব কেথিরাইজেশন** (নারীদের বন্ধ হয়ে যাওয়া ফেলোপিয়ান টিউবকে খুলে দেওয়া- এই বন্ধ হয়ে যাওয়াই অধিকাংশ নারী বন্ধ্যা হওয়ার কারণ); এবং **থ্রোম্বোলিসিস** (রক্তের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত রক্ত-জমাট গলিয়ে দেওয়া)।



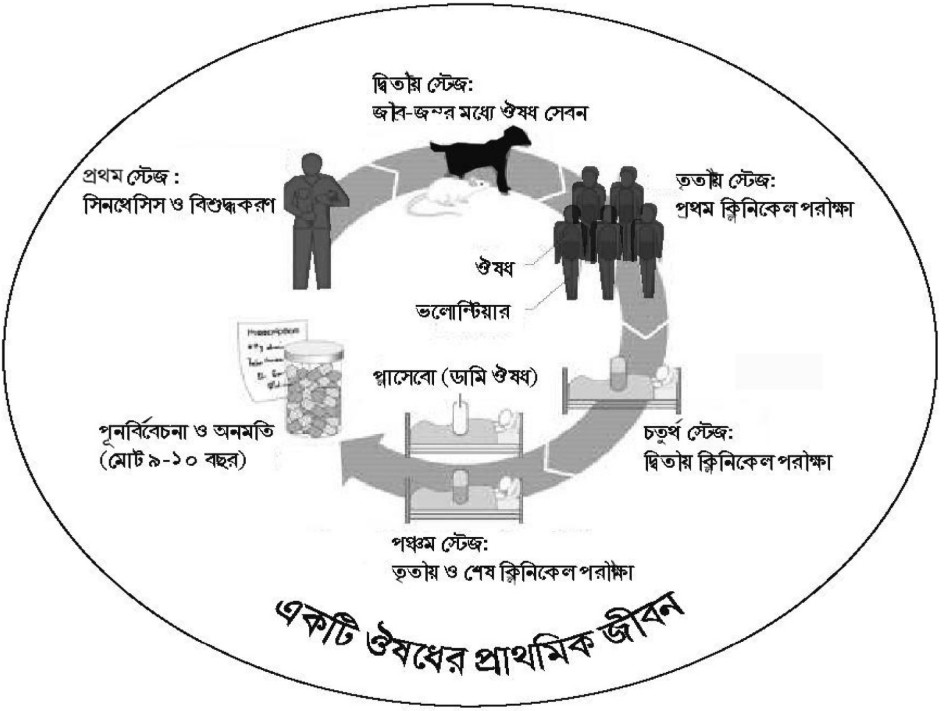
টমোগ্রাফি থেকে প্রাপ্ত মস্তিষ্কের ছবি

ঔষধ প্রযুক্তি

ড্রাগ্স শব্দের অর্থ দু'টি- রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ঔষধ ও মাদকদ্রব্য। উভয় অর্থ কিন্তু সামর্থবোধক- কারণ, **ড্রাগ্স** মূলত দেহের কোষে ক্রিয়া করে। কিছু **ড্রাগ্স** আছে যা নেশা করার বস্তু যেমন, সিগারেটের **নিকোটিন** ও মাদকদ্রব্য **হিরোইন**। আমরা এগুলো নিয়ে এখানে কোন গবেষণা করতে যাবো না। আমরা মূলত মানবকল্যাণে ব্যবহৃত ঔষধ প্রযুক্তির উপর আলোচনা করবো। এই প্রযুক্তিকে **'ফারমাসিউটিক্যাল'** বলে।

নতুন কোন ঔষধ তৈরী চাট্টিখানি কথা হয়। এর পেছনে বহু বছরের সাধনা, অর্থ-কড়ি, প্রযুক্তি ও গবেষণা থাকে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১০ বছর পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হতে পারে। সুতরাং আজকে যে ঔষধটি আপনি ফার্মেসিতে যেয়ে ক্রয় করতে পারছেন তা তৈরীর ইতিহাস অনেক দীর্ঘ হতে পারে। আমরা নক্সার মাধ্যমে

বিষয়টি নীচে তুলে ধরেছি (দেখুন নীচের চিত্রটি)। প্রতিটি স্তরে কি করতে হয় তার বিবরণ একে একে এখানে বর্ণনাও করেছি।



প্রথম স্টেজ : সংশ্লেশন ও বিশুদ্ধকরণ (১-২ বছর) হলো একটি ঔষধ জন্মের প্রাথমিক স্তর। রিসার্চ মেডিসিন বিজ্ঞানীরা প্রথমে কোন বিশেষ বস্তু ঔষধ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হওয়ার সম্ভবনা উন্মোচন করেন। তারপর এটা সঠিকভাবে **সিনথেসাইজ** ও বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তি শুরু হয়। এই প্রাথমিক কার্যাদি সফলভাবে (যদি তা হয়েই থাকে) আঞ্জাম দিতে ২ বৎসর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

দ্বিতীয় স্টেজ : সম্ভাব্য ঔষধ বস্তুটি **'গিনি পিগ'** নামে খ্যাত বিভিন্ন জীব-জন্তু যেমন ইঁদুর, খরগোশ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিতে কৃত্রিম উপায়ে রোগাক্রান্ত করে কিংবা এমনিতেই বস্তুর ক্রিয়া জানার জন্য এটা দেওয়া হয়। এতে যদি উক্ত জন্তুর ক্ষতি হয় তাহলে ঔষধ আকারে তা প্রস্তুত করার স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়ে গেল। আর যদি দেখা যায় জন্তুটির উপকার হয়েছে তাহলে তা পরবর্তী স্টেজ পর্যন্ত গড়াতে পারে। এই

পর্যায়কে বিজ্ঞানীরা **এনিমেল টেস্টিং** বলেন এবং এক্ষেত্রেও **১** থেকে **২** বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

তৃতীয় স্টেজ : প্রত্যেক দেশেই খাদ্য ও ঔষধ নিয়ন্ত্রক ইন্সপেক্টর থাকেন। তার কাজের মধ্যে ঔষধ তৈরীর ফার্ম বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী কর্তৃক সৃষ্ট নতুন কোন ঔষধের **ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল** পর্যবেক্ষণ করা। সুতরাং ইন্সপেক্টরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে নতুন ঔষধ **'ভলোন্টিয়ার'** রোগীদেরকে পরিবেশন করানো হয়। মানবিক ড্রাগ টেস্টিংয়ের এই প্রাথমিক পর্যায়ে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হতে পারে। সাধারণত ঔষধ-জীবনের তৃতীয় বছরে এই পরীক্ষা চলে। যদি দেখা যায় ঔষধটি গ্রহণযোগ্য কোন উপকারে আসছে তাহলে পরবর্তী স্টেজ পর্যন্ত তা পরীক্ষিত হতে নির্বাচিত হবে।

চতুর্থ স্টেজ : এ পর্যায়ে এসে নতুন ঔষধ **'সত্যিকার রোগীদেরকে'** পরিবেশ করানো হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও খুব অল্পসংখ্যক রোগী জড়িত থাকেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে ঔষধ দীর্ঘদিন পরিবেশ করতে দেওয়ার পর এ থেকে যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে ও তার ক্ষতির মাত্রা ইত্যাদি **মনিটর** করা হয়। এই স্টেজে সর্বাধিক **১** বছর পর্যন্ত চলে যায়। এর পরও যদি ঔষধটি সত্যিকার অর্থে নির্দিষ্ট রোগের উপশম বা উপকারী ড্রাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয় তাহলে তা দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য নির্বাচিত হবে।

পঞ্চম স্টেজ : ঔষধটি পূর্বোক্ত সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাই একে এবার দ্বিতীয়বারের মতো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিতে হবে। এই স্টেজেও বছর খানেক সময় অতিবাহিত হয়। এই স্টেজের বৈশিষ্ট্য হলো দু'টি ভিন্ন রোগী গ্রুপকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়। একটি গ্রুপ ঔষধ সেবন করবে আর অপরটি **'প্লাসেবো'** নামক একটি ড্রাগ সেবন করবে যার কোন প্রতিক্রিয়া দেহে হয় না। গবেষকরা এবার অবলোকন করবেন, নতুন ড্রাগ সেবনকারী ও **প্লাসেবো** সেবনকারী দলের স্বাস্থ্যে কতটুকু রদবদল ঘটেছে। এখান থেকে সফলতা নিয়েই শেষ পর্যন্ত ফাইনাল স্টেজে ঔষধটি পদার্পন করে।

ষষ্ঠ ও শেষ স্টেজ : খাদ্য ও ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেটর এবার সবগুলো তথ্যাদি পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেবেন, এই নতুন ঔষধটি সাধারণ পাবলিকের জন্য গ্রহণযোগ্য কি না - যদি তা হয় তাহলেই আপনি আমি ফার্মেসি থেকে এটা ক্রয় করে উপকৃত হতে পারবো।

পরিচ্ছেদ ৫

যাতায়াত প্রযুক্তি

যাতায়াত ব্যবস্থা যে দেশে যে পরিমাণ উন্নত সে দেশ বা জাতি ততোবেশি ধনাঢ্য বলেই ইতিহসব্যাপী পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর কারণ হলো, মানুষ সর্বদাই মুভমেন্টে থাকে। যে কোন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বেঁচে থাকার একটি মৌলিক উপায় উপকরণ হলো উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা। দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক স্থান থেকে অপর স্থানে মানুষ ও মালামাল যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা না থাকলে ঐ দেশ বা জাতিকে **'বেকওয়ার্ড'**, গরীব ইত্যাদি বলা হয়। সুতরাং উন্নত জাতির একটি লক্ষণ হলো উত্তম যাতায়াত ব্যবস্থা। সঠিক, উত্তম, গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলে একটি দেশের জনগণ সর্বত্র এবং শহরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন দূরবর্তী অঞ্চলে ঘরবাড়ি করে থাকার সুযোগ করে নিতে পারে। এতে পুরো দেশের অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে টেকনোলজির বিকল্প নেই। আমরা এ প্রসঙ্গে বেশ ক'টি আধুনিক যাতায়াত যানের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। অবশ্য ইতোমধ্যে **মোটর** গাড়ি, ট্রাক, ট্রলার ইত্যাদি যাতায়াতের মাধ্যম, পাকা রাস্তার উপর আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা এবার যানবাহনের উপরই আমাদের বক্তব্য সীমিত রাখবো।

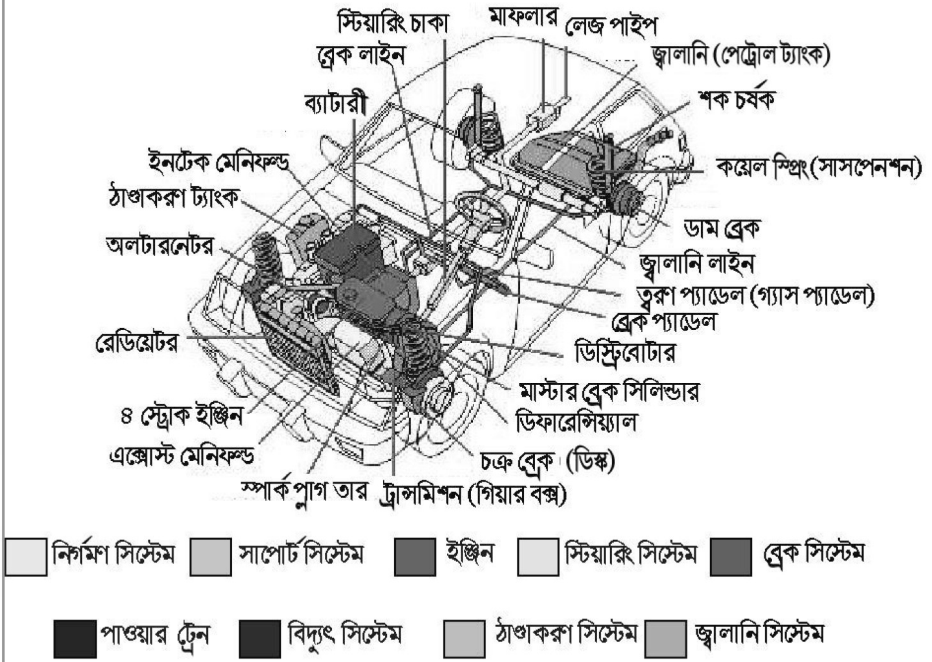
মাটির উপর যাতায়াত

মানুষ অবশ্য সর্বদাই নিজের ক্ষমতাবলে মাটির উপর চলাচল করে আসছে। এরপর বাইসাইকেল, গরু ও ঘোড়া এবং ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি তো আছেই। এছাড়া অনেক দেশেই আছে প্যাসেঞ্জার ও কার্গো ট্রেন। তবে বর্তমান বিশ্বে এক স্থান থেকে অপর স্থানে মানুষ ও পণ্য যাতায়াতের একটি উপায় সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয়- তাহলো মোটরচালিত যান। এই যানটি প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী- এবং তা **পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস,** বিদ্যুৎ কিংবা সূর্যালোক থেকে **এনার্জি** সংগ্রহ করে চালনা করা হয়। আমরা এ প্রসঙ্গে গাড়ির ইঞ্জিনের মৌলিক প্রযুক্তি তুলে ধরবো।

গাড়ি ও ইঞ্জিন

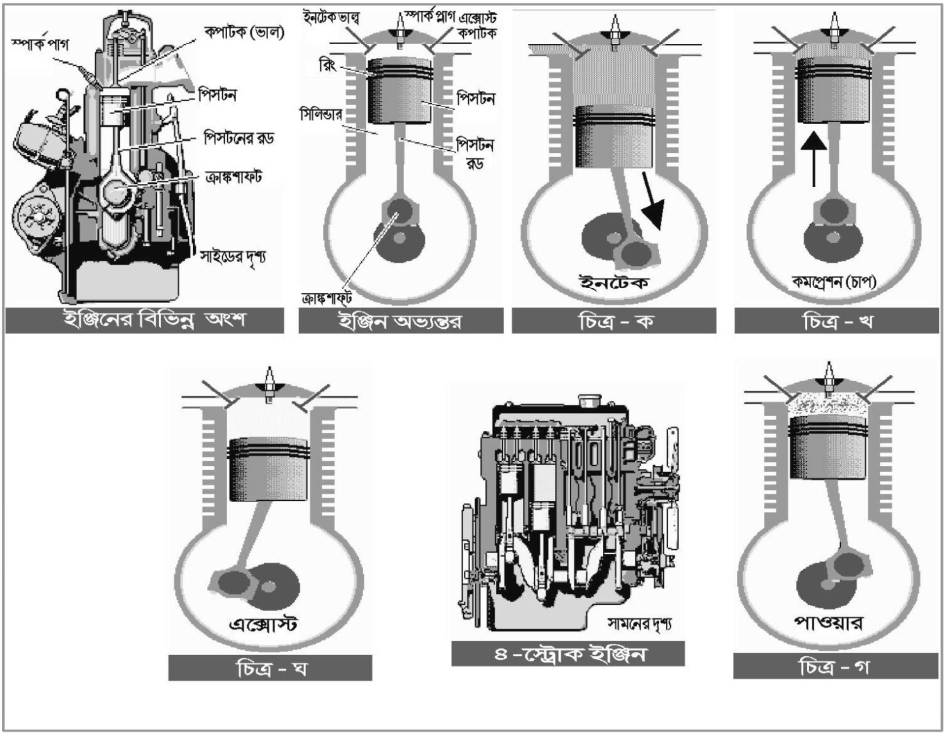
একটি গাড়ি মূলত বেশ কয়েকটি কৃত্রিম তন্ত্রের সমষ্টি। এই সিস্টেমগুলো নিম্নের ছবিতে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। ছবিতে **গ্যাস** ইঞ্জিনযুক্ত ম্যানুয়েল গিয়ারসম্পন্ন একটি

গাড়ির নমুনা দেখা যাচ্ছে। ৯টি মৌলিক সিস্টেম দ্বারা পুরো গাড়িটি নির্মিত। এর পেছনে যে কতটুকু প্রযুক্তি বিদ্যমান তা অনায়াসেই বুঝা যায়।



গাড়ি মূলত ইঞ্জিনচালিত যান। সুতরাং প্রথমেই আমাদেরকে গাড়ির **ইঞ্জিন** সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হয়- তাই এটাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা চালাচ্ছি। অবশ্য লেখা থেকে ছবি কথা কয় ভালো- তাই পাঠকদের প্রতি অনুরোধ আপনারা পাঠের সাথে চিত্রগুলোর প্রতিও মনোযোগ দেবেন। আজকাল অধিকাংশ গাড়িতে **চার-স্ট্রোক গ্যাসোলিন** বা

পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন গাড়ি তৈরীর ফার্ম বিভিন্ন মডেলের **ইঞ্জিন** ব্যবহার করলেও সবগুলোর **প্রিন্সিপাল** মূলত একই।



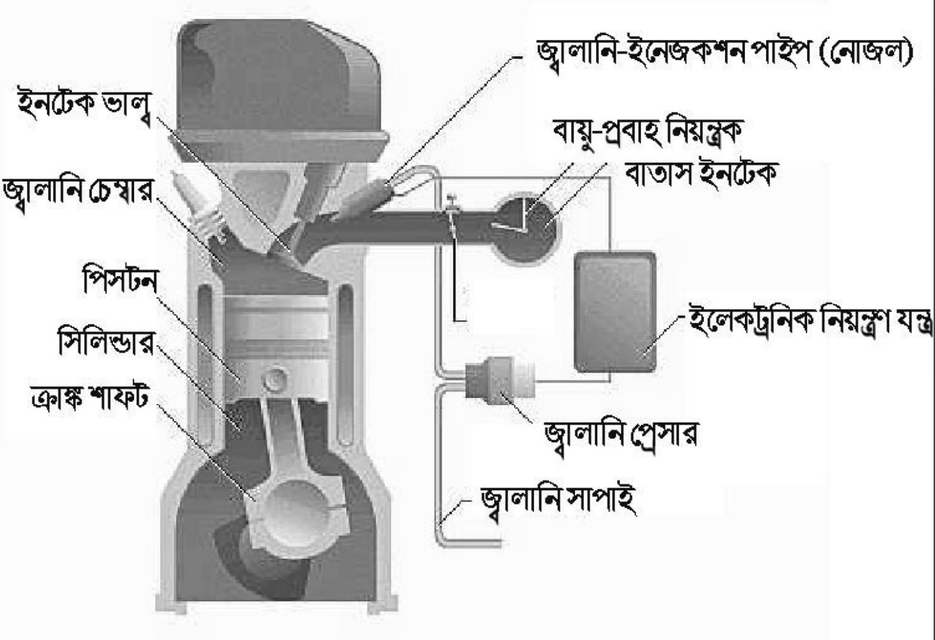
উপরে গাড়িতে ব্যবহৃত **চার-স্ট্রোক** ইঞ্জিনের কয়েকটি ড্রইং আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা প্রথম দু'টি চিত্রে ইঞ্জিনের সাইড ও সামনের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আরেকটি চিত্রে ইঞ্জিনের ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অঙ্কিত হয়েছে। তবে আমাদের জন্য যে চারটি চিত্র ভালোভাবে স্ট্যাডি করা জরুরী ওগুলো হলো যথাক্রমে চিত্র -ক থেকে চিত্র -ঘ পর্যন্ত। এই চারটি ছবি ইঞ্জিনের চারটি স্ট্রোকের সময় কি ঘটে তা বুঝাচ্ছে। পিসটনের উভয় দিকে (অর্থাৎ উপর অথবা নীচের দিকে) একবার চালনাকে বলে একেকটি স্ট্রোক। সুতরাং পিসটনটির প্রথম স্ট্রোকের সময় **ইনটেক ভাল্ব** বা কপাটক খুলে যায়, ফলে বাতাসমিশ্রিত জ্বালানি প্রবেশ করে। এতে **পিসটন** নীচের দিকে চলন্ত হয়- এই স্ট্রোকের নাম **ইনটেক স্ট্রোক** (চিত্র -ক)। এর পরের স্ট্রোকের নাম

কমপ্রেশন বা চাপ। এ সময় উভয় কপাটক বন্ধ থাকে ও **পিসটন** উপরের দিকে ওঠে। এর ফলে বাতাসমিশ্রিত জ্বালানির মধ্যে চাপ সৃষ্টি হয় (চিত্র - খ)। এর পরের স্ট্রোকটি হলো **পাওয়ার স্ট্রোক**। এসময় **স্পার্ক প্লাগ** জ্বলে ওঠে ও জ্বালানিতে আগুণ ধরে। ফলে পিসটনকে বেড়েওঠা **গ্যাস** জোর করে নীচের দিকে নামিয়ে আনে (চিত্র - গ)। ফাইনেল স্ট্রোকের নাম **এক্সোস্ট স্ট্রোক**। এসময় **এক্সোস্ট ভাল্ব** খুলে যায় ফলে **পিসটন** উপরের দিকে ওঠে ও জ্বলে যাওয়া **গ্যাস** বা ধোঁয়া বের হয়ে যায় (চিত্র -ঘ)। এই শেষ হলো ইঞ্জিনের চারটি স্ট্রোক। এরপর পুনরায় প্রথম স্ট্রোক শুরু হয় (চিত্র - ক), এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। এরপর আবার এই চক্র শুরু হবে। অর্থাৎ **ইনটেক-কমট্রেশন-পাওয়ার-এক্সোস্ট ..... ইনটেক ...**; এই চারটি স্ট্রোক বারবার চলতে থাকবে। এভাবে ইঞ্জিনের **ক্রাঙ্কশাফ্ট**ও চলতে থাকবে।

উপরে বর্ণিত বেসিক **চার-স্ট্রোক ইঞ্জিন** প্রায় সব **পেট্রোল** চালিত গাড়িতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকাংশ গাড়ির ইঞ্জিনে অন্তত ৪টি **সিলিন্ডার** একত্রে কাজ করে। কোন কোন গাড়িতে ৮ **সিলিন্ডার** ইঞ্জিনও ব্যবহৃত হয়। **ডিজেল** ইঞ্জিনের মৌলিক **ডিজাইন** অনুরূপ হলেও এদের **ইগনিশন** (বা **স্পার্ক প্লাগ** দ্বারা আগুন ধরানো) সিস্টেম কিছুটা ভিন্ন। এসব **ইঞ্জিন** সাধারণত ট্রাক, বাস ও বড় আয়তন ও ক্ষমতাসম্পন্ন গাড়িতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকাল অবশ্য গ্যাসচালিত **ইঞ্জিন** অনেকে ব্যবহার করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে **সিএনজি (কমপ্রেস্ড নেচালের গ্যাস)** গ্যাসের মূল্য কম থাকায় অনেকেই **ডিজেল** বা **পেট্রোল** ইঞ্জিনকে পরিবর্তন করে **গ্যাস** ইঞ্জিনে রূপান্তর করে নিচ্ছেন বা নিয়েছেন। আসলে উভয় ইঞ্জিনে তেমন বেশী তফাৎ নেই। যা বদলানোর দরকার হয় তাহলো **ফিউল ইনজেকশন সিস্টেম**।

জ্বালানি প্রবেশকরণ

গাড়ির ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চেম্বারে (বা **কমবাসশন চেম্বারে**) সঠিক পরিমাণ জ্বালানি ও বাতাস ঠিক ঠিক সময়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে। জ্বালানি তো অবশ্যই ট্যাঙ্কে জমা থাকবে যতক্ষণ না তার দরকার পড়ে। দরকারের সময় তা **কারবোরেটর** বা আধুনিক গাড়িতে ব্যবহৃত **ফিউল ইনজেকশন সিস্টেম** দ্বারা **পাম্প** করে নেওয়া হয়।



আধুনিক গাড়িতে ব্যবহৃত জ্বালানি-ইনজেকশন সিস্টেম

ফিউল সিস্টেম থেকে ইঞ্জিনে **গ্যাস** ও জ্বালানি মিশ্রিত অবস্থায় গিয়ে পৌঁছে। নতুন ফিউল সিস্টেম- যেমন ফিউল ইনজেকশন সিস্টেমে খুব সতর্কতার সাথে সিলিন্ডারের ভেতর জ্বালানি স্প্রে করে দেওয়া হয়। এই সিস্টেম সার্বিকভাবে লাভজনক।

এক্সোস্ট সিস্টেম

এই সিস্টেমের মাধ্যমে ইঞ্জিনে পুড়ে যাওয়ার পর জ্বালানি থেকে **গ্যাস** আকারে যে বর্জ্য অবশিষ্ট থাকে তা বেরিয়ে আসে পেছনের **এক্সোস্ট পাইপের** মাধ্যমে। তবে **ইঞ্জিন** থেকে খুব ভালো **গ্যাস** বর্জ্য হিসাবে বেরিয়ে আসে না। বাস্তবে **পেট্রোল** ও **ডিজেল ইঞ্জিন** থেকে যা বর্জ্য হিসাবে বেরিয়ে আসে তা পারিপার্শ্বিকতার জন্য ক্ষতিকর **হাইড্রোকার্বন** ও **কার্বন মনোক্সাইড** গ্যাস। তবে আজকাল এই গ্যাসটি যাতে সরাসরি বেরিয়ে আসতে না পরে তার জন্য বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইঞ্জিনের **কমবাসশন চেম্বার** থেকে বেরিয়ে আসার পর গ্যাসটিকে **কনভারটার চেম্বারে**

নিয়ে যেটুকু সম্ভব পরিবর্তন করে জলীয় বাষ্প ও **কার্বন ডাইওক্সাইড** গ্যাসে রূপান্তর করা হয়। এছাড়া ইঞ্জিনের শব্দকে কমানোর জন্যও বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

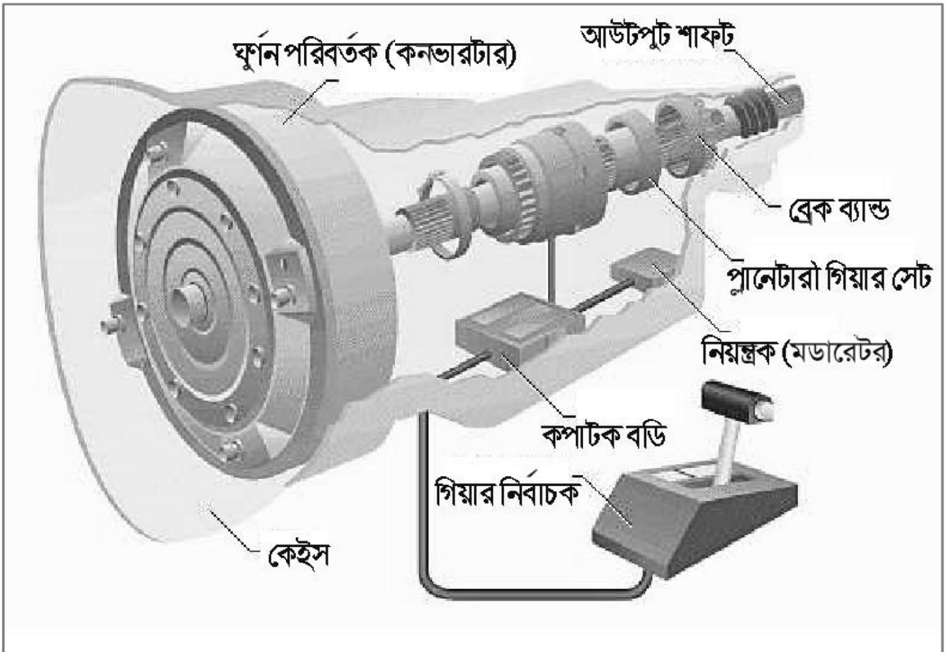
ঠাণ্ডাকরণ সিস্টেম

ইঞ্জিনের জ্বালানি পুড়ার সময় প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। এই উচ্চ তাপকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে বিরাট সমস্যা হবে। ঠাণ্ডাকরণ প্রযুক্তির মাধ্যমে তা আঞ্জাম দেওয়া হয়। ইঞ্জিনের **সিলিন্ডার** থেকে তাপকে সরিয়ে বাইরে বাতাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। অধিকাংশ গাড়িতে এক ধরনের তরল ঠাণ্ডাকরণ পদার্থ ব্যবহৃত হয় যা ইঞ্জিনের সর্বত্র চক্রাকারে চলমান থাকে। এই পদার্থকে পাম্পের মাধ্যমে **রেডিয়েটরে** নিয়ে যাওয়া হয়। রেডিয়েটরের কাজ হলো তাপযুক্ত পদার্থকে তাপমুক্ত করা। অতীতে তরল ঠাণ্ডাকরণ পদার্থ শুধুমাত্র পানি ছিল। সুতরাং **ইঞ্জিন** চলন্ত রাখতে যেয়ে প্রচুর পরিমাণ পানি রেডিয়েটরে দিতে হতো। আজকাল অবশ্য ঠাণ্ডাকরণ উপাদান হিসাবে এক ধরনের কেমিক্যালের তৈরী **'এ্যান্টিফ্রিজ'** তরল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুটির বৈশিষ্ট্য হলো এর স্ফুটনাঙ্ক পানি থেকে বেশী ও হিমাঙ্ক পানি থেকে কম। সুতরাং বেশি গরম ইঞ্জিনকেও এটা ঠাণ্ডা করতে পারে।

ইঞ্জিনের তাপ অবশ্য অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে ঠাণ্ডাপ্রধান দেশে এই তাপকে কাজে লাগানোর জন্য দ্বিতীয় একটি ছোট্ট **রেডিয়েটর** দ্বারা সীট ও সামনের জানালা গরম করা হয়ে থাকে। এতে গাড়ির অভ্যন্তর যাত্রীদের জন্য উষ্ণ থাকে একং জানালা ফ্রিজ হওয়া থেকেও রক্ষা পায়।

ট্রান্সমিশন সিস্টেম

যে কোন গাড়ির মধ্যে এই সিস্টেম থাকা জরুরী। ইঞ্জিনে সৃষ্ট ঘুর্ণন গতিকে **ট্রান্সমিশন সিস্টেম** দ্বারা গাড়ির চাকা সঠিকভাবে ঘুরাতে হবে।



ট্রান্সমিশন (গিয়ার) প্রযুক্তি

গিয়ারবক্স নামেও পরিচিত **ট্রান্সমিশন সিস্টেম** ইঞ্জিনের নিকটে অবস্থিত। ইঞ্জিনে সৃষ্ট পাওয়ারকে **ড্রাইভশাফ্‌টে** নিয়ে আসাই এটার কাজ। ইঞ্জিনের **ক্রাঙ্কশাফ্‌ট** ঘুরার সময় একঝাক **গিয়ার সিস্টেম** দ্বারা এই গতিকে চাকা পর্যন্ত সঠিকভাবে নিয়ে আসতে হবে। একাধিক সাইজের **গিয়ার** একাধিক গতির সৃষ্টি করে। সুতরাং উচ্চ **গিয়ার** গাড়িতে গতি বাড়াবে এবং নিম্ন **গিয়ার** কমাবে। উচ্চ গিয়ারে **পাওয়ার** থাকে কম কিন্তু গতি বেশি- অপরদিকে নিম্ন গিয়ারে **পাওয়ার** থাকে বেশি কিন্তু গতি কম। এ কারণেই স্থির অবস্থা থেকে গাড়িকে চলন্ত করতে যেয়ে প্রথম **গিয়ার** লাগে- এতে আছে বিরাট শক্তি। একই কারণে উপরের দিকে ওঠার সময়ও প্রথম বা দ্বিতীয় **গিয়ার** ব্যবহার করতে হয়। **গিয়ার** সিস্টেম সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে: **ম্যানুয়েল** (ড্রাইভার দ্বারা রদবদল করা হয়); **অটোমেটিক** (স্বয়ংক্রিয়); এবং **কন্টিনিউয়াসলি ভেরিয়েব্‌ল** (সর্বদা পরিবর্তনশীল স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন)।

একটা গাড়ি প্রযুক্তিতে আরও বেশ ক'টি সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। আমরা এ প্রসঙ্গে ওগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে এসব ব্যাপার এখানে বলে রাখা ভালো। প্রথমত **ইঞ্জিন** ও **গিয়ার** সিস্টেম থেকে যে ঘুর্ণন ক্ষমতা পাওয়া গেল তাকে রাস্তার অবস্থাভিত্তিক সঠিক উপায়ে কাজে লাগাতে হবে। একজন ড্রাইভারকে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া জরুরী। সুতরাং গাড়ির চাকায় কতটুকু ঘুর্ণন বা গতি থাকবে, কোনদিকে গাড়ি চলবে (সোজা, ডানে না বায়ে ঘুরবে ইত্যাদি), কোন্ সময় গাড়িটিকে থামাতে হবে, গতির ফলে সৃষ্ট কম্পন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য আলাদা প্রযুক্তির প্রয়োজন। গাড়িতে **স্টিয়ারিং, ব্রেক, ক্লাচ, সাসপেনশন** ইত্যাদি হলো এই প্রযুক্তি। ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণে থাকে প্রথম তিনটি আর শেষোক্ত সিস্টেম স্প্রিং দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া একটি গাড়িতে **ইলেকট্রিক্যাল** ও **স্টার্ট (ইগনিশন)** তন্ত্রও থাকতে হবে।



ইঞ্জিন স্টার্ট (ইগনিশন) প্রযুক্তি

রেলগাড়ি

ট্রান্সপোর্ট প্রযুক্তির উপর আমাদের আলোচনার অংশ হিসাবে এবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাবলিক যোগাযোগে ব্যবহৃত রেলগাড়ি সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা এখানে তুলে ধরবো। সাধরণত দুই ধরনের ট্রেন বর্তমানে চালু আছে। এগুলো হলো : মাটির উপরের ট্রেন ও মাটির নীচের ট্রেন।

মাটির উপরের ট্রেন আমরা অনেকেই চড়েছি। মাটির নীচেরটা হয়তো সবাই চড়েন নি- তবে এ লেখক অসংখ্যবার লণ্ডনে এই ট্রেনে যাতায়াত করেছে। উভয় ট্রেনের **ইঞ্জিন** বা **লকোমটিভ** কিন্তু ভিন্ন। মাটির উপরের **লকোমটিভ** আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত হয়ে থাকে। তবে এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন **ডিজেল / পেট্রোল** কিংবা আরোও পুরাতন বাস্পীয় **ইঞ্জিন** দ্বারাও চলানো হয় বলে দেখা যায়। সাধারণত বাস্পীয় ইঞ্জিনচালিত **লকোমটিভ** শুধুমাত্র আনন্দভ্রমণে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রেন চলাচলের জন্য **ইলেকট্রিক লকোমটিভ** ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে গেল কয়েক দশক ধরে পৃথিবীব্যাপী **'মেগনেটিক লেভিটেশন ট্রেন'** এর উপর খুব বেশী আগ্রহ জন্মেছে। বলা যায়, এই লকোমোটিভই হলো সর্বাধুনিক ট্রেন সিস্টেম।

দু'টি উপায়ে **ইলেকট্রিক লকোমটিভ** বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে থাকে। বিদ্যুতপ্রবাহ তারের মাধ্যমে লাইনের উপরে চলন্ত থাকে। ট্রেনের **লকোমটিভ** বা **ইঞ্জিন** চলন্তাবস্থায় এসব তার থেকে বিদুৎ সংগ্রহ করে শক্তিশালী **ইলেকট্রিক মোটর** পরিচালিত রাখে। অপর পদ্ধতিটি হলো রেল ট্রাকের পাশে অতিরিক্ত একটি লাইন থাকে যেখান থেকে ট্রেনের **ইঞ্জিন** বিদ্যুতের সার্বক্ষণিক সাপ্লাই পায়।

ভবিষ্যতের ট্রেন নামে খ্যাত নতুন ট্রেন হলো **'মেগলেভ'** বা **'মেগনেটিক্যালী লেভিটেইটেড ট্রেন'**। বর্তমানে জাপান, জার্মানী ও আমেরিকায় এই ট্রেন প্রযুক্তি দ্রুত শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে **প্রটোটাইপ** তৈরী হয়ে গেছে। এসব ট্রেন মূলত বাতাসের উপরে চলে- ফলে অত্যন্ত গতিশীল হতে পারে ফ্রিকশন্যাল শক্তি তাতে প্রায় না থাকায়। **মেগলেভ** ট্রেন মূলত চুম্বক ট্রেন। চুম্বককে কৌশলে কাজে লাগিয়ে ট্রেনটিকে **'গাইডওয়ে'** (ট্রাক) থেকে কিছুটা শূন্যে তুলে সামনের দিকে অগ্রসর করা হয়।

দু'টি মৌলিক উপায়ে এই বাতাসে চলন্ত ট্রেনের **ডিজাইন** করা হচ্ছে। এর প্রথমটি হলো **'ইলেকট্রমেগনেটিক সাসপেনশন'** **(ইএমএস)**। এই সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হলো গাইডওয়েতে **ইলেকট্রমেগনেট** (লৌহজাত ধাতুকে **ইলেকট্রিক** তার দ্বারা পেছিয়ে তারপর তারের মধ্য দিয়ে **কারেন্ট** পরিচালনা করলে যে সাময়িক চুম্বক তৈরী হয় তাকে **ইলেকট্রমেগনেট** বলে। **কারেন্ট** না থাকলে এতে আর চুম্বক শক্তি বিদ্যমান থাকে না।) বসিয়ে ট্রেনটিকে চুম্বকের শক্তির মাধ্যমে উপরের দিকে তুলে দেওয়া হয়। এরূপ সিস্টেম অনেকটা কম খরচে সৃষ্টি করা গেলেও এটা তেমন বিপদমুক্ত নয়। এর কারণ হলো, বর্ণিত উপায়ে ট্রেনে লিফ্‌ট সৃষ্টি করে মাত্র কয়েক মিলিমিটার উপরে ওঠানো সম্ভব। সর্বোচ্চ ১০মি.মি. (৩/৮ ইঞ্চি) উপরে ওঠানো যায়। ট্রেনটি যাতে চলন্তাবস্থায় ট্রাকের উপর লেগে না যায় সেজন্য **কম্পিউটার** দ্বারা সার্বক্ষণিক **মনিটর** ও রদবদল করার প্রয়োজন হয়। এরপরও এই সিস্টেম একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়। **ইএমএস** ডিজাইনকে অগ্রসর করে নিতে জার্মান সরকার কমার্শিয়্যাল গ্রান্ট একটি কোম্পানীকে দিয়েছে। প্রায় ২০ মাইল লম্বা একটি ট্রাকে এরূপ ট্রেন টেষ্ট করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় সিস্টেমটি অনেকটা বিপদমুক্ত তবে খুব বেশী ব্যায়বহুল। এই সিস্টেমকে বলে **'ইলেকট্রডাইনামিক সাসপেনশন'** **(ইডিএস)**। এতে বাতাসে ঝুলন্ত করতে যেয়ে **'সুপারকন্ডাকটিং চুম্বক'** ট্রেনের মধ্যে ও ট্রাক বা গাইডওয়েতে বৈদ্যুতিক কয়েল বা স্ট্রিপ ব্যবহার করে উভয়ের মধ্যে শক্তিশালী বিপরীতমুখী চুম্বকীয় ফিল্ড সৃষ্টি করা হয়।



মেগলেভ চিত্র - ক



মেগলেভ চিত্র – খ



মেগলেভ চিত্র – গ

এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অনেকটা ব্যয়বহুল হওয়ার কারণ হলো **সুপারকন্ডাকটিভ** চুম্বককে সর্বদাই অতি নিম্ন তাপমাত্রায় রাখতে হবে বিশেষ **রেফ্রিজারেশন** টেকনিকের মাধ্যমে। **সুপারকন্ডাকটার** ওসব বস্তু বা ধাতুকে বলে যেগুলোর মধ্যে **ইলেকট্রিক রেজিসটেন্স** মোটের উপর নেই বললেই চলে। অর্থাৎ ওগুলো **কন্ডাকটার** হিসাবে সুপার। তবে সাধারণত অতি অল্প তাপমাত্রা হলে এসব বস্তু কার্যকরী হয়। **ইডিএস** সিস্টেম দ্বারা লিফ্‌ট কিন্তু অনেক বেশি করা সম্ভব। ট্রেনটিকে এই উপায়ে **১৫০** মি.মি. (৪-৬ ইঞ্চি) পর্যন্ত উপরে ঝুলন্ত করা যায়।

মেগনেটিক লেভিটেশন ট্রেন সাধারণ চাকাচালিত ট্রেনের তুলনায় অনেক দিক থেকে উন্নততর। প্রথমতঃ **ফ্রিকশন** বা বিরপরীতমুখী শক্তি এই নতুন সিস্টেমে অতি অল্প থাকবে। শুধুমাত্র বাতাসই হবে ট্রেনের গতির বিরুদ্ধ শক্তি। এর ফলে এই ট্রেন **৩৪৩** মাইল / ঘণ্টায় (৫৫২ কি.মি./ঘণ্টায়) চলে বিশ্বরেকর্ড তৈরী করেছে। এই ট্রেন হবে পারিপার্শ্বিকতার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ- কারণ অতি অল্প গ্যাসীয় বর্জ্য বায়ুমণ্ডলে ছাড়বে। তবে **মেগনেটিক লেভিটেশন ট্রেন** এখনও টেস্ট পর্যায়ে আছে। যদিও ইতোমধ্যে ছোটখাটো স্বল্পদীর্ঘ লাইনে সাধারণ পাবলিকও বিভিন্ন দেশে- যেমন ইংল্যান্ড, জার্মানী, জাপান, আমেরিকা ও চীনে এই ট্রেনে যাতায়াত করছেন।

মাটির নীচের ট্রেন

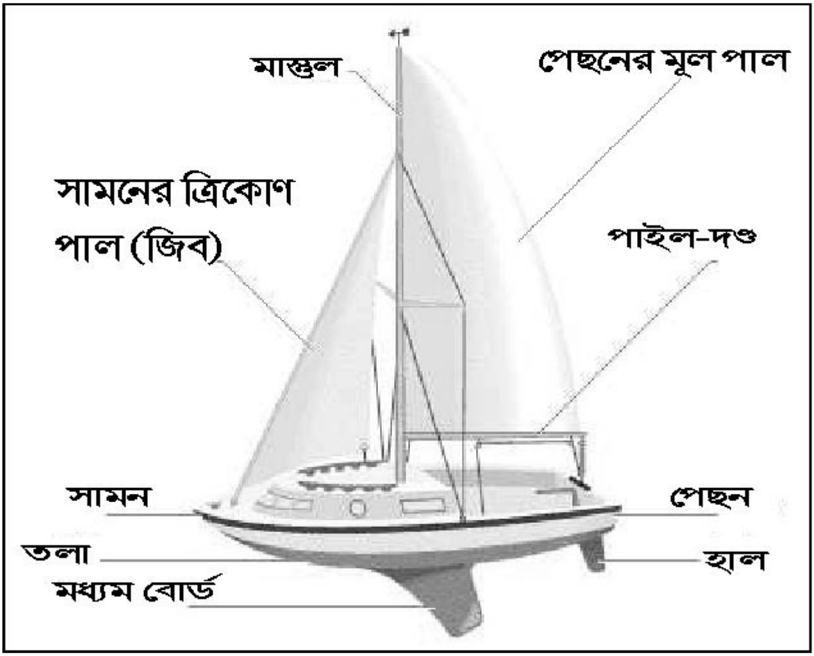
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান শহরে সাবওয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন চালু আছে। এটাকে মেট্রো সিস্টেমও বলে। লন্ডনের **আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন**, প্যারিসের **মেট্রো ট্রেন** ও নিউইয়র্কের **সাবওয়ায়ের** কথা কে না শোনেছেন। বেশ কয়েক বছর পূর্বে মিশরের রাজধানী কায়রোতেও **মেট্রো ট্রেন** চালু হয়েছে।

বড় বড় শহরে মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন চালনা করে মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা করা হলে শহরের **ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম** অনেকটা স্বস্তিকর অবস্থায় নিয়ে আসা যায়। লন্ডন, প্যারিস, টোকিও ও নিউইয়র্কের মাটির নীচের ট্রেনে দৈনিক লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করে থাকে। যদি এই ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে শহরের রাস্তায় রাস্তায় জানযোটের ফলে নগরজীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। মাটির নীচের ট্রেন সার্ভিস চালু করা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। এতে বহু বহু টাকার প্রয়োজন। গরীব দেশসমূহের জন্য এরূপ সিস্টেম চালু আদৌ সম্ভব নয়- অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হলো গরীর দেশের

রাজধানীসমূহেই মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং যাতায়াত ব্যবস্থা নাজুক হয়ে পড়ছে।

পানির উপর যাতায়াত

আমরা এতক্ষণ স্থলভূমির উপর যাতায়াত প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে আমাদের এই পৃথিবীটি কিন্তু বেশিরভাগ জলময়। অর্থাৎ খাল-বিল-নদী-নালা ছাড়াও পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে বিরাট বিরাট সাগর-মহাসাগর। মানুষ আদি কাল থেকেই সাগরের উপর জাহাজ চালিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করে আসছে। এদিকে ছোট-বড় নৌকা দ্বারা নদী-হাওর-বিলে চলাচল তো ছিলোই। তবে আমরা ঐসব নৌকা-জাহাজ নিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করবো না। আধুনিক যুগে ব্যবহৃত **মোটর** চালিত নৌকা ও জাহাজের প্রযুক্তির উপর আমাদের আলোচনা সীমিত রাখবো। এতে পাঠকরা জাহাজ ও **স্পীড বোট** সম্পর্কে আরো কিছু অবগত হবেন-এটাই আশা।

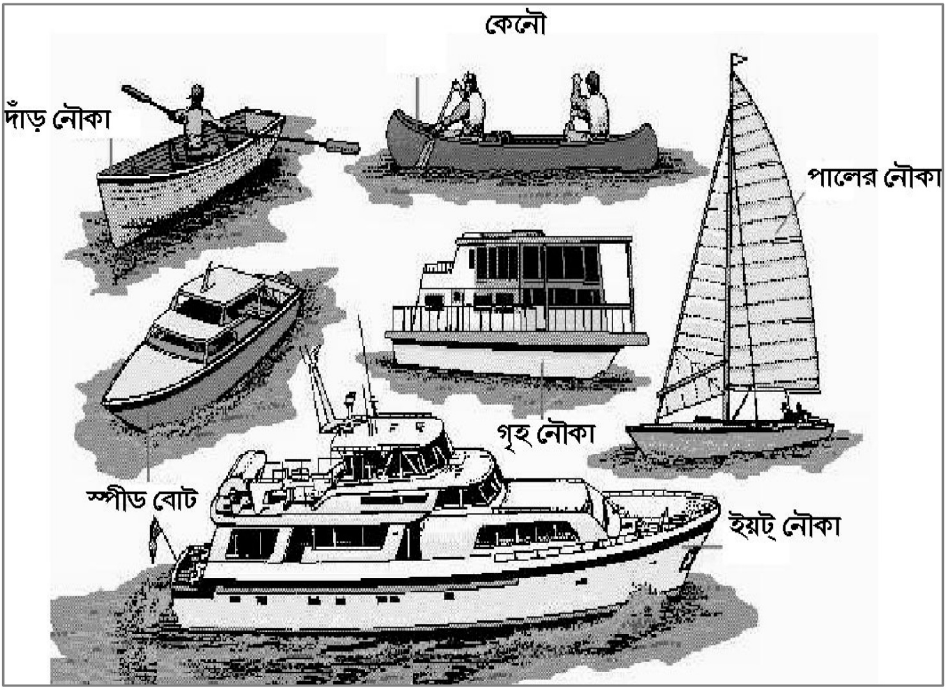


স্পীড বোট

পানির উপর চলন্ত উচ্চ গতিসম্পন্ন মোটরচালিত **স্পীড বোট** কে না দেখেছেন। এগুলোর **ডিজাইন** ও কার্যকারিতা সত্যিই চমকপ্রদ। পৃথিবীর সর্বত্র এসব বোট দেখতে পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত আনন্দভ্রমণ থেকে পানিক্রীড়ায় এসব বোট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



আমরা ইতোমধ্যে গাড়িতে ব্যবহৃত **ইন্টারনেল কমবাসশন** ইঞ্জিনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। **পেট্রোল, ডিজেল** বা **গ্যাস** জ্বালানি হিসেবে এসব ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়। আজকাল প্রায় সকল বোটই এ জাতীয় **ইঞ্জিন** দ্বারা চালিত। সাধারণত মোটরটি বোটের পেছনের মাথায় স্থাপিত থাকে।



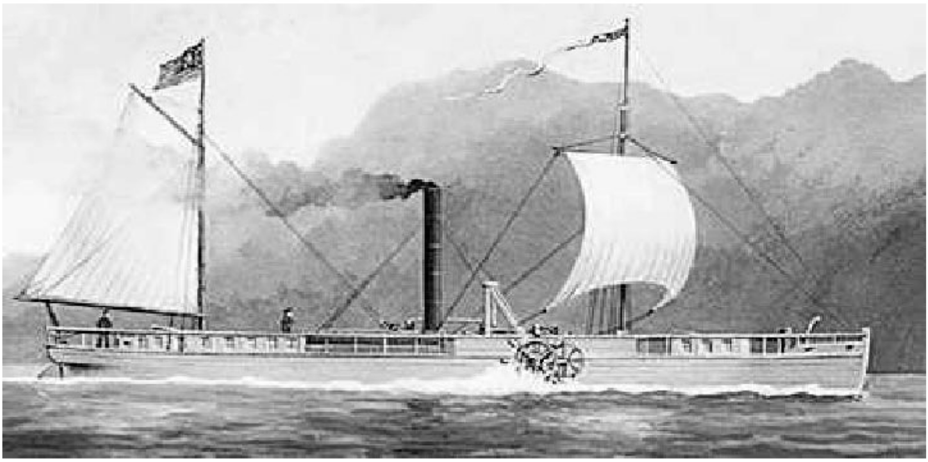
জাহাজ

বোট ও জাহাজের মধ্যে পার্থক্য বড়ত্বের মধ্যে। এছাড়া জাহাজ সাধারণত সাগর-মহাসাগরে চলাচল করে, আর বোট সৈকত ও নদী-নালায় ভাসমান যান। আজকাল কিন্তু এই পার্থক্যনির্ণয় অনেকটা ঐচ্ছিক ব্যাপার। কোন কোন আনন্দতরী আছে যেগুলোকে বোট বলা হয় বটে কিন্তু তা অনেকটা জাহাজের মতো। জাহাজ সম্পর্কে আমাদের বর্ণনা বড়গুলোর উপরই সীমিত থাকবে কারণ, ইতোমধ্যে বোট বা ইঞ্জিনচালিত নৌকার কথা তুলে ধরা হয়েছে। জাহাজের ক্ষেত্রে আগের দিনের পালের জাহাজ সম্পর্কে এখানে কিছুই বলার নেই। আমরা যেহেতু ইতিহাসের উপর আলোচনা করছি না বরং আধুনিক প্রযুক্তিই হলো আমাদের মৌলিক আগ্রহ- তাই যে কোন বিষয়ের উপর বর্ণনায় আমরা ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু বলবো না।

বিভিন্ন ধরনের জাহাজ

অনেক ধরনের জাহাজ আছে যা পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরে প্রতিমুহূর্তে চলাচল করে। বিরাট আয়তনের **প্যাসেঞ্জার লাইনার** থেকে অত্যাধুনিক বিমানবাহী সামরিক জাহাজ এবং পানির নীচে চলমান আনবিক শক্তিসম্পন্ন **সাবমেরিন** আজকের মহাসাগরে সর্বদা চলন্ত। আমরা যদি বিভিন্ন জাতের জাহাজের নামগুলোর একটি লিস্ট তৈরী করি তাহলে তা বেশ লম্বা হবে, যেমনঃ

১. ইঞ্জিনচালিত প্যাড্‌লচক্র জাহাজ : এই জাহাজের দু'ধারে দু'টি বড় চাকা ছিল। এগুলোর মধ্যে অসংখ্য বৈঠা থাকতো এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনের মাধ্যমে এগুলো ঘুরিয়ে জাহাজকে সামনের দিকে অগ্রসর করা হতো।



২. স্টীমার : এই জাহাজে স্ক্রুর মতো **প্রপেলার** থাকতো। বাষ্পীয় **ইঞ্জিন** দ্বারা এটা চলতো।

৩. প্যাড্‌লচক্র ও **প্রপেলার** জাহাজ : এই জাহাজগুলো লোহার তৈরী ছিল এবং বাষ্পীয় **ইঞ্জিন** দ্বারা প্যাড্‌লচক্র ও স্ক্রু **প্রপেলার** পরিচালনা করে জাহাজকে সামনের দিকে চালানো হতো।

৪. ক্রুজ শীপ : এগুলো এখনও সাগরে চলাচল করে। এই জাহাজগুলো মূলত প্যাসেঞ্জারদের জন্য তৈরী হয়ে থাকে। আগের দিনের প্যাসেঞ্জার লাইনার জাহাজের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট্ট এসব জাহাজের কদর এখনও কমে নি। মানুষ পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর দ্বীপ ও দেশে এই জাহাজে ভ্রমণ করে মনোরঞ্জনের জন্য।


দ্রুত গতিসম্পন্ন বৃটিশ 'হোভারক্রাফ্‌ট'।

৫. কার্গো জাহাজ : পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরে কার্গো জাহাজের সংখ্যা অনেক বেশী। এসব বিরাট আকার, আয়তন ও ক্যারী ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ দ্বারা দেশ থেকে দেশান্তরে বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্যারী করা হয়। এসব পণ্যের মধ্যে খাবার দ্রব্যাদি, কফি, টেক্সটাইল, ধাতু, তৈল, মিনারেল ইত্যাদি এখানে উল্লেখযোগ্য। কার্গো জাহাজ কোন বিশেষ ধরনের পণ্য ক্যারী করার জন্যও তৈরী করা হয়- যেমন, ওয়েল ট্যাংকার। অপর আরেক ধরনের কার্গো জাহাজ আছে যাকে কন্টেইনার শীপ বলে। এসব জাহাজে যাবতীয় পণ্য বিশেষ কন্টেইনারের মধ্যে থাকে। সুতরাং পোর্টে পৌঁছে জাহাজ থেকে মালামাল ওঠানামা করা অনেকটা সহজ ও অল্প ব্যয়ে সম্ভব হয়। বিশেষ ক্রেইনের মাধ্যমে কন্টেইনার ওঠানো ও নামানো হয়।



কন্টেইনার জাহাজে পণ্য ওঠানো-নামানো হচ্ছে

৬. ক্রুড ক্যারিয়ার : এই জাহাজও একটি কার্গো জাহাজ। এসব জাহাজ দ্বারা ক্রুড তৈল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্যারী করে। এসব জাহাজ খুব বড়- একেকটি জাহাজ ৩ লক্ষ টন তৈল ক্যারী করতে সক্ষম।

৭. ট্রলার : এগুলো সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে জেলেরা ব্যবহার করেন।



সমুদ্রে মাছ ধরার ট্রলার

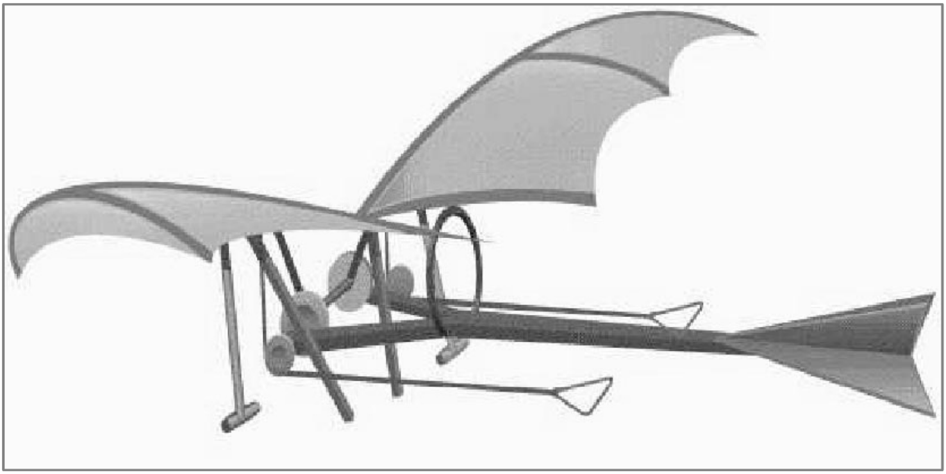
৮. রিসার্চ জাহাজ : গভীর সাগরে ড্রিলিংয়ের জন্য বিশেষ গবেষণা জাহাজ তৈরী হয়েছে। এগুলো প্রায় ৫০০০ ফুট গভীরে সমুদ্রতল থেকে মাটির সাম্পুল নিয়ে আসতে পারে। বিশেষ শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে জাহাজকে সঠিক স্থানে স্থির রাখা হয়।

রিসার্চ জাহাজ সাধারণত দেশের সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বড় বড় কোম্পানী ইত্যাদি দ্বারা পরিচালিত হয়। গেল শতকের ষাটের দশকে চ্যালেঞ্জার নামক একটি গবেষণা জাহাজ নির্মিত হয়। ৪০০ ফুট দৈর্ঘ্য এই জাহাজটি মহাসাগরের তলদেশে **ড্রিলিং** করে সাম্পুল নিয়ে আসে। এটা গবেষণা করেই আধুনিক **জিওলজিক্যাল থিওরী 'প্লেট টেকটনিক'** প্রমাণিত হয়। এই থিওরীতে বলা হয়েছে, সদূর অতীতে (মিলিয়ন মিলিয়ন বৎসর পূর্বে) পৃথিবীর সকল মহাদেশ একটি মাত্র ভূখণ্ড থেকে ভেঙ্গে বিভক্ত হয়েছে।

৯. হোভারক্রাফ্ট : এই জাহাজটি আয়তনে ছোট্ট। এটা পানির উপর চলে। তবে এই যানটির বৈশিষ্ট্য হলো পানির লেবেল থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে থেকে এটা **প্রপেলার** ফ্যানের শক্তিতে চলে। এভাবে চলার ফলে এটার গতি সাধারণ যানের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। বৃটিশ তৈরী একটি **ক্রাফ্ট ৬৫ নটিক্যাল মাইল** পর্যন্ত গতিশীল হতে সক্ষম।

আকাশপথে যতায়াত

বিমান বা উড়োজাহাজ হলো আজকের আকাশভ্রমণের প্রধান উপকরণ। এটা মূলত বাতাসের উপর ভর করে দ্রুত গতিতে চলে। বিমানের পাখা ও **ইঞ্জিন** উভয়টি একত্রে কাজ করে বিমানকে উড্ডয়ন, চলন্ত ও অবতরণ করায়। শতাধিক বছর পূর্বে সর্বপ্রথম বিমান আবিষ্কার হওয়ার পর এখন পাঁচ শতাধিক পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার নিয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য বিমান আন্তর্জাতিক রুটে উড়ে চলছে। কোন একদিন বলা হতো বিমানে যাতায়াত শুধু সুপার-ধনীদের আয়ত্বাধীন আনন্দভ্রমণের উপায় হিসাবে থাকবে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্বল্প সময়ের ভেতর আকাশপথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশপথে যাতায়াত ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব হলো এবং কোন্ কোন্ কারণে তা প্রায় সবার জন্য ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে ওঠলো তার বর্ণনা আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে তোলে ধরবো।



বিমান প্রযুক্তি

বিমান আকাশে উড়ে তার পাখায় উড্ডয়ন শক্তি সৃষ্টি হওয়ার ফলে। আমাদের বায়ুমণ্ডলে যে বাতাস আছে বিমান সেটাকে কাজে লাগায়। গতিশীল থাকাবস্থায় বিমানের পাখায় বিশেষ ডিজাইনের ফলে উড্ডয়ন শক্তি সৃষ্টি হয় এতে বিমানটি উচ্চতা বজায় রেখে তার ইঞ্জিনের শক্তিতে সামনের দিকে চলতে থাকে। শুধু উড্ডয়ন

শক্তি নয়- একটি বিমানে এই শক্তিসহ মোট চারটি ভিন্ন ফোর্স একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে (নীচের ডায়াগ্রামটি দেখুন)।



বিমানে সক্রিয় চারটি মৌলিক গতি

একটি বিমানের মধ্যে অসংখ্য ভিন্ন অংশ আছে যাদের প্রত্যেকটিই একেকটি বিশেষ কাজ বা **ফাংশন** করে। বিমানের মৌলিক অংশগুলো হলো : মূল কাঠামো (**ফিউসেলাজ**), পাখা, অবতরণ চাকা (**ল্যান্ডিং গিয়ার**) ও লেজ অংশ (টেইল)। ফিউসেলাজে থাকে প্যাসেঞ্জার, কার্গো ও পাইলট কক্ষ। পাখার মাধ্যমে বিমানটি উড়তে পারে- এতে সৃষ্টি হয় **লিফ্‌ট**। গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার পড়ে উভয় পাখায় স্থাপিত চালনা করা যায় এমন নিয়ন্ত্রক অংশ। লেজে আছে ফিক্স ও চালনা করা যায় এমন কিছু অংশ যা বিমানটি নিয়ন্ত্রণ ও উড়ার সময় সাহায্য করে। উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য অবশ্য চাকা বা **ল্যান্ডিং গিয়ার** জরুরী।



বিমানের বিভিন্ন অংশ

উপরের ছবিতে যে বিমানটি দেখানো হয়েছে এগুলো মূলত ব্যক্তি মালিকানাধীন ছোট্ট উড়োজাহাজ যা ধনাঢ্য দেশে অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন। তবে এখানে বর্ণিত বিভিন্ন অংশ বড় কমার্শিয়াল বিমানেও বিদ্যমান। **প্রপেলার** না হয়ে সেটিতে হয়তো থাকবে **জেট ইঞ্জিন;** ফিউসেলাজের **ডিজাইন** হয়তো ভিন্ন ইত্যাদি। আমরা এসব মৌলিক অংশের উপর আলাদাভাবে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১. ফিউসেলাজ

এটাই বিমানের মূল প্রধান অংশ বা দেহ। এরই মধ্যে স্থাপিত হয় অন্যান্য ছোট্ট অংশগুলো। ফিউসেলাজে আছে প্যাসেঞ্জার বসার কেবিন ও পাইলটের ককপিট। এছাড়া নীচের অংশে থাকে প্যাসেঞ্জারদের লাগেজ রাখার কম্পার্টমেন্ট। জঙ্গী বিমানে ফিউসেলাজে **ইঞ্জিন** কিংবা বন্দুক থাকতে পারে। কার্গো বিমানে অবশ্য ফিউসেলাজের অধিকাংশ স্থান কার্গো পণ্যে ভরপুর থাকে।

২. পাখা

সকল বিমানেই পাখা আছে। অবশ্য পাখার সাইজ অতি ছোট্ট থেকে বেশ বড় হতে পারে- তা নির্ভর করবে বিমানটি কোন্ ধরনের তার ওপর। যেমন **স্পেইস শাট্লের** পাখা দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র। অপরদিকে **বোয়িং** বিমানের পাখা বিরাট আয়তনের হয়ে থাকে। কোন এক সময় বিমানে মোট চারটি পাখা থাকতো। তবে আধুনিক যুগে প্রায় সকল বিমানেই পাখা থাকে দু'টি এবং এসব এলুমিনিয়াম ও স্টীলের তৈরী ডানার মধ্যে ইঞ্জিন, (জঙ্গী বিমানে) যুদ্ধাস্ত্র, জ্বালানি এবং ল্যান্ডিং গিয়ারসহ আরোও কিছু জরুরী যন্ত্রপাতি এঁটে দেওয়া হয়।

৩. লেজ অংশ

অধিকাংশ উড়োজাহাজের লেজ থাকে। লেজের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্রাংশ আছে। এগুলো হলো: **ভারটিক্যাল** (উল্লম্ব বা খাড়া) ও **হরাইজোন্টেল** (অনুভূমিক) নিয়ন্ত্রক বা স্থিতিরক্ষক (**স্টাবিলাইজার**); **রাডার** (হাল); এবং **এলেভেটর** (উড্ডয়ন-অবতরণ যন্ত্র)। সবক'টি যন্ত্রকে একত্রে **'এমপেনেজ'** বলে। **স্টাবিলাইজার** দ্বারা বিমানটিকে উড়ন্ত অবস্থায় স্থিতিশীল রাখা হয়। **রাডার** দ্বারা বিমানটিকে ডানে-বামে ঘুরানো হয়। তবে **রাডারই** একমাত্র ব্যবস্থা নয়- পাখা দ্বারাও বিমানকে ঘুরাতে হবে। রাডারের কাজ হলো বিমানের নাককে ডানে-বামে নিয়ে যাওয়া। পাইলটের পায়ের নীচে **রাডার** নিয়ন্ত্রণের দু'টি প্যাড আছে। এগুলোতে পা দ্বারা ধাক্কা দিয়ে **রাডার** পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। **এলেভেটর** দ্বারা উপর ও নীচের দিকের গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটাকে উপরের দিকে তুললে বিমানের লেজের অংশ নীচের দিকে যাবে ও নাক উপরের দিকে ওঠবে। ঠিক এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হবে যদি এটাকে নীচের দিকে নামানো হয়। পাইলটরা সাধারণত হাতের মাধ্যমে এলেভেটরের কন্ট্রোল লিভারটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

৪. ল্যান্ডিং গিয়ার

সকল উড়োজাহাজকেই যে কোন ধরনের ল্যান্ডিং গিয়ারসম্পন্ন হতে হবে। এতে ব্যবহৃত হয় ব্রেক ও চাকা। টায়ারগুলো ল্যান্ডিংয়ের সময় স্থির থেকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ২০০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় গতিশীল হয়ে ওঠে। একই সাথে এদের উপর পতিত হয় ৪০০ পর্যন্ত **মেট্রিক টন** ওজন- সুতরাং এয়ারপ্লেনের টায়ার তেমনি ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া চাই। অন্যথায় নিশ্চিত দুর্ঘটনার শিকার হবে বিমানটি অবতরণ

কিংবা উড্ডয়নের সময়। অধিকাংশ বিমানের ফিউসেলাজে উড্ডয়ন শেষে **ল্যান্ডিং গিয়ার** লুকিয়ে রাখা হয়। অবশ্য ল্যান্ডিংয়ের পূর্ব মুহূর্তে আবার বের করে নিয়ে এসে সঠিক স্থানে স্থির করারও ব্যবস্থা আছে।

৫. নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি

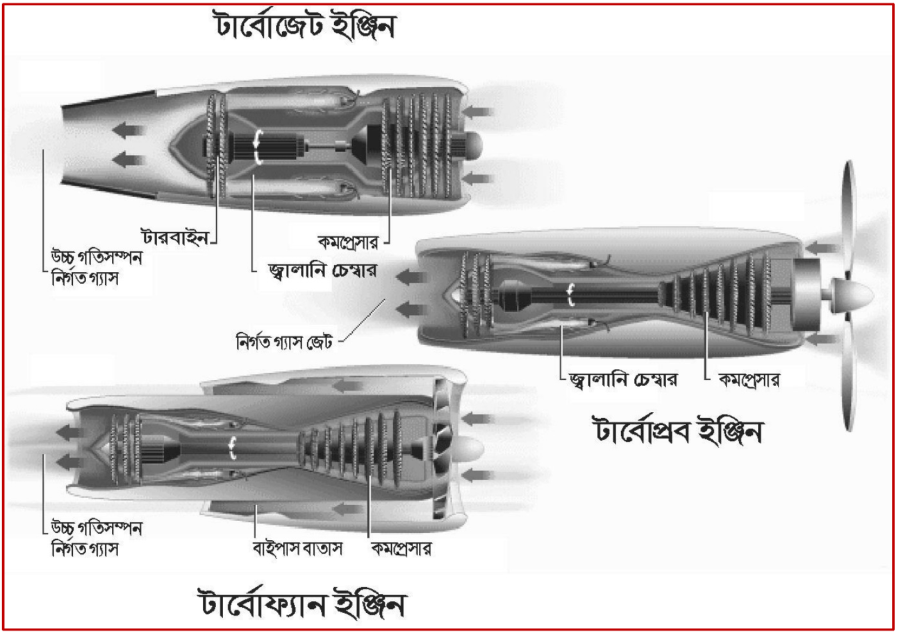
বিমানের নিয়ন্ত্রণ অবশ্য পায়লটের **ককপিট** (কক্ষ) থেকেই করা হয়। একটি আধুনিক বিমানের ককপিটে থাকে অসংখ্য **ইলেকট্রনিক** যন্ত্রপাতি এবং **গিয়ার।** একটি বিমানকে আকাশে উড্ডয়ন, শক্তিপূর্ণভাবে উড়ানো ও এয়ারপোর্টের রানওয়েতে সঠিকভাবে অবতরণ করানো অতি সহজ কাজ নয়। বছরের পর বছর ট্রেনিং নেওয়ার পর পাইলটরা দক্ষতা অর্জন করেন।



ককপিটে যেসব যন্ত্রপাতি থাকে তার মধ্যে বিমানের উচ্চতা, কাত-চিৎ অবস্থা, ইঞ্জিন, **ইলেকট্রিক্যাল** সিস্টেম, **মেকানিক্যাল** সিস্টেম, গতি, বাইরের আবহাওয়া ও তাপমাত্রা, বাতাসের গতিবিধি, গন্তব্যস্থানের দূরত্ব ইত্যাদি। এছাড়া রেডিও কন্ট্রোলের মাধ্যমে পাইলটকে সর্বদাই **গ্রাউন্ড কন্ট্রোল টাওয়ারে** কর্মরত অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করতে হয়।

৫. ইঞ্জিন

একটি উড়োজাহাজের আসল বস্তু হলো তার ইঞ্জিন। **ইঞ্জিন** ছাড়া সে সম্পূর্ণ অচল। দু'টি মৌলিক ইঞ্জিনের যে কোন একটি বিমানে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি হলো **পিসটন ইঞ্জিন** (গাড়িতে ব্যবহৃত ইঞ্জিনের মতো)। আর দ্বিতীয়টি হলো **জেট** বা **টারবাইন ইঞ্জিন**। আধুনিক যুগে অধিকাংশ বিমানে শেষোক্ত **ইঞ্জিন** ব্যবহৃত হয়ে থাকে।



ছোট্ট বিমানে এখনও চরকি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোকে বলে **প্রপেলার** চালিত বিমান। ৪ স্ট্রোক **পিসটন ইঞ্জিন** দ্বারা এসব **প্রপেলার** ঘুরিয়ে বিমানে গতি সৃষ্টি করা হয়। বড় উড়োজাহাজে **জেট ইঞ্জিন** ব্যবহৃত হয়। তিন ধরনের **জেট ইঞ্জিন** বর্তমানে বিভিন্ন বিমানে দেখা যায় (উপরের চিত্রটি দেখুন)। **জেট ইঞ্জিন** মূলত সামনের বাতাসকে জোর করে ভিতরে নিয়ে আসে। এরপর ঘুরন্ত **কমপ্রেসারে** নিয়ে বাতাসকে জ্বালানির সঙ্গে মেশানো হয়। তারপর এতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা পেছন দিকে বের হয়ে যায়। এতে বিমানের মধ্যে সৃষ্টি হয় সামনের দিকে চলমান বিরাট গতি। একই ধরনের জেট ইঞ্জিনের মাধ্যমে রকেটও চালনা করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে কিছুটা অতিরিক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। **রকেট** শূন্য

স্থানের উপর চলমান হলে বাতাস পাবে না- তাই তাকে তার নিজস্ব বাতাস সাথে করে নিয়ে যেতে হয়। **রকেট** প্রযুক্তির উপর আমরা পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো।

বিভিন্ন ধরনের বিমান

সাতটি ভিন্ন ধরনের বিমান আছে। এগুলো হলো ঃ **১.** স্থল ও আকাশপথের জন্য নির্মিত বিমান; ২. বিমানবাহী জাহাজের জন্য নির্মিত **ফাইটার এরোপ্লেইন;** ৩. সাগরের ও আকাশপথে চলাচলের জন্য বিমান; ৪. জল, স্থল ও আকাশপথে চলাচলযোগ্য বিমান; ৫. সোজা উপরের দিকে ওঠানো ও নীচের দিকে নামানো যায় এরূপ বিমান; ৬. অল্প **টেক-অফ** ও অবতরণ বিমান; ৭. এবং মহাকাশ **শাট্‌ল**। এছাড়া উড়োজাহাজ মূলত তিনটি আলাদা ক্লাসে বিভক্ত। এগুলো হলো : **১.** বাণিজ্যিক (**কমার্শিয়াল**), ২. সামরিক (**মিলিটারী**) এবং ৩. ব্যক্তি মালিকানাধীন (**প্রাইভেট**)।

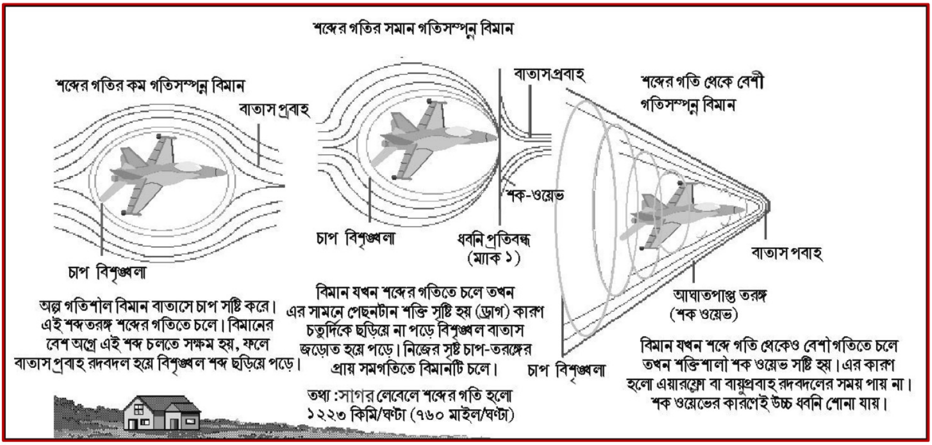


বিভিন্ন ধরনের বিমান

সুপারসনিক ফ্লাইট

বাতাসে শব্দের গতি ১২২০ কি.মি (৭৬০ মাইল) প্রতি ঘণ্টা। একটি বিমানের ফ্লাইট বেশ গতিশীল হয়, স্বভাবতই। এর কারণ হলো বিমানকে প্রথমত আকাশে অবস্থান নিশ্চিত করতে যেয়ে একটি সর্বনিম্ন গতিতে চলতেই হবে এবং দ্বিতীয়ত আকাশপথে চলতে বাতাস ও মহাকর্ষ ছাড়া অন্য কোন বিপরীতমুখী শক্তি বিমানের উপর ক্রিয়াশীল থাকে না। অবশ্য আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি **ড্রাগ, থ্রাস্ট, গ্রাভিটি ও লিফ্‌ট**- এই চারটি শক্তি একই সঙ্গে উড়ন্তাবস্থায় একটি বিমানে বিদ্যমান থাকে। তবে মূলত একমাত্র বাতাসকে ঠেলে চলাকেই, বিমানের সরাসরি বিপরীতমুখী শক্তি বা **ফ্রিকশন্যাল ফোর্স** বলা চলে। এতো গেল বাতাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিমানের গতি।

সুপারসনিক্স অর্থ, যে মাধ্যমের উপর চলন্ত তাতে শব্দের গতি থেকে বেশী গতিশীল কোন বস্তু ও এর গবেষণা। আমাদের বায়ুমণ্ডলে শব্দের গতি চাপ, তাপ ও আদ্রতার তারতম্যের সাথে কিছুটা বেশকম হয়ে থাকে। বিমান ডিজাইনে কিছু গাণিতিক সমীকরণ প্রয়োজন এবং শব্দতরঙ্গ এসব সমীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শব্দের গতিকে **'মাক নাম্বার'** দ্বারা মাপা হয়। এর অর্থ হলোঃ কোন বস্তু যেমন বিমান যদি শব্দের সমান গতিতে (বা ৭৬০ মাইল প্রতি ঘণ্টায়) চলে তাহলে এটার গতি **১ মাক** (এম-**১**) হবে। এখন বাতাসের আদ্রতা, তাপ ইত্যাদির পরিবর্তন হেতু তরঙ্গের গতিও পরিবর্তন হবে- সুতরাং **মাক** নাম্বারও সেই হারে রদবদল হবে। অন্যকথায় **১ মাক** নাম্বারে সর্বদা চলতে যেয়ে হয়তো বিমানের গতিকে সময় সময় পাল্টাতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ঊর্ধ্বাকাশে **স্ট্রাটোস্ফেয়ারে মাক** নাম্বার এম-**১.১**৬। ওখানের বাতাসের আদ্রতা, চাপ, তাপ ইত্যাদি ভিন্ন। **মাক** নাম্বার দ্বারা বিমানের গতি নিয়ন্ত্রণ তাই অনেকটা সুবিধাজনক।

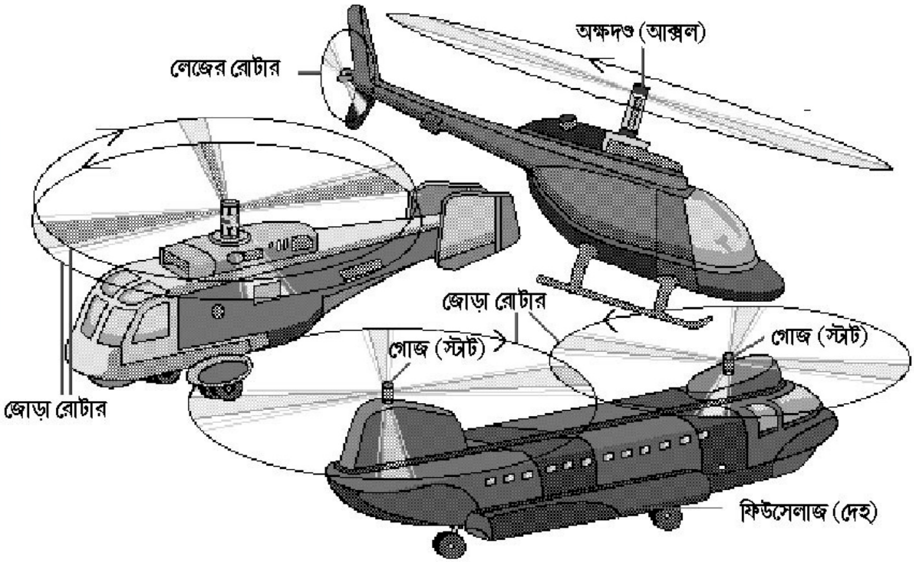


এখন প্রশ্ন আসে বিমান যখন শব্দতরঙ্গের গতি থেকেও বেশি তথা **সুপারসনিক** হয় তখন কি হবে? পরীক্ষা করে দেখা গেছে বিমান বা যে কোন **প্রজেকটাইল** যখন **সাবসনিক** (বা শব্দের গতির নীচের গতিতে) - সাধারণত এম-০.৮৫ এর নীচে চললে, বায়ুমণ্ডলে উড়ন্ত বস্তু তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করে না। কিন্তু এই গতি যখন এম-০.৮৫ থেকে এম-১.৩ হবে তখন আলোড়নও শুরু হবে। গতি যতোই বাড়বে **ডিস্টারবেন্স** ততোই বৃদ্ধি পেয়ে শক্ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। **শক্ ওয়েভ** বেশি হলে ফ্লাইটে সমস্যা দাঁড়াবে তাই আধুনিক **সুপারসনিক** বিমানের পাখা অনেকটা (৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত) পেছনের দিকে বাঁকা করে তৈরী করা হয়ে থাকে। আমরা অনেকেই বৃটেন-ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে সৃষ্ট **'কনকর্ড'** বিমানের কথা শোনেছি কিংবা দেখেছি। এই বিমান ও জঙ্গী বিমানের পাখাগুলো লক্ষ্য করার ব্যাপার- এগুলো সবই খুব বেশী পেছনের দিকে বাঁকা। এই বাঁকাকরণের কারণ হলো উপরে বর্ণিত **সুপারসনিক** গতি ও এ থেকে সৃষ্ট শক্ তরঙ্গের ক্রিয়া থেকে রক্ষা।

হেলিকপ্টার

সকল বিমান ডিজাইনের মধ্যে **হেলিকপ্টার** একটি ব্যতিক্রমধমী উড়ন্ত বস্তু। প্রথমত এটা সরাসরি উপরের দিকে উড্ডয়ন করতে পারে, দ্বিতীয়ত এটা আকাশে একই স্থানে স্থির থাকতে পারে এবং তৃতীয়ত এটা সোজাসুজি অবতরণও করতে পারে। এই তিন 'পারা'র মধ্যে একমাত্র বৃটিশ তৈরী জঙ্গী বিমান **হ্যারিয়ার জাম্পজেট** ছাড়া আর কোন **'বিমান'** এরূপ পারে না। **হেলিকপ্টার** যদিও বিমানের অন্তর্ভুক্ত আকাশযান কিন্তু একে

'বিমান' বলে সম্বোধন না করাই উত্তম। একইভাবে ইংরেজী শব্দ এয়ার**ক্রাফ্ট** ও এয়ারপ্লেইনের অর্থ সমার্থবোধক হলেও এয়ার**ক্রাফ্ট** হেলিকপ্টারসহ যাবতীয় কৃত্রিম উড়ন্ত যানকে বুঝায়- অপরদিকে এয়ারপ্লেইন মূলত একটি **ক্লাস অব ফ্লায়িং অবজেক্ট**। হেলিকপ্টারের মূল উড়ার শক্তি তার **'রোটারি পাখা'**। কিন্তু বিমানের চালিকাশক্তি তাদের ফিক্স করা পাখাযুগল। এখানে মৌলিক পার্থক্য- একটার পাখা ঘুরে অপরটির পাখা স্থির।

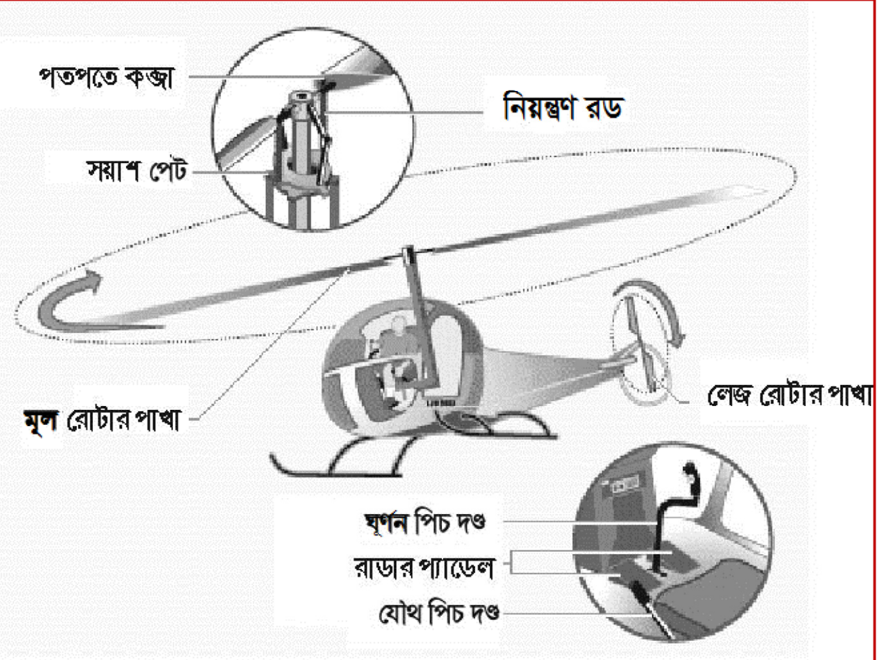


রোটার পাখাসর্বস্ব বিভিন্ন হেলিকপ্টার

ডিজাইন

হেলকিপ্টার যেহেতু উপরের মূল **রোটার** পাখা দ্বারা চালিত তাই চলন্ত অবস্থায় যে বিপরীতমুখী **'টর্ক'** শক্তির জন্ম নেয়, তা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া উপায় নেই। কারণ এই শক্তির ফলে **রোটার** ঘুরবে একদিকে ও পুরো দেহ বা **ফিউসেলাজ** ঘুরবে অপরদিকে। সাধারণত এই সমস্যা সমাধানেই লেজের মধ্যে আরেকটি ছোট্ট **রোটার** পাখা থাকে। উপর-নীচের দিকে গতিশীল এই **রোটার** থেকে সৃষ্টি হয় সাইডের দিকে শক্তি। সুতরাং ফিউসেলাজে সৃষ্ট ঘুর্ণন শক্তিকে এটা ক্যানসেল করে একটি ব্যালান্স তৈরী করে।

এছাড়া এটা দ্বারা আরেকটি কাজও হয়- পুরো কপ্টারকে ঘুরানোরও দরকার। পাইলট লেজ পাখার গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে কপ্টারটিকে ঘুরিয়ে ও সোজা করে চালাতে সক্ষম হোন।



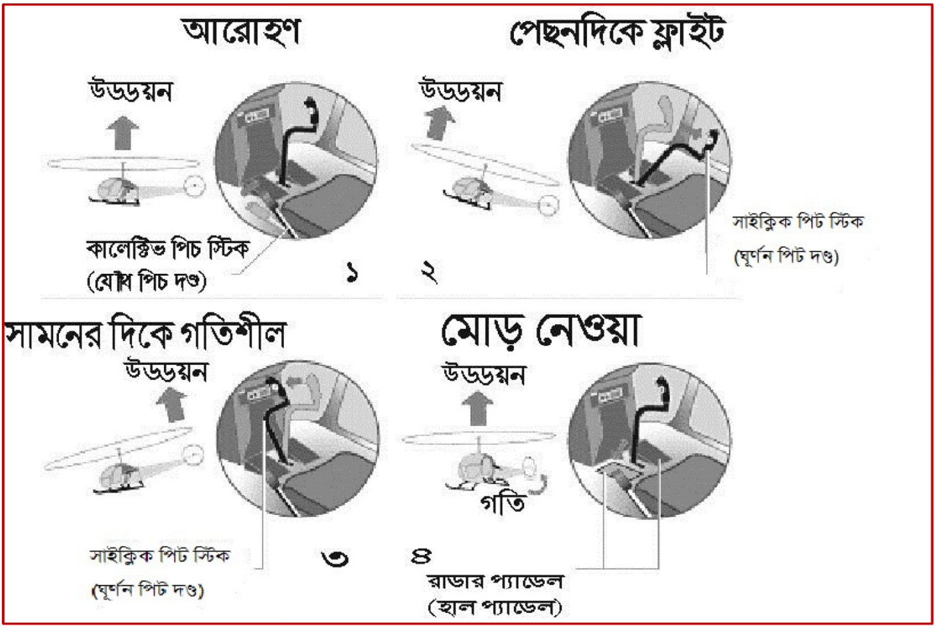
হেলিকপ্টারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি

পাখা থেকে সৃষ্ট **টর্ক** শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে কিছু কিছু হেলিকপ্টারে আরেকটি সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। এসব কপ্টারে একটির বদলে দু'টি মূল **রোটার** পাখা থাকে। তবে তাদের ঘূর্ণন পথ বিপরীত দিকে। এতে ফিউসেলাজের উপর দু'টি বিপরীতমুখী **টর্ক** শক্তি জন্ম নেওয়ায় এমনিতেই তা কেনসেল হয়ে ব্যালান্স সৃষ্টি করে। এছাড়া বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্মিত এসব **রোটার** পাখাকে কাত-চিৎ করাও যায়- ফলে হেলিকপ্টারকে ডানে-বামে, কিংবা উপরে-নীচের দিকেও ঘুরানো সহজ হয়ে ওঠে।

একজন পাইলটকে **হেলিকপ্টার** নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিসহ **হেলিকপ্টার** তৈরী হয়। এসব নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাদি বা উপায়-উপকরণের মধ্যে মূল **রোটার** পাখা, ঘুর্ণন পিচ্ দণ্ড (**সাইক্লিক পিচ্ রড**), **সয়াশ প্লেট**, লেজ **রোটার** পাখা, পতপতে কব্জা (**ফ্লাপিং হিঞ্জ**), নিয়ন্ত্রণ রড (**কন্ট্রল রড**), **রাডার প্যাডেল** ও যৌথ পিচ্ দণ্ড উল্লেখযোগ্য।

মূল রোটার পাখা : লিফ্‌ট বা উড্ডয়ন সাধনে **রোটার** পাখাতে টিল্ট বা পিচ্ দিতে হয় (অর্থাৎ কাত-চিৎ করা হয়)।

সাইক্লিক পিচ্ রড : মূল **রোটার** পাখার নীচে **সয়াশ প্লেট** আছে। এগুলোকে **সাইক্লিক পিচ্ রড** বা ঘুর্নন পিচ্ দণ্ড নাড়িয়ে রোটারে পিচ্ তৈরী করা হয়। এই পিচ্‌কে রদবদলের মাধ্যমে পাইলট হেলিকপ্টারকে উড্ডয়ন, সামন-পেছন কিংবা ডানে-বামে চালাতে পারেন।



সয়াশ প্লেট : যৌথ পিচ্ দণ্ড ও ঘুর্ণন পিচ্ দণ্ড নড়াচড়া করলে এই **সয়াশ প্লেইট** নড়ে ও **রোটার** পাখাকে বিভিন্ন দিকে ঘুরায়।

টেইল রোটার : এটার মৌলিক কাজ হলো মূল **রোটার** পাখা দ্বারা সৃষ্ট **টর্ক** (ঘুর্ণন) গতির প্রভাব থেকে হেলিকপ্টারকে মুক্ত রাখা। এটা বিপরীতমুখী গতি সৃষ্টি করে ব্যালান্স সৃষ্টি করে। উপরের ছবিতে এটাকে **'লেজ রোটার পাখা'** নামে দেখানো হয়েছে।

পতপতে কব্জা (ফ্লাপিং হিঞ্জ) : হেলিকপ্টারের **রোটার** ব্লেডে এরূপ কব্জা আছ। এগুলো ছাড়া কপ্টারটি নিয়ন্ত্রণ করা যেতো না- কারণ, ফ্লাইটের সময় অতিরিক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত লিফট্ সৃষ্টি হতে পারে- এই ডিজাইনের ফলে তা আর হয় না।

নিয়ন্ত্রণ রড (কন্ট্রল রড) : এগুলো ফ্লাইটের সময় **রোটার** ব্লেডের পিচ্ রদবদল করে। এটাই ব্লেডে সৃষ্ট উড্ডয়ন বৃদ্ধি কিংবা কমানোর কাজ করে।

রাডার প্যাডেল : এটা মূলত লেজের **রোটার** ব্লেডকে নিয়ন্ত্রণ করে। কপ্টারকে ডানে কিংবা বায়ে ঘুরাতে হলে পাইলট ডানের না হয় বায়ের **রাডার** (বা হাল) প্যাডেলে প্রেস করেন।

যৌথ পিচ্ দণ্ড (**কালেক্টিভ পিচ্**) : এটা দিয়েই হেলিকপ্টারকে আকাশের মধ্যে স্থির রাখা হয়। এটা সকল **রোটার ব্লেড** ও সয়াশ প্লেটকে একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এটাকে পরিবর্তন করলেই **হেলিকপ্টার** উপরের দিকে উঠতে কিংবা নীচের দিকে নামতে থাকে।

কৃত্রিম উপগ্রহ ও বিমান

আমরা টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির উপর আলোচনাকালে কৃত্রিম উপগৃহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবে এখানে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে উড়ন্ত ও একইসময় মহাকাশে যেয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে অবস্থান করে, এমন একটি অত্যাধুনিক এয়ার**ক্রাফ্ট** নিয়ে কিছুটা আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। আমাদের এ পরিচ্ছেদের বর্ণনার সঙ্গেও এটা সামঞ্জস্যশীল। আমি অবশ্য আমেরিকার নাসা কর্তৃক সৃষ্ট ও চালিত **স্পেইস শাট্ল** নামক বিমান-মহাকাশযানের কথা বলছি। সুতরাং আসুন এবার বুঝে নিই, এই কৃত্রিক উপগ্রহ ও সাধারণ বিমান -এই উভয় চেহারাসম্পন্ন যানটি কিভাবে কাজ করে।

শাট্ল এমন একটি যান যা মানুষসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এমনকি কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশে যেতে এবং আবার পৃথিবীতে ফিরে

আসতে পারে। এটা একটি পুনঃব্যবহারযোগ্য বিমান-মহাকাশযান। **স্পেইশ শাট্‌ল** নির্মণের পূর্ব পর্যন্ত যাবতীয় মহাকাশ যান মূলত পুনঃব্যবহারযোগ্য ছিলো না। একবার উড্ডয়ন শেষে এটা আর পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনে কাজে লাগানো আদৌ সম্ভব ছিলো না। সুতরাং বিজ্ঞানীরা বিশেষকরে আমেরিকার **নেশন্যাল এ্যারোনটিক্স এন্ড স্পেইস এডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)** এর গবেষক ও ইঞ্জিনিয়াররা একটি পুনঃপুন ব্যবহারযোগ্য মহাকাশযান নির্মাণের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালান। তাদের এই পরিশ্রমের ফসলই হলো **স্পেইস শাট্‌ল** নামক এই বিমান-মহাকাশ যানটি।



দীর্ঘ ১০ বছরের পরিশ্রম ও প্রস্তুতি শেষে **১৯৮১** সালের ১২ এপ্রিল **স্পেইস শাট্‌ল 'কলোম্বিয়া'** সর্বপ্রথম মহাকাশে উড্ডয়ন করে। আজ প্রায় তিন দশক পরেও মাত্র তিনটি শট্‌ল অপারেশন্যাল আছে। এগুলো হলো: **ডিসকোভারি** (১৯৮৩), **আট্‌লানটিস** (১৯৮৫) এবং **এন্ডেভার** (১৯৯১)। শাটল মহাকাশযান ১০০% সফল হয়েছে তা ঠিক নয়- দু'বার বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২৮ জানুয়ারী **১৯৮৬** সালে ঘটে প্রথম দুর্ঘটনাটি। এদিন **'চ্যালেঞ্জার'** নামক **স্পেইস শাট্‌ল** উৎক্ষেপণের মাত্র ৭৩ সেকেণ্ড পরে বিরাট বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়। এতে মোট ৭ জন বিজ্ঞানী প্রাণ হারান। এরা সবাই চ্যালেঞ্জারের যাত্রী ছিলেন। এরপর দীর্ঘ ২ বছর শেষে পুনরায় মিশন শুরু হয়। ৮০টি মিশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের পর আবারো ২০০৩ সালে আরেকটি বিরাট দুর্ঘটনার শিকার হয় **'কলোম্বিয়া' শাট্‌ল।** এই দুর্ঘটনায়ও যাত্রীদের কেউ রেহাই পান নি। ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৩ সালে **কলোম্বিয়া** পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় **রি-এন্ট্রি** করতে যেয়ে সম্পূর্ণরূপে জ্বলে যায়। এই মিশনে ভারতে জন্মনেওয়া মহিলা **আস্ট্রনাট** কল্পনা চাওলা-ও ছিলেন। যা হোক এ দু'টি দুর্ঘটনা ও এসাথে ১৪ জন দক্ষ বিজ্ঞানীর করুণ মৃত্যু যদিও **শাট্‌ল** প্রোগ্রামকে অনেকটা দুঃখজনক করেছে তথাপি এর সফলতাও কম বলা চলে না। অবশ্য নাসা আগামী ১০ বছরের মধ্যেই **শাট্‌ল প্রোগ্রাম গ্রাউন্ডেড** করবে বলে ইতোমধ্যে ঘোষণা

দিয়েছে। শাটলের অনুরূপ অন্য যান তৈরীর তৎপরতা থেমে নেই কিন্তু, বরং জোরেসুরে চলছে।

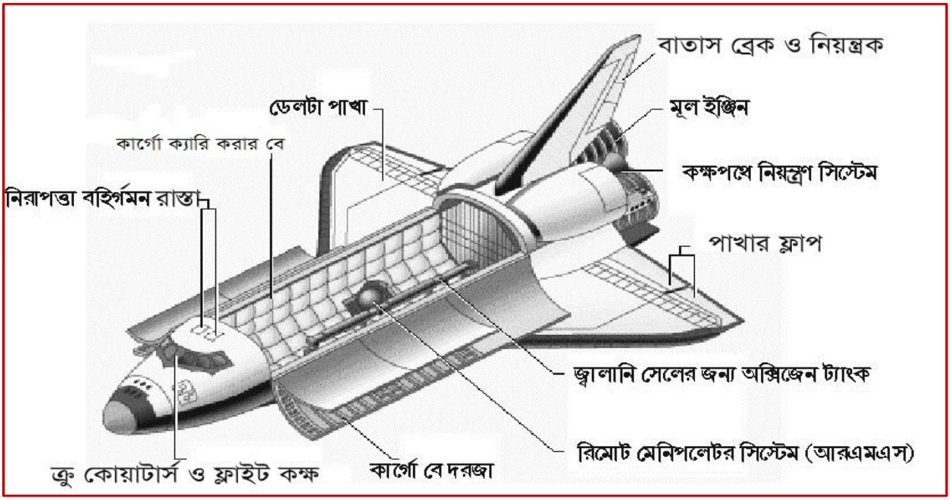
শাট্‌ল প্রযুক্তি

স্পেইস শাট্‌ল আধুনিক যুগের অত্যন্ত জটিল-কঠিন ও প্রযৌক্তিক দিক থেকে খুব অগ্রগামী একটি সিস্টেম। এ প্রসঙ্গে **শাট্‌ল** প্রযুক্তিকে পুরোপুরি বুঝিয়ে বলার কল্পনাও করা যায় না। তবে সার্বিকভাবে এই প্রযুক্তির মৌলিক দিকগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তোলে ধারার চেষ্টা চালাচ্ছি। আশা এ থেকেই পাঠকদের মোটামুটি একটি ধারণা জন্মাবে।

শাট্‌ল প্রোগ্রামের মূলে কয়েকটি তন্ত্র কাজ করে। এগুলো হলো : **অরবিটার (শাট্‌ল** যান), দু'টি **সলিড রকেট বুস্টার** দ্বারা **প্রোপালশন** (চালনা) সিস্টেম, তিনটি মূল **ইঞ্জিন** এবং একটি বহিঃস্থ জ্বালানি ট্যাংক।

শাট্‌ল যান

এই বিমান-মহাকাশযানই হলো **স্পেইস ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম (এসটিএস)** এর মেরুদণ্ড, হৃদযন্ত্র এবং মগজ। কারণ একে ঘিরেই সকল ব্যবস্থা। এই বিমানকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ, কক্ষপথে প্রদক্ষিণকরণ এবং পৃথিবীতে আবার নিয়ে আসাই হলো **এসটিএস** এর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। **স্পেইস** শাটলে অত্যন্ত উচ্চমানের ও



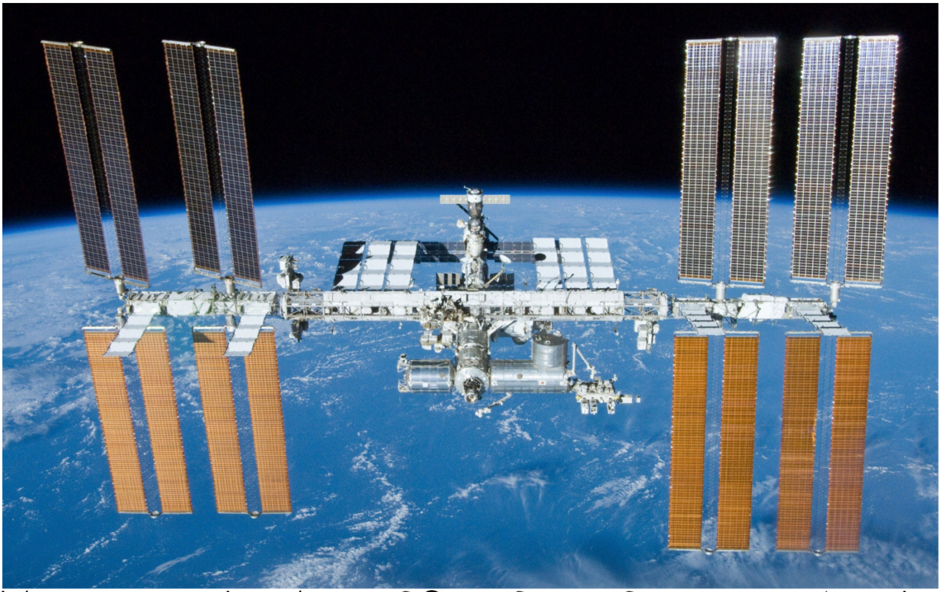
অত্যাধুনিক প্রযৌক্তিক এবং কারিগরী বিদ্যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিমানটিতে আছে অতি উন্নতমানের **ফ্লাইট কন্ট্রোল**, তাপ থেকে বাঁচার প্রযুক্তি এবং তরল জ্বালানি দ্বারা রকেট-চালনার উপায়-উপকরণ।

সলিড রকেট বুস্টার (এসআরবি)

শাট্‌ল উৎক্ষেপণের শক্তি আসে দু' দিকে স্থাপিত দু'টি **সলিড রকেট বুস্টার** থেকে। একই সাথে যখন এ দু'টো শক্তি সৃষ্টি করে তখন এর পরিমাণ ২৬ মিলিয়ন নিউটনে যেয়ে পৌঁছে। উৎক্ষেপণের প্রথম দুই মিনিটই হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শাটলকে এ সময়ের ভেতর বিরাট ত্বরণ দ্বারা মহাকশে প্রেরণ করতে হবে তথা মুক্তগতি (বা **এস্কেপ ভেলোসিটি**) অর্জন করা দরকার। **এসআরবি** শাট্‌লকে এই দুই মিনিটে ৪৫ কিলোমিটার (২৮ মাইল) ঊর্ধ্বে তুলে আলাদা হয়ে যায়। এসময় শাটলের গতি ৪,৯৭৩ কি.মি./ঘণ্টায় (৩,০৯৪ মাইল/ঘণ্টায়) যেয়ে পৌঁছে। বুস্টারদ্বয় সাগরে পতিত হয়। অপরদিকে **শাট্‌ল** মহাকাশে যাত্রা অব্যাহত রাখে। বুস্টারগুলো কিন্তু নষ্ট হয় না- সাগর থেকে এগুলো তুলে এনে মেরামত করে পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

মূল ইঞ্জিন

বুস্টারের কাজ শেষ হওয়ার পর শাটলের মূল তিনটি **ইঞ্জিন** একে সামনের দিকে অগ্রসর করতে থাকে। পেছনে স্থাপিত এই ইঞ্জিনত্রয় থেকে সৃষ্টি হয় ৫.৩ মিলিয়ন টন শক্তি। মাত্র ৮ মিনিটের জন্য এগুলো কাজ করে- এরপর বন্ধ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে অবশ্য **শাট্‌ল অরবিটার** পৃথিবীর কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছে যায়। কক্ষপথে পৌঁছে শাটলের মূল ইঞ্জিনগুলো পরবর্তী ফ্লাইটের পূর্ব পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আরো কিছু ছোটখাটো **ইঞ্জিন** স্টার্ট দিতে হয়। এগুলো দ্বারা কক্ষপথে সঠিকভাবে চলা ও নিয়ন্ত্রণ কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়। শাটল অরবিটারের ফিউসেলাজের উভয়দিকে দু'টি **ইঞ্জিন** আছে- এগুলো হলো **অরবিটেল মেনুভারিং সিস্টেম (অএমএস)**। এছাড়া আরোও ৪৪টি ছোট্ট **ইঞ্জিন** নাকে ও লেজের উভয় দিকে আছে। এগুলোও শাটলকে কক্ষপথে ঘুর্ণনের সময় নড়াচড়া করতে সাহায্য করে।



ইন্টারনেশন্যাল স্পেইস স্টেশনঃ পৃথিবীর ১৬টি দেশে মিলে মহাকাশে এই **স্পেইস স্টেশন** তৈরী করেছেন। এটা নির্মাণ করতে যেয়ে **শাটল অরবিটার** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্টেশনটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তৈরী করা হয়েছে।

বহিঃস্থ জ্বালানি ট্যাংক

শাটল অরবিটারকে এই বিরাট ট্যাংটি জ্বালানি যোগান দেয়। তিনটি **ইঞ্জিন** একত্রে চলাকালে প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন পড়ে। ১৫৪ ফুট লম্বা ও ২৭.৫ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এই ট্যাংক তার কাজ সেরে মহাসাগরে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে যায়। শাটলের এই অংশটুকু আর পুনর্বার ব্যবহার করা যায় না। ৮.৫ মিনিট স্থায়ী এর জীবন। ইতোমধ্যে প্রতি মিনিটে এই ট্যাংক থেকে তরল **হাইড্রোজেন** ও তরল **অক্সিজেন অক্সিডাইজার** জ্বালানি হিসাবে প্রতি সেকেণ্ডে ৪৫০ কেজি শাটল্ অরবিটারের মূল তিনটি ইঞ্জিনকে সাপ্লাই দেয়। এলুমিনিয়াম-লিথিয়ামের তৈরী এই ট্যাংটির ওজন ২৭,০০০ কেজি- আর এটা জ্বালানি-শূন্য থাকাবস্থার মাপ। ট্যাংকে মোট জ্বালানির পরিমাণ থাকে ২ মিলিয়ন লিটার।

পরিচ্ছেদ ৬

উৎপাদন

ইতোমধ্যে আমরা প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরী যা কিছুই বর্ণনা করেছি তা সবই উৎপাদন শিল্পের ফল। গাড়ি, বিমান, হেলিকপ্টার, ফার্মেসিউটিক্যালস্ ইত্যাদি সবই উৎপাদন করতে হবে। আর উৎপাদনের কিছু নিয়ম-কানুন আছে। এছাড়া নতুন কিছু উৎপাদন বা উদ্ভাবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তো আছেই সেসাথে ব্যবসায়িক, অর্থনৈতিক, **ফিজেবিলিটি**, রাজনীতিক ও পারিপার্শ্বিক অনেক প্রশ্নাদি থেকে যায়। এসব ব্যাপার যদি ইতিবাচক হয় তবেই উৎপাদন প্রযুক্তিতে হাত দেওয়া যাবে। যদিও উৎপাদনের মাত্রা, ধরন ইত্যাদির উপর নির্ভর করবে উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোন্‌টি প্রযোজ্য আর কোন্‌টি নয়।

কোন এক কালে মানুষের হাতই ছিলো বস্তু উৎপাদনের মূল হাতিয়ার। কিন্তু আজকের বিশ্বে প্রায় সবগুলো উৎপাদন কার্য স্বয়ংক্রিয় কিংবা **অপারেটর** চালিত **মেশিনারী** দ্বারা আঞ্জাম দেওয়া হয়।



রবট এসেম্বলি লাইন : জেনারেল মোটর কোম্পানীর গাড়ি উৎপাদনে ১৬,০০০ স্বয়ংক্রিয় রবট ব্যবহার করে।

আধুনিক যুগে **সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজাইন, অটোমেশন, ম্যাস প্রডাকশন** (প্রচুর উৎপাদন), **রবটিক্স** ইত্যাদি উৎপাদন শিল্পের সঙ্গে জড়িত হয়েছে। আমরা এখানে এগুলোর উপর কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং

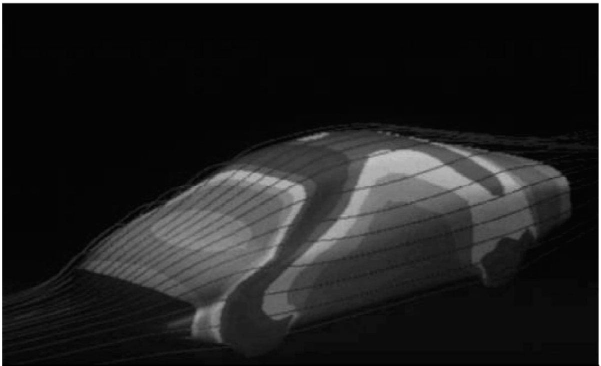
যে কোন **ইঞ্জিনিয়ারিং** প্রজেক্টের বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণ নিয়ে পূর্ণ গবেষণার নাম **সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং**। **সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং** প্রিন্সিপাল দ্বারা আধুনিক **ইঞ্জিনিয়ারিং** কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। যে কোন **প্রডাকশন** সিস্টেমে কয়েকটি মৌলিক সংবিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী। যেমন: **বৈজ্ঞানিক মেথড; টীম এপ্রোচ**- এতে শুধু **ইঞ্জিনিয়ার** কিংবা বিজ্ঞানী থাকবেন তা-ই নয়- বিভিন্ন প্রফেশনে জড়িত মানুষ যথা, আইনজীবী ও সমাজবিজ্ঞানী প্রমুখও থাকবেন; এবং অপারেশনের উপর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি সুচিন্তিত কার্যপ্রণালী গ্রহণ।

ডিজাইন

উৎপাদন শিল্পে **ডিজাইন** কেন্দ্রীয় গুরুত্ব বহন করে। সুচিন্তিত **ডিজাইন** ছাড়া উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। **ইঞ্জিনিয়ার** ও বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন শুরুর পূর্বে একটি **ডিজাইন প্রোগ্রাম** করতে হবে। বড় শিল্প হলে কোথায় কোন্ যন্ত্রপাতি থাকবে, কোন্ অংশে কিসব যন্ত্রাংশ তৈরী হবে এবং কিভাবে এগুলো একত্রিত করে এসেম্বলীর মাধ্যমে শেষ প্রোডাক্ট বেরিয়ে আসবে- এসব প্রশ্নের সঠিক সমাধান গবেষণার মাধ্যমে বের করাও ডিজাইনের প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। এছাড়া নতুন প্রোডাক্ট সৃষ্টি ও উৎপাদনে তো অবশ্যই যন্ত্রের **ডিজাইন, প্রটোটাইপ** তৈরী, **টেস্টিং** ইত্যাদি কার্য আঞ্জাম দিতে হবে। এসব কাজে আজকাল **কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (সিএডি বা ক্যাড)** এবং **কম্পিউটার এইডেড মেনুফেকচারিং (সিএএম বা ক্যাম)** বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আগের দিনে ইঞ্জিনিয়ারদেরকে নিজ হাতে **ড্রাফটিং, ড্রইং** ইত্যাদি বহু কষ্ট ও দক্ষতার সাথে করে- তারপর ডিজাইনের **ব্লুপ্রিন্ট** বানাতে হতো। আজকাল এতো কষ্টের আর প্রয়োজন নেই। **ক্যাড ও ক্যাম কম্পিউটার সফ্‌টওয়ার** দ্বারা একটি যন্ত্রের যাবতীয় অংশ সম্পূর্ণরূপে **ডিজাইন** করে তিন-

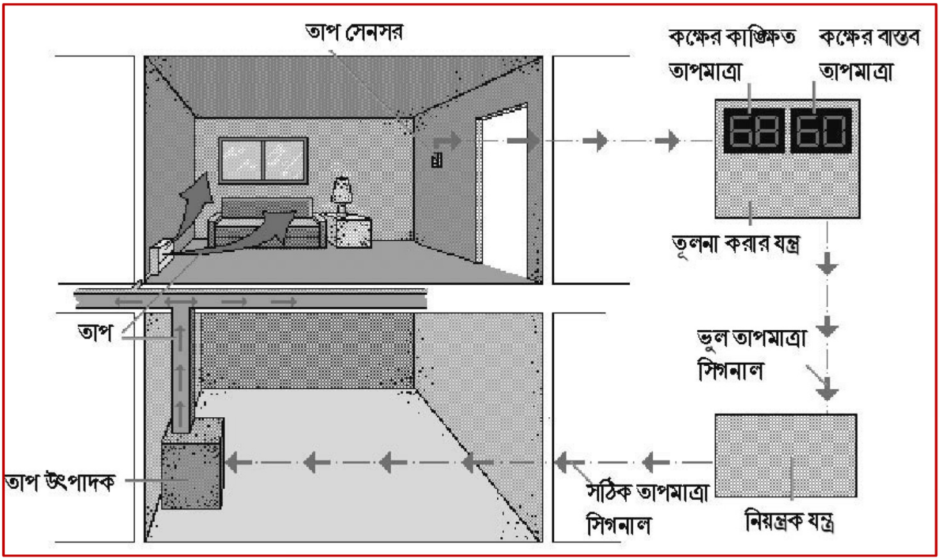
বিস্তৃতিসম্পন্ন **মডেল** তৈরী করা যায়। এমনকি যন্ত্রটির **প্রটোটাইপ** তৈরীর পূর্বে **কম্পিউটার** মডেলে তা সেস্ট করাও সম্ভব।

অটোমেশন



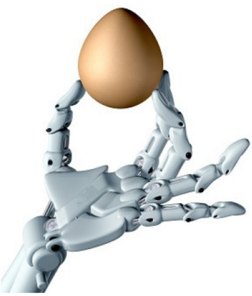
ক্যাড ও ক্যাম দ্বারা ডিজাইন ও পরীক্ষা : গাড়ির মধ্যে বাতাসের প্রতিক্রিয়া এই সফ্টওয়ের দ্বারা পরীক্ষা করা হচ্ছে

অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণ হলো উৎপাদন প্রক্রিয়া যেখানে, কিছু বিশেষ কার্য সম্পাদনে প্রযৌক্তিক উপায়ে সৃষ্ট বিভিন্ন মেশিনকে কাজে লাগানো হয়। যেমন মনে করুন, আপনি একটি কক্ষের তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাপমাত্রা আসবে একটি **বয়লার** বা **ফারনেস** (চুল্লি) থেকে। আপনি এক উপায়ে তা করতে সক্ষম হবেন যদি **থার্মোস্ট্যাট** দিয়ে তাপ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেন (নীচের চিত্রটি দেখুন)।



উপরের (পূর্বের পৃষ্ঠার) ছবি থেকে বুঝাই যাচ্ছে যে, তাপ **সেনসর** যন্ত্রটি যখন আপনার চয়েজকৃত তাপমাত্রা থেকে ভিন্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করবে তখন তুলনা করার যন্ত্র থেকে একটি ভুল **সিগনাল** নিয়ন্ত্রক যন্ত্রে যেয়ে পৌঁছুবে। সেখান থেকে আপনার চয়েজ করা তাপমাত্রায় নিয়ে পৌঁছানের জন্য তাপ উৎপাদক যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রক যন্ত্র একটি সঠিক **সিগনাল** প্রেরণ করবে। এতে উৎপাদক তাপ বাড়ানোর জন্য আরো শক্তি বৃদ্ধি করে বেশি তাপ সিস্টেমে ছাড়বে। আপনার সিদ্ধান্তকৃত তাপমাত্রায় না পৌঁছা পর্যন্ত বাড়ানো / কমানোর **সিগনাল** আসতে থাকবে। অবশেষে উভয় তাপমাত্রা- অর্থাৎ সেনসরের ও কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা সমান হলে আর **সিগনাল** যাবে না। সুতরাং **থার্মোস্টেট** প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা **অটোমেশন** করতে সক্ষম হলাম। ঠিক এভাবে বড় বড় সিস্টেমে **অটোমেশন** সম্ভব এবং তা হচ্ছেও।

উপরে বর্ণিত **থার্মোস্টেট** দ্বারা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ হলো **'ফিডব্যাক'** তন্ত্রের একটি উপমা। অটোমেশনে এই **ফিডব্যাক** প্রিন্সিপালটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এটা বুঝতে পারলে **অটোমেশন** কি তা বুঝা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আমরা এটা বুঝাতে পারছি যে, বার বার **থার্মোস্টেট** থেকে **সিগনাল** আসতে থাকবে যতক্ষণ না কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা হবে- কিন্তু তাপ উৎপাদক যন্ত্র তাপমাত্রা কি জানে না- সে **'সঠিক করো' সিগনাল** পেলেই (তা বাড়ানো বা কমানো হতে পারে) সে তার তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবে বা কমাবে- এই যা। যখন তাপ বেড়ে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌছে যাবে তখন ক্ষণকালের জন্য **সিগনাল** না আসলেও কিছুক্ষণ পরই আবার বাড়া বা কমে যাওয়ার অবস্থা হবে- সুতরাং **সিগনাল** কিছুক্ষণ পরপর আসতেই হবে। এভাবে সঠিক তাপমাত্রা সর্বদা স্বস্থানে রাখতে যেয়ে **ফিডব্যাক** করতে হচ্ছে থার্মোস্টেটকে। অপর একটি দৃষ্টান্ত হলো **রবট** দ্বারা একটি ডিম ধরে রাখা (নীচের চিত্রটি দেখুন)



রবটটিকে **প্রোগ্রাম** করা হয়েছে সঠিক চাপ দ্বারা ডিমটিকে ধরে রাখতে। একটি **কম্পিউটার** রবটের 'হাত' থেকে সর্বদাই **ফিডব্যাক সিগনাল** পাচ্ছে। এতে বলা হচ্ছে হাতকে হয় কিছুটা চেপে ধরো না হয় কিছুটা টস্ করো। এভাবে বারবার **সিগনাল** না পেলে **কম্পিউটার** কিভাবে জানবে কতটুকু চাপ ডিমটি ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন? একটি মাত্র

সিগনালও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কারণ ভাঙ্গার চাপ ও ছাড়ার ছাপের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু খুব অল্প। সুতরাং **ফিডব্যাক** সিস্টেমের মাধ্যমে রবটকে **'ইন্টেলিজেন্ট'** কাজ করানো সম্ভব হচ্ছে। একই কায়দায় একটি **রবটকে** সামনের বস্তুগুলোর উপর হোচট্ না খেয়ে ঘুরে ফিরে বুদ্ধিমানের মতো চলার জন্য তাকে দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন **সেনসর** ও **ফিডব্যাক সিগনাল**। সামনের বস্তুর দূরত্ব মেপে সে হোচট্ না খেয়ে যেদিকে চললে নিরাপদ, সে সেদিকে মোড় নিয়ে অগ্রসর হতে পারে।

ম্যাস প্রেডাকশন

এটার অর্থ কোন বিশেষ যন্ত্র বা উৎপাদিত বস্তুর বিভিন্ন অংশ একই সাথে তৈরী করা। এতে বস্তুটি একটি **এসেম্বলী** লাইনে বিভিন্ন অংশ একটার পর আরেকটি লাগিয়ে লাইনের শেষে পুরো বস্তু তৈরী করা সম্ভব। আধুনিক যুগে বড় বড় গাড়ির **ফেক্টরী**, বিমান তৈরীর কারখানা, **কম্পিউটার**, **টিভি** ইত্যাদি তৈরীতে এরূপ **ম্যাস প্রোডাকশন** দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে উৎপাদন করার মধ্যে অনেক উপকার নিহীত। প্রথমতঃ অল্প সময়ের মধ্যে বস্তুটি **ড্রইং বোর্ড** থেকে বাস্তবতার আলো দেখতে পারে; তৈরীতে খরচ কম পড়বে; **অটোমেশন** সম্ভব; **কোয়ালিটি কন্ট্রোল** অনেকটা সহজ কারণ, একই **ফেক্টরীতে** যাবতীয় অংশ তৈরী হওয়ায় পরীক্ষন (**ইন্সপেকশন**) ও নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সহজ হবে।

রবটিক্স

আধুনিক যুগে **রবট** শিল্পোন্নত দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রযৌক্তিকভাবে অগ্রগামী গাড়ি তৈরীর **ফেক্টরী** থেকে হাসপাতালের করিডোরে আজ **রবট** দ্বারা বিভিন্ন উপযোগী কার্যক্রম আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। **বরট** মূলত কৃত্রিম মেশিন যা **কম্পিউটার** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। **রবটকে** যেভাবে **প্রোগ্রাম** করা হবে সেভাবেই এটা ক্রিয়া সম্পাদন করবে। সুতরাং **রবট** বাস্তবে কোনো **'বুদ্ধিসম্পন্ন'** মেশিন নয়- বরং একে যা বলা হবে তা-ই করবে। আর এই করার মধ্যেও সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ সর্বদাই ভাবে তার নিজের মতো কিছু তৈরী করতে পারে কি না। বিজ্ঞান দ্বারা এখন এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের দেহকাঠামো একটি **বায়োলজিক্যাল মেশিনই** নয়- বরং এতে বিরাজ করে কিছু অতিস্বাভাবিক গুণাবলী যা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি অসম্ভব। একটি দৃষ্টান্ত হলো মানুষের মধ্যে **ইমোশন** বা ভাবের জন্ম। এটা ঠিক কেনো ও কিভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা কেউ সঠিকভাবে জানে না। অথচ ব্যাপারটি বাস্তব। কেউ কেউ

যদিও বলছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমরা এমন কিছু **কম্পিউটার** দেখতো পাবো যাদের **মেমোরি** ও **প্রসেসিং** শক্তি মানুষের মগজের সমতূল্য। তা হতে পারে, কিন্তু এরপরও ঐ **কম্পিউটার ইমোশন**, চিন্তাশক্তি, ভাবনা-কল্পনা ইত্যাদি ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ নির্জীব থাকবে এটা সন্দেহাতীত। যা হোক **রবট** মানুষের মতো হতে হবে তা কিন্তু মোটেই নয়।



কিছু **রবট** আছে যার একটি বা কয়েকটি মাত্র কাজ। যেমন **এসেম্বলী** লাইনে একটি **রবট** হয়তো শুধুমাত্র স্ক্রু লাগাবে, অপরটি একাধিক যন্ত্রাংশ **ওয়েল্ডিং** করে একত্রিত করবে, অপর আরেকটির কাজ হয়তো কোন যন্ত্রকে কিছুটা ধাক্কা দেয়া মাত্র ইত্যাদি। এরূপ রবটকে **কম্পিউটার** দ্বারা নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সহজ। এর কারণ হলো এগুলো একটি স্থানে স্থির থেকে তার **আর্মস** (হাত) দ্বারা **সিগনাল** পেয়ে কাজ করে। অপর আরেক ধরনের **রবট** আছে (যেমন উপরের ছবিতে যে রবটটি দেখানো হয়েছে), যেগুলো চলন্ত। হাসপাতালের **রবট** এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে যেতে পারে। এসাথে সে বিভিন্ন কাগজপত্র, খাবার ট্রে, ঔষধ ইত্যাদি ডেলিভারী করতেও সক্ষম। এসব কাজ আঞ্জাম দিতে তার অন-বোর্ড **কম্পিউটার** ও দেহ-কাঠামো থাকতে হবে বেশ জটিল ও প্রযুক্তির দিক থেকে সুন্দরভাবে সৃষ্ট। **রবট**কে এক স্থান থেকে অপর কোন স্থানে নিয়ে যাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। হ্যাঁ, সোজাসুজি হলে ভিন্ন কথা। তবে সামনে কি আছে, তা বুঝা, দেখা, গন্তব্যস্থলে পৌঁছা হলো কি না জানা, কতটুকু ডানে-বামে ঘুরানো দরকার ইত্যাদি **'বুঝতে'** হলে বেশ জটিল প্রোগ্রামের প্রয়োজন- সেসাথে স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা থাকতে হবে।

বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে অবগতির জন্য দরকার ইন্দ্রিয় বা **সেন্স**। যেমন দূরত্ব মাপার জন্য **ইলেকট্রনিক সিগনাল** ব্যবহৃত হতে পারে। সিগনালটি বস্তুর উপরে পতিত হয়ে

ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা থেকে একটি **কম্পিউটার** দূরত্ব অতি সহজে এবং নির্ভুলভাবে বের করতে সক্ষম। একইভাবে ক্যামেরা ফিট করে সামনের ছবি **রবটকে** দেখানো যেতে পারে। কোন বস্তুর সঙ্গে লেগে যায় কি না সেটা বুঝানো যেতে পারে বিশেষ **সেন্সর** ধাতু বা বস্তু রবটের গায়ে লাগিয়ে। এসব **সেন্সর** দ্বারা **রবট**কে সামনে চলতে সহায়তা করা যায়। এরপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে, **রবটকে** মানুষের মতো নিয়ন্ত্রণ আদৌ সম্ভব নয়। একটি সীমিত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছা- এই যা।



রবটের ব্যবহার

আগেই বলেছি **রবট** বলতে কাজের যন্ত্রকেই বুঝায়। যেসব কাজ মানুষের হাতে করা আদৌ সম্ভব নয় বা করানো বিপদসঙ্কুল ওসব ক্ষেত্রে **রবট** ব্যবহার একটি উত্তম সমাধান। এছাড়া রবটকে দিনরাত কাজে লাগিয়ে রাখা কোন সমস্যা নেই। এদিক থেকে আর্থিক ক্ষেত্রেও এগুলো লাভজনক। গত ক'বছর আগে এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে ৭ লক্ষাধিক **রবট** ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মধ্যে ৫ লক্ষাধিক শুধু জাপানেই কার্যরত আছে। বাকীগুলোর মধ্যে ৬০ হাজার আমেরিকা ও ১ লক্ষ ২০ হাজার পশ্চিম উইরোপে কর্মক্ষেত্রে ডিউটি দিচ্ছে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, রবটের ব্যবহার আধুনিক শিল্প-কারখানায় কতোটা উপযোগী।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে **রবট** দ্বারা পুনঃপুন যেসব কাজ করতে হয়, তা করানো হয়ে থাকে। দেখা গেছে মানুষ এ ধরনের কাজ সারতে প্রায়ই ভুল-ক্রুটি করে বসে- বা এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় তা সঠিকভাবে করতে পারে না। এরূপ অবস্থায় রবটের জুড়ি নেই- সে তো আর সময় কি জিনিস জানে না। দৈনিক ছব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে যেতে পারে। দরকার শুধু **ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই** নিশ্চিতকরণ- যা আমাদের দেশে একটি বিরাট সমস্যা বৈকি!

রবটের ভবিষ্যৎ

রবটের যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে তা ইতোমধ্যে আলোচিত ব্যাপার-স্যাপার থেকে সহজেই অনুমেয়। তবে **রবট** মানুষের মতো হবে এবং আমাদের নেতা-ফেতা কিংবা শাসক হয়ে যাবে- এরূপ ধারনা বাজে। এগুলো আসলে **সাইন্স-ফিকশনের** গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, **রবট** প্রযুক্তি দিন দিন উন্নততর হবে। **কম্পিউটার** খুব বেশি শক্তিশালী হচ্ছে এবং সেসাথে **সফ্‌টওয়ার** উন্নয়ন এই প্রযুক্তিকে সহায়তা করবে। এগুলোর ব্যবহার আমরা যেসব ক্ষেত্রে বেশী লক্ষ্য করবো তাহলো: নতুন যন্ত্রপাতি উৎপাদনে; বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট উচ্চ প্রযুক্তির কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ; বাড়িঘর ও হাসপাতালে বিকলাঙ্গদের সাহায্যে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন ইত্যাদি। ইতোমধ্যেই **রবট** দ্বারা রোগীর অপারেশন থেকে **ভয়েস কমান্ডের** মাধ্যমে বিকলাঙ্গের সহযোগিতা আঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। **রবট** টেকনোলজির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো **'মাইক্রোইলেকট্রোকেমিকেল সিস্টেম'**। আমরা এটাকে বাংলায় বলতে পারি 'ক্ষুদ-বৈদ্যুদিত-রসায়নিক-তন্ত্র'। **রবট** বিজ্ঞানীরা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **রবট** বানাচ্ছেন যেগুলোকে হয়তো কোন একদিন মানুষের শিরায় শিরায় চালনা করে বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোষের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। এরূপ **টেকনোলজি** মনে হয় এখনও বেশ দূরের ব্যাপার। তবে বলা যায় না ... ...।

কৃত্রিম বুদ্ধি

আমরা এখন অবশ্য আধুনিক **রবট** টেকনোলজির **'কাটিং এজে'** পৌঁছে যাচ্ছি- **আরটিফিশেল ইন্টেলিজেন্স** বা কৃত্রিম বুদ্ধি। এখন পৃথিবীব্যাপী জোরেসুরে এই প্রযুক্তির উপর গবেষণা চলছে। সংক্ষেপে **এআই**- এর অর্থ, কৃত্রিম উপয়ে সৃষ্ট যন্ত্র বা **কম্পিউটার প্রোগ্রাম** দ্বারা মানুষের মতো চিন্তাশক্তি ও সে মুতাবিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও কার্যাদি করানো। **এআই** মূলত কম্পিটারের সঙ্গে সম্পর্কিত। **কম্পিউটিং পাওয়ার** ও

সেসাথে অত্যন্ত বুদ্ধিসম্পন্ন জটিল প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশ কিছু কাজ করা সম্ভব হয়েছে যা আগে বলা হতো **সাইন্স ফিকশন**। উদাহরণ হলো, আজকাল একটি কম্পিউটারে আপনি মৌখিক **কমাণ্ড** বা নির্দেশ দিতে পারবেন এবং **কম্পিউটার** সে মুতাবিক কাজ করবে। আমাদের মুখের ভাষা **কম্পিউটার 'শিখে'** নিতে পারে ও সেই কথাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাইপও করে দেবে। কম্পিউটারের এই ক্ষমতাকে বলে **ভয়েস রিকোগনিশন**। এছাড়া রোগিদের **সাম্পুল আনালিসিস** এবং রোগ ধরা আজকাল সচরাচর **কম্পিউটার** সফটওয়ারের সাহায্যে করা হচ্ছে। এসব অগ্রগতির পরও সত্যিকার **এআই** কোনদিনই হয়তো সম্ভব হবে না। উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই কম্পিউটারের মেমোরিতে কিছু **'পূর্ব-তথ্য'** মওজুদ রাখতে হবে। দৃষ্টান্ত হলো, মূত্র সাম্পুলে কি পরিমাণ কি থাকলে এটাকে **ডায়াবেটিস** বলা যায় সে তথ্য কম্পিউটারের মেমোরিতে আগেই ঢুকিয়ে রাখা চাই- অন্যথায় **রেফারেন্স** হিসাবে **কম্পিউটার প্রোগ্রাম** কি ব্যবহার করবে? একইভাবে **ভয়েস রিকোগনিশন** সিস্টেম যদিও অত্যন্ত **সোফিসটিকেইটেড** বলতেই হয়- এরপরও অভিধানসহ কিছু শব্দ উচ্চারণের স্বরূপ বা **ফনেটিক্স** সম্পর্কে মেমোরিতে তথ্যাদি আগে থেকেই জমা রাখতে হবে।

এআই এর উপর ইতোমধ্যে যা গবেষণা হয়েছে তা থেকে একটি কথাই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাস্তবে মানবিক গুণসম্পন্ন কোন কৃত্রিম তন্ত্র সৃষ্টি আদৌ কোনদিনই সম্ভব হবে না। হ্যাঁ, আমরা **কম্পিউটার পাওয়ার** ও প্রোগ্রামারের বুদ্ধির সমন্বয়ে গড়ে তুলতে পারি **এআই সিমুলেশন** (নকল **এআই**)- সত্যিকার **এআই** নয়। তবে গবেষণা ও কোটি কোটি ডলার ব্যয় চলছে- চলবেই ... ...।

পরিচ্ছেদ ৭

যোগাযোগ প্রযুক্তি

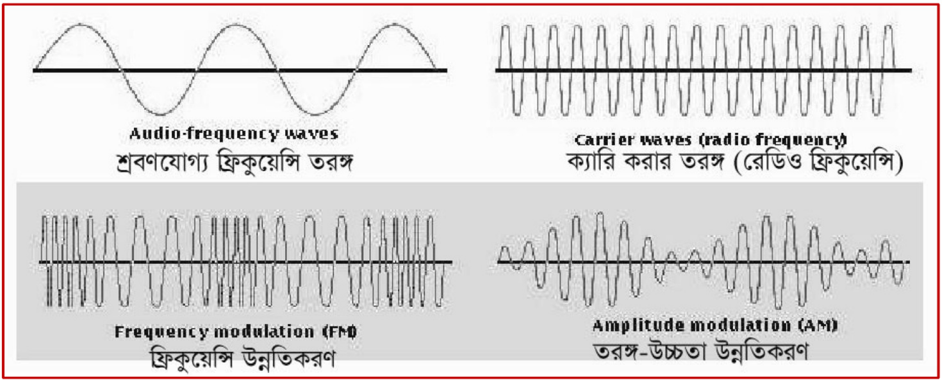
কমিউনিকেশন বা যোগাযেগের সংজ্ঞা হলো: **আমাদের ভাব, তথ্য এবং সংবাদ কোন বিশেষ স্থান ও কালে একে অন্যের মধ্যে আদান-প্রদান করা**। এর অন্তর্ভুক্ত আছে লেখা, কথা, অঙ্গভঙ্গি (যা অর্থহীন নয়), দৃশ্যমান যোগাযোগ (যেমন ছবি, চলচিত্র, **মাল্টিমিডিয়া** ইত্যাদি) এবং **টেলিকমিউনিকেশন (ই-মেইল, টেলিফোন, মোবাইল, টেলিভিশন, কেবল টিভি, স্যাটেলাইট টিভি** ইত্যাদি **ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন**)। তথ্য ও ভাবের আদান-প্রদান আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে কোন উপায়েই হোক আমাদেরকে তথ্য ও আইডিয়া সেয়ার করতে হয়। আর এটা করতে যেয়ে মানুষ আদিকাল থেকেই দ্রুত ও সুবিধাজনক **'মাধ্যম'** আবিষ্কার করে আসছে। আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা দ্রুততম মাধ্যম আমরা ব্যববহার করছি- এটার নাম **ইলেকট্রোমেগনেটিক** তরঙ্গ। আমরা এ প্রসঙ্গে অত্যাধুনিক **ইলেকট্রনিক** মিডিয়ার উপরই আলোচনা করবো। আমরা জানবো, বিভিন্ন **কমিউনিকেশন** যন্ত্রাদি কিভাবে কাজ করে। প্রথমেই রেডিও তরঙ্গের উপর কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

রেডিও তরঙ্গ

এটা অবশ্য ইতোমধ্যে উল্লেখিত **ইলেকট্রমেগনেটিক** তরঙ্গ। এই **ওয়েভ** আলোকের গতিতে চলে। শূন্যস্থানের উপরও এটা চলতে পরে- বরং শূন্যস্থান বা ভাকিউমের উপর এটা সর্বাপেক্ষা গতিশীল, **১৮৬** হাজার মাইল প্রতি সেকেণ্ড। তরঙ্গের বিভিন্ন রূপ আছে। একটা দৈর্ঘ্য, আরেকটা স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং অপরটি খুব বেশি স্বল্পদৈর্ঘ্য। কোনটার **ফ্রিকুয়েন্সি** কম কোনটার বেশি। এসব বৈচিত্র কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কাজের জন্য উপযোগী। সুতরাং আমরা যে ক্ষেত্রে যেটার দরকার তা ব্যবহার করি।

যেসব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব কম, তাদের **ফ্রিকুয়েন্সি** (বা প্রতি সেকেন্ডে ক'বার তরঙ্গ-সাইকেল সংঘটিত হয় তা) ততো বেশি। অপরদিকে যেসব তরঙ্গ দীর্ঘ তাদের **ফ্রিকুয়েন্সি** অনেক কম। হেনরিক **হার্টজ** এর নামানুসারে ফ্রিকুয়েন্সির হিসাব **হার্টজ** বলা হয়। **১ কিলোহার্টজ** সমান ১০০০ সাইকেল প্রতি সেকেন্ড। আর **১ মেগাহার্টজ** অর্থ **১** মিলিয়ন সাইকেল প্রতি সেকেন্ড। এরপর আরেকটি বড় অঙ্ক আছে যাকে বলে **গিগাহার্টজ**- সমান ১ হাজার মিলিয়ন সাইকেল প্রতি সেকেন্ড। এখন এই হিসাবে রেডিও তরঙ্গের ব্যাপ্তি কতটুকু? বাস্তবে তা বিরাট- গোটা ক'টি **কিলোহার্টজ** থেকে

কয়েকটি **গিগাহার্টজ** পর্যন্ত হলো রেডিও তরঙ্গের রেঞ্জ। দৃশ্যমান আলোও এরূপ তরঙ্গের খেলা। কিন্তু ওগুলোর দৈর্ঘ্য আরো কম।

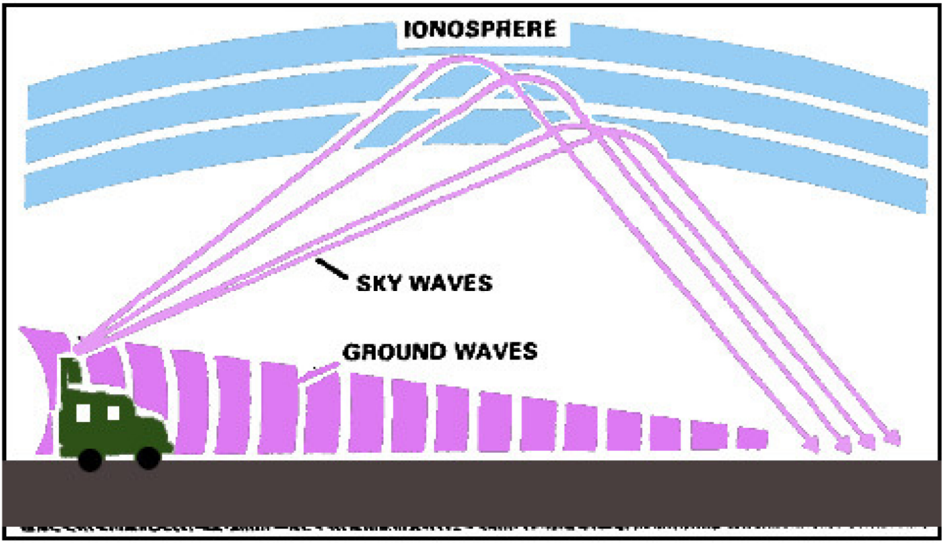


রেডিও তরঙ্গের ব্যবহার

রেডিও তরঙ্গ শুধুমাত্র বেতার সম্প্রচারের জন্যই ব্যবহৃত হয় না। **টিভি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডার, স্পেইস** যোগাযোগ ইত্যাদিতে তা কাজে লাগানো হয়। আমরা জানি রেডিও তরঙ্গ **ইলেকট্রমেগনেটিক** রেডিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এটা সোজা চলে। সুতরাং আমাদের পৃথিবীটা বলের মতো হওয়ায় পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে রেডিও **সিগনাল** পাঠাতে হলে এই তরঙ্গকে কোনভাবে বক্র করতে হবে। সৌভাগ্যবশত এই বক্রকরণ আমাদেরকে কৃত্রিম উপায়ে করতে হয় না- বায়ুমণ্ডলের একটি স্তর আছে যাকে বলে **আয়োনোস্ফেয়ার**। এই স্তরটির শুরু ৫০ মাইল ঊর্ধ্বে এবং শেষ ৬০০ মাইল উপরে। অধিকাংশ রেডিও **সিগনাল** এই স্তরে পৌঁছে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে- সুতরাং এভাবে প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে রেডিও **সিগনাল** পুরো পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়। তবে সর্বক্ষেত্রে এরূপ 'ফ্রি' বক্রকরণ ক্রিয়া কার্যকরী নয়। ১০ মিটার কিংবা এর কম দীর্ঘ রেডিও তরঙ্গ **আয়োনোস্ফেয়ারে** যেয়ে ফিরে আসে না। এসব ক্ষেত্রে কিছু প্রযৌক্তিক **'চালাকি'** করতে হয়। আমরা পরে এই প্রযুক্তির উপর আলোচনায় যাচ্ছি।

রেডিও তরঙ্গ দ্বারা যোগাযোগ করতে যেয়ে আমাদেরকে দু'টি মৌলিক প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। এর একটির নাম **ট্রান্সমিটার** আর অপরটি **রিসিভার**। **ট্রান্সমিটার** হলো প্রেরকযন্ত্র এবং **রিসিভার** অর্থ প্রাপকযন্ত্র। প্রেরকযন্ত্র দ্বারা সিগনালকে কাঙ্ক্ষিত

রেডিও তরঙ্গে পরিবর্তন করে প্রেরণ করা হয়। আর প্রাপকযন্ত্র ওটাকে আবার সেই মূল তরঙ্গে রূপান্তর করে দেয়। এ কথাগুলো দ্বারা উভয় যন্ত্রের কাজ সম্পর্কে একটু ধারণা জন্মালেও মোটেই যথেষ্ট নয়, তাই বোধহয় ব্যাপারটি আরও বুঝিয়ে বলার দরকার।



রেডিও ট্রান্সমিটার

একটি রেডিও **ট্রান্সমিটার** বা প্রেরকযন্ত্রের মধ্যে তিনটি আলাদা কাজ সারার পর রেডিও তরঙ্গটি আকাশে ছেড়ে দিতে হয়। এগুলো হলো : **ইলেকট্রিক** পাওয়ারকে **'অসিলেটর'** বা কম্পনযন্ত্রের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত রেডিও তরঙ্গে রূপান্তর; **ফ্রিকুয়েন্সি** বা তরঙ্গসংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে ঐ কম্পনের মধ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **'অ্যাম্প্লিফাইয়ার'** (বা ধ্বনিবিবর্ধক যন্ত্র) এর ব্যবহার যাকে **মডুলেশন** বলে; এবং যে তরঙ্গ প্রেরণ করা হবে তাকে সঠিক বৈদ্যুতিক **ভল্টেজে** রূপান্তরের জন্য একটি **'ট্রান্সডিউসার'** (বা তরঙ্গপরিবর্ধক যন্ত্র) এর ব্যবহার। এছাড়া আরোও এক দু'টো জিনিসের প্রয়োজন আছে যেগুলোর কথা যেতেযেতে উল্লেখ করবো। শুধু শব্দপ্রেরণই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়- অর্থাৎ রেডিও **সিগনাল** তাহলে, ট্রান্সডিউসারের কাজ **মাইক্রফোন** দ্বারাই সেরে যাবে। আর ছবি বা চলচিত্র হলে তার জন্য **ট্রান্সডিউসার** হবে **'ফটোইলেকট্রিক যন্ত্র'**। এই যন্ত্রটি সম্পর্কে আমরা **টেলিভিশন** নিয়ে আলোচনাকালে

আরো বলবো। এখন আমরা প্রেরকযন্ত্রের মৌলিক কিছু যন্ত্রাদির উপর আরোও তথ্যাদি তুলে ধরবো।



১. অসিলেটর

উপরের ছবিতে আমরা একটি **'কুয়ার্টজ্'** (বা সুক্ষ্ম দানাদান খনিজ দ্রব্য) দেখতে পাচ্ছি। এরূপ বস্তু রেডিও ট্রান্সমিটারে **'অসিলেটর'** বা কম্পনযন্ত্র হিসাবে কাজে লাগানো হয়। অসিলেটরকে অবশ্য খুব সতর্কতার সাথে নিয়ন্ত্রণে রেখে এর দ্বারা কম্পন তৈরী করতে হবে। আপনারা **'কুয়ার্টজ'** ঘড়ি সম্পর্কে হয়তো অবগত আছেন। এসব ক্রিস্টেলে ইলেকট্রনিক্সভাবে কম্পন সৃষ্টি করা হয়। সাধারণত **ভিএইচএফ (ভেরী লো ফ্রিকুয়েন্সি), এলএফ (লো ফ্রিকয়োন্সি)** এবং **এমএফ (মিডিয়াম ফ্রিকুয়েন্সি)** রেডিও তরঙ্গের জন্য **কুয়ার্টজ্ ক্রিস্টেল** বেশ উপযোগী। অবশ্য উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির জন্য **ইলেকট্রিক** সার্কেটের মাধ্যমে একাধিক **ক্রিস্টেল** ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে খুব উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সির প্রয়োজন হলে **'ক্লাইসট্রোন' (মাইক্রওয়েভ জেনারেটর)** ও **'ম্যাগনেট্রোন'** (অপর একটি **মাইক্রওয়েভ জেনারেটর**) ব্যবহার করা যায়।

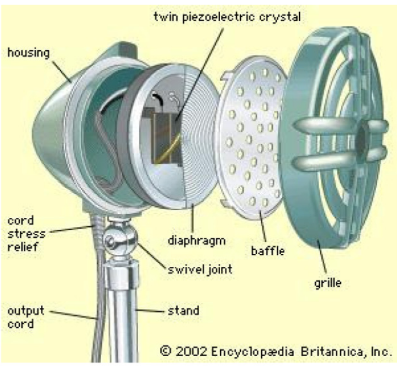
২. ক্যারিয়ার ওয়েভ

পরিবর্তিত বা মডুলেটেড সিগনালকে **'ক্যারির'** (বা নেওয়ার) জন্য একটি বিশেষ রেডিও তরঙ্গ থাকতে হবে- এটার নামই **ক্যারিয়ার ওয়েভ**। দু'টি উপায়ে ক্যারিয়ার ওয়েভে (**ভিডিও** বা **অডিও** থেকে) প্রাপ্ত সিগনালকে ক্যারিয়ার তরঙ্গের মধ্যে যুক্ত করা যায়। এর একটি হলো **ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন (এফএম)** ও অপরটি **আমপ্লিটিউড মডুলেশন (এএম)**। আপনি নিশ্চয় রেডিও সেটে এই দু'টি নাম দেখেছেন।

ক্যারিয়ার তরঙ্গকে সাধারণত প্রেরকযন্ত্র একটি অপরিবর্তিত ফ্রিকুয়েন্সিতে রাখে। এটা প্রাপকযন্ত্রের **'রেজোনেন্স সার্কেটে'** ধরা পড়ে। এখন এই সিগনালকে পরিবর্তন করা হয় সুবিধামতো। তরঙ্গের **আমপ্লিটিউড** বা **'উচ্চতা'** বদলাতে হলে একটি মেসেজ ছাড়া হয়। এ ক্ষেত্রে **আমপ্লিটিউড মডুলেশন** বা **এএম** সিগনালে রূপান্তর হলো। আর যদি **ফ্রিকুয়েন্সি** বদলানোর **সিগনাল** প্রেরণ করা হয় তাহলে তা হবে **ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন** তথা **এফএম** সিগনাল।

৩. মাইক্রফোন

আপনি আমি সবাই **মাইক্রফোন** কি তা জানি। **টেলিফোন, মোবাইল, টেপ রেকর্ডার, কম্পিউটার** ইত্যাদি অনেক যন্ত্রে মাইক্রফোনের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবে যেখানেই শব্দ তরঙ্গকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পাঠানো, একে বড় আওয়াজের বানানো (মাইক) কিংবা ধারণ করার দরকার পড়ে, সেখানেই মাইক্রফোনের দরকার পড়ে। এই যন্ত্রটি যা করে তাহলো, সৃষ্ট শব্দ-তরঙ্গ ধরে তাকে **ইলেকট্রিক্যাল** সিগনালে রূপান্তর শেষে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া।

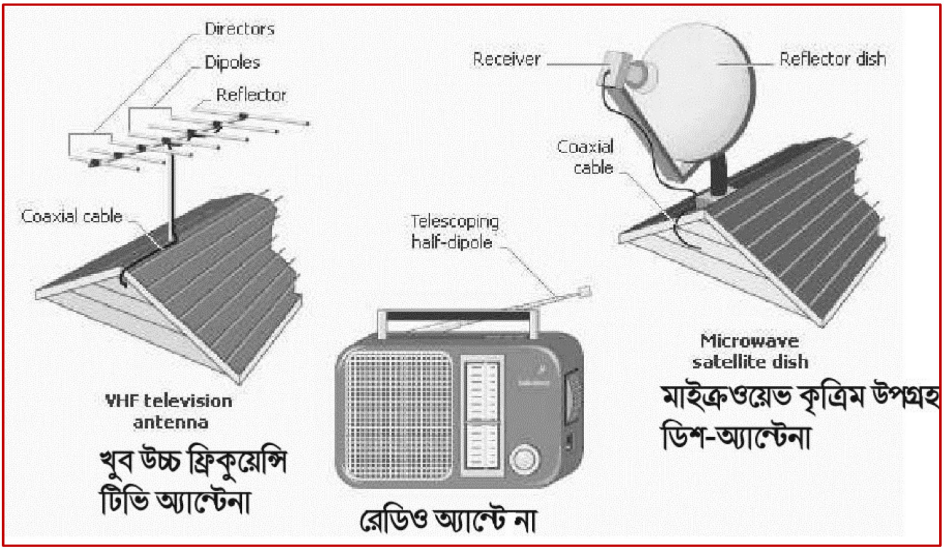


মাইক্রফোন শব্দ-তরঙ্গকে প্রায় একই সঙ্গে ঘটিত দু'টি পদক্ষেপে অনুরূপ **ইলেকট্রিকেল** সিগনালে রূপান্তর করে। প্রথমত, শব্দতরঙ্গ (অর্থাৎ, শব্দ থেকে সৃষ্ট চাপের ফলে বাতাসে যে কম্পন হয় তা) **'ডায়াফ্রাম'** নামক একটি চেপ্টা প্লাস্টিকের মতো বস্তুর উপর এসে পতিত হয়। এতে এটা বাতাসের চাপের সঙ্গে

সামঞ্জস্য রেখে কেঁপে উঠে। দ্বিতীয়ত, এই কম্পন থেকে **ডায়াফ্রাম ইলেকট্রিক** সার্কেটে কিছু রদবদল ঘটায়। **ডায়াফ্রাম** থেকে কোন্ ধরনের রদবদল ঘটবে তা নির্ভর করে মাইক্রফোনের ধরনের উপর। যেমন এটা যদি **কার্বন মাইক্রফোন** হয় তাহলে, কার্বনের কন্টাকের মধ্যে যে **রেজিসটেন্স** আছে তাতে পরিবর্তন আনবে; যদি তা **কনডেনসার মাইক্রফোন** হয় তাহলে **ইলেকট্রস্টেটিক কেপাসিটেন্সে** রবদল ঘটাবে; **ডাইনামিক** ও **রিবোন মাইক্রফোনের** ক্ষেত্রে যথাক্রমে মেগনাটিক ফিল্ডের কয়েলে বা কন্ডাকটারের মধ্যে সৃষ্টি করবে গতি; কিংবা তা যদি হয় **ক্রিস্টেল মাইক্রফোন** তাহলে **ফিজোইলেকট্রিকেল ক্রিস্টেলে** যোগান দেবে বক্রতা ও মোচড়। মোটকথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডায়াফ্রামে সৃষ্ট কম্পন-গতি থেকে **ইলেকট্রিকেল আউটপুটে** একটি রদবদল তৈরী করবে। **মাইক্রফোন** বিভিন্নভাবে **ডিজাইন** করা হয়। যেমন একদিক থেকে শব্দ সংগ্রহের জন্য **'ইউনিডাইরেকশনেল'**, দু'দিক থেকে **'বাইডাইরেকশনেল'** এবং প্রায় সবদিক থেকে সংগ্রহের উপযোগী **'অমনিডাইরেকশনেল' মাইক্রফোন।**

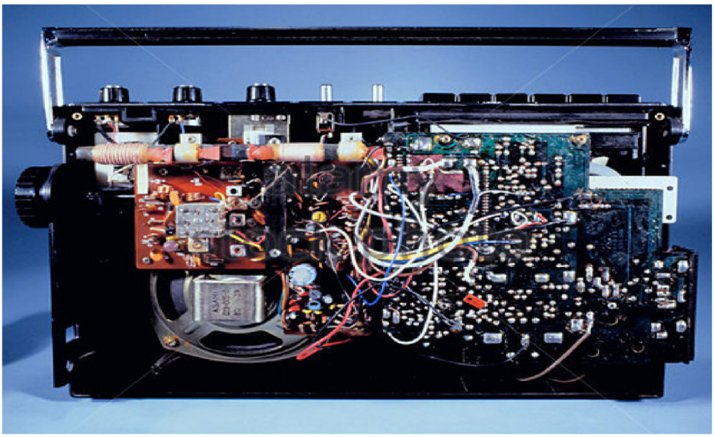
৪. অ্যান্টেনা

অ্যান্টেনার মাধ্যমে তরঙ্গকে চতুর্দিকে ছেড়ে দিতে হয়। প্রেরকযন্ত্রের অংশ হলেও তা স্টেশনের কাছে থাকতে হবে- তা কিন্তু নয়। সাধারণত এসব **ট্রান্সমিটার অ্যান্টেনা** খুব বড়-সড়ো ও উঁচু হয়ে থাকে। তাই শহর থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে এগুলো স্থাপিত হতে পারে। **এফএম** প্রচারের জন্য খুব উঁচু **অ্যান্টেনা** না হলে বেশিদূর পর্যন্ত **সিগনাল** প্রেরণ করা যায় না। অ্যান্টেনার কাজ হলো **ক্যারিয়ার ওয়েভকে মডুলেইট** (অর্থাৎ, **মাইক্রফোন** বা **রেকর্ডিং** যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত শব্দ-তরঙ্গকে যুক্তকরণ) ক্রিয়া শেষে তা **ইলেকট্রমেগনেটিক** তরঙ্গ হিসাবে বাতাসে (কিংবা মাহাকাশে হলে শূন্য **স্পেইসে**) ছেড়ে দেওয়া। আর এই সিগনালকে অনুরূপ এরেকটি **রিসিভার অ্যান্টেনা** যখন ধরে ফেলবে তখন তাতে একটি ছোট্ট **ইলেকট্রিকেল কারেন্ট** চলতে থাকবে। এই **কারেন্ট** তারের মাধ্যমে প্রাপকযন্ত্রে পৌঁছার পর **আমপ্লিফাই** (বা বর্ধিতকরণ) শেষে প্রেরক যন্ত্রের পাঠানো মূল ম্যাসেজে রূপান্তর করে দেয় এবং তা **'স্পিকার'** এর মাধ্যমে আওয়াজ তুলে। সুতরাং এভাবে আমরা বেতারের মাধ্যমে প্রেরিত কথা, গান, কবিতা আর নাটক শোনতে পাই।



রেডিও রিসিভার

রেডিও প্রাপকযন্ত্রের ক'টি মূল অংশ হলো: **ইলেকট্রমেগনেটিক** তরঙ্গকে গ্রহণ বা রিসিভ ও তা **ইলেকট্রিকেল** কম্পনে রূপান্তরের জন্য একটি **অ্যান্টেনা;** এসব কম্পনকে শক্তিশালী করার জন্য আমপ্লিফাইয়ারের ব্যবহার; এবং পাঠানো সিগনালে পুনঃরূপান্তরের জন্য যন্ত্রাদি; এক বা ততোধিক **স্পিকার**- যার মাধ্যমে প্রেরিত শব্দকে শ্রবণ করা হবে। অবশ্য আধুনিক রেডিওতে আরোও এক দু'টু অতিরিক্ত যন্ত্রাদি থাকতে পারে। তবে মৌলিক যন্ত্রাংশ এগুলোই।



আধুনিক রেডিওর অভ্যন্তর (পূর্বের পৃষ্ঠায়): এটাই আধুনিক **ট্রান্সজিসটার** রেডিও যন্ত্রের রিসিভার। এতে আছে **ইন্টেগ্রেটেড সার্কেট (আইসি)**- এগুলো মূলত শত শত **ট্রান্সসিজটার** সুইচ। বাকী যন্ত্রগলো হলো **রেজিস্টারস্; কেপাসিটারস্;** এবং **ইন্ডাকটারস্** (তারের তৈরী কয়েলস্)। আরো নতুন ও আধুনিক কিছু রিসিভারে যন্ত্রাংশ আরোও অল্প- কারণ, দিন দিন নতুন শক্তিশালী ও আয়তনে ছোট্ট **আইসি** তৈরী হচ্ছে। কিছু যন্ত্রে **'টিউনিং'** এর জন্য **'ফেইজ-লকড্-লুপ'** বা পিএলএল সিস্টেম ব্যবহৃত হয়, ফলে আগের মতো **টিউনিং** তার ও বড়ো ডায়ালের প্রয়োজন হয় না। ডিজিট বা নাম্বার দিয়ে বিভিন্ন স্টেশনের **ফ্রিকুয়েন্সি** দেখানো হয়।

রেডিও **অ্যান্টেনা** সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে জেনে নিয়েছি। তবে অতিরিক্তি যা বলার তাহলো, আধুনিক রেডিও **সিগনাল** খুব শক্তিশালী হওয়ায় **অ্যান্টেনা** তুলনামূলকভাবে বেশ ছোট্ট হলেও চলে। দুর্বল সিগনালকেও **রিসিভার** যন্ত্র ঘষামাঝা করে স্পিকারে উচ্চারণ করিয়ে দিতে সক্ষম, যা আপনার আমার নিকট শ্রবণযোগ্য হয়ে ওঠে। এখন মোবাইল ফোনেও রেডিও থাকে। ওগুলোর জন্য আলাদা কোনো অ্যান্টেনার প্রয়োজনই হয় না।

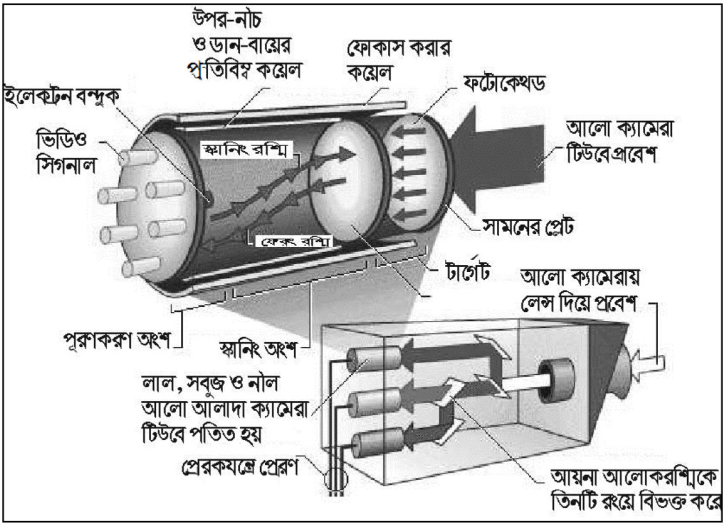
আমরা আমপ্লিফাইয়ার বলতে কি বুঝায় তা-ও ইতোমধ্যে কিছুটা আলোচনা করেছি। এই অংশ প্রাপ্ত সিগনালকে শক্তিশালী করে। সিগনালের **ভলটেজ** বৃদ্ধি করা হলো তার কাজ। **হাই-ফাইডিলিটি (হাই-ফাই)** রিসিভারে রেডিওর আমপ্লিফাইয়ার ও **টিউনার** এই উভয় **সার্কেট** থাকে। অপরদিকে একটি **হাই-ফাই** রেডিওতে সাধারণত আলাদা টিউনার ও আমপ্লিফাইয়ার থাকতে পারে।

টেলিভিশন

টিভি মূলত **অডিও** (শব্দতরঙ্গ) ও **ভিডিও** (ছবি) **সিগনাল** একত্রে প্রেরণ ও সেটে পুনরায় প্রদর্শনের নাম। আমরা টিভির পর্দায় যা দেখি তা প্রথমে ক্যামেরা দিয়ে ধারণ করে শব্দ ও ছবিকে **ইলেকট্রিকেল সিগনালে** রূপান্তর করা হয়। এটা মূলত রেডিও তরঙ্গ। শব্দের জন্য একটি ও ছবির জন্য আরেকটি **ফ্রিকুয়েন্সি** সাধারণত থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় **সিগনাল** একই ধরনের করা যায়- যেমন **এফএম (ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন), ভিএইচএফ (ভেরী হাই ফ্রিকুয়েন্সি)** ও **ইউএইচএফ (আলট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি)**। এসব যাবতীয় **সিগনাল** কিন্তু **'ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন'** ছাড়া আর

কিছুই নয়। **টিভি** আমরা সকলেই দেখেছি। অনেক সময় অবশ্য 'কিভাবে ছবি আকাশের উপর ভর করে চলে আসে এবং লাইভ পিকচারও?' এ প্রশ্নটি আমাদের মনে খেলা করে যায়। আমরা অনেকেই এর জবাব জানি না- তবে এক্ষুণি জেনে নেবো। একটু ধৈর্যসহ পাঠ করতে থাকুন।

প্রথমত ছবি ও শব্দকে **ইলেকট্রিক্যাল** সিগনালে রূপান্তর করতে হবে। এরপর এই **সিগনাল** রেডিও তরঙ্গের মতো আকাশে ছেড়ে দেওয়ার পর **টিভি রিসিভার** দিয়ে তা পুনরায় ধরা হয়। ছাড়া আর ধরার মধ্যেই আসল প্রযুক্তি- আকাশে চলার মধ্যে নয়। **প্রশ্ন:** ছাড়ার সময় টিভির ক্যামেরায় কি ঢুকে? উত্তর: আলোকরশ্মি। আমরা যেভাবে আলোকরশ্মি আমাদের চোখে ঢোকার পর সামনের ছবি বা দৃশ্য দেখতে পাই ঠিক সেভাবে টিভির ক্যামেরায় আলোকরশ্মি ঢোকার পর তা দেখা যায়। কিন্তু ক্যামের‍্যাম্যান তার **ভিউ-ফাইন্ডার** দিয়ে দেখলেইতো হবে না- এটাকে **ইলেকট্রিকেল** সিগনালে রূপান্তর করে দূর-দূরান্তে ছেড়ে দিতে হবে। এই ছেড়ে-দেওয়া পর্যন্ত কাজটা সারা হয় **টিভি** স্টুডিও সম্প্রচার সেন্টারে। অর্থাৎ **টিভি** স্টেশনে। এখন আকাশে নিষ্কলুষ দু'টি **ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল** চতুর্দিকে ছেড়ে দেওয়ার পর কোন একটি যন্ত্র লাগবে যা এগুলোকে **'ধরে'** কিছু চালাক প্রযুক্তির মাধ্যমে **'পরিচয়'** করে নেওয়া ও যে সূত্রদ্বয় থেকে (অর্থাৎ ক্যামেরার সামনের সেই প্রেজেন্টার ও তার ছবি) এগুলো এসেছে তাতে পুনরায় রূপান্তর শেষে প্রদর্শন করা। পাঠকরা বোধহয় বিষয়টি এখন অনেকটা আঁচ করে নিয়েছেন। তবে অবশ্যই এখনো স্পষ্ট হয়নি। এবার তাই, আমরা **টিভি** ক্যামেরা ও স্টেশনের কাজ এবং **রিসিভার** যন্ত্র তথা **টিভি** সেটের উপর আরো কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি।



টিভি ক্যামেরা

উপরের ছবিটির প্রতি ভালো করে লক্ষ্য করুন। ছবির নীচের অংশে রঙ্গিন **টিভি** ক্যামেরার মৌলিক কাজ যে প্রাপ্ত আলোকে (অর্থাৎ সামনের দৃশ্য থেকে প্রবেশকৃত আলোকরশ্মিকে) তিনটি প্রাথমিক রঙে রূপান্তর- তা সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে। তিনটি টিউবের একটির (এখানে লালটির) কিছু অতিরিক্ত প্রযুক্তি ছবির উপরের অংশে অঙ্কন করা হয়েছে। টিউবগুলোই ছবিকে **ইলেকট্রিকেল** সিগনালে রূপান্তর করে। ক্যামেরার ভেতর ছবি (অর্থাৎ আলোকরশ্মি) ঢোকার পর বিশেষ আরশি দ্বারা প্রাইমারি রঙে পরিবর্তন করা হয়। তিনটি আলাদা টিউবে এগুলো প্রেরণ করে তিনটি **ইলেকট্রিকেল সিগনাল** তৈরী করার পর বাইরের তারগুলোর মাধ্যমে স্টেশনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে ছেড়ে দিতে হবে। এরপর তিনটি রংয়ের সিগনালকে একসাথে একটি **'ভিডিও' সিগনাল** বানিয়ে রেডিও বা কেবল ওয়েরের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পাঠানো হয়।

উপরের ছবিতে আমরা ক্যামেরার মধ্যে তিনটি মৌলিক তন্ত্র খুঁজে পাই: ছবি ধারণের জন্য **'অপটিক্যাল'** সিস্টেম; একটি **পিক-আপ** যন্ত্র যার মাধ্যমে ছবিকে **ইলেকট্রিকেল** সিগনালে রূপান্তর করা হবে; এবং একটি **সিগনাল কোড** সৃষ্টির যন্ত্র- যাতে এটা প্রেরণযোগ্য করা সম্ভব হয়। আমরা এ তিনটি সম্পর্কে আরো কিছু বলবো।

অপটিক্যাল সিস্টেমঃ এই তন্ত্রে যেসব যন্ত্রাংশ থাকে তাহলো লেন্স (ছবিকে ফোকাসে আনার জন্য) এবং আয়না সিস্টেম (এগুলো রঙিন ছবিকে তিনটি আলাদা প্রাইমারি রঙ তথা লাল, সবুজ ও নীল-এ রূপান্তর করে)। সুতরাং এখন ছবিকে তিনটি আলাদা আলোকরশ্মিতে রূপান্তর করা হলো। তারপর কি হবে?

পিক-আপ যন্ত্রঃ এই যন্ত্রই ছবি থেকে প্রাপ্ত আলোকরশ্মিকে **ইলেকট্রিকেল সিগনাল** বানায়। ক্যামেরার মধ্যে এটাই হলো **'চালাক'** অংশ। আধুনিক ক্যামেরা এই কাজের জন্য **আইসি (ইন্টেগ্রেটেড সার্কেট)** ব্যবহার করে যেগুলো আলোকরশ্মি-স্পর্শকাতর। এই গুণটির ফলে এদের আরেকটি নামকরণ হয়েছে- **চার্জড্ কাপল্ড ডিভাইসেস (সিসিডি)।**

আমরা জানি চলচিত্র বানাতে ছবিগুলো **'রেকডিং'** করার জন্য দীর্ঘ ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। এখন, এই একই কাজ **টিভি** ক্যামেরার পিক-আপ যন্ত্রও করে- তবে পার্থক্য হলো রেকর্ডিং হয় ইলেকট্রনিক্সভাবে। পিক-আপ যন্ত্রের টিউবের সামনে **'ফটোকেথড'** স্তর পরে **'ফটোসেনসিটিভ'** কিছু বস্তুর একটি স্তর আছে। এটাকে বলে **টার্গেট**। এই টার্গেটে আরোকরশ্মি পড়ার পর এটা তা **ইলেকট্রনিক** ছবিতে রূপান্তর হয়- কারণ **লাইট-সেনসিটিভ** হওয়ায় এটায় রদবদল ঘটে। টিউবের পেছনে আছে **ইলেকট্রন** রশ্মি (নেগিটিভ চার্জসম্পন্ন **ইলেকট্রন**)। এই রশ্মি টার্গেটের **ইলেকট্রনিক** ছবিকে **'পড়ে'** নেয়। এই রশ্মি সৃষ্টি হয় টিউবের পেছনের একটি **'ইলেকট্রন বন্দুকের'** মাধ্যমে। এই রশ্মিকে প্রণালীবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে টার্গেটের ছবিকে **স্কান** করার প্রয়োজন। এ কাজে ব্যবহৃত হয় কিছু **'ইলেকট্রমেগনেট'** (বিদ্যুৎনির্ভর চুম্বক)। যে মুহূর্তে **ইলেকট্রন** রশ্মি সামনের টার্গেটে সৃষ্ট **ইলেকট্রনিক** ছবিতে কোন উজ্জ্বল স্থানে হিট করবে তখনই টিউব থেকে বের হয়ে আসে উচ্চ **ভলটেজ**। আর যখনই এটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোন অংশে হিট করবে তখনই টিউবটি নিম্ন **ভলটেজ** সৃষ্টি করবে। এভাবে উঁচু-নীচু ভলটেজই হলো **ইলেকট্রনিক টেলিভিশন** সিগনাল। এ পর্যান্ত এসে আমরা টিভি ক্যামেরার সামনের দৃশ্যটিকে **ইলেকট্রিক ভলটেজে** রূপান্তর করে নিলাম- তারপর?

এনকোডার

আমরা ছবি ধারণ করে **ইলেকট্রনিক টেলিভিশন সিগনাল** সৃষ্টি পর্যন্ত এসে গেছি। এখন এই সিগনালকে (অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত **ইলেকট্রিক** ভলটেজকে) আকাশে প্রেরণের পূর্বে আর কি করা দরকার? আসলে খুব বেশি নয়। **সিসিডি** যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত সিগনালকে প্রথমে **'আমপ্লিফিকেশনের'** মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়। এরপর **'এনকোডার'** নামক যন্ত্রের মাধ্যমে তিনটি আলাদা রঙিন সিগনালকে আলো-আঁধার মুতাবিত একত্রিত করে **ভিডিও** সিগনালে রূপান্তর করতে হবে। এই ঔজ্জ্বল্যতার বিভিন্ন মাত্রাকে বলে **'লুমিনেন্স'**। সুতরাং **লুমিনেন্স** কতটুকু সে হিসাবে পুরো **ইলেকট্রনিক** সিগনালটি তৈরী হওয়ার পর প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তবে একত্রে তৈরী করে তিন-রঙকে **টিভি রিসিভার** আবার আলাদা করে ছবি তৈরী করবে কি করে? সেটা নিশ্চিতকরণে **এনকোডার** আরেকটি **সিগনাল** তৈরী করে- যার মধ্যে আলাদাকরণের তথ্যাদি থাকে। আর এটা পেয়ে **রিসিভার** একই উপায়ে আলাদাকরণ কাজটি সারে।

এখন আমরা সিগনালটি প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছি। তবে তা প্রেরণের পূর্বে একটি ব্যাপার বুঝে নিলে ভালো হয়। এই ব্যাপারটি হলো ছবি ধারণ ও টিভির স্ক্রীনে **ডিসপ্লে**। এই উভয় ক্ষেত্রে যে **টেকনিক** ব্যবহৃত হয় তাকে বলে **'স্কানিং'**। ক্যামেরার টিউবের ইলেকট্রনগুলো এই **স্কানিং** কাজ করে। একেকটি **স্কান** সমান একেকটি **স্টিল** (বা স্থির) ছবি। সুতরাং চলন্ত ছাবির **সিগনাল** পাঠাতে হলে ক্যামেরাকে প্রতি সেকেণ্ডে বেশ কিছু **স্কান** করতে হবে। আর এই **স্কানিং** যতক্ষণ সম্প্রচার চলবে ততক্ষণ নিরলসভাবে করে যেতে হবে। **স্কানিং** করতে যেয়ে পুরো দৃশ্যকে বেশ কিছু লাইনে ভাগ করে নিতে হয়। একইভাবে **টিভি** রিসিভারে অপর একদল **ইলেকট্রন** রশ্মি ক্যামেরা দ্বারা ধারণকৃত ছবি স্ক্রীনে **'তৈরী'** করে দেখাতে এই **স্কানিং টেকনিক** ব্যবহার করে। এক্ষেত্রেও রশ্মিগুলো (বা **ইলেকট্রন গান্স**) প্রতি সেকেণ্ডে অনেকবার পুরো স্ক্রীনটি **স্কান** করে ছবি অঙ্কন করে থাকে। টিভির স্ক্রীনকে বেশ কিছু লাইনে ভাগ করে এ কাজ করতে হয়।

এখন এটা বুঝাই যাচ্ছে যে, **টিভি** ক্যামেরা যে রেইটে ছবি **স্কান** করতে থাকবে সেই একই রেইটে **টিভি** রিসিভারের **ইলেকট্রন** রশ্মিকেও স্ক্রীন **স্কান** করতে হবে। আর সর্বোপরি টিভির পর্দাকে একই সংখ্যক লাইনে ভাগ করাও জরুরী। অন্যথায় ছবি

সঠিক দেখাবে না। তাই বিভিন্ন দেশে **টিভি** তৈরীর কোম্পানী ও **টিভি** সম্প্রচার সংস্থার মধ্যে একটি **'স্কান এগ্রিমেন্ট'** করতে হয়। আমাদের এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপে ৬২৫ লাইনকে সেকেণ্ডে ২৫ বার **স্কানিং** করা হয়ে থাকে। আমেরিকায় এটা ভিন্ন। তাদের টিভির লাইন সংখ্যা ৫২৫ ও **স্কানিং** রেইট ৩০। ওহ, আরেক কথা। **টিভি** সিগনালের সঙ্গে শব্দ তরঙ্গও থাকতে হবে। এটা মাইক্রফোনের মাধ্যমে রেডিও তরঙ্গ হিসাবে ধারণ করার পর **টিভি** সিগনালের সঙ্গে **'সিংক্রোনাইজ'** (সঠিকভাবে একত্রিকরণ) করে পাঠানো হয়।

টিভি সিগনাল ট্রান্সমিশন

এবার আমরা **টিভি** সিগনালকে প্রেরণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছি। **স্কানিং** এর মাধ্যমে ধারণ, **আমপ্লিফিকেশন**, রঙ আলাদাকরণ, **ইলেকট্রিক** সিগনালে পরিবর্তন, **এনকোডিং** দ্বারা একত্রিকরণ শেষে, আমরা একটি **ইলেকট্রনিক** রঙ্গিন **টিভি সিগনাল** তৈরী করেছি। এখন তা কিভাবে প্রেরণ করবো? করবো তা অবশ্যই **ট্রান্সমিটার** যন্ত্রের মাধ্যমে। **ট্রান্সমিটার 'ক্যারিয়ার ওয়েভের'** মধ্যে **টিভি** সিগনালকে একত্রিত করে। এরপর আমিপ্লিফিকেশনের মাধ্যমে ক্যারিয়ারকে শক্তিশালী করে অ্যান্টেনার জন্য রেডি করে দেয়। **অ্যান্টেনা** থেকে সিগনালটি চতুর্দিকে আকাশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে **টিভি রিসিভার অ্যান্টেনা** কিংবা **রিলে স্টেশনের অ্যান্টেনা** ধরে ফেলে।

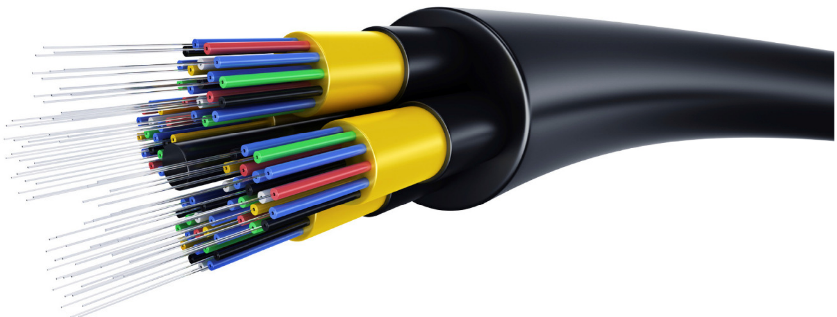
ট্রান্সমিটারঃ ট্রান্সমিটার দ্বারা **সিগনাল ট্রান্সমিশন** হয়- এটা অনুমেয়। তবে ঠিক কিভাবে হয়? সিগনালকে **ট্রান্সমিটার** যন্ত্র মডুলেশনের মাধ্যমে শক্তিশালী করার সময় সিগনালের উভয় অংশ তথা **ভিডিও** ও **অডিও** অংশকে যথাক্রমে **ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন (এফএম)** ও **আমপ্লিটিউড মডুলেশন (এএম)**-এ রূপান্তর করে। এ দু'টো তরঙ্গ তখন একত্রিত করার পর একটি **ক্যারিয়ার ওয়েভ** বানানো হবে- যাতে থাকবে **ভিডিও** ও **অডিও** তথ্যাদি। এখন **ক্যারিয়ার ওয়েভটি** অ্যান্টোর জন্য সত্যিকার অর্থে রেডি।

টিভি ক্যারিয়ার তরঙ্গের **ফ্রিকুয়েন্সি** (যা **হার্টজ** ইউনিটে মাপা হয়ে থাকে) সাধারণত ৪ **মেগাহার্টজ** (৪ মিলিয়ন **হার্টজ**) পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন চ্যানেলের জন্য ভিন্ন **সিগনাল** রেইট থাকা জরুরী। অন্যথায় ছবি **'মিক্স-আপ'** হয়ে যাবে। এ লক্ষ্যে **টিভি** সিগনালের **'ব্যান্ড'** রেঞ্জ বেশ চওড়া করার দরকার পড়ে।

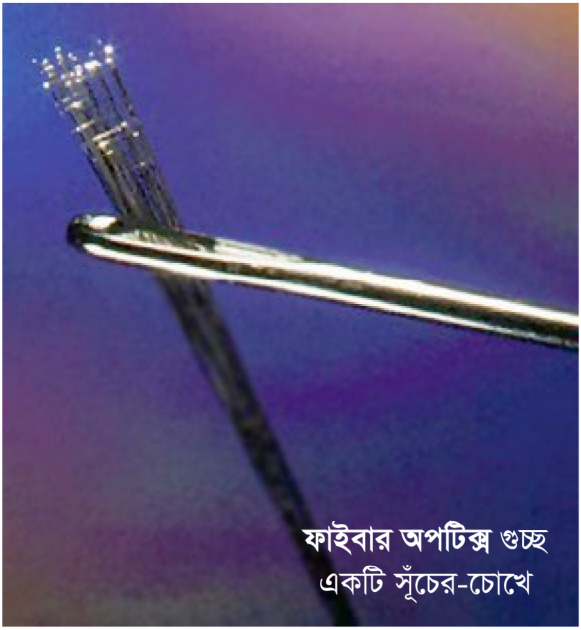
টিভির **সিগনাল** খুব শক্তিশালী। যে কোন সিগনালের মতো এগুলোও সোজাসুজি চলে। সুতরাং দূরদূরান্তে **সিগনাল** পাঠাতে হলে বিশেষ **রিলে স্টেশন** বানাতে হবে। সাধারণত বেশ উঁচু অ্যান্টেনার মাধ্যমে পৃথিবীস্থ **সিগনাল** প্রেরণ করা হয়। তবে ১২০ কি.মি. (৭৫ মা.) এর বেশি একটি **অ্যান্টেনা** দ্বারা পাঠানো সম্ভব নয়। তাই এতটুকু দূরে-দূরে **অ্যান্টেনা রিলে স্টেশন** বসাতে হয়। এভাবে দূরে **সিগনাল** পাঠালে কোন কোন সময় কিছু অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি হয়ে থাকে। টিভিতে মূল ছবি ছাড়াও আরেকটি **'ভূতুড়ে'** ছবি দৃশ্য হয়। এই সমস্যা অবশ্য দূর করার একাধিক রাস্তা আছে। **টিভি সিগনাল** যদি **ফাইবার অপটিক্স কেবল, মাইক্রওয়েভ রিলে স্টেশন** কিংবা **কমিউনিকেশন** কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পাঠানো হয় তাহলে এরূপ ভূত অদৃশ্য হবে।

ফাইবার অপটিক্স কেবল টেলিভিশন

উপরে আমি স্বচ্ছ ভূতমুক্ত ছবি প্রেরণের তিনটি পদ্ধতি- যা আজকের বিশ্বে সর্বত্র চালু আছে, তার কথা ব্যক্ত করেছি। এগুলো সম্পর্কে আরো কিছু জানার আছে। সুতরাং প্রথমেই আমরা অত্যাধুনিক **ফাইবার-অপটিক্স কেবল টিভি** কি তা জেনে নেবো। **ফাইবার অপটিক্স** অর্থ, চুলের মতো সরু **ট্রান্সপেরেন্ট** ফাইবারের মাধ্যমে আলোকরশ্মি বিকিরণ। সুতরাং এসব কৃত্রিম বস্তুর একপ্রান্তে আলোকরশ্মি ঢুকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে- ইতোমধ্যে খুব অল্প আলোই ক্ষয় হয়। আলোকের গতি যেহেতু ৩,০০,০০০ কিলেমিটার প্রতি সেকেণ্ড তাই **ফাইবার অপটিক্স** কেবলের মাধ্যমে প্রেরিত আলোকরশ্মিও এই তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ড বেগে ছুটে চলে। এমনকি ফাইবারকে যদি বক্র করাও হয় তথাপি গতি ও ক্ষয়ে কোন বেশকম হয় না।



ইলেকট্রনিক্স সিগনাল প্রেরণের জন্য **ফাইবার** অপটিক্সের জুড়ি নেই। কারণ এ উপায়ে **সিগনাল** এক স্থান থেকে অপর স্থানে খুব তাড়াতাড়ি প্রেরণ করা যায় অথচ **সিগনাল** ক্ষয় হয় না। অনেক বেশি তথ্যাদি এক সঙ্গে পাঠানোও সম্ভব। টিভির ক্ষেত্রে ব্যান্ডকে চওড়া করে পাঠানো যায়। **টিভি** সিগনালকে আলোক রশ্মিতে পরিণত করে **ফাইবার** অবটিক্সের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হয়। এরপর একে প্রাপকযন্ত্র পুনরায় **অডিও-ভিডিও** সিগনালে রূপান্তর করে স্ক্রীনে প্রদর্শনের মাধ্যমে ছবি-শব্দ দেখায়।



ফাইবার অপটিক্স গুচ্ছ একটি সূঁচের-চোখে

মাইক্রওয়েভ রিলে ট্রান্সমিশন

এ উপায়েই কোন কোন ক্ষেত্রে **টিভি সিগনাল ট্রান্সমিট** করা হয়ে থাকে। তবে খুব উঁচু **টিভি টাওয়ার** দ্বারা এই প্রেরণ কার্য সমাধা করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো মাইক্রওয়েঢ **সিগনাল** অর্থ কি? বাস্তবে রেডিও সিগনালের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন **ইলেকট্রমেগনেটিক** ওয়েভকে **মাইক্রওয়েভ** বলে। মাইক্রওয়েভের দৈর্ঘ্য মাত্র ১.০ সে.মি. থেকে ৩০ সে.মি. এর মধ্যে সীমিত। এর ফ্রিকুয়েন্সিও (কতবার তরঙ্গটি প্রতি সেকেণ্ড কম্পন (উঁচু-নীচু) করে তাকেই বলে **ফ্রিকুয়েন্সি**) খুব বেশী। মাইক্রওয়েভের প্রচুর ব্যবহার **'রেইডার'** ও **'মাইক্রওয়েভ অভেন'**-এ দেখতে পাওয়া যায়। এমরা এগুলোর উপর আলোচনা পরে করবো। **টিভি সিগনাল** হিসাবে **মাইক্রওয়েভ** ব্যবহার করতে হলে **টিভি টাওয়ার** প্রতি ৩০ মাইল অন্তর স্থাপিত হতে হবে। এ কারণেই এই সিস্টেমের ব্যবহার আজকাল উঠে যাচ্ছে। এখন বেশিরভাগ **টিভি ট্রান্সমিশন** স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। সুতরাং কৃত্রিম উপগ্রহ বা **স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন** সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন

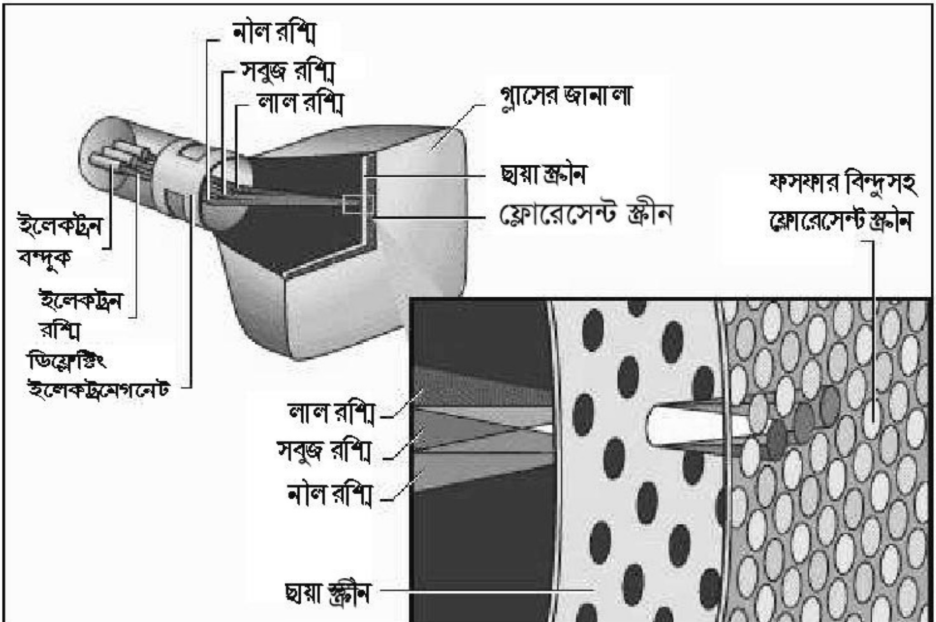
এই অত্যাধুনিক **টিভি ট্রান্সমিশন** সিস্টেমকে বুঝার পূর্বশর্ত হলো, **কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট** বলতে কি বুঝায় সেটা আগে জানা। যোগাযোগ উপগ্রহ মূলত এই উদ্দেশ্যেই মহাকাশে স্থাপিত করা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে স্থাপিত **আর্থ স্টেশন** থেকে **সিগনাল** স্যাটেলাইটে প্রেরণ করে তা পৃথিবী-গোলকের অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পাঠানো যায়। তবে সাধারণ প্রদক্ষিণরত **স্যাটেলাইট** থেকে যোগাযোগ সর্বদা সম্ভব নয়। এর কারণ হলো পৃথিবীর নিজস্ব দৈনিক গতি। **আর্থ-স্টেশন** (ভূ-কেন্দ্র) থেকে **সিগনাল** প্রেরণের সময় তো স্যাটেলাইটকে রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে। এ সমস্যা সমাধানে একটি সুন্দর প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। একে বলে **'জিওসিংক্রোনাস অরবিট'** বা **'জিওস্টেশনারী অরবিট'**। এর অর্থ, পৃথিবী থেকে সোজা উপরে কোন একটি স্থানে স্যাটেলাইটকে স্থির রাখা।



আমরা অবশ্য **'কৃত্রিম উপগ্রহ'** পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইটের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে যা বলার তাহলো, উক্ত বিশেষ কক্ষপথে **স্যাটেলাইট** স্থাপিত হলে রেডিও, **টিভি** এবং অন্যান্য **সিগনাল** সর্বদাই উপগ্রহে পাঠানো ও সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রিলে করা সম্ভব। এরূপ **স্যাটেলাইট**

ট্রান্সমিশন সম্ভব হওয়ার কারণেই আজ পৃথিবীর যে কোন স্থানে বসে আমরা '**লাইভ**' বা সরাসরি সম্প্রচার শোনতে ও দেখতে পাই।

টিভি সিগনাল রিসিভার টেলিভিশন সিগনালকে একটি প্রাপকযন্ত্র গ্রহণ (রিসিভ) করে তা ছবি ও শব্দে রূপান্তর শেষে স্ক্রীনের মধ্যে প্রদর্শন করে দেয়। সিগনালটি অবশ্যই অ্যান্টেনার মাধ্যমে '**ক্যাচ**' করতে হবে।



কিভাবে রঙ্গিন টেলিভিশন কাজ করে

একটি রঙ্গিন **টিভি** সেটের টিউবে থাকে তিনটি **ইলেকট্রন** বন্দুক। এদের একটি লাল, আরেকটি সবুজ ও অপরটি নীল রঙের আলোকরশ্মির (যা **অ্যান্টেনা** দ্বারা প্রাপ্ত **টিভি** সিগনালে ছিল) জন্য ব্যবহৃত হয়। এসব বন্দুক থেকে আলোকরশ্মি বের হওয়ার পর '**ইলেকট্রমেগনেট**' দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে টিভির স্ক্রীনকে সর্বদা **স্কান** করতে হবে। টিভির স্ক্রীনে আছে বিশেষ '**ফসফার**' (এক ধরনের বস্তু যার উপর **ইলেকট্রমেগনেটিক** রশ্মি পতিত হলে তা আলোকিত হয়ে ওঠে) নামক বিশেষ বস্তু আছে। এ বস্তুর মধ্যে লাল, সবুজ ও নীল রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডট ঐ স্কানের মধ্যকার রশ্মি দ্বারা আলোকিত হয়ে

ওঠে। মূল স্ক্রীনের পূর্বে বহু ছোট্ট ছোট্ট ছিদ্রবিশিষ্ট অপর একটি **'শাডো মাস্ক'** স্ক্রীন আছে। এটার কাজ হলো রশ্মির রং যাতে স্ক্রীনের সঠিক রংবিশিষ্ট ডটে পতিত হয় তা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ লাল রঙ যাতে লাল ডটে, সবুজ রঙ সবুজ ডটে ও নীল রঙ নীল ডটে পড়ে, শাডোস্ক্রীন এ নিশ্চয়তা দান করে। সকল ডট একত্রে উজ্জ্বল হয়ে ছবি সৃষ্টি করে **টিভি** স্ক্রীনে (দেখুন উপরের ছবিটি)।

টিভি সিগনাল প্রদর্শনের সময় অবশ্য শব্দও শ্রবণযোগ্য করতে হবে। এজন্য আলাদা রেডিও **রিসিভার** আছে। **সিগনাল** থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে শব্দকে আলাদা করে টিভির স্পিকারে প্রেরণ করা হয়। সুতরাং উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে **টিভি ভিডিও সিগনাল** ও **অডিও সিগনাল** মিলিত হয়ে স্ক্রীনে প্রদর্শিত হতে থাকে- আর আমরা দেখতে পাই শব্দ ও দৃশ্যের সমন্বয়ে ঘটিত জ্যান্ত ছবি।

টেলিগ্রাফ

টেলিগ্রাফের ব্যবহার আজকাল প্রায় শেষ। তবে **'টেলিপ্রিন্টিং'** নামক সিস্টেম এখনও কিছুটা চালু আছে। যেহেতু এই লেখা ইতিহাস নিয়ে নয়, তাই **টেলিগ্রাফ** সম্পর্কে খুব একটা বলার প্রয়োজন নেই- কারণ ইতিহাস বর্ণনা ছাড়া এই প্রযুক্তি সম্পর্কে বলা এ প্রসঙ্গে তেমন কিছু নয়। এরপরও টেলিগ্রাফের অর্থ কি তা জেনে নিলে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যল্প হলেও বৃদ্ধি পাবে।

টেলিগ্রাফ হলো রেডিও বা তারের মাধ্যমে **ইলেকট্রিকেল সিগনাল** এক স্থান থেকে অপর স্থানে প্রেরণ। প্রতিটি সিগনালে থাকে কিছু ডট ও ডাশ- যাকে **মর্স কোড** বলে। প্রেরকযন্ত্র থেকে সৃষ্ট এসব ডট-ডাশ প্রাপকযন্ত্রে আসার পর কোন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ম্যাসেজের অর্থ সনাক্ত করে লিখে নিতে পারেন। প্রাথমিক যুগে তারের মাধ্যমে এসব **সিগনাল** পাঠানো হতো। পরবর্তীতে অবশ্য বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে দেশ থেকে দেশান্তরে **টেলিগ্রাফ** দ্বারা খবরা-খবর আদান-প্রদান হয়েছে।

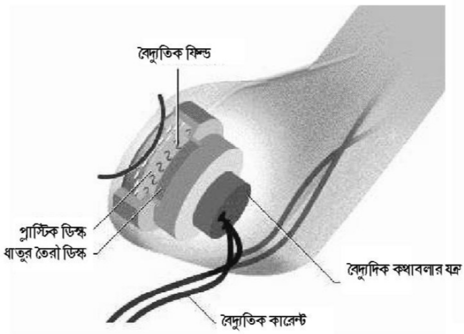
টেলিপ্রিন্টিং

এ সিস্টেমটির মূলে একটি টাইপরাইটারের মতো প্রেরকযন্ত্র ও আরেকটি **কিবোর্ড**-ছাড়া টাইপরাইটারের মতো প্রাপকপযন্ত্র কাজ করে। প্রেরকযন্ত্রে ইংরেজী অক্ষরগুলো টাইপ করে শব্দ ও বাক্য বানানো হয়। মেশিন এসব অক্ষরকে **ইলেকট্রিক** সিগনালে

পরিণত করে এরপর তা রেডিও বা তারের মাধ্যমে প্রেরণ করার পর প্রাপকযন্ত্রে **প্রিন্ট** হয়ে বেরিয়ে আসে। সুতরাং ম্যাসেজ পাঠাতে টাইপিং, এবং প্রাপ্তির সময় তা আবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে **প্রিন্ট** হয় বলেই একে **'টেলিপ্রিন্টিং'** বলে। এই সিস্টেম এখনও চালু থাকলেও দিন দিন তা **ইলেকট্রনিক্স মেইল (ই-মেইল)** দ্বারা স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং সম্ভবত শীঘ্রই টেলিপ্রিন্টিংও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে।

ল্যান্ড টেলিফোন

টেলিফোন কি তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই এটা ব্যবহার করি। তবে এ উপ-শিরোনামে আমি ইচ্ছে করেই ল্যান্ড শব্দটি প্রথমে যুক্ত করেছি। এর কারণ হলো আজকাল অসংখ্য মানুষ অপর এক ধরনের **টেলিফোন** ব্যবহার করে, যাকে আমরা **'মোবাইল'** বলে ডাকি। সুতরাং **টেলিফোন** বলতে ঐ ল্যান্ড ফোনকেই বুঝাচ্ছে। ফোনে কথাবলা বেশ সহজ। তবে এটা কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে হয়তো সবাই অবগত নন। সুতরাং এখন আমরা ব্যাপারটি জেনে নেবো।



টেলিফোনে কথা বলা



টেলিফোনে কথা শোনা

একটি **টেলিফোন** সেটে বেশ কিছু প্রযুক্তি বিদ্যমান। সেটের যে অংশ আমরা কানে লাগাই তাতে আছে প্রেরকযন্ত্র বা **ট্রান্সফরমার** ও প্রাপকযন্ত্র বা **রিসিভার**। প্রথমটি দ্বারা মুখে উচ্চারিত শব্দতরঙ্গ তারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিই ও দ্বিতীয়টি দ্বারা তারের মাধ্যমে আগত অপর প্রান্ত থেকে সৃষ্ট শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করি (দেখুন ছবিগুলো)। টেলিফোনে অবশ্য **'সজাগকরণ'** তন্ত্র থাকতে হবে। এর দ্বারা আমরা জানতে সক্ষম হই যে, কেউ কোন দূরবর্তী স্থান থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে চায়। এ কাজটি সেটের

‘**রিংগার**’ করে থাকে। **ইলেকট্রিক সিগনাল** এসে রিংগারকে সজাগ করে তুলে। হাতের স্যাটটি তুলে নিলেই রিংগার থেকে **সূইচিং** হয়ে প্রাপকযন্ত্রে **সিগনাল** আসে এবং আমরা শোনতে পাই অপরপ্রান্ত থেকে কে যেনো বলছে, ‘**হ্যাঁলো!**’।

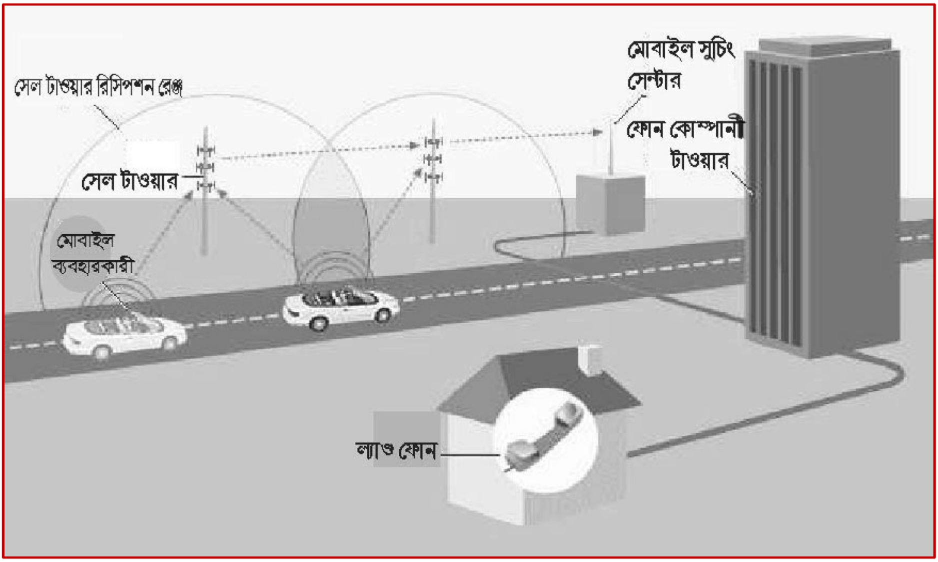
টেলিফোনে অবশ্য ‘**লাইভ**’ বা সরাসরি কথাবার্তা হয়। ভূমির উপরিভাগে / নীচে স্থাপিত তার, মহাসাগরের তলদেশে স্থাপিত **ইন্টারকন্টিনেন্টাল** কেবল কিংবা স্যাটেলাইটের সাহায্যে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে, আমাদের কথাগুলো শব্দতরঙ্গ তথা **ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল** হয়ে ছুটে চলে প্রেরণস্থল থেকে প্রাপ্তিস্থানে। এই তরঙ্গের গতি ৩ লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ড। তাই বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় কিংবা বৃটেনে কথা বলার সময় আমরা মনে করি অপর প্রান্তের মানুষটির সঙ্গে কথাবার্তা যেন একান্ত সামনা-সামনি হচ্ছে- ব্যবধান শুধু লোকটিকে না দেখা। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার যে, মাঝে মধ্যে ‘**টাইম লাগিং**’ হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমার কথা তার কাছে কিছু দেরিতে যেয়ে পৌঁছে কিংবা তার কথা আমার নিকট কিছুটা দেরিতে আসে। এরূপ ক্ষেত্রে কথাবার্তা সময় সময় সম্ভব হয় না। আমরা ফোন রেখে আবার ডায়াল করি। এছাড়া ‘**একো**’ বা প্রতিবিম্ব সমস্যাও দেখা দিতে পারে। নিজের কথা নিজেই ক্ষণকাল পরে শোনা যায়। এসব ব্যাপার নিশ্চয়ই পাঠকদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে- তবে **টেলিফোন** ব্যবহারে সমস্যা সৃষ্টি সচরাচর হয় না- বাস্তবে তা খুব বিরল।

মোবাইল ফোন

পুরো বিশ্বব্যাপী ‘**কথাবলার**’ এক অভিনব সিস্টেম চালু হয়েছে। আমাদের অনেকের পকেটে একটি শক্তিশালী রেডিও যন্ত্র আছে। এটা বিভিন্ন ‘**মিউজিক্যাল**’ টোনে সময় সময় বেজে ওঠে আর আমরা তা পকেট থেকে বের করে টিপ দিয়ে বলি, ‘**হ্যাঁলো!**’। হ্যাঁ, আমি অবশ্যি যে যন্ত্রটির কথা বলছি তা ‘**ধারণা**’ করার জন্য আপনাকে কোন পুরষ্কার দেওয়া যাবে না। কারণ আপনি জানেন, এটি **মোবাইল** ফোন। **মোবাইল** ফোন ছোট্ট হলেও এটি আধুনিক প্রযুক্তির এক অত্যাশ্চর্য শক্তিশালী যন্ত্র। এটা দ্বারা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে কোন স্থানে থেকে অন্য যে কোন জায়গায় অনুরূপ যন্ত্রের মাধ্যমে সরাসরি কথা এবং এমনকি **ভিডিও কনফারেন্স** পর্যন্ত করা যায়। আমরা হয়তো ‘**বৈজ্ঞানিক কাল্পনিক**’ চলচিত্রে ঘড়ির মধ্যে এভাবে কথা বলার দৃশ্য দেখেছি। তখন আমরা মনে করতাম, এগুলো তো **সাইন্স ফিকশন**! আর নয়, বাস্তবেই আপনি এখন টেলিফোনের মাধ্যমে আপনার দূরদেশে বসবাসরত

বন্ধুটির সঙ্গে হেসে-কেঁদে, একে অন্যকে জ্যান্ত দেখে দেখে কথা বলতে পারেন। অবশ্য সিস্টেমটি বোধহয় এ বই প্রকাশের সময় বাংলাদেশে আসে নি- কিন্তু বেশি দেরি হবে না- আসবেই। তাহলে অত্যাশ্চর্য এই **মোবাইল** ফোন কিভাবে কাজ করে? আসুন একটু তলিয়ে দেখি।

আপনার ফোন একটি **রেডিও ট্রান্সমিটার**। এ থেকে শব্দতরঙ্গ প্রথমে **মোবাইল** ফোন কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত নিকটতম একটি ট্রান্সমিটিং টাওয়ারে যেয়ে পৌঁছে। এই টাওয়ারের নাম **সেলুলার টাওয়ার**। দু' ধরনের **টাওয়ার** আছে, প্রথমটির ব্যাপ্তি মাত্র ১.৫ মাইল। অর্থাৎ দেড় মাইল দূর পর্যন্ত এটা শব্দতরঙ্গকে ধরতে সক্ষম। দ্বিতীয়টির রেঞ্জ ৩০ থেকে ৩৫ মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি **টাওয়ার** যে পরিমাণ এলাকা কাভার করতে সক্ষম তাকে বলে, একটি সেল। সুতরাং **নেটওয়ার্ক** সৃষ্টিতে এসব **টাওয়ার** একটা থেকে আরেকটির দূরত্ব হিসাব করে বসাতে হবে।



এখন, টাওয়ারে **সিগনাল** ধরার পর একে সঠিক পথে প্রেরণের জন্য কেন্দ্রীয় সূইচিং স্টেশনে পাঠানোর দরকার। এ কাজটি তিনটির যে কোন একটি দ্বারা সম্পাদিত হয়- তার, **ফাইবার-অপটিক্স** কেবল কিংবা **মাইক্রওয়েভ**। কেন্দ্রীয় সূচিং **স্টেশন** ল্যান্ড ফোন কিংবা অপর কোন **মোবাইল** ফোনের সঙ্গে সিগনালটি সংযুক্ত করে দিতে

সক্ষম। যেহেতু সেল থেকে সেলে সংযুক্তি বিদ্যমান তাই আমরা যদি **মোবাইল** নিয়ে এক সেলের রেঞ্জ থেকে অপরটির রেঞ্জে চলে যাই তাহলে কোন অসুবিধা হয় না। এক **টাওয়ার** থেকে পরবর্তী নিকটতম টাওয়ারে সিগনালটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে **ট্রান্সফার** হয়ে যায়। এভাবে আমাদের **'নেটে'** কোন অসুবিধা দাঁড়ায় না (দেখুন উপরের ছবিটি)।

মোবাইল ফোন আকজাল শুধু কথাবলার **'টেলিফোন'** নয়। এটা আমাদেরকে ছবি ও **ভিডিও** তোলা ও প্রেরণ; **ট্যাক্স ম্যাসেজ** প্রেরণ ও গ্রহণ; ই-মেইলসহ **ইন্টারনেট** সুবিধা; **ভিডিও** কনফারেন্সিং ইত্যাদিসহ আরো বহু সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে। আপনি যদি একটি উন্নতমানের লেইটেস্ট **মোবাইল** সেটের মালিক হয়ে থাকেন তাহলে সর্বদাই নিজেকে **'ইন-টাচ্'** রাখতে সক্ষম হবেন। এমনকি আপনার ব্যবসা-বাণিজ্যের খবরা-খবরও মোবাইলের মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন। **মোবাইল টেকনোলজি** দিন দিন উন্নততর হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ইতোমধ্যে **মোবাইল নেটওয়ার্ক** তৈরী হয়ে গেছে। শহরাঞ্চল ছাড়াও সুদূর পল্লীগাঁ পর্যন্ত এখন **মোবাইল নেটওয়ার্ক** চালু হয়েছে। সুতরাং **মোবাইল** ফোনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তা নিশ্চিত।

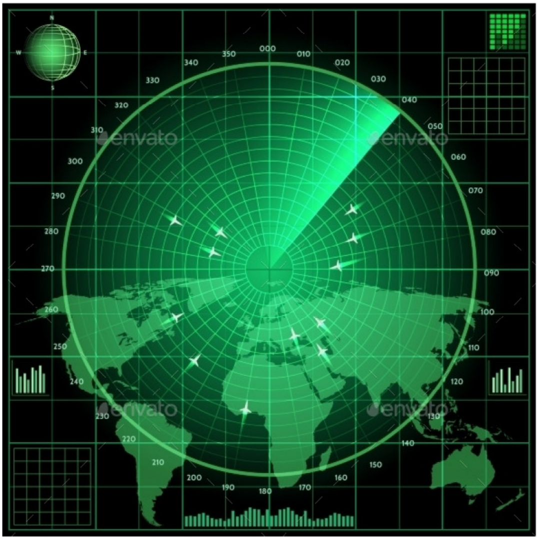
রেডিও ডিটেকশন এন্ড রেঞ্জিং (Radar)

রেডিও সিগনালের মাধ্যমে শব্দ, ছবি, **ভিডিও** ইত্যাদি প্রেরণ ও গ্রহণ ছাড়াও অপর আরেকটি কাজ করা যায় তাহলো দূরবর্তী কোন বস্তু সনাক্তকরণ। যে উপায়ে এটা করা হয় তাকেই বলে **রাডার** বা **রেইডার**। এই প্রযুক্তিটি বেশ দিন যাবৎ চালু আছে। এটার মূলে যা তাহলো, রেডিও **সিগনাল** প্রেরণ করে বস্তুর উপর পতিত এবং আবার ফিরিয়ে আনা। **রাডার** যন্ত্রাদি এই ফেরৎ আসা সিগনালের প্রতিবিম্ব সনাক্ত করে। এ থেকে যেসব তথ্যাদি পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'টি হলো, বস্তুর দূরত্ব, (চলন্ত হলে) এটার গতি ও গতিপথ এবং আকার। **রাডার** দৃষ্টির বাইরের বস্তু সনাক্তকরণে এবং যে কোন আবহাওয়ায় ব্যবহার করা যায়। এর ফলে এটা বিমান ও জাহাজ চলাচলসহ বিভিন্ন **নাভিগেশন** সিস্টেমে চালু আছে।

একটি **রাডার** যন্ত্র থেকে **ইলেকট্রমেগনেটিক সিগনাল** প্রেরণ করার পর উহা তার চলার রাস্তায় কোন বস্তু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেই লাফ মেরে ফিরে আসে। এই ফিরে

আসা সিগনালের কিছু অংশ **রাডার** সিস্টেম আবার ক্যাচ করে নেয়। এখন **রাডার** সিস্টেম যদি শুধুমাত্র বস্তুটি আছে তা জানার জন্য সৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে, তা জানা যাবে। তবে বাস্তবে **রাডার** দ্বারা আরো বেশ কিছু তথ্যাদি জানা যায়।

রাডার সিস্টেমে মোট চারটি মৌলিক যন্ত্র থাকে। এগুলো হলো **ট্রান্সমিটার** (প্রেরকযন্ত্র), **অ্যান্টেনা**, **রিসিভার** (প্রাপকযন্ত্র) ও **ডিসপ্লে** (দৃশ্যমান স্ক্রীন)। **ট্রান্সমিটার** সঠিক **সিগনাল** তৈরী করে। **অ্যান্টেনা** এই সিগনালকে **ইলেকট্রমেগনেটিক রেডিয়েশন** হিসেবে প্রেরণ করার পর বস্তুর গায়ে লেগে কিছু অংশ ফিরে রিসিভারে এসে পৌঁছে। অবশ্য এই একই অ্যান্টেনাই ফেরৎ আসা সিগনালকে ধরে। **রিসিভার** যন্ত্র তা গবেষণা করার পর ডিসপ্লেতে পাঠিয়ে দেয়। সুতরাং একজন **অপারেটর** স্ক্রীনের সামনে বসে সর্বদাই রাডারের **সিগনাল** দেখতে পারবেন।



রাডারের ব্যবহার

আগেই বলেছি রাডারের ব্যবহার ব্যাপক। এখানে আমি গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করছি। পৃথিবীর বিভিন্ন বিমানবন্দরে **রাডার** সিস্টেম দ্বারা বিমানের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই সিস্টেমকে বলে **'এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল'**। আকাশে উড়ন্ত বিভিন্ন বিমানের উড্ডয়ন, ফ্লাইট ও অবতরণ যাতে বিনা বাধায় ও দুর্ঘটনামুক্ত থাকে তার জন্য **এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল** দরকারী। আর এই কন্ট্রোল সিস্টেমের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাটিই হলো **রাডার**। এই সিস্টেমে দু'টি আলাদা **রাডার** থাকে। প্রথমত আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য পুরো বিমানভ্রমণকে **রাডার** দ্বারা কাভারের ক্ষেত্রে একটি **নেটওয়ার্ক** আছে যাকে বলে, 'এয়ার রুট **সারভেইলেন্স রাডার**'। দ্বিতীয়ত, এয়ারপোর্টের নিকটে উড়ন্ত বিমানকে রাডারের আওতায় রাখার জন্য আছে

আরেকটি **নেটওয়ার্ক** যাকে বলে, **‘এয়ারপোর্ট সার্ভেইলেন্স রাডার’**। প্রথমটি হলো দীর্ঘ ও শেষেরটি অল্পদীর্ঘ রেঞ্জের **রাডার**।

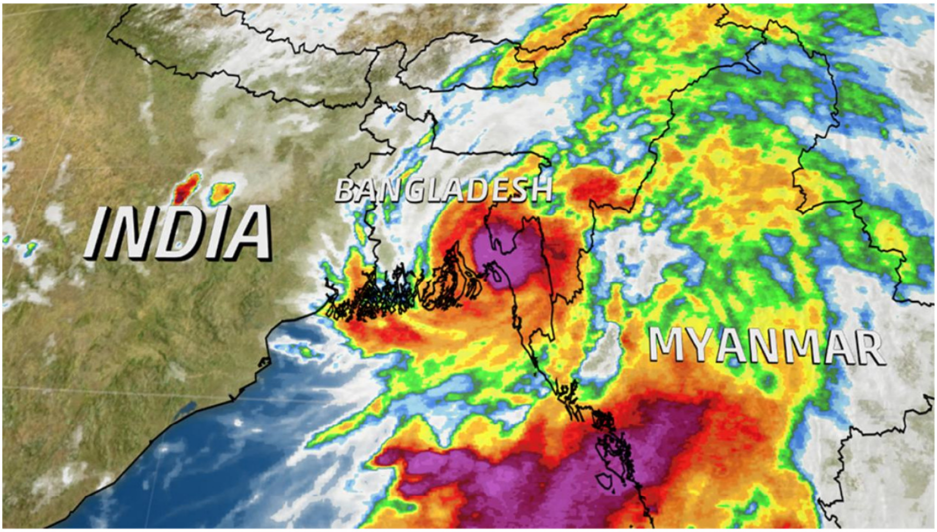
সাগরে জাহাজ চলাচলেও **রাডার** ব্যবহৃত হয়। এসব **রাডার** দ্বারা স্থলভাগ, অন্যান্য জাহাজ, **লাইটহাউস** ইত্যাদি **স্কান** করা হয়। অন্ধকার রাতে ও গভীর কোয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় এসব **রাডার** বেশ উপযোগী হয়ে ওঠে।

সর্বাপেক্ষা বেশী **রাডার** ব্যবহৃত হয় সামরিক ক্ষেত্রে। অতীতে মিলিটারী দ্বারাই **রাডার** ব্যবহার ও প্রযৌক্তিক পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং তারাই যে এটার ব্যবহার আজো বেশি করবে তাতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই। বিশেষ করে যুদ্ধ জাহাজ, বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানবাহিনী **রাডার** ছাড়া প্রায় অচল। দেশের **এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমেও রাডার** ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বোমা ও মিসাইলের জন্যও **রাডার** দরকারী।



ট্রাফিক নিরাপত্তায়ও **রাডার** ব্যবহৃত হয়। যেসব ড্রাইভার গাড়ির গতির মাত্রা মানে না, তাদেরকে ধরার উত্তম একটি পন্থা হলো **রাডার**। অতিরিক্ত গতিশীল বলে বিবেচিত কোন গাড়ির দিকে একটি সরু **রাডার** বীম প্রেরণ করা হয়। সিগনালটি সাসপেক্ট গাড়ির গায়ে লেগে ফিরে আসে। **ডপলার এফেক্ট** থেকে বিশেষ যন্ত্র গাড়ির সঠিক গতি নির্ণয় করে। যদি সীমা অতিক্রম করা হয়ে থাকে তাহলে পুলিশ ঐ গাড়ির ড্রাইভারকে থামতে **সিগনাল** দেবে। পশ্চিমা দেশসমূহে এভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে **রাডার** ব্যবহার হয়ে আসছে প্রায় অর্ধ শতক যাবৎ।

আবহাওয়াবিদরাও **রাডার** ব্যবহার করে থাকেন। পুরো বিশ্বব্যাপী একটি আবহাওয়া **রাডার** সিস্টেম আছে। আবহাওয়াবিদরা সেই **ডপলার এফেক্ট** ব্যবহার করে আকাশে মেঘের গতি, দূরত্ব ইত্যাদি নির্ণয় করেন। **রাডার** দ্বারা বৃষ্টি, বরফ ইত্যাদির মাত্রা ও বাতাসের গতি নির্ণয় করা যায়। এয়ারপোর্টেও অনুরূপ **রাডার** আছে যেগুলো দ্বারা **ল্যান্ডিং কন্ডিশন** নির্ণয় করা সম্ভব হয়।



রাডার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়। মহাকাশ সংক্রান্ত কিছু গবেষণায় **রাডার** বেশ কার্যকরী। পৃথিবীর কক্ষপথে ভ্রমণরত সকল কৃত্রিম বস্তু সনাক্তকরণের জন্য আমেরিকা, বৃটেন ও কানাডা **'স্পেইসট্রাক' রাডার** সিস্টেম গড়ে তুলেছে। এই সিস্টেমে আছে একাধিক বড় আকারের **সার্ভেইলেন্স রাডার** যার মধ্যে নিরাপত্তামূলক **'বলিস্টিক মিসাইল আরলি ওয়ার্নিং সিস্টেম'** নামক তন্ত্রও জড়িত। এই সিস্টেম থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে কোনো মহাকাশ বৈর্জ্য ভূপাতিত হয়ে ক্ষতিসাধন করতে পারে কি না। তবে স্পেইসে স্থাপিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ **রাডার** সিস্টেম হলো **গ্লোবেল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)**।



জিপিএস সিস্টেমের মূলে আছে মহাকাশে সমদূরত্বে প্রদক্ষিণরত ২৪ টি কৃত্রিম উপগ্রহ।

জিপিএস আমেরিকার **ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট** দ্বারা চালিত। এই সিস্টেম থেকে আমেরিকার মিলিটারী সঠিক অনেক তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তবে যে কোন ব্যক্তির নিকট যদি **জিপিএস রিসিভার** থাকে তাহলে সে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। এই সিস্টেমের মূলে মোট ২৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ আছে যেগুলো পৃথিবীর উচ্চ কক্ষপথে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর যে কোন স্থানে কোন ব্যক্তির নিকট যদি উপযুক্ত **জিপিএস** প্রাপকযন্ত্র থাকে তাহলে সে তার নিজস্ব অবস্থান সঠিকভাবে জানতে পারবে। আজকাল সকল এ্যান্ড্রোইড মোবাইলে জিপিএস রিসিভার থাকায় ব্যবহারকারী কোথায় আছেন তা সহজেই সনাক্ত করা যায়। এছাড়া গাড়িতে জিপিএস থাকলে রোড ম্যাপ ও ট্রাফিক অবস্থা ড্রাইভার জানতে পারেন। গন্তব্যস্থলের ঠিকানা সিস্টেমে প্রবেশ করলে ম্যাপ ও কথার মাধ্যমে উত্তম রুটে আপনাকে নিয়ে যাবে জিপিএস। জিপিএস থাকায়ই এখন বের হচ্ছে ড্রাইভারহীন গাড়ি।



এই মোবাইলের মতো যন্ত্রটি আসলে একটি **ইলেকট্রনিক** ম্যাপ।

জিপিএস উপগ্রহে **রাডার** যন্ত্র ছাড়াও আছে এটমিক ঘড়ি। পৃথিবীর যে কোন স্থান ও কাল নির্ণয়ে উভয় যন্ত্র কাজ করে। মিলিটারী ছাড়াও যে কোন মানুষ কিছু অপেক্ষাকৃত অল্প দামী যন্ত্রাদির মাধ্যমে নিজের পজিশন ও টাইম নির্ণয় করে নিতে পারে। আজকাল **'টমটম'** নামক এক ধরনের ছোট্ট যন্ত্র বের হয়েছে। এটি গাড়ির মধ্যে থাকে। যন্ত্রের মধ্যে চালক গন্তব্যস্থলের ঠিকানা টাইপ করে দিলেই এটা

কথার মাধ্যমে পুরো ভ্রমণটি গাইড করে নেবে। অর্থাৎ গাড়ি সামনে যাবে না বায়ে-ডানে ঘুরবে ইত্যাদি বলে গাড়িকে গাইড করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে। যন্ত্রটির মধ্যে রাস্তার ম্যাপও আছে। পুরো ইউরোপ আমেরিকায় এখন এই সিস্টেম চালু হয়েছে ও দিন দিন তা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। টমটম মূলত **জিপিএস** দ্বারা চালিত। এছাড়া যে কোন ব্যক্তি **জিপিএস রিসিভার** দ্বারা রাস্তার ম্যাপ দেখে নিজের অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন।

জিপিএস উপগ্রহগুলো পৃথিবী থেকে **১২,৫০০** মাইল ঊর্ধ্বে মহাকাশে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রতি **১২** ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে আসে। পৃথিবীর বিষুবরেখা থেকে ৫৫ ডিগ্রী কাত করে কক্ষপথ নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে দুই মেরু অঞ্চলও কাভার করা যায়। প্রতিটি **স্যাটেলাইট** স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের **সোলার সেল** সূর্যের দিকে ও **রাডার অ্যান্টেনা** পৃথিবীর দিকে সর্বদা স্থির রাখে। **রাডার** ছাড়াও প্রত্যেক স্যাটেলাইটে আছে চারটি করে আনবিক ঘড়ি।

জিপিএস অবশ্য বেশী ব্যবহৃত হয় সামরিক ক্ষেত্রে। আধুনিক সামরিক বাহিনীর জঙ্গী বিমান, বোমারু বিমান, ট্যাংক, জীপ, মিলিটারী পার্সোনেল ক্যারিয়ার, হেলিকপ্টার, যুদ্ধ জাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ, সাবমেরিন ও অন্যান্য গ্রাউন্ড বেইসে **জিপিএস রিসিভার** যন্ত্রাদি বিদ্যমান। এছাড়া তথাকথিত স্মার্ট বোমা এই **জিপিএস** রিসিভাবের উপর নির্ভরশীল।

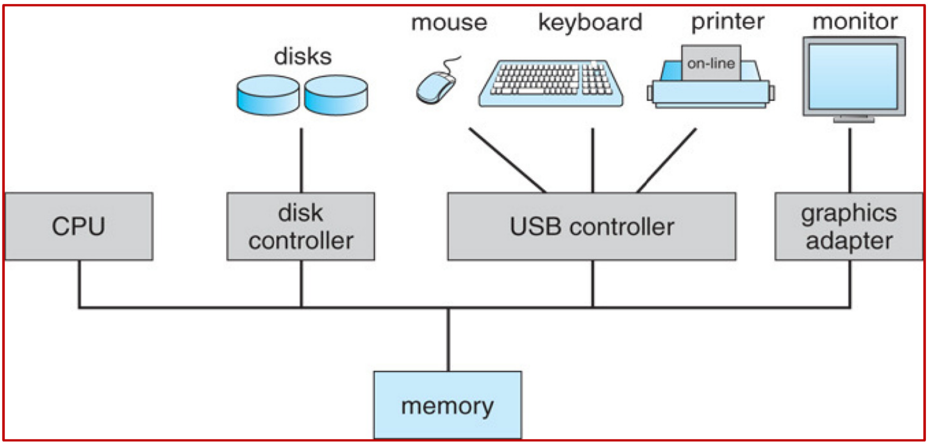
আমরা ইতোমধ্যে সিভিলিয়ান সেক্টরে গাড়িতে ব্যবহৃত টমটম সিস্টেমের কথা বলেছি। তবে **জিপিএস** এর ব্যবহার প্রায় অসীমিত হতে পারে। এর কারণ হলো **জিপিএস** সিস্টেম ব্যবহারে যে যন্ত্রের দরকার পড়ে তা স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করে না বরং **স্যাটেলাইট** থেকে প্রেরিত **সিগনাল** ব্যবহার করে যন্ত্রটির অবস্থান এই পৃথিবীর কোথায় আছে তা নির্ণিত হয় মাত্র। তবে এটুকু তথ্যই অনেক কাজের জন্য বিরাট। সিটির ম্যাপ থাকলে যন্ত্রটি ম্যাপের মধ্যে নিজের অবস্থান তথা ব্যবহারকারীর অবস্থান বলে দিতে পারবে। সুতরাং **জিপিএস** ইতোমধ্যে এয়ারপোর্ট, জাহাজ, বিমান, ট্রেন, **মোটর**গাড়ি থেকে **স্পেইস শাট্‌ল** পর্যন্ত প্রায় সব ধরনের চলন্ত সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। **জিপিএস** সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি পৃথিবীর কোথায় অবস্থান করছেন তা ১০ ফুটের ভেতর পর্যন্ত সঠিক হবে।

পরিচ্ছেদ ৮

আধুনিক কম্পিউটার

আমাদের অনেকের ঘরে **পিসি (পার্সোন্যাল কম্পিউটার)** আছে। গেল ক'টি মাত্র দশক পূর্বেও এরূপ ব্যবাহারোপযোগী একটি মেশিন পৃথিবী-গোলাকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তা কল্পনাও করা যায় নি। কিন্তু তা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। যতো দিন যাচ্ছে **কম্পিউটার** প্রযুক্তি ততো বেশী সোফিস্টিকেইটেড হয়ে ওঠছে। আমাদের জীবনচলার ক্ষেত্রে **কম্পিউটার** দিন দিন একটি অপরিহার্য বস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে- বরং আমরা অনেকটা এর উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছি- যেমনটি হয়ে উঠেছি টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদির উপর।

কম্পিউটার ব্যবহারের উপকারিতা যে কতো বিরাট তা বুঝিয়ে বলাও মুশকিল। অথচ **কম্পিউটার** সিস্টেম এর গণিত আবিষ্কারক প্রখ্যাত মুসলিম গাণিতিক **আল-খোওয়ারিজমি** (৭৮০ - ৮৫০ খ্রীঃ) কি কোন দিন ভেবেছিলেন যে, তাঁর বীজগণিত সৃষ্টির সফলতা এরূপ ইউনিভার্সেল হয়ে ওঠবে? তবে সুখের বিষয় আল-খোয়ারিজমির অবদানকে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ভুলেন নি। **কম্পিউটার** সাইন্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ **'আলগোরিথম'** শব্দটি তাঁরই নামানুসারে হয়েছে। আধুনিক কম্পিউটারের মূলে কয়েকটি মৌলিক তন্ত্র কাজ করে। আমরা এখন এসব তন্ত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো।



উপরোক্ত নক্সা থেকে আমরা **কম্পিউটার** সিস্টেমের মৌলিক কিছু বিষয়-বস্তু অনুধাবন করে নিতে পারি। প্রথমত, এটা সহজেই অনুমেয় যে, কম্পিউটারে সর্বদাই কিছু তথ্য **ইন্সট্রাকশন** বা নির্দেশ হিসাবে ঢুকাতে হয়। এই সিস্টেমকে বলে **ইনপুট**। আর দ্বিতীয়ত, এই **ইনপুট** থেকে কিছু **প্রসেসিং** বা প্রক্রিয়া শেষে ফলাফল সিহাবে কিছু তথ্য বের করা। এই সিস্টেমকে বলে **আউটপুট**। এই **ইনপুট / আউটপুটই** হলো কম্পিউটারের মৌলিক **ফাংশন**।

ইনপুট যন্ত্রাদি

আমরা কম্পিউটারে তথ্য ও নির্দেশ ঢুকানোর জন্য কিছু যন্ত্র ব্যবহার করি। এগুলো হলো: **মাউস, কিবোর্ড, স্কানার, ডিজিটেল ভিডিও** / ছবি **ক্যামেরা, মাইক্রফোন, টাচ্ প্যানেল, লাইট পেন** ও **জয়স্টিক**। **মাউস** হলো একটি **পয়েন্টিং** যন্ত্র। এর দ্বারা পয়েন্টারকে স্ক্রীনের যে কোন স্থানে নিয়ে টিপ দিয়ে বিভিন্ন **কমান্ড** কম্পিউটারে দেওয়া যায় ও সাথে সাথে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলও পাওয়া যায়। **আপেল মেকিনটশ** নামক **কম্পিউটার** এই মাউসকে প্রথম আবিষ্কার করে। এখন সব ধরনের **কম্পিউটার** সিস্টেমে মাউসের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মূলত প্রতিটি পিসিতে এখন **মাউস-কিবোর্ড-ডিসপ্লে** সংযুক্তি একটি **স্ট্যান্ডার্ড**।

কিবোর্ড দ্বারা আমরা টাইপ করে টেক্সসহ কিছু **কমান্ড** কম্পিউটারে ঢুকাতে সক্ষম হই। আমি এই বইটি লিখতে যেয়ে **ওয়ার্ড প্রসেসর** প্রোগ্রামের **উইন্ডোতে** বাংলায় টাইপ করেছি। আমার টাইপ করা শব্দ, বাক্য, প্যারা ইত্যাদি কম্পিউটারের **ফাইল** সিস্টেমে সংরক্ষণ করে করে পুরো বইটি লিখেছি। এছাড়া কম্পিউটারের কিছু কমান্ডও এক বা একাধিক বোতাম টিপে আঞ্জাম দিয়েছি। যেমন টাইপের সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি সংরক্ষণ করতে যেয়ে সর্বদাই **'কন্ট্রল+এস'** এই দু'টি **কিবোর্ড** কারেক্টার টাইপ করেছি। এতে আমার ফাইলটি সংরক্ষণ হয়েছে।

স্কানার যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা ছবি, লেখা ইত্যাদি কাগজ থেকে **স্কান** করে কমিউটারে ঢুকাতে পারি। এরপর এই ছবি / লেখাকে ইচ্ছেমতো প্রসেসিংও করা যায়। **স্কানার** আলোকরশ্মির মাধ্যমে কাগজের বা বস্তুর ছবিকে **ইলেকট্রিক** সিগনালে রূপান্তর করে

কম্পিউটারে প্রেরণ করে। **স্কানার সফট্ওয়্যার** একে **ডিজিটেল** ছবি বানিয়ে প্রদর্শন শেষে তা সংরক্ষণের সুযোগ করে দেয়।

ডিজিটেল ক্যামেরা থেকেও ছবি কিংবা **ভিডিও** কম্পিউটারে ট্রান্সফার করা যায়। এমনকি মোবাইলে ধারণকৃত **অডিও / ভিডিও /** ছবি কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই সিস্টেমকে বলে **ব্লুটুথ**। কম্পিউটারে আজকাল বিভিন্ন **ইনপুট পোর্ট** আছে। এর মধ্যে একটি হলো **ইউএসবি পোর্ট।** ইউনিভার্সেল এই পোর্টের মাধ্যমে আজকাল কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের **মিডিয়া** ও তথ্যাদি ঢুকানো ও বের করা যায়।

মাইক্রফোন দ্বারা যে কোন শব্দ, কথাবার্তা ইত্যাদি কম্পিউটারে রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা আছে। **মাল্টিমিডিয়া** প্রোডাকশনে এ ব্যবস্থা থাকা জরুরী। এছাড়া আজকাল অনেক কম্পিউটারেই **ভয়েস রিকোগনিশন সিস্টেম** আছে। কথা সনাক্তকরণের জন্য মাইক্রফোনের ব্যবহার অপরিহার্য। আপনি বিশেষ কিছু ওয়ার্ড প্রসেসরে কথা বলবেন আর তা **কম্পিউটার** স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাইপ করে যাবে- আপনাকে টাইপ করতে হবে না। দেখুন, কি সুন্দর সিস্টেম! আপনি লেখক বা সাহিত্যিক। কিন্তু কম্পিউটারে টাইপ করা জানেন না কিংবা টাইপ করতে অলসতা বোধ করেন। কোন সমস্যা নেই। আপনি গল্পটি বলে যান- আপনার কথা বুঝার কম্পিউটারটি আপনার জন্য পুরো উপন্যাসটি টাইপ করে যাবে! তবে দুঃখের সাথে বলতে হয়- **ভয়েস রিকোগনিশন সিস্টেম** এখনো শুধুমাত্র ইংরেজী বা অনুরূপ **'লেটিনাইজ্ড'** ভাষায় সম্ভব। নিরাশ হতে নেই- হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তা বাংলায়ও হয়ে যেতে পারে।

ছোঁয়ার প্যানেল বা **টাচ প্যানেল** সাধারণত **লাপটপ** কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্যানেলটি মূলত মাউসের মতো কাজ করে। আপনি এতে আঙ্গুল নেড়ে **মাউস** পয়েন্টারকে নড়াচড়া করতে পারবেন। আরেক ধরনের টাচ সিস্টেম আছে যাকে **টাচ সেসনিটিভ স্ক্রীন** বলে। এই সিস্টেমে স্ক্রীনে প্রদর্শিত যে কোন আইটেম ও আইকনে ছুঁয়ে তাকে ক্রিয়াশীল করা যায়।

অনুরূপ আরেকটি কলমের মতো যন্ত্র আছে যাকে **লাইট পেন** বলে। ব্যবহারকারী ঐ কলমটিকে স্ক্রীনে লাগিয়ে যে কোন বস্তু বা আইকনে ক্লিক করতে পারেন যেভাবে **মাউস** দ্বারা করা হয়। তবে ব্যবধান হলো পেনটি সরাসরি বস্তুর উপরে রেখে হয়

কলমের সাইডের বোতামে টিপ কিংবা কলমে চাপ দিতে হবে। এই সিস্টেমও তেমন জনপ্রিয় হয় নি। মাউসের মতো সহজে আইকন ও **ইনসারশন পয়েন্ট** নিয়ন্ত্রণ, মেনু আইটেম চয়েজ ইত্যাদি কার্যাদি অন্য কোন সিস্টেমেই এখনও করা যাচ্ছে না।

সবশেষে আরেকটি **ইনপুট** যন্ত্র আছে যা আমি কোনদিন ব্যবহার করি নি, তবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এটা ফেবারিট বস্তু। হ্যাঁ, আমি **জয়স্টিক** নামক লম্বা লাঠির মতো বস্তুটির কথা বলছি। এটা মূলত **কম্পিউটার** গেম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আউটপুট যন্ত্রাদি

আমরা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন যন্ত্রাদির মাধ্যমে কম্পিউটারকে **কমান্ড** ও তথ্য প্রদান করি। তবে ফলাফল তো আসতে হবে। **ইনপুট** সিস্টেম থেকে **কম্পিউটার** তথ্যাদি নিয়ে **'সফট্ওয়্যার'** প্রোগ্রামের নির্দেশ মুতাবিক **প্রসেসিং** শেষে ফলাফল কোনো না কোনো ভাবে আমাদেরকে অবগত করাতে হবে। এই কাজের জন্যই **আউটপুট সিস্টেম**। সাধারণত খুব তাড়াতাড়ি প্রদর্শনের জন্য **আউটপুট** যন্ত্র হিসাবে **কম্পিউটার সফট্ওয়্যার** একটি **মনিটর** ব্যবহার করে থাকে। মনিটরটি হতে পারে টিভির মতো টিউবের তৈরী কিংবা একেবারে ফ্ল্যাট **ক্রিস্টেল ডিসপ্লে ইউনিট**, যেমন **লাপটপ** কম্পিউটারের স্ক্রীন। আরো যেসব যন্ত্রাদির মাধ্যমে **আউটপুট** বেরিয়ে আসতে পারে তাহলো, **প্রিন্টার** (রঙ্গিন বা সাদাকালো), **স্পীকার**, **ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার**, **প্রজেক্টার** ইত্যাদি।

কম্পিউটারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ

ইনপুট / আউটপুট বা **আইও** ছাড়াও একটি কম্পিউটারের মধ্যে আরোও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ আছে। এসব যন্ত্রের মধ্যে **অপারেটিং সিস্টেম (অএস), সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ), অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট (এএলইউ), স্টোরেজ, রীড অনলি মেমোরি (রম)** ও **রান্ডম একসেস মেমোরি (র‍্যাম)**, তারের লাইনসমূহ বা **বাস সিস্টেম** সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

কিভাবে কম্পিউটার কাজ করে

আমরা ইতোমধ্যে কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের উপর কিছুটা বলেছি। এবার আমরা **কম্পিউটার** ঠিক কিভাবে কাজ করে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এই

আলোচনাকালে আমরা উপরোক্ত যন্ত্রাদির **ফাংশন** নিয়ে আরোও তথ্যাদি তুলে ধরবো- এতে পাঠকরা ওসব যন্ত্রের সঙ্গে বেশি পরিচিত হবেন।

কম্পিউটার মূলত দু'টি আলাদা তন্ত্রের সাহায্যে **ফাংশন** করে। বিভিন্ন **সলিড** যন্ত্রাদির দ্বারা তৈরী কম্পিউটারের দৃশ্যমান সবকিছুকে বলে **হার্ডওয়ার** (বা কঠিন-যন্ত্রাংশ)। সুতরাং **কিবোর্ড, মাউস, মনিটর, সিপিইউ, প্রিন্টার, মডেম, স্কানার, পেন ড্রাইভ, ফ্লপি ড্রাইভ, রম ড্রাইভ, হার্ড ড্রাইভ,** সংরক্ষণ **ইউনিট্স (মেমোরি)** ইত্যাদি সবই কঠিন-যন্ত্রাংশের অন্তর্ভুক্ত। কম্পিউটারের অপর গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্রের নাম হলো **সফট্ওয়্যার** (তরল-যন্ত্রাংশ)। **সফট্ওয়্যার** হলো **কম্পিউটার প্রোগ্রাম** বা সুচিন্তিত নির্দেশনামা। এর দ্বারা কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়ারকে ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়। **সফট্ওয়্যার** দু' ধরনের আছে। একটি হলো **অপারেটিং সিস্টেম সফট্ওয়্যার** ও অপরটি আলাদা আলাদা ছোট-বড় **ডিজাইন** করা **সফট্ওয়্যার**। প্রথমটি দ্বারা **কম্পিউটার** পরিচালিত হয়। আর দ্বিতীয়টি দ্বারা ব্যবহারকারী তার কাঙ্ক্ষিত **প্রসেসিং** করেন।

১. অপারেটিং সিস্টেম

কম্পিউটার সফট্ওয়্যারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো **অপারেটিং সিস্টেম (অএস)** বা পরিচালনা তন্ত্র। একটা কম্পিউটারের সূইচ অন করার পর থেকেই এই সিস্টেম ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং অফ করার পূর্ব পর্যন্ত তা বন্ধ হয় না। **অএস**-এর তিনটি প্রধান কাজ: ক. সকল **কম্পিউটার** হার্ডওয়ারকে **কো-অর্ডিনেট** ও নিয়ন্ত্রণ করা; খ. সকল **ফাইলকে** বিভিন্ন সংরক্ষণ মাধ্যমে (যেমন: **হার্ড ডিক্স, রম-র‍্যাম মেমোরি, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি), ডিজিটেল ভিডিও ডিস্ক (ডিভিডি)** ইত্যাদি) সুবিন্যস্ত করে রাখা; এবং গ. হার্ডওয়ারের সকল ভুল-ত্রুটি ও তথ্যাদি সংক্রান্ত সমস্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানেজ করা।

অপারেটিং সিস্টেম হলো কম্পিউটারের কেন্দ্রীয় **'ফাদার-ফিগার'**। কম্পিউটারে কোন ক্রিয়াই অপারেটিং সিস্টেমকে না ছুঁয়ে হয় না। তার সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া একটি পূর্বশর্ত। সুতরাং যে কোন কাজ করাতে যেয়ে যখন কেউ **প্রোগ্রাম** তৈরী করবে তখন তাকে বুঝতে হবে যে কম্পিউটারের **অপারেটিং সিস্টেম** কি জিনিস। কারণ, অপারেটিং সিস্টেমের উপর জ্ঞান ছাড়া **প্রোগ্রাম** সৃষ্টি আদৌ সম্ভব নয়। **অপারেটিং সিস্টেম**

আজকাল বিভিন্ন কাজ একইসাথে করতে পারে। এই সিস্টেমকে বলে **'মাল্টিটাসকিং'**। অতীতে **সিঙ্গুলটাসকিং** কম্পিউটারে কোন বিশেষ কাজ শেষে আরেকটি শুরু করতে হতো। যেমন একটি **ডকুমেন্ট** প্রিন্টারে ছেড়ে তা **প্রিন্ট** হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। এখন একই সাথে একাধিক কাজ সারা যায়।

আজকাল বেশ কিছু ভিন্ন **অপারেটিং সিস্টেম** প্রচলিত আছে। তবে সাধারণ **পিসি** ব্যবহারকারীরা তিনটি সিস্টেমের সঙ্গে পরিচিত- এগুলো হলোঃ **ইউনিক্স** (যে কোন কম্পিউটারের **অপারেটিং সিস্টেম** হিসেবে **ইন্সস্টল** করা যায়), **উইন্ডোজ (পিসি)** ও **মেকিনটশ অপারেটিং সিস্টেম- মেক-অএস**।

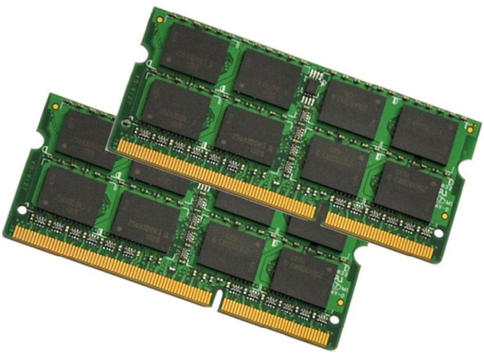
ইউনিক্স এর মতো অনেকগুলো আলাদা **অপারেটিং সিস্টেম** আছে। এরমধ্যে **সানঅএস, জেনিক্স** ও **লাইনাক্স** এখানে উল্লেখযোগ্য। **ইউনিক্স** সিস্টেম ইন্টারনেটের জন্যও বেশ সুবিধাজনক- কারণ এটা যে কোন কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। তবে সিস্টেমটি পরিচালনা বেশ কঠিন। সুতরাং একে একাডেমিক সার্কেলেই বেশি ব্যবহার করা হয়- সাধারণ পাবলিকের জন্য এটা তেমন সুবিধাজনক নয়।

উইন্ডোজ সিস্টেম মাইক্রসফট কর্পোরেশনের সৃষ্টি। এটা সাধারণ পাবলিকের জন্যই তৈরী করা হয়েছে। উইন্ডোজের একাধিক ভারশন বিদ্যমান। লেটেস্ট **উইন্ডোজ** অপারেটিং সিস্টেমের নাম হলো **ভিসটা**। তবে এই বই প্রকাশের সময় হয়তো অপর কোন ভারশন বাজারে এসে থাকবে।

মেকিনটশ কম্পিউটার সাধারণ **পিসি** থেকে কিছুটা আলাদা। যে কোন ব্যক্তি যাতে খুব তাড়াতাড়ি **কম্পিউটার** পরিচালনা শিখে নিতে পারে সেটা বিবেচনা করে এই **কম্পিউটার** সৃষ্টিকারীরাই সর্বপ্রথম **গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (জিইউআই)** আবিষ্কার করেন। মাউসও তাদের আবিষ্কার। **মেক-অএস** বর্তমানে **সিস্টেম-এক্স** নামে পরিচিত। আসলে **মেক-অএস** সিস্টেমকে মাইক্রসফট অনুসরণ করে তাদের **উইন্ডোজ** সিস্টেম তৈরী করেছিল। এর পূর্বে আরেক সিস্টেম চালু ছিল যাকে **ডিস্ক অপরেটিং সিস্টেম (ডস)** বলে। আজকাল এ সিস্টেম প্রায় উঠে গেছে। এর কারণ হলো, **ডস গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেইস সিস্টেম** নয়। **ডস** শিখা কঠিন- প্রত্যেকটি **কমান্ড** জানতে হবে।

২. মেমোরি

কম্পিউটার ছবি, অক্ষর, শব্দ ইত্যাদি কোনো তথ্যই কি জিনিস তা জানে না! এটা একটা **ইলেকট্রনিক** যন্ত্র। এর অর্থ হলো, একমাত্র ইলেকট্রনিক্সভাবে তাকে বিভিন্ন তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত করাতে হবে। **কম্পিউটার** বিজ্ঞানীরা এ কাজ আঞ্জাম দিতে যেয়ে একটু চালাকি করেছেন- তারা আবিষ্কার করেছেন দু'টি মাত্র নাম্বার বা সংকেত: শূন্য (০) ও এক (১)। ০- অর্থ সূইচ অফ আর ১- অর্থ সূইচ অন। লক্ষণীয় বিষয় যে, **কম্পিউটার** সবকিছু এই অন-অফ সূচিং এর মাধ্যমে বুঝে। সুতরাং সব ধরনের তথ্যকে আমরা ০ কিংবা ১ দ্বারা রেপ্রেজেন্ট করতে পারি। এই সংকেতদ্বয়কে বলে **'বাইনারি ডিজিট'**। এগুলোকে **'বিট'**-ও বলে। সুতরাং ১ বিটের মাধ্যমে আমরা দু'টি সম্ভাব্য রেপ্রেজেন্টেশন করতে পারি: ০ এবং ১। তাই একটি সিঙ্গুল বিট তথ্য অর্থ দু'টি সম্ভাবনার নাম- ০ এবং ১। এখন বিট যদি দু'টো হয় তাহলে সম্ভাব্য তথ্য হবে ৪টি (২*২)। যথা: ০০, ০১, ১০, ১১। বিট তিনটি হলে সম্ভাব্য তথ্য আবার দ্বিগুণ হবে (২*২*২) তথা ৮টি। যথা: ০০০, ০০১, ১০০, ১১১, ০১১, ০১০, ১০১, ১১০। লক্ষ করুন, প্রতিটি **'নাম্বার প্যাটার্ন'** আলাদা। এভাবে আমরা বিট যুক্ত করে সম্ভাব্য রেপ্রেজেন্টেশনকে প্রত্যেকবার দ্বিগুণ করে নিতে পরি। আটটি বিট একত্র হলে তাকে বলে একটি **'বাইট'**। সুতরাং এক বাইটে ০ ও ১ এর সম্ভাব্য রেপ্রেজেন্টেশন হবে ২*২*২*২*২*২*২*২ বা $২^{৮}$ = ২৫৬টি।



একটি মাত্র বাইটে যেহেতু ২৫৬টি কম্বিনেশন বিদ্যমান তাই আমরা এতে কিবোর্ডের যাবতীয় **ক্যারেক্টার** সেট সংরক্ষণ করতে পারি। কারণ, **কিবোর্ডে** মোট ক্যারেক্টার সংখ্যাই হলো এক **বাইট** পরিমাণ- অর্থাৎ ২৫৬। এতে ০ থেকে ২৫৬ পর্যন্ত যে কোন নাম্বারও সংরক্ষণ করা যাবে। কিন্তু **কম্পিউটার মেমোরি** এক বাইটসম্পন্ন তো নয়। বাস্তবে তাতে আছে হাজার হাজার বা এমনকি মিলিয়ন বিলিয়ন **বাইট**। এক **কিলোবাইট** সমান ১০২৪ **বাইট**। এতে মোট ১০০০ অক্ষর সংরক্ষণ করা যায়। অরপদিকে **১ মেগাবাইট** (১ হাজার **কিলোবাইট**)

মেমোরিতে আমরা **১** মিলিয়ন অক্ষর সংরক্ষণ করতে পারি। আর **১ গিগাবাইট (১** হাজার **মেগাবাইট)** মেমোরিতে এক বিলিয়ন অক্ষর সংরক্ষণ করা যায়। আজকের কম্পিউটারে **মেমোরি গিগাবাইটস্‌** দ্বারা মাপা হয়। সুতরাং **মেমোরি** সমস্যা এখন অনেকটা অতীতের ব্যাপার।

কম্পিউটারের বাস্তব **মেমোরি** দু' ধরনের। প্রথমটি হলো **রান্ডম একসেস মেমোরি (র‍্যাম)**। এই **মেমোরি** পড়া যায় এবং ব্যবহারকারী (অর্থাৎ **কম্পিউটার প্রোগ্রাম)** এটাকে নিয়ে কাজ করতে পারে। এটা ব্যবহারোপযোগী। অপর মেমোরিটি হলো **রীড অনলি মেমোরি (রম)**। বুঝাই যাচ্ছে, এই **মেমোরি** শুধুমাত্র পড়া যায়। এই মেমোরিকে রদবদল সম্ভব নয়। কিছু বিশেষ **মেমোরি** চীপে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এসব **চীপ** কিন্তু কম্পিউটারের সর্কেটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এটা র‍্যাম মেমোরির অন্তর্ভুক্ত। এতে **১** থেকে **২ গিগাবাইট** পর্যন্ত তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব। র‍্যাম **মেমোরি** যতো বেশী হবে ততোই শক্তিশালী **গ্রাফিক্যাল প্রোগ্রাম** পরিচালনায় কম্পিউটারটি ভালো কাজ করবে। তবে কম্পিউটারের **সার্কেট** থেকে আলাদা যন্ত্রেও তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব। যেমন: **ফ্লপি ডিস্ক** (বর্তমানে এটার ব্যবহার একেবারে নেই বললেই সারে)- সংরক্ষণ ক্ষমতা ২ **মেগাবাইট; হার্ড ড্রাইভ**- সংরক্ষণ ক্ষমতা শত শত **মেগাবাইটস** থেকে কয়েক **গিগাবাইটস** পর্যন্ত; **কমপেক্ট ডিস্ক** বা **সিডি**- সংরক্ষণ ক্ষমতা ৬৮০ **মেগাবাইট; ডিজিটেল ভিডিও ডিস্ক (ডিভিডি)**- সংরক্ষণ ক্ষমতা ৮.৫ **গিগাবাইট;** এবং **পেন ড্রাইভ** - সংরক্ষণ ক্ষমতা ২ থেকে **৩ গিগাবাইট**।

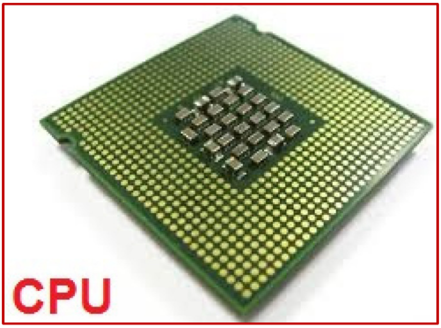


৩. বাস

না, এটা রাস্তার কোন যানবাহন নয়! **কম্পিউটার** বিজ্ঞানে **বাস** অর্থ ভিন্ন। **বাস** আসলে কিছু গুচ্ছকৃত তারকে বুঝায়। বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মধ্যে তথ্য ট্রান্সফারের কাজে এসব তার ব্যবহৃত হয়। বলা যায় **বাস** কোন যান নয় বরং হাইওয়ে রাস্তা। এই রাস্তায় কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের তথ্যাদি চলাচল করে। **বাস** সাধারণত একটি কেবলকে বুঝায় যেখানে বেশকিছু তার প্যারালাল ডিজাইনে তৈরী। একটি তার একটি **বিট** তথ্য ক্যারী করতে পারে- সুতরাং ৮ বিটের জন্য আটটি, ১৬ বিটের জন্য ১৬টি এবং ৩২ বিটের জন্য ৩২টি তারসম্বলিত কেবল থাকতে হবে। আজকাল অনেক **কম্পিউটার** আছে যেগুলোতে ৬৪ **বিট** পর্যন্ত **বাস** আছে।

৪. সেন্ট্রেল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ)

সিপিইউ মানেই **কম্পিউটার**। একটি **কম্পিউটার** এ ইউনিট ছাড়া সম্পূর্ণ গার্বেজ। এটা কম্পিউটারের হার্ট বললেও অত্যুক্তি হবে না। **ইনপুট** সিস্টেম থেকে প্রাপ্ত সবকিছু এই **সিপিইউ** প্রসেস করে **আউটপুট** সিস্টেমে ফলাফল হিসাবে পাঠানো হলো তার কাজ। একটি স্ট্যান্ডার্ড সিপিইউতে থাকে **প্রসেসিং** ইউনিটসমূহ যাদের কাজ হলো **প্রোগ্রাম** বা **সফট্ওয়্যার** নির্দেশসমূহ গ্রহণ, প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ সারা, তুলনা করা, লজিক্যাল সিদ্ধান্ত নেওয়া (অর্থাৎ কোনো বিষয় সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয়- এ কাজের জন্য **বুলিয়ান আলজাবরা** নামক গণিতের একটি শাখা আছে।), সাময়িকভাবে তথ্য জমা রাখা যাতেকরে **সিপিইউ**-এর অন্যান্য অংশ এগুলো প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে, **প্রোগ্রাম** চলাকালে কোন্ অংশ কখন চলবে তা নিয়ন্ত্রণ করা এবং কম্পিউটারের অন্যান্য সকল ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা।



সিপিইউকে পরিচালনা করতে দরকার পড়ে কিছু বিশেষ নির্দেশমালা যাকে বলে **‘কম্পিউটার প্রোগ্রাম’**। **কম্পিউটার** প্রোগ্রামের অপর নাম হলো **‘সফট্ওয়্যার’**। সাধারণত **সফট্ওয়্যার হার্ডড্রাইভ, ফ্লপি** ও **সিডি-রমে** থাকে। এসব স্টোরেজ যন্ত্র থেকেই **প্রোগ্রাম** নির্দেশমালা **‘রান’** করে সিপিইউতে প্রবেশ করানো হয়। **সিপিইউ** ও

কম্পিউটারের **রান্ডম একসেস মেমোরি** এক সাথে কাজ করে। কারণ **সফট্ওয়্যার** নির্দেশসমূহ প্রয়োজনে মেমোরিতে তথ্যাদি রাখে ও বের করে আনে এবং তা সিপিউতে নিয়ে কাজ সেরে আবার মেমোরিতে ঢুকায়। এভাবে **কম্পিউটার সফট্ওয়্যার** দ্বারা **সিপিইউ, মেমোরি** ও অন্যান্য যন্ত্রাংশকে কাজ করানো হয়। কোন যন্ত্রই বিনা নির্দেশে কিছু করে না। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে হয় **অপারেটিং সিস্টেম (অএস)** কিংবা **প্রোগ্রামার** দ্বারা সৃষ্ট **সফট্ওয়্যার** নির্দেশ দ্বারা। প্রতিটি নির্দেশের জন্য র‍্যাম মেমোরিতে কিছু নির্দিষ্ট স্থান রিজার্ভ করা থাকে যাকে বলে **'এডরেস'** বা ঠিকানা। সুতরাং সিপিইউকে যদি কোন বিশেষ তথ্যের ঠিকানা জানানো হয় তখন সে সেখান থেকে তথ্যটি নিয়ে আসতে পারে প্রসেসিংয়ের জন্য।

প্রোগ্রাম চলাকালে **সিপিইউ** ও **র‍্যাম** এর মধ্যে তথ্য লেনদেন হয় পূর্বে উল্লেখিত **বাস** দ্বারা। **র‍্যাম** থেকে তথ্য সিপিউতে বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করার পর **ইন্সট্রাকশন ডিকোডার** নামক একটি ইউনিট (যা **সিপিইউ** এর একটি অংশ) তথ্যগুলোকে সিপিইউয়ের জন্য প্রস্তুত করে। কারণ লিখিত **সফট্ওয়্যার** নির্দেশসমূহ **সিপিইউ** বুঝতে পারে না যতক্ষণ তা **বাইনারি** কোডে রূপান্তর না হয়েছে। এই **ইন্টারপ্রিটার** ইউনিট দ্বারা **ডিকোড** হওয়ার পর প্রস্তুতকৃত **ডাটা** বা তথ্য **সিপিইউ** এর মূল অংশে প্রবেশ করে- যাকে বলে **এ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিট (এএলইউ)**। **এএলইউ** এর কাজ হলো প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ ও **লজিকেল অপারেশন** করা। **এএলইউ** প্রয়োজনে **'রেজিস্টার'** নামক **মেমোরি** অংশে সাময়িকভাবে ডাটা সংরক্ষণ করে থাকে। **রেজিস্টার** থেকে তথ্যাদি খুব দ্রুত আনা ও এতে স্টোরও করা যায়। **এএলইউ** বিশেষ কিছু কাজ করে যেমন যোগ, বিয়োগ, ভাগ, পুরণ এবং **কন্ডিশনেল টেস্ট** ইত্যাদি। এসময় সে ফলাফল হয়তো রামের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে, না হয় অপর রেজিস্টারে জমা রাখবে অতিরিক্ত কাজের জন্য। কোনটি করবে তা-তো অবশ্য নির্ভর করবে প্রোগ্রামের নির্দেশের উপর। এসব চলাকালে **সিপিইউ** যাতে প্রোগ্রামের নির্দেশসমূহ সঠিকভাবে পালন করে যায় তা নিশ্চিতকরণে **'প্রোগ্রাম কাউন্টার'** নামক একটি ইউনিট কর্মরত থাকে।

অন্যান্য কার্যাদি

সিপিইউকে একটি সফল **প্রসেসিং** ইউনিট হিসেবে কাজ করে যেতে আরো কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। যেমন **ফ্লাগ্স** ও **ক্লক পাল্স**। **কন্ডিশনেল টেস্ট** দ্বারা অথবা

কন্ডিশন ছাড়াই প্রোগ্রামের মধ্যে **ব্রাঞ্চিং** বা বিভিন্ন **প্রোগ্রাম** অংশে লাফ মারতে হয়। এই সুবিধার জন্য সিপিইউকে সাহায্য করে **ফ্লাগ্স**। এখানে সময়িকভাবে কিছু তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। ঘড়ি পাল্স ইউনিটের কাজ হলো **সিপিইউ** এর সার্কেটে অনবরত কিছু **ইলেকট্রিকেল পাল্স** প্রেরণ করা। ক্লক পাল্স একাধিক হয়ে থাকে। ক'টি ক্লক পাল্স একটি সিপিইউতে প্রতি সেকেন্ড অতিক্রম হচ্ছে তার হিসাব হলো, **সিপিইউ** এর **প্রসেসিং** গতির একটি মাপ। যেমন একটি **১০০ মেগাহার্টজ প্রসেসর** অর্থ হলো, প্রতি সেকেন্ড এর মধ্যদিয়ে **১০০** মিলিয়ন ক্লক পাল্স অতিক্রম করে। সুতরায় **প্রসেসর** গতি যতো বেশি হবে কম্পিউটারটি ততো বেশি গতিশীল হবে।

৫. প্রোগ্রাম করার ভাষা

আমরা ইতোমধ্যে অনেকবার **প্রোগ্রাম** বা **সফট্ওয়্যার** শব্দগুলো ব্যবহার করেছি। এগুলোর মোটামুটি একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। আমরা এটাও জানতে পারলাম যে, একটি **কম্পিউটার** মূলত **প্রোগ্রাম** দ্বারাই কাজ করে। **প্রোগ্রাম** ছাড়া এটা বৈর্জ্য পদার্থ বৈ নয়। তাহলে **প্রোগ্রাম** বা **সফট্ওয়্যার** আসলে কী জিনিস? আসুন এবার এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে দেখি।

প্রোগ্রাম হলো কম্পিউটারকে আমাদের স্বার্থে ব্যবহার করার একগুচ্ছ বিশেষ **ইন্সট্রাকশন** বা নির্দেশমালার নাম। বেশ কয়েক দশক যাবৎ **কম্পিউটার** বিজ্ঞানীরা সহজে শেখা যায় এমন কিছু **প্রোগ্রাম** করার **'ভাষা'** আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। তারা ইতোমধ্যে অনেক এরূপ ভাষা আবিষ্কারও করেছেন যা সবাই ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছেন- সৃষ্টি করছেন নতুন নতুন **সফট্ওয়্যার**। তবে **প্রোগ্রাম** করার ভাষা একটি ডাইনামিক ব্যাপার- অর্থাৎ এটা সর্বদাই উন্নততর করা চেষ্টা চলছে। **কম্পিউটার** কিন্তু একটি মাত্র ভাষাই বুঝে- এই ভাষার নাম **বাইনারি মেশিন কোড**। সুতরাং **প্রোগ্রাম** করার ভাষা দু' ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমটিকে বলে **'ল লেবেল'** যা কম্পিউটারের সিপিইউকে বুঝানো যায় সহজে। অপরটি হলো **'হাই লেবেল'** যা অনেকটা ইংরেজী ভাষার মতো। সুতরাং হাই লেবেল ভাষা সবাইকে বুঝা অনেকটা সহজ কিন্তু কম্পিউটারকে বুঝানোর জন্য **ইন্টারপ্রিটার** এর দরকার পড়ে। ইন্টাপ্রিটারের কাজ হলো যে কোন ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন কোডে রূপান্তর করা।

৫.১. মেশিন কোড

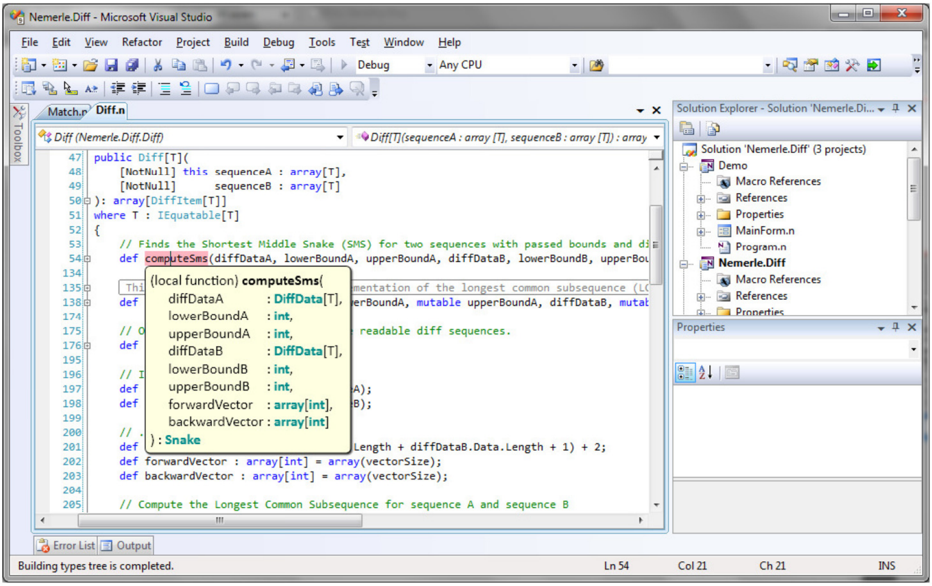
আগেই বলেছি এই ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো কম্পিউটারের **সিপিইউ** এটাকে সরাসরি বুঝতে পারে। সুতরাং মেশিক কোডে লিখিত **প্রোগ্রাম** সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে কাজ করে। তবে দীর্ঘ জটিল **প্রোগ্রাম** মেশিন কোডে লিখা খুব কঠিন। এছাড়া কোডের মধ্যে ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সনাক্তকরণ বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। **মেশিন কোড** মূলত ০ এবং ১ দ্বারা ঘটিত। আজকাল খুব অল্প ক্ষেত্রেই **মেশিন কোড** ব্যবহৃত হয়।

৫.২. এসেম্বলী ভাষা

এসেম্বলী ভাষা উপরোক্ত **মেশিন কোড** থেকে অনেকটা সহজ ও পরবর্তী ঊর্ধ্বদিকের **কম্পিউটার** লেঙ্গুয়েজ। একটা দৃষ্টান্ত হলো: 'MOV A, B' । এই নির্দেশ দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, লকেশন এ-তে যে তথ্য আছে তা কপি করে লকেশন বি-তে নিয়ে যাও। এই একই নির্দেশ মেশিন কোডে ১৬টি ০ ও ১-এর সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ লাইন লিখতে হবে। সুতরাং **এসেম্বলী** ভাষা কম্পিউটারের **সিপিইউ** বুঝবে না- একে প্রথমে **'এসেম্বলার'** নামক অপর আরেকটি বিশেষ **প্রোগ্রাম** দ্বারা পরিবর্তন করে মেশিন কোডে নিয়ে যেতে হবে। এই ভাষা কিন্তু মেশিন কোডের কাছাকাছি। সুতরাং এটা ব্যবহার করলে কম্পিউটারের **সিপিইউ** দ্রুত কাজ করবে। কিন্তু ভাষাটি অত্যন্ত বিমূর্ত। বুঝা কঠিন এবং প্রতিটি নির্দেশ মাত্র সামান্য কাজের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং **এসেম্বলী** ভাষাও আকজাল আর তেমন বেশি ব্যবহৃত হয় না। খুব জটিল দীর্ঘ **সফট্ওয়্যার** সৃষ্টিতে এটা উপযোগী নয়।

৫.৩. উচ্চ লেবেল ভাষা

উপরোক্ত ভাষাদ্বয়কে সাধারণত ল-লেবেল ভাষা হিসেবেই ধরা হয়। উচ্চ লেবেল ভাষা আগেই বলেছি অনেকটা সহজ। বেশ ক'টি উচ্চ লেবেল ভাষা আছে। আমরা এ প্রসঙ্গে জনপ্রিয় কিছু ভাষার উপর আরোও বিস্তারিত আলোচনা করবো।



৫.৩.১. আলগল (ALGOL)

এই ভাষাটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। **আলগল** অর্থ **আলগোরিথমিক লেঙ্গুয়েজ**। এটাই ছিলো প্রথম '**প্রসিডিউরেল**' (একটার পর আরেকটা নির্দেশ মেনে রেজাল্ট বের করা) ভাষা। এই ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই গাণিতিক সমস্যার সামাধানে ব্যবহৃত হয়।

৫.৩.২. বেসিক (BASIC)

এই ভাষাটি এখনও খুব জনপ্রিয়। এটা বেশ সহজ ও **প্রোগ্রামিং** ফিল্ডে নবাগতরা এটা ব্যবহার করে থাকেন। বেসিক অর্থ, **বিগেনার্স অল-পারপোজ সিম্বোলিক ইন্সট্রাকশনস্ কোড**। ১৯৬৫ সালে এই ভাষাটি সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

৫.৩.৩. সি (C)

আগে অব্যহৃত **বি** নামক একটি ভাষার পরেরটি হলো এই **সি**। ১৯৭২ সালে এই ভাষা আত্মপ্রকাশ করে। ভাষাটি **কম্পাইলড্** অর্থাৎ, এর নির্দেশগুলো আগেই মেশিন কোডে রূপান্তর করা হয়। এছাড়া এটা একটি **স্ট্রাকচারড্** ভাষাও। বিভিন্ন ধরনের **কম্পিউটার ফ্লাটফর্মে** নেওয়া সহজ হওয়ায় এই ভাষা এখনও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন।

৫.৩.৪. সি++ (C++)

এটা **সি** ভাষার উন্নততর ভারশন। **১৯৮৫** সালে এই ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটে। **অবজেক্ট অরিয়েন্টেট প্রোগ্রামিং** (প্রতিটি সমস্যাকে একেকটি বস্তু মনে করে যে **প্রোগ্রামিং** করা হয় তাকেই বলে **অবজেক্ট অরিয়েন্টেট প্রোগ্রাম**) -এর সুবিধা থাকায় এটা জনিপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। **একাউন্ট, ফাইনেন্স ও ক্যাড (কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন)** **সফট্ওয়্যারে** এই ভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫.৩.৫. কোবল (COBOL)

কোবল অর্থ, **কমন বিজনিস অরিয়েন্টেড লেঙ্গুয়েজ**। যদিও **১৯৫৯** সালে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ, তথাপি ইংরেজী ভাষার মতো এই **কম্পিউটার প্রোগ্রামিং** ভাষা, বিজনিস সেক্টরে ব্যবহারোপযোগী হওয়ায় এখনও অনেকে এটা দ্বারা **সফট্ওয়্যার** তৈরী করেন।

৫.৩.৬. ফোর্থ (FORTH)

এই ভাষাটি **১৯৭০** সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্থ শব্দটির অর্থ হলো, **ফোউর্থ জেনারেশন ভাষা (৪ জিএল)**। **ইন্টারপ্রিটার** দ্বারা চালিত **স্ট্রাকচার্ড** ভাষা, বিভিন্ন ধররের অনেক **ফাংশন** আছে।

৫.৩.৭. ফোরট্রান (Fortran)

শব্দটির অর্থ, **ফরমুলা ট্রান্সলেশন**। **১৯৫৪** সালে এর প্রথম আবির্ভাব। প্রথমে এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য **ডিজাইন** করা হয়েছিল। ভাষাটি **কম্পাইলড্**, এবং আজকাল বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই ভাষায় **বেরিয়েবল** (পরিবর্তনশীল মাত্রা), **কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট** (অবস্থাসাপেক্ষ নিদের্শনা) এবং আলাদা **প্রোগ্রাম** ইউনিট যাকে বলে **সাবরুটিন** ইত্যাদি আছে। মূলত এই ভাষাই এগুলো আমাদেরকে শিখিয়েছে।

৫.৩.৮. পাসকাল (Pascal)

এখনও জনপ্রিয় এই ভাষাটির নাম ফরাসী বিজ্ঞানী **ব্লেইজ পাসকালের** (১৬২৩ - ১৬৬২) নামানুসারে রাখা হয়েছে। **১৯৭১** সালে এর আত্মপ্রকাশ। ভাষাটি **কম্পাইলড্** (অর্থাৎ আগেই মেশিন কোডে পরিণত করা হয়)। **সিন্টেক্সট্** (ভাষার শব্দসমূহ)

অত্যন্ত সহজ আর **স্ট্রাকচার ও প্রসিডোর** দ্বারা ঘটিত এই ভাষাটি মূলত **আলগলের** মতো (৫.৩.১.)। এছাড়া পাসকালে **ডাটা টাইপ** (বা তথ্যের ধরন যেমন, টেক্স, ক্যারেক্টার, ইন্টেজার (আস্ত নাম্বার), ফ্লোট (ডেসিমেল নাম্বার) ইত্যাদি) আছে। **সি** ভাষার মতো কম্পিউটারের একটি স্ট্যান্ডার্ড ভাষা হলো **পাসকাল**।

৫.৩.৯. ভিবি (VB)

ভিজুয়েল বেসিক নামক এই ভাষাটি এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। ১৯৯০ সালে **মাইক্রসফ্‌ট কর্পোরেশন** এই ভাষাটি আবিষ্কার ও জনপ্রিয় করে তুলে। কোন কোন সময় এই ভাষাকে **র‍্যাপিড এপলিকেশন ডেভোলাপমেন্ট (আরএডি)** নামেও অভিহিত করা হয় এই কারণে যে, খুব অল্প সময়ে বেশ জটিল **কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যার** এটা দ্বারা তৈরী করা সম্ভব।

৫.৩.১০. জাভা (JAVA)

সান মাইক্রসিস্টেম এই ভাষাটির আবিষ্কারক। বর্তমানে **ওয়ার্লড ওয়াইড ওয়েভে** এটা ব্যবহৃত হয়।

৫.৩.১১. এইচটিএমএল (HTML)

১৯৮৯ সালে ইন্টারনেটের জন্য একটি সর্বজনবোধ্য স্ট্যান্ডার্ড ভাষা তৈরী হয়। এ ভাষাটির নামই হচ্ছে, **হাইপারটেক্স মার্কআপ লেঙ্গুয়েজ (HTML)**। ভাষাটি বর্তমানে ইন্টারনেটে **ওয়েভ পেইজ পাবলিশিংয়ের** জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটা খুব সহজও বটে।

উপরোক্ত প্রধান ক'টি **প্রোগ্রামিং** ভাষা ছাড়াও আরো অনেক ভাষা আছে। আমরা এ প্রসঙ্গে ওগুলোর নাম উল্লেখ করবো মাত্রঃ **এডিএ (ADA)**- অগাস্টাস এডা বাইরন, ভাষাটি বর্তমানে সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে; **এপিএল (APL)- এ প্রোগ্রামিং লেঙ্গুজ**, এটা গাণিতিকরা ব্যবহার করেন; **লিস্‌প (LISP) - লিস্ট প্রসেসিং**, এটি **আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট (এআই)** প্রজেক্টে বেশী ব্যবহৃত হয়; **লগো (LOGO)**- গ্রীক শব্দ **লগো** থেকে এর নামকরণ যার অর্থ শব্দ, শিশু-কিশোরদের জন্য সৃষ্ট এই ভাষা মূলত ছবি আঁকার জন্য ব্যবহৃত হয়; **পার্ল (PERL)**- অর্থ **প্রাকটিকেল এক্সট্রাকশন এন্ড রিপোর্টিং লেঙ্গুয়েজ;** ট্যাক্সট্‌ **প্রসেসিং** ভাষা; **পাইলট (PILOT)**-

প্রোগ্রামিং ইনকুয়ারী লেঙ্গুয়েজ অর টিচিং; এসকিউএল (SQL)- স্ট্রাকচার্ড কুয়েরী লেঙ্গুজ, ডাটাবেইজ সৃষ্টির ভাষা; **এক্সএমল (XML)- এক্সটেনসিবল মার্কআপ লেঙ্গুজ,** এটা ইন্টারনেটে ব্যবহৃত হয়; **ফিউচার বেসিক (Future BASIC); আপেল স্ক্রিপ্ট (Apple Script); হাইপারকার্ড (Hypercard)।** এছাড়া আজকাল খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে মাইক্রসফটের **ভিজুয়্যাল বেসিক.নেট (Visual Basic.Net)।** এটা একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ **বস্তুভিত্তিক ভাষা (Object Oriented Language)।**

৬. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

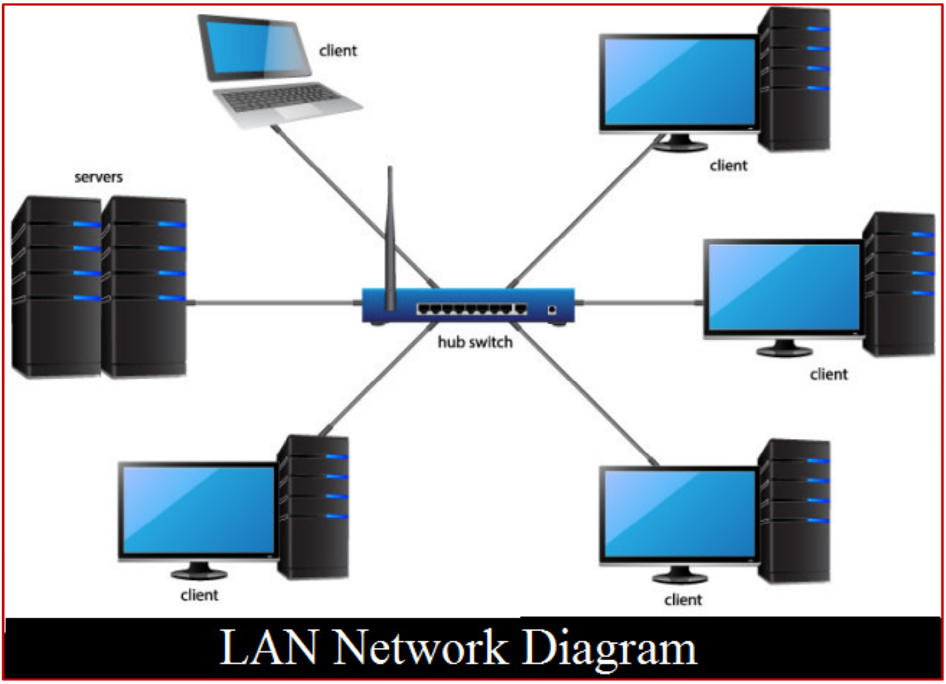
আপনার **কম্পিউটার** অপর যে কোন কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিছু বিশেষ কানেকশন ও **সফট্ওয়্যার** দ্বারা এটা করা হয়ে থাকে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডাটা বা তথ্যাদি খুব তাড়াড়াতি আদান-প্রদান সম্ভব, বিধায় এই সিস্টেম প্রতিটি অফিসে রাখা হয়ে থাকে। এছাড়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই আমরা **'ইন্টারনেট'** ব্যবহার করে থাকি। বর্তমানে দু' ধরনের **নেটওয়ার্ক** ব্যবহৃত হয়: **লকেল এরিয়া নেটওয়ার্ক** (এলএএন) এবং **ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক** (ডব্লিউএএন)।



বাস নেটওয়ার্ক: এই নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্য হলো একটি **কম্পিউটার** অকেজো হলেও অন্যগুলো চলবে।

৬.১. লকেল এরিয়া নেটওয়ার্ক

এই **নেটওয়ার্ক** সাধারণত একই বিল্ডিংয়ে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে। এটার দ্বারা একই **প্রিন্টার, স্কানার** ইত্যাদি সকলে শেয়ার করতে পারেন। বিভিন্ন **প্রোগ্রাম** ও **ফাইল** নেটওয়ার্কের যে কোন কম্পিউটারে দেখা ও ব্যবহারের সুযোগও রাখা যায়। কয়েক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত **এলএএন নেটওয়ার্ক** করা সম্ভব। ছোট থেকে বড় অফিস বিল্ডিং এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এরূপ **নেটওয়ার্ক** থাকে।



এলএএন নেটওয়ার্কের সকল কম্পিউটারকে কেনোভাবে জড়িত করতে হবে। এ কাজ সারতে সাধারণত **নেটওয়ার্ক** কেবল ব্যবহার করা হয়। কেবল কয়েক ধরনের আছে: **কোএক্সিয়েল** তার, **অপটিক্যাল** তার, একজোড়া তামার তার কিংবা **অপটিক্যাল ফাইবার**। এছাড়া বেতার কানেকশনের জন্য **ইনফ্রারেড** ও রেডিও **ফ্রিকুয়েন্সি** ট্রান্সমিশনও কাজে লাগানো সম্ভব। **এলএএস** নেটওয়ার্কে অবশ্য শুধুমাত্র **সিপিইউ**

থাকে তাই নয়, এতে থাকতে পারে একাধিক **প্রিন্টার, স্কানার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, ওয়েভ ক্যামেরা, হার্ড ড্রাইভ** ইত্যাদি। সাধারণত প্রতিটি পিসির সাথে **নেটওয়ার্ক সফট্ওয়্যার** থাকে। সুতরাং কিছু বিশেষ **নেটওয়ার্ক** কেবল দ্বারা অতি সহজে **নেটওয়ার্ক** চালু করা যেতে পারে।

৬.২. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক

বুঝাই যাচ্ছে এই নেটওয়ার্কের অর্থ হলো, সিটি থেকে সিটি কিংবা দেশ থেকে দেশান্তরে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে **নেটওয়ার্ক** সৃষ্টি। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বিরাট ডব্লিউএএন **নেটওয়ার্ক** হলো ইন্টারনেট। আমরা একটু পরই **কম্পিউটার** ও ইন্টারনেটের উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। সাধারণত এই **নেটওয়ার্ক** টেলিফোনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। একই কোম্পানীর বিভিন্ন অফিস নিজস্ব ডব্লিউএএন **নেটওয়ার্ক** করে থাকে। এতে ক্লাসিফাইড **ফাইল** অপরের নিকট প্রকাশ হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং **নেটওয়ার্ক** দ্রুত কাজও করে। এই নেটওয়ার্কের একটি দৃষ্টান্ত হলো দেশব্যাপী ব্যাংকের বিভিন্ন অফিস পরিচালনা।

৭. কম্পিউটার ও ইন্টারনেট

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে বিশ্ব জুড়ে **ইনফরমেশন** (তথ্যাদি) সহজে এবং কম খরচে বিনিময় করার উদ্দেশ্যে **ইন্টারনেট** নামে একটি অভিনব ব্যবস্থা চালু হয়। খুব শীঘ্রই এটা জনপ্রিয় একটি শিক্ষা-মাধ্যম ও তথ্য বিনিময় উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। আজকাল আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে যে কোন অন্যান্য একাধিক স্থানে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এই **ইন্টারনেট** সত্যিই **ইনফরমেশন** টেকনোলজিকে বিপ্লবে পরিণত করে দিয়েছে। কম্পিউটারের উপর এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে এসে আমি এ সর্বাধুনিক **কম্পিউটার** বিপ্লবের উপর আলোকপাত করবো।

ইন্টারনেট হলো একাধিক **কম্পিউটার,** যেগুলো টেলিফোনের মাধ্যমে **নেটওয়ার্ক** হিসেবে জড়িত করা হয়। এ **নেটওয়ার্ক** সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত হতে সক্ষম। অর্থাৎ যেখানেই **টেলিফোন** লাইন থাকবে সেখানে একটি **কম্পিউটার** ইন্টারনেটের নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত করা সম্ভব। এমনকি ল্যান্ড-লাইন না থাকলেও **মোবাইল** ফোনের মাধ্যমে সুদূর মফস্বলে থেকেও আপনি ইন্টারনেটের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ

করতে পারেন। তাহলে, অভিনব এই **টেকনোলজি** আসলে কী- তা একবার তলিয়ে দেখা যাক।



বাস্তবে **ইন্টারনেট** হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড **ইলেকট্রনিক** মাকড়সার জালের মতো **নেটওয়ার্ক**, যা ভূ-গোলকের চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। ইন্টারনেটকে Net বা জালও বলা হয়ে থাকে। যে মুহূর্তে আপনি আপনার নিজের **কম্পিউটার** ও টেলিফোনের **(মডেম)** মাধ্যমে **ইন্টারনেট** খুলবেন, তখন আপনার কম্পিউটারও এই জালের অংশ হিসেবে হয়ে যাবে। নেটওয়ার্কে যে লক্ষ লক্ষ আরও **কম্পিউটার** একই সময় জড়িত আছে, তখন এগুলো আপনার সাথে **ইনফরমেশন** সেয়ার করতে পারবে, অর্থাৎ আপনি তাদের সাথে সরাসরি **ইনফরমেশন** রদবদল করতে পারবেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন ধরনের **ফাইল** স্থানান্তরিত করা যায়। আপনি যদি আপনার কোন বন্ধুর নিকট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানে পত্রাদির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে আপনি ইন্টারনেটের **ই-মেইল (ইলেকট্রনিক মেইল)** সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন। আপনার এ পত্র প্রথমতঃ

একটি **সুপারকম্পিউটার** বা **সার্ভারে** জমা হয়ে থাকবে। যখনই আপনার বন্ধু **ইন্টারনেট** খুলবেন তখনই **সার্ভার** থেকে আপনার বন্ধুর কম্পিউটারে লেখাটা পৌঁছে যাবে। বস্তুত এই **সুপারকম্পিউটার** সার্ভারের মাধ্যমেই ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ ধরনের বহু সার্ভার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়েছে। এই অতিথি বা হস্‌ট কম্পিউটারের মাধ্যমেই আপনি ইন্টারনেটে জড়িত হতে পারবেন।

ইন্টারনেটে যোগ দিতে হলে কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। প্রথমতঃ আপনার একটা **কম্পিউটার** অবশ্যই থাকতে হবে। সেই সাথে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য একটি **মডেম** এর দরকার। আজকাল এই **মডেম** কম্পিউটারের সাথেই এসে থাকে। তারপর ইন্টারনেটে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে কোন একটি **সার্ভিস প্রভাইডার** বা ইন্টারনেটে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

আজকাল ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশেরও বিভিন্ন শহরে এসব **সার্ভিস প্রভাইডার** আছে। এসব প্রতিষ্ঠান মাসিক বা বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট ফি নিয়ে থাকে। তাছাড়া আছে **প্রি-পেইড কার্ড সিস্টেম**। সাধারণত যতোক্ষণ আপনি **ইন্টারনেট** খুলে রাখবেন ততক্ষণ লক্যাল রেইটে **টেলিফোন** খরচ পড়বে, তবে এ খরচটা তেমন বেশী নয়। এর কারণ হলো আপনি পৃথিবীর যে কোন স্থানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকলেও লক্যাল রেইটে **টেলিফোন চার্জ** হবে। আজকাল **ইন্টারনেট সার্ভিস** বেশ সস্তা হয়েছে। লন্ডন-আমেরিকা ও ইউরোপে কোন কোন ক্ষেত্রে **ইন্টারনেট** প্রায় ফ্রি হয়ে গেছে। এসব সার্ভিস প্রভাইডাররা তাদের আয় মূলত বিজ্ঞাপন থেকে পেয়ে থাকে। এছাড়া **টেলিফোন** কোম্পানি থেকেও তারা একটি লভ্যাংশ পায়। **ইন্টারনেট** সত্যিই **ইনফরমেশন** টেকনোলজিকে সর্বসাধারণের নাগালের ভেতরে এনে দিয়েছে। **কম্পিউটার** বিজ্ঞানীদের ধারণা, ২০১০ সালের দিকে পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ বাড়িতে এবং স্কুল কলেজে সর্বত্র **ইন্টারনেট** চালু থাকবে।

পরিচ্ছেদ ৯

মাহাকাশে ভ্রমণ

মানুষ আদিকাল থেকেই পৃথিবীর বাইরে যে বিরটা জগৎ বিদ্যমান সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত এ চেষ্টায় শুধুমাত্র থিওরী ও অনেক ক্ষেত্রে ধারণাভিত্তিক মতবাদ সৃষ্টি ছাড়া, জানার সে ইচ্ছেকে তেমন বেশী অগ্রসর করা সম্ভব হয় নি। এর কারণ হলো, মাত্র শত বছর হয় মানুষ মাটির কবল থেকে মুক্ত হয়ে আকাশপথে ভ্রমণ শিখেছে। আর সত্যিকার অর্থে মহাকাশে কি আছে এবং সবকিছু কিভাবে কাজ করে তা জানতে হলে সেখানে যাওয়ার বিকল্প নেই। বিংশ শতকের শেষ অর্ধে এসে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে উঠে মাহাকশে পদার্পন মানুষের জন্য সম্ভব হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত স্বশরীরে চন্দ্র পর্যন্ত ভ্রমণ করেছে মানুষ- তাবে, কৃত্রিম মহাকাশ যান ইতোমধ্যে সৌরজগৎ পার হয়ে আন্ততারা মহাকাশে যেয়ে পৌঁছে গেছে। আমরা এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র আধুনিক প্রযুক্তির উপর আলোচনা করছি। সুতরাং মাহাকাশে ভ্রমণের ইতিহাস বর্ণনা আমাদের জন্য অপ্রাসঙ্গিক বিধায়, আমরা এই ভ্রমণের প্রযুক্তির উপর এখন বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরবো মাত্র।

মহাকাশ ভ্রমণ প্রযুক্তি

মানবসৃষ্ট মেশিন ও স্বয়ং মানুষের জন্য মহাকাশ একটি কঠিন ও শঙ্কাময় পারিপার্শ্বিকতা বটে। সেখানে বাতাস তো নেই-ই, সেসাথে সূর্যালোকের তেজস্ক্রিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে বস্তুকে প্রচণ্ড গরম করে তুলে আর **'রাতের সাইডে'** অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়ার দিকটি, খুব দ্রুত হীম শীতল ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। সুতরাং মহাকাশ বিজ্ঞানীদেরকে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে এরূপ খুব বেশী বন্ধুত্বহীন পরিপার্শ্বিকতার জন্য মহাকাশযান সৃষ্টি এবং নভোচারীদের নিরাপত্তার জন্যও চিন্তাভাবনা করতে হয়।

মৌলিক ডিজাইন

মহাকাশে যেতে হলে বিশেষ **স্পেইস ক্রাফ্‌ট** যে দরকারী, তাতো আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানীরা এসব **ক্রাফ্‌ট** তৈরীর কিছু মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। প্রতিটি যানে এসব প্রযুক্তি থাকা জরুরী। যানের প্রতিটি অংশই বিশেষ কিছু

কার্যের জন্য **ডিজাইন** করতে হবে। মহাকাশে যাওয়ার পর কতদিন বা কাল যানটি কার্যকরী হবে, উড্ডয়নের সময় যে ভীষণ কম্পন হয় সেটা ক্রাফ্‌টকে সহ্য করে যাওয়া, মহাকাশে প্রেরণ করতে যাতে সর্বনিম্ন শক্তি লাগে তার জন্য ক্রাফটিকে যেটুকু সম্ভব পাতলা (ওজনে কম) হওয়া ইত্যাদি বিষয় ডিজাইনারদেরকে ভাবতে হয়।

দু'টি বস্তু মহাকাশ যানের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো ধাতু দ্বারা আবৃত **প্লাস্টিক** যার নাম **মাইলার** এবং **গ্রাফাইট ইপোক্সি** নামক **কন্সট্রাকশন মেটেরিয়েল** যার ওজন কম অথচ খুব শক্ত। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো খুব ব্যয়সপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং ডিজাইনারদেরকে বাজেটের কথাও ভাবতে হয়। **ইলেকট্রনিক্স** যন্ত্রাদিতে যাতে কম খরচ হয় সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

মাহাকশে উৎক্ষেপণ

মহাকাশ ভ্রমণে সর্বাপেক্ষা কঠিন একটি কাজ হলো উৎক্ষেপণ। কারণ রকেটকে স্থির অবস্থা থেকে খুব দ্রুত ত্বরান্বিত করে **'মুক্তগতি'** পর্যন্ত না তুলতে পারলে এটা মহাকাশে যেয়ে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং উৎক্ষেপণের জন্য খুব বেশী জ্বালানি ব্যবহার করতে হয়।



আইজ্যাক নিউটনের (১৬৪২ - ১৭২৭) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আইন **রকেট** প্রযুক্তির মধ্যে ব্যবহৃত হয়। **রকেট** ইঞ্জিনে থাকে **হাইড্রোজেন** জ্বালানী। **হাইড্রোজেন** জ্বলতে থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল **ম্যাস** (ওজন) অগ্নিকুণ্ডের আকারে রকেটের **ইঞ্জিন** থেকে দ্রুত নীচের দিকে বেরিয়ে আসে। এর ফলে সৃষ্টি হয় একটি উর্ধ্বগতিশীল ফোর্স যা ইঞ্জিনকে উপরের দিকে তুলে।

থ্রাষ্ট বা ধাক্কা

রকেট ইঞ্জিনের **থ্রাষ্ট** বা ধাক্কা পাউন্ড কিংবা **কিলোগ্রাম** দিয়ে মাপা হয়। **১** কে.জি. **থ্রাষ্ট**

এর অর্থ হলো ৯.৮১ মিটার প্রতি সেকেণ্ড গতি। এই গতি মহাকর্ষের ফলে সৃষ্ট ত্বরণ গতির সমপরিমাণ।

এফিসিয়েন্সি বা কার্যদক্ষতা

একটি **রকেট** ইঞ্জিনের **এফিনিয়েন্সি** থেকেই এর সঠিক কার্যক্ষমতা নিরূপণ করতে হয়। **স্পেসিফিক ইম্পালস** (নির্দিষ্ট বেগ) বা **এসপিআই** হচ্ছে এটা নিরূপণের ইউনিট। এই **ইউনিট = গতি / মহাকর্ষ**। সুতরাং রকেটের উর্ধ্বগতিশীলতা যতো বেশি হবে এর নির্দিষ্ট বেগও ততো বড় হবে। সাধারণত **রকেট** ইঞ্জিনের **স্পেসিফিক ইম্পালস** ২০০ ইউনিট হয়ে থাকে। কিন্তু আনবিক শক্তিসম্পন্ন **রকেট** ইঞ্জিনের **এসপিআই** ৮০০ থেকে ৯০০ পর্যন্ত হতে পারে।

মহাকাশে **রকেট** প্রেরণে একাধিক স্টেজ বা পার্যায় ব্যবহৃত হয়। আরোহণের সময় প্রাথমিক পর্যায়ে বিরাট ফোর্সের প্রয়োজন পড়ে। বড় বড় **বুষ্টার** ইঞ্জিনের মাধমে বিরাট মাত্রার জ্বালানি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপগ্রহ বা **স্পেইস** ক্রাফটকি প্রথমে পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্ত করতে হয়। মহাকর্ষ থেকে মুক্তির জন্য যে গতির প্রয়োজন তাকে বলে মুক্তগতি। এই গতি সম্পর্কে একটু পরই আলোচনা হবে।

উর্ধ্বাকাশে আরোহণের পর **বুষ্টার** ট্যাংকের আর প্রয়োজন নেই, তাই এগুলোকে ক্রাফট থেকে আলাদা করে ভূপাতিত করা হয়। সাধারণত এগুলো মহাসাগরে পতিত করা হয় যাতে ভবিষ্যতে আবার ব্যবহার করা যায়। তবে এই প্রথম স্টেজের পরও **স্পেইস** ক্রাফটে আরও **ইঞ্জিন** থেকে যায়। এগুলো ক্রাফটিকে আরও উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়ার পর আলাদা করে দেয়া হয়।

মহাশূন্যে অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে পৌঁছার পর কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে ঘুর্ণমান হয়। তখন আর বেশি ফোর্স বা পাওয়ারের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ক্রাফটিকে সঠিক কক্ষপথে ঘুরানোর জন্য ধাক্কা লাগে যা অল্প শক্তিসম্পন্ন **ইঞ্জিন** দিয়ে সহজে তা সম্পাদন করা যায়। কক্ষপথে একবার ঘুর্ণমান হয়ে গেলে ক্রাফটি পৃথিবীর মহাকর্ষ দ্বারা চালিত হয়। বাস্তবে কক্ষপথে ঘুরার অর্থ হলো পৃথিবীর দিকে এমনিতেই পতিত হওয়া (**ফ্রি ফল**), কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গুলে (বক্রভাবে) পতিত হওয়ায় তা পৃথিবীর উপর এসে পড়ে যায় না। ঠিক যেভাবে পৃথিবীর চতুর্দিকে চন্দ্র তার কক্ষপথে

ঘুরে সেভাবে কৃত্রিম উপগ্রহও একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। সুতরাং চন্দ্রের যেহেতু কোন **ইঞ্জিন** নাই তাই ক্রাফটেরও কোন ইঞ্জিনের প্রয়োজন মূলত নেই। তবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনে আবার পৃথিবীতে ফিরে আনতে যেয়ে ছোট্ট আকারের একটি **ইঞ্জিন** এর গায়ে জড়িত দেয়া হয়।

মিশন

একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ সহজ ব্যাপার নয়। এটা একটি মিশন। প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষজ্ঞ টীম। সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো: **১. লঞ্চ** (উৎক্ষেপণ), **২. ইনফ্লাইট অপারেশন** (উড়ান্তাবস্থায় নিয়ন্ত্রণ) ও ৩. পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা (তবে সবক্ষেত্রে নয়)।

লঞ্চ: রকেট ইঞ্জিনসহ উপগ্রহটিকে খাড়াভাবে একটি **লঞ্চ প্যাডে** রাখা হয়। এরপর উচ্চতর ধাক্কা সৃষ্টিতে বিরাট মাত্রার জ্বালানী ব্যবহারের মধ্যমে ছোড়ে দেয়ার জন্য ফোর্স তৈরী করা হয়। **বুস্টার ইঞ্জিন** থেকে নিম্নের দিকে খুব দ্রুত আগুন বেরুতে থাকে। এরফলে মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে সমস্ত ক্রাফটের বিরাট ওজনকে উপরের দিকে তুলা হয়। স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হতে বেশি পাওয়ারের প্রয়োজন। যেমন, একটি গাড়ির সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী **গিয়ার** হলো **ফাস্ট গিয়ার**। এর কারণ হলো গাড়িটিকে স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল করতে বেশি ফোর্সের প্রয়োজন। কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সময়ও স্থির অবস্থা থেকে উপরের দিকে গতিশীল করতে বেশি শক্তির দরকার হয়। এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বেশি জ্বালানী ক্ষয় হয়ে যায়। **বুস্টার ইঞ্জিন** ক্রাফটির গতি ৭,৬০০ মিটার প্রতি সেকেন্ডে নিয়ে পৌঁছায়। সাধারণতঃ ২ মিনিটের মধ্যেই সমগ্র ক্রাফটটি অন্তত ১০০ মাইল উর্ধ্বে আরোহণ করে।

কৃত্রিম উপগ্রহকে একশত মাইল উর্ধ্বে তুলেই পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুর্ণমান করা হয়। এই কক্ষপথকে বলে **লো আর্থ অরবিট [এলইও]**। **কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট** বা যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহকে আরও বহু উর্ধ্বে নিয়ে যেতে হয়- এই কক্ষপথকে বলে, **জিওসিক্রোনাস** বা **জিওষ্টেশনারী অরবিট [জিইও]**। **কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট** সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। **জিইও** মূলত: ২৪ ঘণ্টার অরবিট। অর্থাৎ

পৃথিবীর দৈনিক গতির সমপরিমাণ, এর ফলে উপগ্রহটি পৃথিবীর যে কোন স্থানের উপর **স্টেশনারী** বা স্থির থাকে।

কোন **স্পেইস** ক্রাফটকে যদি পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হয়, যেমন, আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের জন্য, তাহলে এটাকে মহাকর্ষ থেকে মুক্ত করে দিতে হবে। অর্থাৎ মুক্তগতির মাধ্যমে এমন ধাক্কা দিতে হবে যাতে পৃথিবীর মহাকর্ষ এটাকে আর আটকে রাখতে না পারে [মুক্তগতি সম্পর্কে বিস্তারিত একটু পরই বর্ণিত হবে]।

ইনফ্লাইট অপারেশন: উড়ান্তাবস্থায় ক্রাফটিকে নিয়ন্ত্রণ, ন্যাভিগেশন ও কন্ট্রোল করতে হবে। মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থার বিশেষ অর্থ আছে। **গাইড্যান্স** বা নিয়ন্ত্রণ হলো ক্রাফটিকে কোনদিকে নিয়ে মহাকাশে স্থাপন করা হবে- যেমন, কোনো বিশেষ গ্রহের কক্ষপথে নেওয়া কিংবা অন্য কোনো কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে **ডকিং** (ভিড়ানো) করা। ন্যাভিগেশনের মাধ্যমে উড়ান্তাবস্থায় ক্রাফট্‌টি কোনো বিশেষ সময়ে এবং ভবিষ্যতে ঠিক কোন স্থানে এটি অবস্থান করবে তা নির্ণয় করা হয়। কন্ট্রোলের অর্থ হলো যে কোন সময় ক্রাফট্‌টির গতিপথ রদবদল করার ব্যবস্থা। সাধারণতঃ কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে যে ছোট্ট **রকেট ইঞ্জিন** থাকে সেটি দিয়ে এ কাজটি আঞ্জাম দেওয়া হয়।



একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যেয়ে বিশেষ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। ক্রাফটের ওজন, গতি, অবস্থান, মহাকর্ষ ইত্যাদি বিষয় সঠিকভাবে নির্ণয়ের মাধ্যমে অংক কষে এর নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হবে তা জেনে নিয়ে রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে **অন-**

বোর্ড কম্পিউটারে ইন্সট্রাকশন বা নির্দেশ দিতে হবে। এই কাজটির জন্য থাকে একটি **গ্রাউণ্ড ক্রু।** ক্রাফটের অবস্থান নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। শক্তিশালী **রাডার** থেকে মহাকাশে **সিগনাল** প্রেরণ করা হয়। এই **সিগনাল স্পেইস** ক্রাফট্ থেকে ফিরে আসার পর এর অবস্থান হিসেব করে বের করা যায়। তবে এ উপায়ে অবস্থান নির্ণয় নিম্ন কক্ষপথে স্থাপিত ক্রাফটের বেলা প্রযোজ্য।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের অবস্থান তার নিজের রেডিও **সিগনাল** থেকে জানা যায়। আর যেসব **স্পেইস** ক্রাফট্ আন্তঃগ্রহ মহাকাশে চলমান থাকে এগুলোর অবস্থান জানতে বিজ্ঞানীরা রেডিও **সিগনাল** ও তা ফেরত আসার মাধ্যমে হিসেব করে বের করেন। অবশ্য **সিগনাল** যাওয়া আসার সময়, **রেডশিফট** (টার্গেট পর্যবেক্ষকের নিকট থেকে দূরে যেতে সিগনালের রদবদল- ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে প্রথম পর্বে আলোচনা হয়েছে) এবং **ডপলার এফেক্ট** (এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে) ইত্যাদি বিষয় হিসাবে নিতে হবে। একটি ক্রাফটকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। ক্রাফটের মধ্যেও **অটোমেটিক** নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। মহাকাশে তারার অবস্থান, যে কোন মুহূর্তে তার নিজের অবস্থান ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান ইত্যাদি থেকে ক্রাফটের নিজস্ব **কম্পিউটার** হিসেব করতে পারে ঠিক কোথায় ক্রাফটি আছে এবং কোনদিকে চলতে হবে। প্রয়োজনে এই অটোপাইলট সিষ্টেম দিয়েও যানটিকে কাঙ্ক্ষিত পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পাওয়ার সাপ্লাই

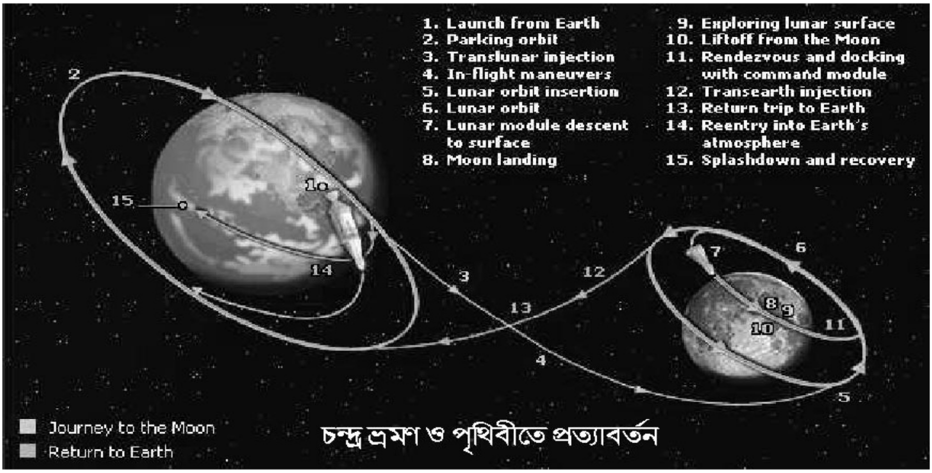
মহাকাশযানের মৌলিক **পাওয়ার সোর্চ** হচ্ছে **ইলেকট্রিসিটি**। স্বল্পমেয়াদী কৃত্রিম উপগ্রহকে সাধারণ **ব্যাটারি** কিংবা উচ্চ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন **ফিউল সেল** দ্বারা **পাওয়ার** দেয়া হয়ে থাকে। **ফিউল সেল অক্সিজেন** ও **হাইড্রোজেন** প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে যার **ওয়েষ্ট প্রোডাক্ট** বা বৈর্জ্য হলো পানি।

দীর্ঘমেয়াদী কৃত্রিম উপগ্রহে থাকে **সোলার প্যানেল**। পাখার মতো স্থাপিত এসব প্যানেলে আছে অসংখ্য **সোলার সেল** [সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির এক ধরণের ব্যাটারি]। কোন কোন ক্রাফটে সেলগুলো চতুর্দিকে জড়িয়ে দেয়া হয়। তবে এই সেলগুলো থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎ কিছু সাধারণ ব্যাটারিকে চার্জের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

কারণ সবসময় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সূর্যালোক পায় না। তার কক্ষপথে ঘুরার সময় এক পর্যায়ে পৃথিবী বা গ্রহের ছায়ার মধ্যে পতিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

সোলার এনার্জি কিন্তু দূর দূরান্তে মিশনের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়। বিরাট গ্রহ জুপিটার ও এর থেকে দূরবর্তী গ্রহে ভ্রমণরত কৃত্রিম উপগ্রহে ছোট্ট আনবিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় **পাওয়ার** সাপ্লাইয়ের জন্য। সংক্ষেপে এগুলো হচ্ছে **থার্মোইলেকট্রিক** (তাপদ্যুিৎ) সিষ্টেম। তেজষ্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট তাপকে **থার্মোকাপোল্স** নামক একটি যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়।

পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাঃ কোন মহাকাশযানকে যদি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন পড়ে যেমন **স্পেইস শাট্ল,** তাহলে একটি নিয়ন্ত্রিত উপায়ে অবরোহণ করতে হবে। প্রথমে **ডিঅরবিট** নামক একটি স্টেজ আছে। এর মাধ্যমে ক্রাফটের মধ্যে স্থাপিত যন্ত্র দিয়ে এটির গতি কমিয়ে আনা হয়। এই অল্পমাত্রায় গতি স্তিমিত হওয়ার ফলেই কিন্তু ক্রাফটটি পৃথিবীর দিকে অবরোহণ শুরু করবে। পৃথিবীর ঊর্ধ্ব বায়ূমণ্ডল এই গতিকে আরও কমাতে থাকবে। এরপর শুরু হবে বায়ূমণ্ডলে **রি-এন্ট্রি** বা পুনঃপ্রবেশ ফেইজ। এই ফেইজ ক্রাফটের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা। ক্রাফটের একটু সামনেই সৃষ্টি হয় বিরাট উচ্চতাপ। বাস্তবে ক্রাফটের দেহে সরাসরি কোন তাপমাত্রা হয় না, গতিশীল ক্রাফট থেকে সৃষ্ট সক-ওয়েভ সামনের বায়ূর মধ্যে কমপ্রেশন (চাপের মাধ্যমে এঁটে দেয়া) তৈরী হয়- যা এই তাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। বাস্তবে বায়ূ **প্লাজমা** অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রার সমান হতে পারে। এই উচ্চতাপে ক্রাফটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। সুরতাং এ থেকে রক্ষার্থে কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। বারবার ব্যবহারযোগ্য **স্পেইস** ক্রাফট শাটল-এর দেহে এই অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য এক ধরণের বিশেষ টাইল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো মূলতঃ তাপ-**ইনস্যুলেটর**- অর্থাৎ তাপকে এই বস্তু ভেতরের দিকে যেতে বাঁধা দেয়।



চন্দ্র ভ্রমণ ও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

উচ্চগতিশীল ক্রাফটকে বায়ুমণ্ডল খুব দ্রুত কম গতিতে নামিয়ে আনে। বাস্তবে বায়ূমণ্ডল গাড়ির ব্রেকের মতো কাজ করে। এসময় অপর একটি ব্যাপার হচ্ছে রেডিও যোগাযোগ **ব্লাক-আউট**। পৃথিবী ও ক্রাফটের মধ্যে যোগাযোগ রাখা যায় না। ভীষণ তাপযুক্ত বাতাস **আয়োনাইজড্** (বা চার্জকৃত) হয়ে ক্রাফটকে ঘিরে রেখে, ফলে রেডিও-তরঙ্গ আসা-যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

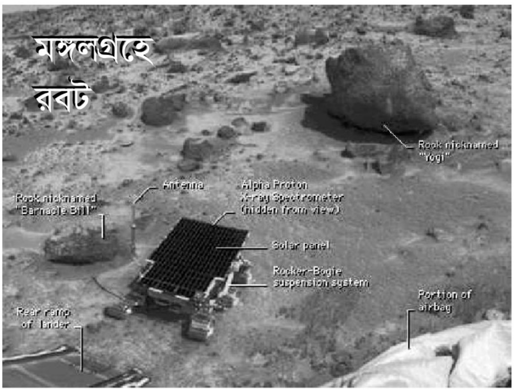
এস্কেপ ভেলোসিটি বা মুক্তিগতি

এ পর্যন্ত মুক্তিগতি শব্দটি একাধিকবার লেখা হয়েছে। এটা হচ্ছে পৃথিবী বা যে কোন গ্রহ-উপগ্রহের মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গতি।

সবকিছুর মধ্যে স্বভাবের মৌলিক ফোর্স মহাকর্ষ ক্রিয়াশীল আছে। একটি বড় জড়বস্তু যেমন সূর্য বা পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট মহাকর্ষ আছে যা তার জড়বস্তুর পরিমাণের (মূলত এর ম্যাসের) উপর নির্ভরশীল। জড় যতো বেশী থাকবে মহাকর্ষও ততো বেশি হবে। মহাকর্ষের এই আকর্ষণ থেকে মুক্ত না হতে পারলে কোন বস্তু কিংবা একটি **স্পেইস ক্রাফট** মহাশূন্যে যেতে সক্ষম হবে না। একটা দৃষ্টান্ত হলো উড়োজাহাজ। আমরা জানি, পৃথিবীর দৈনিক গতি থাকায় পৃথিবীটা একটি উচ্চগতিতে (প্রতি মিনিটে ২৭ কি.মি.) পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে (স্পিন করছে)। উড়ন্ত একটি বিমান যখন আকাশে ভ্রমণ করে তখন এই গতির ফলে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে যেতে গতি হওয়ার কথা, **নিজস্ব গতি + দৈনিক গতি**। অপরদিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে **দৈনিক গতি**

- নিজস্ব গতি হওয়ার কথা। অর্থাৎ যেহেতু নিম্নের ভূমি এমনিতেই ভ্রমণরত সুতরাং এক দেশ থেকে আরেকদেশে উড়ে যেতে নীচের মাটির ভ্রমণকেও হিসাবে ধরতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রেয়োজন নেই। ৫০০ মাইল কিংবা ১০০০ মাইল গতিশীল হলেও বিমানটি আসলে মহাকর্ষের খপ্পর থেকে মুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটি যেভাবে আমাদের নিয়ে ঘুরছে সেভাবে বিমনটিকেও সে না ছেড়ে ঘুরাতে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবী তার বায়ূমণ্ডলসহ ঘুরে। আর বায়ূমণ্ডলে গতিশীল কোন বস্তুকে সে ঘুরায়। একারণে বিমানের গতি হবে নীচের মাটির সঙ্গে তুলনামূলক। কিন্তু বিমানের গতি যদি হয় ১০,৮০০ মিটার প্রতি সেকেণ্ড! তহালে ভিন্নকথা। কারণ এই গতি পৃথিবী থেকে মুক্তির গতি বা **মুক্তগতি**। এরূপ গতিশীল বস্তুকে মহাকর্ষ আটকে রাখতে পারে না। তবে যতো বেশি ঊর্ধ্বে আরোহণ করা হবে মুক্তগতির মাত্রাও ততো বেশি কমে আসবে। বাস্তবে একটি **স্পেইস** ক্রাফট যখন ১ মিলিয়ন মাইল দূরত্বে চলে যায় তখন সেটা পৃথিবীর মহাকর্ষের প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত হবে। কিন্তু তখন এটা সূর্যের বিরাট মহাকর্ষে আবদ্ধ হয়ে ঘুরতে থাকবে। সূর্যের মুক্তগতি হলো ৬১৭.৫ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ড। সুতরাং সৌরজগত থেকে মুক্ত হতে হলে এই গতির প্রয়োজন।

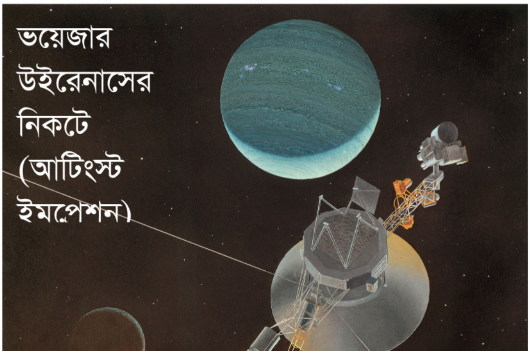
এস্কেপ ভেলোসিটি নির্ণয়ের একটি সরল পদ্ধতি আছে। এই ফর্মুলাটা হলোঃ Sq(2 x GM/R) এখানে Sq অর্থ ব্র্যাকেটের সবকিছুর ফলাফলের **স্কোয়ার রুট**, G হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন্যাল স্থির নাম্বার (বর্তমানে যে নাম্বার সাবাই মেনে নিয়েছেন তা হলো, G = 6.67259 X $১০^{-৮}$), M অর্থ গ্রহের **ম্যাস** (ওজন) এবং R হলো গ্রহের ব্যসার্ধ **(রেডিয়াস)**।



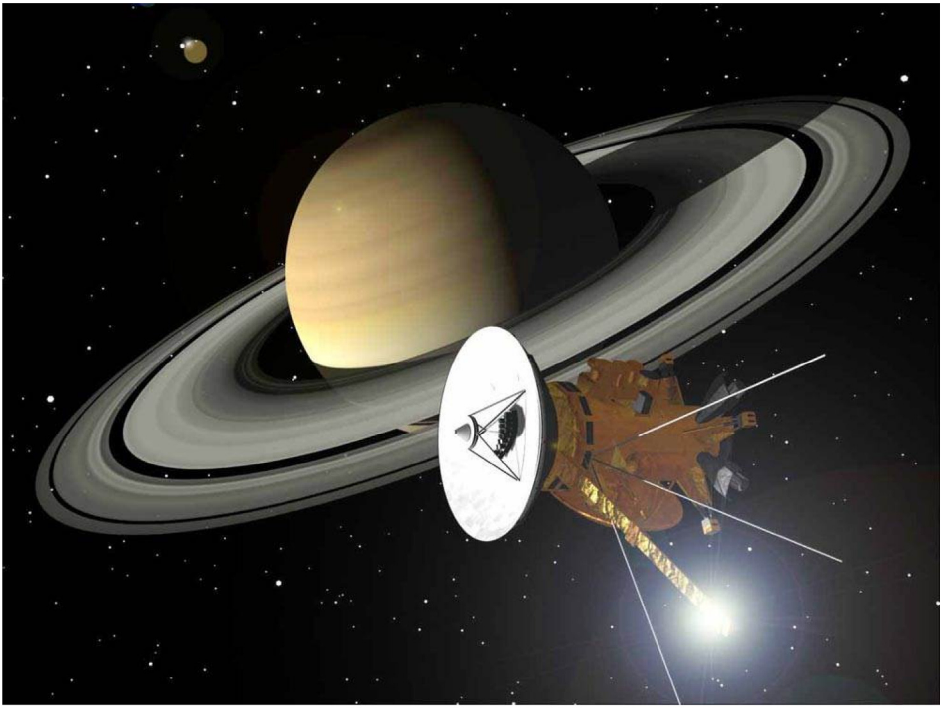
মহাকাশে অভিযান এই মাত্র মানুষ শুরু করেছে। আমাদের সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহে মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। পৃথিবী থেকে প্রথম মানুষ মাত্র ক'দশক আগে আমাদের অকৃত্রিম উপগ্রহ চন্দ্রের মাটিতে অবতরণ করেছে। কিন্তু মাহাকাশ তো বিরাট।

অন্য একটি গ্রহ- মঙ্গলে, মানবশূন্য কৃত্রিম উপগ্রহ অবতরণ করা সম্ভব হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই এ গ্রহে মানুষ গিয়ে পৌঁছবে। আমেরিকা ও রাশিয়া একটার পর একটা কৃত্রিম উপগ্রহ বা **রবট** উপগ্রহ মাহাকাশে প্রেরণ করে যাচ্ছে। দূর-দূরান্তের গ্রহ জুপিটার, শনি, ইউরেনাস ইত্যাদির কাছে এগুলো পাঠিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহ হচ্ছে। মানুষ যদি কোনদিন এই সৌরজগত ছেড়ে যেতে চায়, আর আমার বিশ্বাস যাবেই- তাহলে এসব তথ্যাদি একান্ত জরুরী। তবে সৌরজগত ছেড়ে তারকাজগতের দিকে পাড়ি দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এতে মৌলিক সমস্যা হচ্ছে দূরত্ব।

আমাদের নিকটতম তারাটিই ৩ থেকে ৪ আলোক বৎসর দূরে অবস্থান করছে। অর্থাৎ আলো যেতেই ৩-৪ বছর সময় লেগে যায়। সুতরাং আলোকের কাছাকাছি না হলেও অন্তত ৫০% গতিশীল মাহাকাশযান ছাড়া আন্তঃতারা মানবসহ ভ্রমণ আদৌ সম্ভব নয়। তবে নিরাশ হবার কিছু নয়। ইতোমধ্যে মানবশূন্য একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আন্তঃতারা মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৭৮ সালে **ভয়েজার-১** নামক এই **স্পেইস** ক্রাফটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জুপিটারের বিরাট মাহকর্ষ দ্বারা ধাক্কা দিয়ে এটির গতি ৪০,০০০ মাইল প্রতি ঘণ্টায় উর্ত্তীর্ণ করা হয়। এরপর এটিকে ৯ আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত ভেগা নামক একটি তারার দিকে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে এই উচ্চগতিও কিন্তু অত্যল্প। ভেগায় পৌঁছতে অন্তত ৪০ হাজার বছর লাগবে!


ভয়েজার উইরেনাসের নিকটে (আটিংস্ট ইমপ্রেশন)

আন্তঃতারা ভ্রমণে **'সময় ব্যয় হওয়ার'** ব্যাপারে **আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯ - ১৯৫৫)** আমাদেরকে কিছুটা আশার আলো যোগিয়েছেন। তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, আলোকের গতির সঙ্গে তুলনামূলক গতিশীল **স্পেইস** ক্রাফটের নভোচারীরা অন্তত সময়কে অনেকটা বাঁচাতে সক্ষম হবেন। তাদের কাছে কয়েক আলোক বৎসরের দূরত্বও লাগবে কায়েক মাস কিংবা এরচেয়ে কম সময়। তবে পৃথিবীতে ঠিকই কয়েক বছর পার হয়ে যাবে। তথাপি এই থিওরী আমাদেরকে **টাইম ট্রাভেলের** সম্ভাবনা উন্মোচন করে দিয়েছে যদিও তা শুধুমাত্র ভবিষ্যতের দিকে। এমন দিন হয়তো আসবে, যেদিন এই গ্রহের শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সৃষ্টি মানবজাতি মাহাকাশের অগণিত তারায় তারায় ভ্রমণ করবে। সেদিন আমরা যতো দূরে মনে করছি হয়তো তা ততো দূরে নয়।



শেষ কথা

আলহামদুলিল্লাহ্! দীর্ঘ বছর খানেক নেশাগ্রস্থ পরিশ্রম শেষে **'সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'** শিরোনামে এই গ্রন্থটি রচনার কাজ শেষ করতে সক্ষম হলাম। বিজ্ঞানের উপর এরূপ একটি বড় রচনা যে কোন ব্যক্তির জন্যই দুঃসাহসিক কাজ- আর আমি অধমের জন্য তো তা-ই, বরং প্রায় দুঃসাধ্য বলা যায়। এরপরও মহান প্রভুর মর্জিতে কাজটি আঞ্জাম দিয়েছি। পাঠকদের নিকট এটা কিভাবে সমাদৃত হবে জানি না। তবে আশারাখি এটা পাঠের মাধ্যমে অনেকেরই বিজ্ঞান বিষয়ের উপর জ্ঞানের পিরিধি অন্তত কিছুটা বর্ধিত হবে।

আমরা এই গ্রন্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মৌলিক অনেক বিষয় উপস্থাপন করেছি। শতাধিক ছবি, নক্সা, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি কিছুটা নিজে অঙ্কন করে আর বাকীগুলো ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে বিষয় অনুধাবনে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ছাপানো হয়েছে। তবে একথা মোটেই দাবী করা যাবে না যে, এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের সকল শাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। তার জন্য দরকার বিশ্বকোষের। আর মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন দু'টি বিষয় যে, এদের উন্নয়ন, পরিবর্তন, নতুন তথ্যাদি আবিষ্কার ও অভিনব যন্ত্রপাতির আত্মপ্রকাশ প্রতিনিয়ত ঘটছে। সুতরাং এই গ্রন্থে বর্ণিত অধিকাংশ বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আজ থেকে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো **'আউট-অব-ডেইট'** হয়ে যেতে পারে। ঠিক এভাবেই একশ' দু'শ, পাঁচ শত বছর পূর্বেকার বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সমসাময়িক কালে গ্রহণযোগ্য সত্য হয়েও আজ সেই গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে- বরং ইতিহাসের বিষয় হিসাবে অস্তিত্বশীল আছে মাত্র। যা হোক, একুশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানমহলে গ্রহণযোগ্য তথ্যাদি এই গ্রন্থের মাধ্যমে সবার জন্য সরল বাংলায় বর্ণনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি এ কারণে যে, পাঠকদের মনে আশাকরা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি সাধারণ আগ্রহ বাড়বে। এতে সমাজে যদি বিজ্ঞানের প্রতি জনপ্রিয়তা ও চেতনা সৃষ্টিতে কিছুটা অবদান রাখে তাহলে গ্রন্থটির উদ্দেশ্য সফল হবে। আর আধুনিক এই যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিই যে, বৈষয়িক উন্নয়নের চাবিকাঠি তা-তো আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।